প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৫৮

প্রকাশক : অমল গুপ্ত অয়ন ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড

কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রাকর : রবীন্দ্রনাথ দাশ মুদ্রাকর প্রেস

১০/১সি মারহাট্টা ডিচ্ লেন

কলকাতা ৭০০ ০০৩

আলোকচিত্রশিল্পী : প্রিয়রঞ্জন রক্ষিত

প্রচ্ছদ : অজয় গুপ্ত

● সূচীপত্র ●

● চিত্রসূচী ●

টাইট্‌ল ও প্রথম ফর্মার মধ্যে মোট দশ পৃষ্ঠার ছবি নিচের ক্রম অনুসারে সাজানো হয়েছে :

১. উপরে বাঁ দিক ২. উপরে ডান দিক
৩. নিচে বাঁ দিক ৪. নিচে ডান দিক

• ভূমিকা •

শহুরে-সমাজের বর্তমান যে চিত্রটি খুব সহজেই চোখে পড়ে তা হলো, একদিকে দুর্নীতিপরায়ণ রাজনীতিজীবী ও বৃহৎবণিকচক্র, ঘুষখোর অকর্মণ্য আমলা ও কর্মচারী, চোরাকারবারী ফাটকাবাজ-স্মাগলার-ভেজালদারদের দৌরাত্ম্য এবং অন্যদিকে এদেরই অনুগ্রহপুষ্ট সমাজবিরোধী মস্তান ও গুণ্ডাবাহিনী কালো-টাকার প্রাচুর্যে গা-ভাসিয়ে চলেছে, অনর্জিত অর্থের দাপটে অশালীন প্রতিযোগিতা করে বিলাসব্যসনের পঙ্কে নিজেরা তো ডুবছেই, যুবশক্তিকেও প্রলুব্ধ করে ডোবাচ্ছে আদর্শহীন ভ্রষ্টাচারের পঙ্ককুণ্ডে।

মুঘল যুগের শেষ দিকেও বিদেশী নীতিহীন বণিক-সংস্থাগুলির কৃপাপুষ্ট একশ্রেণীর নব্যধনিকের (এবং অভিজাতের) উদ্ভব হয়েছিল। বাংলায়, বিশেষত কলকাতায়, এঁরা মত্ত ছিলেন বাঈনাচ, বুলবুলি ও ঘুড়ির লড়াই, আখড়াই-হাফ-আখড়াই-ফুল আখড়াই দোল দুর্গোৎসব নিয়ে মাত্রাহীন আড়ম্বরে এবং তরল-বিলাসিতার ব্যয়বহুল, লক্ষ্যহীন, আদর্শহীন প্রতিযোগিতায়। আজকের তথাকথিত বারোয়ারী পূজা, দোল-দেওয়ালীর তাণ্ডবে এবং ভুইফোঁড় পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে স্থূল অশালীন বিকৃতরুচির নাচগাননাটকের রমরমা ব্যবসায়ের মধ্যে সে-যুগের খানিকটা আভাস পাওয়া যেতে পারে।

এটা বাবু কালচারের একটা দিক। আজিম-উস্-সান পর্যন্ত জন্ কোম্পানীর কাছ থেকে উপঢৌকনের নামে ঘুষ নিচ্ছেন দেখলে বোঝা যায়, সে-যুগে এবং তার পরবর্তীকালে নৈতিক মানের অধঃপতন কতখানি হয়েছিল। এই নব্য ধনিক-শ্রেণীর মানসিকতা অননুকরণীয় ভাষায় হুতোম তাঁর নক্সায় বর্ণনা করেছেন :

> "নবাবী আমল শীতকালের সূর্য্যের মত অস্ত গ্যালো। মেঘান্তের রৌদ্রের মত ইংরাজের প্রতাপ বেড়ে উঠলো। বড় বড় বাঁশ ঝাড় সমূলে উচ্ছন্ন হলো। কঞ্চিতে বংশলোচন জন্মাতে লাগলো। নবো মুন্সি, ছিরে বেনে ও পুঁটে তেলি রাজা হলো। সেপাই পাহারা, আসা সোটা ও রাজা খেতাব, ইণ্ডিয়া রবরের জুতো ও শান্তিপুরের ডুরে উড়ুনির মত রাস্তার বাঁদাড়ে, ও ভাগাড়ে গড়াগড়ি যেতে লাগলো। কৃষ্ণচন্দ্র, রাজবল্লভ, মানসিংহ, নন্দকুমার, জগৎশেঠ প্রভৃতি বড় বড় ঘর উৎসন্ন যেতে লাগলো, তাই দেখে হিন্দু ধর্ম, কবির মান, বিদ্যার উৎসাহ, পরোপকার ও নাটকের অভিনয় দেশ থেকে ছুটে পালালো। হাফ আখড়াই, ফুল আখড়াই, পাঁচালী আর যাত্রার দলেরা জন্মগ্রহণ কল্লো।

সহরের যুবকদল গোখুরী, ঝকমারী ও পক্ষীর দলে বিভক্ত হলেন। টাকা বংশগৌরব ছাপিয়ে উঠলেন।"

এবং আক্ষেপ করেছেন :

"হায়! যাদের জন্মগ্রহণে বঙ্গভূমির দুরবস্থা দূর হবার প্রত্যাশা করা যায়, যারা প্রভূত ধনের অধিপতি হয়ে স্বজাতি, সমাজ ও বঙ্গভূমির মঙ্গলের জন্য কায় মনে যত্ন নেবে, না সেই মহাপুরুষরাই সমস্ত ভয়ানক দোষ ও মহাপাপের আকর হয়ে বসে রইলেন, এর বাড়া আর আক্ষেপের বিষয় কি আছে। আজ এক শ' বৎসর অতীত হলো, ইংরাজরা এদেশে এসেছেন, কিন্তু আমাদের অবস্থার কি পরিবর্ত্তন হয়েছে? সেই নবাবী আমলের বড় মানুষী কেতা, সেই প্যাকানো কাছা, সেই কোঁচান চাদর, লপেটা জুতো ও বাবরি চুল আজও দেখা যাচ্ছে, বরং গৃহস্থ মধ্যস্থ লোকের মধ্যে পরিবর্ত্তন দেখা যায়, কিন্তু হুজুরেরা যেমন তেমনি রয়েছেন!"

ইংরেজ-রাজ ভক্ত লোকনাথ ঘোষ সে-যুগের 'হুজুর' শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য পরিবার ও ব্যক্তির পরিচিতি দিয়েছেন সানন্দ গৌরবে—দেখা যাচ্ছে হুজুরদের সকলেই বিলাসব্যসনে দিন কাটাতেন না; তাঁদের অনেকেই শিক্ষাবিস্তারে উদ্যোগী, বিদ্যোৎসাহী, সমাজসংস্কারের পক্ষে বা বিপক্ষে আন্দোলনকারী, (খেতাব পাবার আকাঙ্ক্ষায় হলেও) জনহিতৈষণামূলক কাজে বিপুল অর্থব্যয়ে অকৃপণ। সঙ্গে সঙ্গে লেখক 'গৃহস্থ মধ্যস্থ' শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের পরিচয় ও কর্মজীবনের (তৎসহ সে-যুগের বিভিন্ন আন্দোলনের) তথ্যভিত্তিক বিবরণ দিয়েছেন। এই দুই শ্রেণীর মিলিত চেষ্টায় শিক্ষা সংস্কৃতি শিল্প সাহিত্য বিজ্ঞান ধর্ম দেশাত্মবোধ প্রভৃতি প্রায় সর্বক্ষেত্রেই নতুন চিন্তা চেতনা ও আন্দোলনে সমাজ ও দেশ উদ্বুদ্ধ ও আন্দোলিত হয়ে উঠেছিল, যার ফলে উনবিংশ শতকে রেনেসাঁ সম্ভব হয়েছিল—আশ্চর্য দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে উঠেছিল এই একটি শতক: স্বল্প পরিসরে হলেও, গ্রন্থকার যুগটিকে বিভিন্ন জীবনীর মাধ্যমে সাফল্যের সঙ্গে আঁকতে পেরেছেন।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কলকাতায় কুঠি স্থাপনের সময় থেকে তাঁদের আশ্রয় প্রশ্রয় সহায়তায় ব্ল্যাক জমিন্দার বা রতন সরকারের মতো যে-সব এদেশীয় হঠাৎ ধনী মানী ক্ষমতাবান হতে থাকেন এবং উনিশ শতকের তৃতীয় পাদ পর্যন্ত ইংরেজ রাজ ও ইওরোপীয় শিক্ষার কল্যাণে যে-সকল জ্ঞানীগুণীর আবির্ভাব হয়, এঁদের বিশেষত মহারাজা, রাজাধিরাজ রাজা, রাজা বাহাদুর, নবাব বাহাদুর, স্যার রায়বাহাদুর, খানবাহাদুর, রায় সাহেব, খান সাহেব প্রভৃতিদের জীবনী নথিভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা ঐ সময় অনুভূত হতে থাকে। বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির জীবনী বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিতও হয়। অন্যান্যের মধ্যে অন্যতম সিভিলিয়ান

ডবলু এইচ ডইলি "ইণ্ডিয়ান পীয়ারেজ" নামে একখানি পুস্তক রচনার পরিকল্পনা নিয়ে তথ্য সরবরাহের জন্য ভারতীয় খেতাবধারীদের কাছে অনুরোধমূলক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন (১৮৭৭), ডইলি সাগ্রহ সাড়া পেতে থাকেন : বহু তথ্যও সংগৃহীত হয়—দুর্ভাগ্যবশত ডইলি তাঁর পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। এরও পূর্বে লোকনাথ ঘোষ তাঁর 'The Modern History of Indian Chiefs, Rajas Zamindars Ec.' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড (আংশিকভাবে অনূদিত বর্তমান গ্রন্থ) The Native Aristocracy and Gentry of India' রচনা ও প্রকাশ করবার উদ্দেশ্যে তথ্য সরবরাহের অনুরোধ জানিয়ে সংবাদপত্রে (Hindu Patriot, 1876 বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে থাকেন, চিঠি লিখে ও ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করেও প্রভাব প্রতিপত্তিহীন 'নেটিভ' লেখক বিশেষ সাড়া পাননি। ১৮৭৯তে তাঁর গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হওয়ায়, ডইলি তাঁর পরিকল্পনা ত্যাগ করায় আর গ্রন্থকার ঘোষের অক্লান্ত চেষ্টায় বেশ কিছু তথ্য বিভিন্ন ব্যক্তি ও পরিবারের কাছে থেকে সংগৃহীত হয় ; যাঁরা কোন সাড়া দেন নি, তাঁদের বন্ধু বান্ধবের কাছে থেকে বা প্রকাশিত পত্র পত্রিকা ও পুস্তক থেকে তথ্য আহরণ করে এই গ্রন্থখানি তিনি ১৮৮১তে প্রকাশ করেন। এই খণ্ডে দেশীয় রাজ্য, প্রদেশ এবং প্রেসিডেন্সি অনুযায়ী ন'টি বিভাগ আছে : প্রথম বিভাগটিতে দেওয়া হয়েছে বাঙলা বিহার ওড়িশার "Aristocracy And Gentry of India"-র পরিচয়। "কলকাতার বাবু বৃত্তান্ত"-এ প্রথম বিভাগের পঞ্চম পরিচ্ছেদ থেকে প্রধানত কলকাতা কেন্দ্রিক জীবনীগুলি অনুবাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যথাসম্ভব মূলানুগ-অনুবাদ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

মূল গ্রন্থের লেখক লোকনাথ ঘোষের জীবনী লেখা হয়েছিল কিনা আমাদের জানা নেই। তবে এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কাঁটাপুকুর (বাগবাজার)-এর দেওয়ান হরিঘোষের পরিবারের বংশ লতিকা থেকে অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না যে, লোকনাথ ঘোষের জন্ম এই বংশে। আমাদের অনুমান ঠিক হলে, তাঁর পিতা মুক্তীশ্বর ঘোষ ছিলেন পুরী হাসপাতালের চিকিৎসক। লোকনাথ ঘোষ প্রণীত "Musics appeal to India" শীর্ষক পুস্তিকা ও লেখক সম্বন্ধে মধ্যস্থ (পৌষ, ১২৮০, পৃষ্ঠা ৬৩৮) 'প্রাপ্ত গ্রন্থাদি সম্বন্ধে উক্তি'তে লিখছেন—

"৮। 'Musics Appeal to India' অর্থাৎ ভারতবাসীদিগের নিকট সঙ্গীতের আর্দ্ধাশ। এখানি ইংরাজী ভাষায় লিখিত এবং অতি ক্ষুদ্রাক্ষরে ডিমাই ৮ পেজি ফরমের প্রায় চারি ফরম পরিমাণে মুদ্রিত।"

এই প্রসঙ্গে লেখক সম্পর্কে বলা হয়েছে—

"বঙ্গ-সঙ্গীত বিদ্যালয়ের অন্যতর ছাত্র শ্রীযুক্ত বাবু লোকনাথ ঘোষ ইহার রচয়িতা। ইনি ইংরাজীতে সুপণ্ডিত, বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের উচ্চশ্রেণীর কর্মচারী।

ইঁহার স্বভাব ও চরিত্র, যতদূর জানি, বিশেষ প্রতিষ্ঠার যোগ্য। এমন সকল লোক বঙ্গ-সঙ্গীত বিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাতে বিদ্যালয়ের বিশেষ গৌরব ও ভাবী উন্নতির চিহ্ন, সন্দেহ নাই।"

গ্রন্থের আখ্যাপত্রে লেখক-পরিচিতি দিয়ে লেখক লিখেছেন :

তিনি 'Honorary Registrar Bengal Music School, Member of the Family Literary Club, Author of Victoria Stutika : A Sanskrit Hymn Book in Honor of Her Most Gracious Majesty The Queen Empress of India, The Music and Musical Notation of Various Countries, The Modern History of The Indian Chiefs, Zamindars, Ec. Part 1, Rajas, The Native States Ec. Ec.'

গ্রন্থখানি 'His Excelleney The Most Honb'le (sic !), George Frederick Samuel, Marquess of Ripon, K. C., P. C., C. M. S. I., Viceroy and Governor-General of India'-কে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও নম্রতার সঙ্গে উৎসর্গ করা হয়েছে।

"কলকাতা পুরশ্রী" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসমরেশ চট্টোপাধ্যায় বিশেষ আগ্রহ সহকারে এই অনুবাদগ্রন্থের প্রায় সবটাই ধারাবাহিকভাবে তাঁর পত্রিকায় প্রকাশ করেন—এজন্য তিনি আমার ধন্যবাদার্হ। বন্ধুবর শ্রীঅশোককুমার উপাধ্যায় ('সেকালের দারোগা কাহিনীর' অন্যতম সম্পাদক) প্রেরণা ও উৎসাহ না দিলে এ অনুবাদ সম্পন্ন হত না। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁকে ছোট করব না। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থখানির একটি কপি শ্রদ্ধেয় অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে তাঁর পুত্র বন্ধুবর শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ দীর্ঘদিনের জন্য ব্যবহার করতে দেওয়ায় তাঁর নিকট আমি বিশেষভাবে ঋণী। মূল গ্রন্থে বর্ণিত চরিত্রগুলির কোন আলোকচিত্র না থাকলেও, অনুবাদ গ্রন্থখানিতে প্রকাশক শ্রীঅমল গুপ্ত বহু আয়াস ও ব্যয় করে ৪০ খানি আলোকচিত্র দিয়েছেন; তবে তিনিও, চেষ্টা সত্ত্বেও বেশ কিছু আলোকচিত্র বা প্রতিকৃতি সংগ্রহে সমর্থ হন নি। রাণী স্বর্ণময়ীর প্রতিকৃতি দেবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। আলোকচিত্রগুলি সংগ্রহে শ্রীসুনীল দাস প্রভৃত সাহায্য করেছেন, এজন্য তিনি আমার ধন্যবাদার্হ।

উৎসর্গ

বর্তমান সমাজ-সচেতন যুবশক্তির উদ্দেশে অনুবাদপুস্তকখানি
উৎসর্গিত হল

অনুবাদক
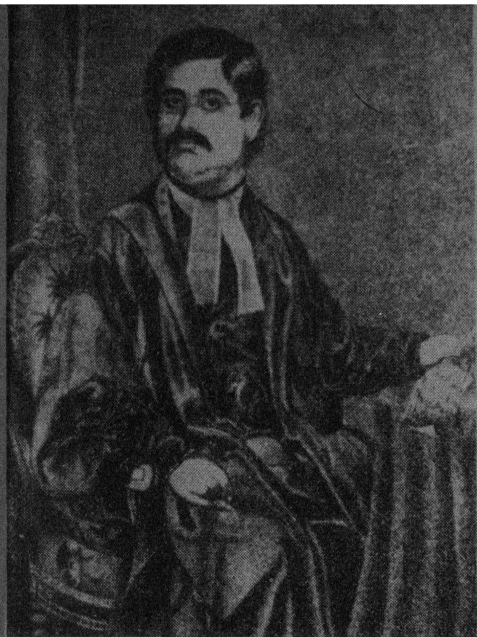
১. অনুকূলচন্দ্র মুখার্জী ২. দিগম্বর মিত্র
৩ দুর্গাচরণ লাহা ৪. হরচন্দ্র ঘোষ
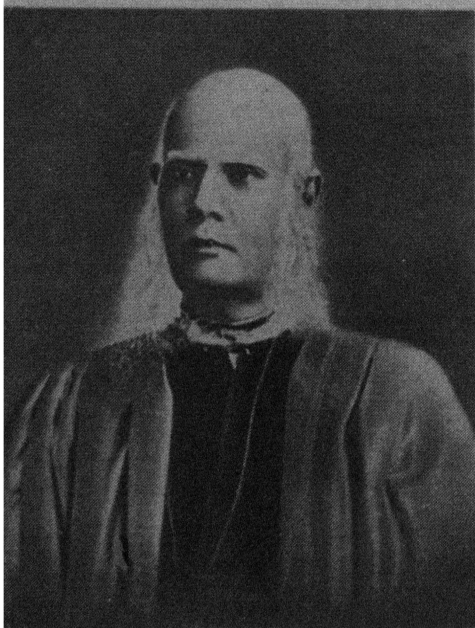
১. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ২. কৃষ্ণদাস পাল
৩. কৃষ্টমোহন ব্যানার্জী ৪. মতিলাল শীল
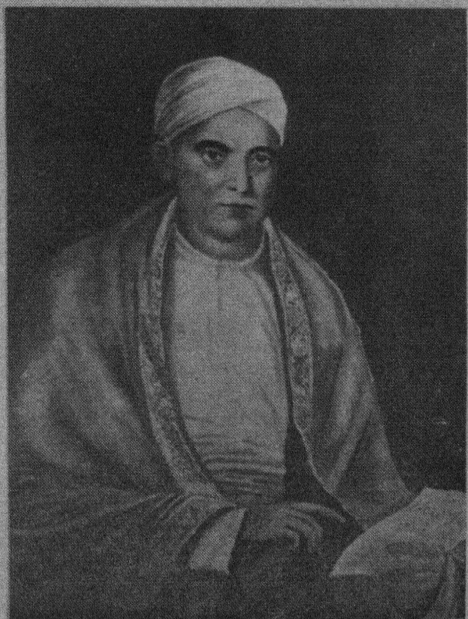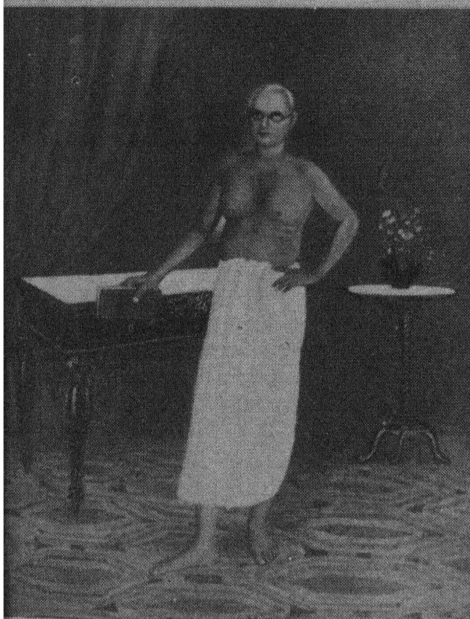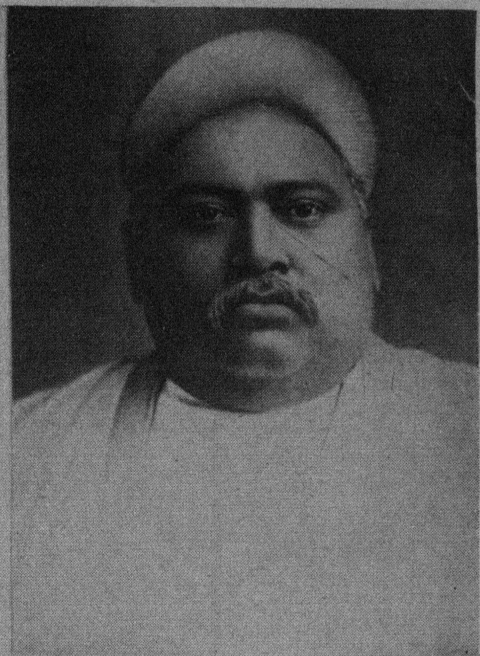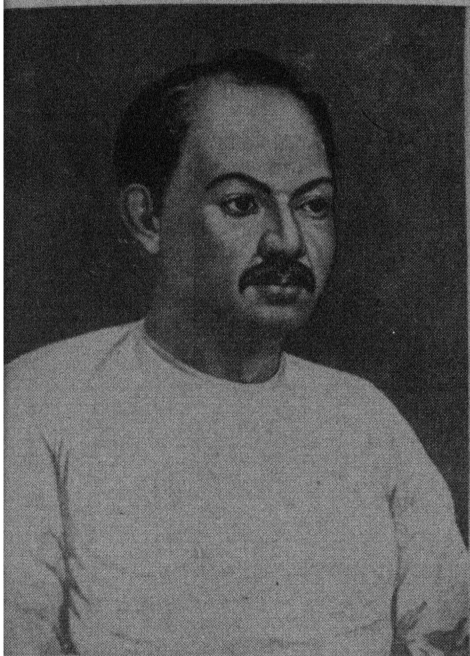
১. রাজেন্দ্র মল্লিক   ২. যদুলাল মল্লিক

৩. নন্দলাল বসু   ৪. রামদুলাল দে (সরকার)
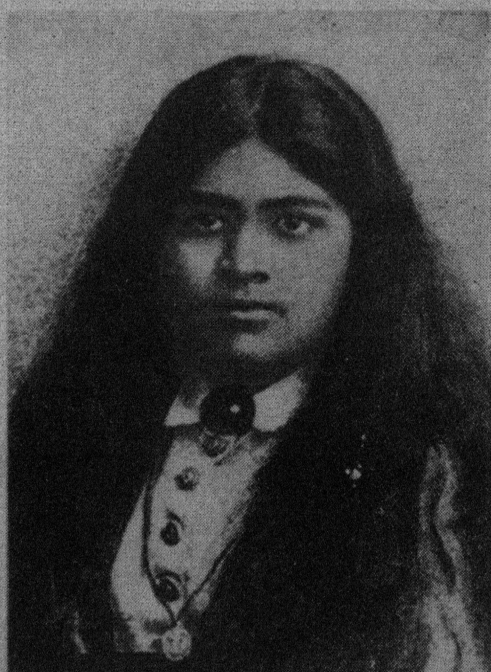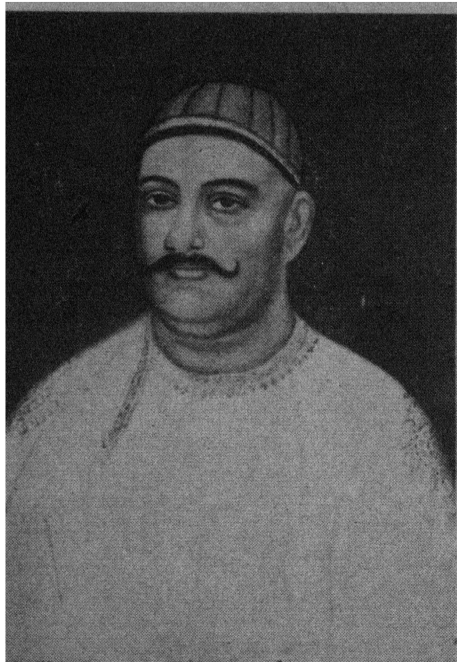
১. আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু) ২. রামগোপাল ঘোষ
৩. রামমোহন রায় ৪. তরু দত্ত
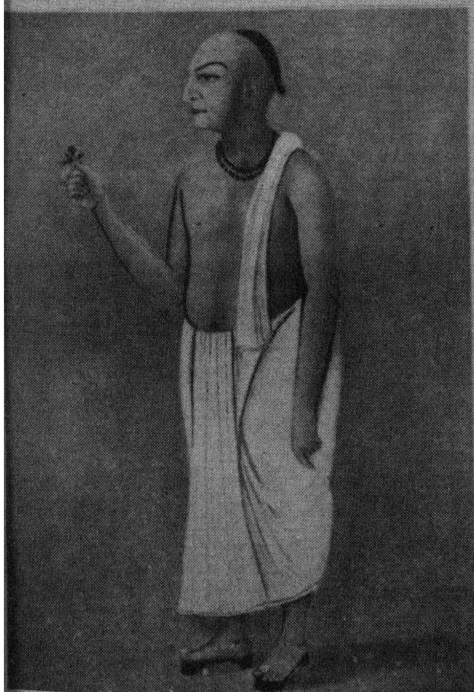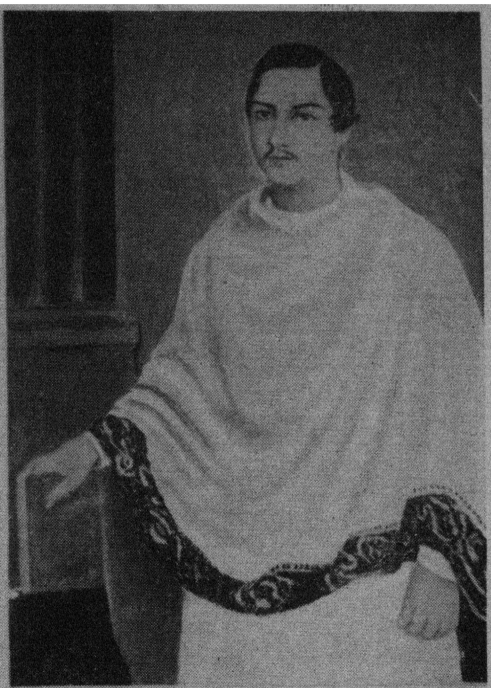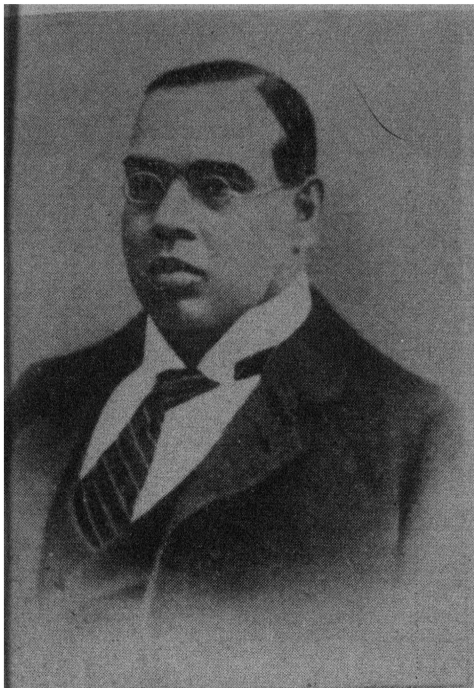
১. রমেশচন্দ্র দত্ত ২. কালীপ্রসন্ন সিংহী
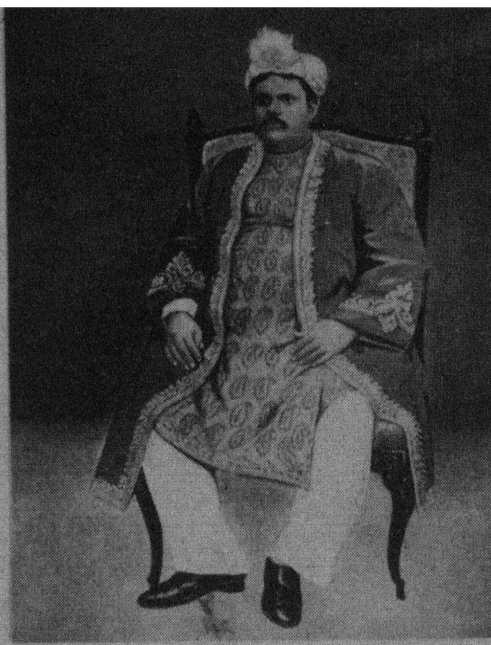
১. কমলকৃষ্ণ দেব ২. বিনয়কৃষ্ণ দেব
৩. নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব ৪. রামকমল সেন
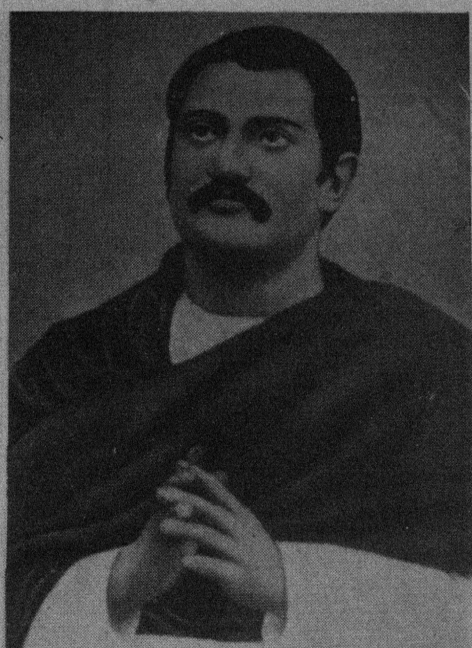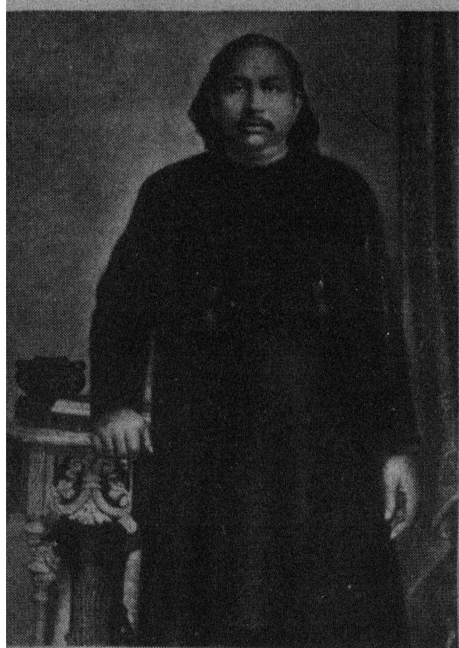
১. নরেন্দ্রনাথ সেন ২. কেশবচন্দ্র সেন
৩. গোপীমোহন ঠাকুর ৪. যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর
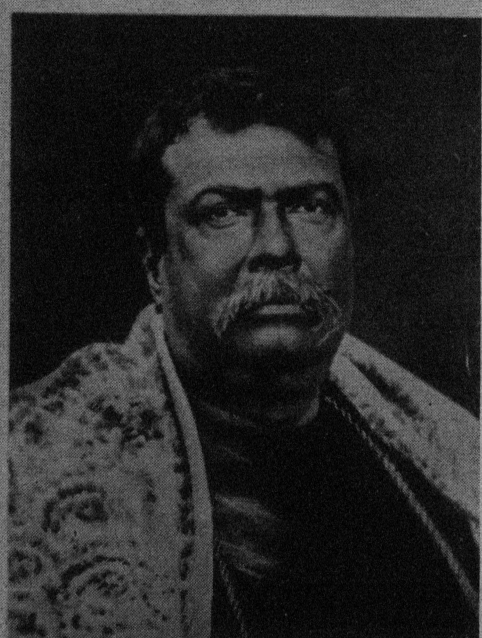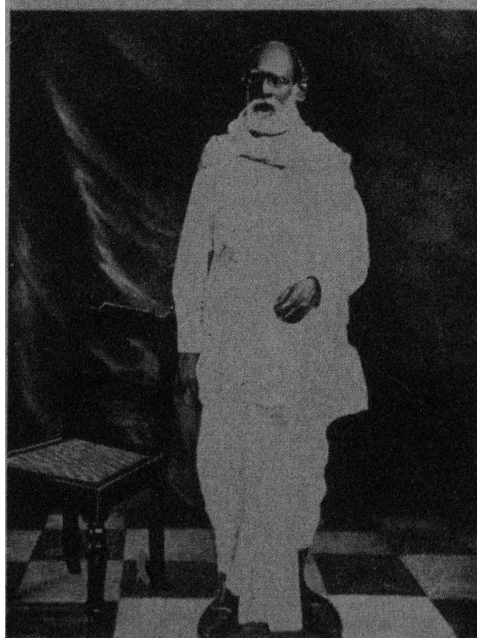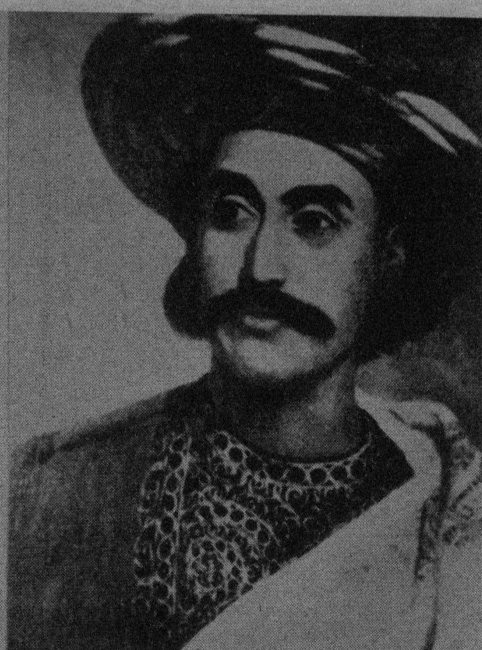
১. প্রসন্নকুমার ঠাকুর ২. দ্বারকানাথ ঠাকুর
৩. সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ৪. ডাঃ যদুনাথ মুখার্জী
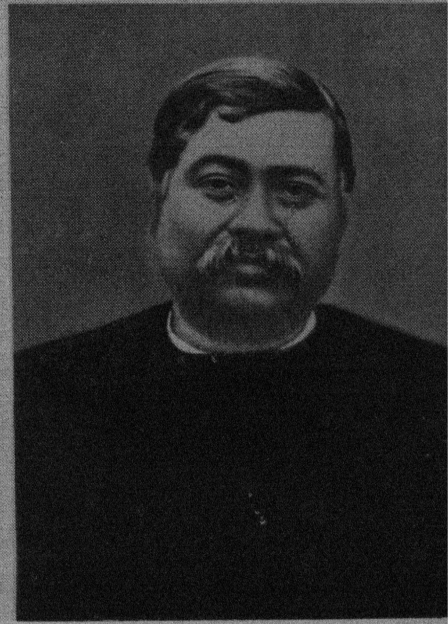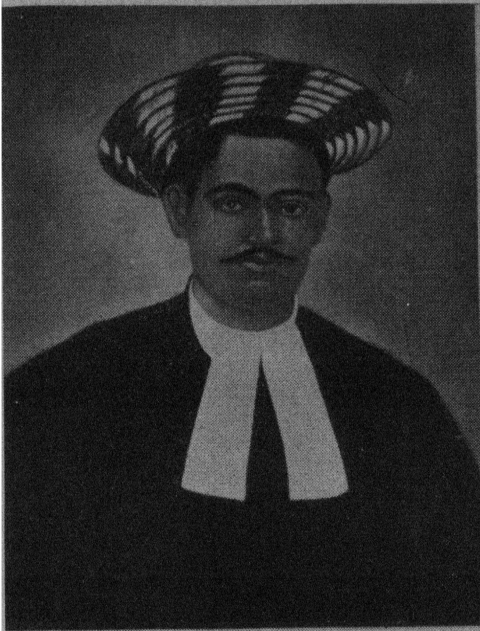
১. দ্বারকানাথ মিত্র ২. প্রতাপচন্দ্র সিংহ
৩. রাজেন্দ্রলাল মিত্র ৪. রমেশচন্দ্র মিত্র
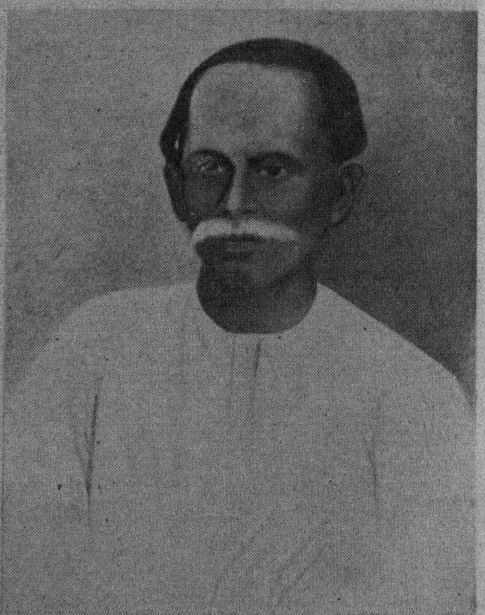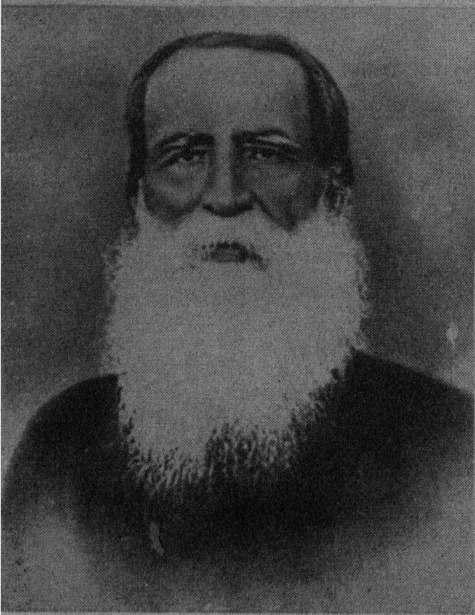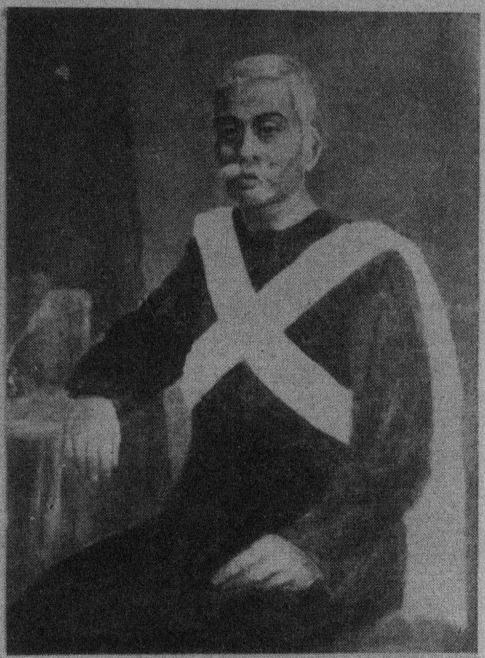
১. গিরিশচন্দ্র ঘোষ ২. প্যারীচাঁদ মিত্র
৩. ভূদেব মুখোপাধ্যায় ৪. অক্ষয়কুমার দত্ত

নবাব আমির আলি খান বাহাদুর

আত্মজীবনী 'আমীর নামাহ্'য় নবাব লিখেছেন, তাঁর পূর্ব-পুরুষ, বাগদাদের কাজী, সৈয়দ নুহ্ দেশত্যাগ করে দিল্লী চলে আসেন; দিল্লীতেই তিনি সপরিবারে বাস করতে থাকেন। নবাব আমির আলি তাঁরই অধস্তন নবম পুরুষ। বিপুল পাণ্ডিত্যের জন্য কাজী নুহ্কে বাদশাহী সরকার বহু খেতাব ও প্রচুর ভূসম্পত্তি দান করেন। তাঁর পুত্র সৈয়দ আবু বক্‌র্ বিশেষ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন, তাঁকে শেইখ্-উল্-মুশায়েখ্ বলা হত; বাদশাহ ও অভিজাতবর্গেরা তাঁকেও প্রচুর ভূসম্পত্তি দান করেছিলেন। তাঁর পুত্র মুল্লাহ্ শাহ্ নূর মুহম্মদ দিল্লী ছেড়ে বিহারে চলে আসেন। তাঁর প্রপৌত্র মুহম্মদ রফি পাটনা জেলার বাঢ়ে কাজী সৈয়দ মুহম্মদ মাহ্‌র কন্যাকে বিবাহ করেন। এই বাঢ়ই পরিবারটির বাসস্থান হয়ে যায়। বাংলায় নবাব নাজিম এঁদের প্রচুর ধনসম্পদ দান করেন; তারপর ইংরাজগণ বিজয়ী হবার পর, পরিবারটি বহুভাবে ইংরাজ সরকারের সেবা করেন; ফলে এঁরা অল্পকালের মধ্যেই বিশিষ্ট ধনী হয়ে ওঠেন; মুহম্মদ রফির পুত্র ওয়ারিস আলিও প্রচুর সম্পত্তি অর্জন করেন; তাঁর পুত্র আস্মুদ্দীন আহ্মদ ওরফে আলি আহ্মদ; ইনি ইংরাজ সরকারের অধীনে বহু উচ্চপদে চাকুরী করেন। লর্ড লেকের মারাঠা-বিরোধী অভিযানের সময় ইনি কয়েকটি রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। তিনি উত্তরপশ্চিম প্রদেশের কয়েকটি জেলায় তহ্সিলদাররূপে চাকুরী করে অবসরকালীন জীবন কাটান বাঢ়ে।

এঁরই পুত্র নবাব আমীর আলি। আমীর আলি জন্মগ্রহণ করেন ১৮১০ খ্রীস্টাব্দের ১০ মার্চ। ১৯ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি কলা, বিজ্ঞান এবং আরবী ও ফার্সী ভাষা শিক্ষা করেন। ১৮৩২-এ পাটনা সিভিল আদালতে তিনি একটি চাকুরী লাভ করেন। পরে অযোধ্যার রাজা নাসিরুদ্দীন হায়দারের দূতের সহকারী হিসাবে তিনি বেন্টিঙ্কের শাসনকালে কলকাতা চলে আসেন; এই চাকুরী করার সময় তিনি উক্ত রাজা ও ইংরাজ সরকারের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হয়ে ওঠেন। রাজার মৃত্যুর পর ১৮৩৭এ তিনি পুনরায় সরকারী চাকুরীতে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৮৩৮এ তিনি প্রেসিডেন্সি কলকাতার স্পেশাল কমিশনারের আদালতে ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হন; ত্রুটিপূর্ণ মালিকানার বা দলিলহীন সকল লাখেরাজ সম্পত্তি ইংরাজ সরকারে বাজেয়াপ্ত করার পক্ষে ওকালতি করা ছিল তাঁর কাজ। এই আদালতেই তিনি ১৮৪৫এ সরকারী উকিল নিযুক্ত হন। ১৮৫৫ সালে এই আদালত ও পুরাতন সদর আদালত মিলিত হবার সময় পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সরকারী চাকুরী করা-কালে তিনি বরাবরই বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছিলেন ও আইনে গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিলেন। আচরণে ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র, মার্জিত। আর ইংরাজ সরকারের প্রতি আনুগত্য ছিল তাঁর প্রায় পুরুষানুক্রমিক বৈশিষ্ট্য এবং বংশের মধ্যে ইংরাজভক্তিতে এই নবাবই শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

১৮৫৭-য় পাটনা বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠে; অন্তত ইংরাজ সরকারের ধারণা হয়েছিল তাই; সদর আদালতের অন্যতম জজ মিঃ ই এ স্যামুয়েল্‌সকে পাটনা বিভাগের কমিশনার করে পাঠান হল; পাটনায় তখন ধর্মান্ধ মুসলমানের সংখ্যা বিপুল। কমিশনারের ব্যক্তিগত সহকারীরূপে প্রেরিত হলেন আমীর আলি; স্থানীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে তাঁর পরিচয় এবং তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব ইংরাজ সরকারকে এই মহাসঙ্কট থেকে রক্ষা পেতে সাহায্য করে।

সে সময় সদর আদালতে ওকালতি করে তিনি মাসে তিন থেকে চার হাজার টাকা রোজগার করতেন। সেই উপার্জন ত্যাগ করে এই পদ-গ্রহণের দ্বারাই প্রমাণিত হয়, তাঁর রাজভক্তি কতখানি বাস্তব ছিল। তিনি লিখেছেন, 'সরকার আমার জন্য একটা মাসিক বেতনেরও (মাসিক ৭০০ টাকা) ব্যবস্থা করেছিলেন; কিন্তু আমি এক পয়সাও গ্রহণ করি নি; ওকালতির স্বাধীনতাও ছেড়েছিলাম; তার কারণ, আমার মনে হয়েছিল যে, ঐ ভাবেই আমি সরকারের সর্বোত্তম সেবা করতে পারব...আর আমার যা-কিছু যোগ্যতা, সে সবই এই ইংরেজ সরকারের অধীনে কাজ

করেই আমি অর্জন করেছি।' অর্থ-সর্বস্ব সে-যুগে এমন নিঃস্বার্থ রাজভক্তি সত্যিই দুর্লভ। সিপাহী বিদ্রোহের সময় তাঁর রাজভক্তি ও সেবার কথা পার্লামেণ্টেও আলোচিত হয়। সরকার তাঁকে সম্মানিতও করেন। নবাব কলকাতার অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট এবং জাস্টিস অফ দি পীস ছিলেন। তাঁকে ২৪ পরগণারও অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট করা হয়। বঙ্গীয় আইন পরিষদের সভ্য পদে মনোনীত করেও তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করা হয় এবং পরবর্তী-কালে তাঁকে 'আজীবন' খান বাহাদুর পদবীতে ভূষিত করা হয়। ১৮৬৭তে অযোধ্যার প্রাক্তন রাজার বিষয়-সম্পত্তি পরিচালনার জন্য তাঁকে (পরি-চালক) নিয়োগ করা হয়। রাজার কাছে (কোম্পানির) দাবী ছিল ৫৬ লক্ষ টাকার মতো বিপুল পরিমাণ অর্থ; তাঁরই একান্ত চেষ্টায় এই দাবীর পরিমাণ কমে দাঁড়ায় সাত লক্ষ টাকায়; অতীব দক্ষতার সঙ্গে তিনি একটি আপস মীমাংসারও ব্যবস্থা করেন; তাঁর শর্ত অনুযায়ী স্থির হয় যে, উক্ত পরিমাণ অর্থও এককালে আদায় দিতে হবে না। মাসিক সাত হাজার টাকার কিস্তি স্থিরীকৃত হয়; এও স্থির হয় যে, প্রাক্তন রাজাকে কোনরূপ সুদ দিতে হবে না। যে দক্ষতা ও সাফল্যের সঙ্গে তিনি অযোধ্যার প্রাক্তন রাজার বিষয়-সম্পত্তির জটিল সমস্যার সুব্যবস্থা করেছিলেন, তার জন্য বাংলার নবাব নাজিমের ঋণের সুব্যবস্থা করবার জন্যও তিনি অন্যতম কমিশনাররূপে নিযুক্ত হন। এ কাজটিও তিনি গভীর বিচারবুদ্ধি ও দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করেন। তাঁর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে লর্ড নর্থব্রুক তাঁকে 'নবাব' উপাধিতে ভূষিত করেন; উপাধির সঙ্গে যথোপযুক্ত খেলাৎও দান করা হয়। ১৮৭৫র ১৭ সেপ্টেম্বর বাংলার তদানীন্তন ছোট লাট স্যার রিচার্ড টেম্পল বেলভেডিয়ারে উপাধি দান উপলক্ষে একটি বিশেষ 'দরবার' আহ্বান করে তাঁর অভিভাষণে বলেন—

'অদ্য সন্ধ্যায় এখানে উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট নবাব আমীর আলি খান বাহাদুর অপরিচিত নন। তাঁর মার্জিত আচরণ ও চমৎকার ব্যবহারের জন্য তিনি সর্বজনশ্রদ্ধেয়। সদর দেওয়ানী আদালতের ব্যবহার-জীবীরূপে তিনি সর্বদাই বিচারকদের আস্থা ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন, অন্যান্য ব্যবহারজীবীর নিকট ছিলেন আদর্শস্থানীয়। (সিপাহী) বিদ্রোহের সময় তাঁর উৎসাহ উদ্দীপনা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে (এই স্থানে ছোটলাটবাহাদুর মিঃ স্যামুয়েল্‌সের লিখিত প্রশংসাসূচক প্রতিবেদনটি পাঠ করেন)। ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে অযোধ্যার রাজা তাঁকে তাঁর বিষয়সম্পত্তির বন্দোবস্ত করবার জন্য নিয়োগ করেন; রাজার বিষয়সম্পত্তি সম্পর্কিত পরিস্থিতি তখন অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় ছিল। তাঁর (নবাবের)

সুব্যবস্থাপনার কথা সকলেরই পরিজ্ঞাত এবং এজন্য সকলের সবিশেষ প্রশংসাও তিনি অর্জন করেছেন। মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিমের বিষয় সম্পত্তির ব্যবস্থাপনাকারী আয়োগের (কমিশনের) অন্যতম সদস্যরূপে তাঁর নিয়োগ যথোপযুক্ত হয়েছিল এবং এতদপেক্ষা সুনির্বাচন আর হতে পারত না। এমন সম্মানজনকভাবে তিনি তাঁর কর্তব্যকর্ম সম্পন্ন করেন যে, মহামান্য বড়লাটও তাঁর কাজ সমর্থন করেন এবং এই জন্য তাঁর এই সাফল্য বিবেচনা করেই তাঁকে মহামান্য বড়লাট বাহাদুর মুসলমানগণের নিকট সর্বাপেক্ষা কাঙ্ক্ষিত নবাব পদবীতে ভূষিত করেন। আমরা আশা করব যে, তিনি দীর্ঘজীবী হয়ে এই সম্মাননা ভোগ করবেন।'

প্রয়াত নবাব ছিলেন ফার্সী ভাষায় কৃতবিদ্য—ঐ ভাষায় খুব ভালভাবে লিখতে ও বলতে পারতেন। উর্দুতেও তাঁর পারদর্শিতা ছিল উল্লেখযোগ্য, আর তার সঙ্গে আইনে গভীর জ্ঞান ও প্রায় সর্বজনীন জনপ্রিয়তার জন্য সদর দেওয়ানী আদালতের আইনজীবীরূপে তিনি সবিশেষ সাফল্যলাভ করেন। এই আদালতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয় হাইকোর্ট স্থাপিত হবার কিছু পরে। বিশেষভাবে সরকারের উচ্চপদাধিকারী ব্যক্তিবর্গ তাঁকে খুব পছন্দ করতেন। কলকাতাতেই তিনি সাধারণত থাকতেন; তাই তিনি ছিলেন সর্বতোভাবেই কলকাতার এবং পাটনা জেলারও মুসলিম সমাজের প্রতিনিধি। আগেই বলেছি তাঁর পরিবারবর্গ থাকতেন পাটনা জেলায়; সেখানে তাঁদের বহুবিস্তৃত ভূসম্পত্তি ছিল। তিনি ছিলেন অতীব সজ্জন, সহৃদয়, মিষ্টভাষী; কাছে গেলে কাউকে কখনও রূঢ় কথা শুনতে হয়নি; তিনি তিন পুত্র রেখে যান—বড় হুগলী ইমামবাড়ার মৎওয়ালী মওলভী আশ্রাফুদ্দীন আহ্‌মদ, মধ্যম আফ্‌জলউদ্দীন আহ্‌মদ এবং কনিষ্ঠ, বর্তমানে অক্সফোর্ডের বেলিয়ল কলেজে পাঠরত আইসান্‌ উদ্দীন আহ্‌মদ।

নবাব ফার্সী ভাষায় কয়েকখানি পুস্তক রচনা করেন, তার মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য বইগুলি হল: ১. আমীর-নামাহ্‌ (ভারতে ইংরাজ শাসনের ইতিহাস); ২. ওয়াজির-নামাহ্‌ (অযোধ্যারাজবংশের ইতিহাস), এবং ৩. বেয়ারিং-নামাহ্‌ (ভারতে লর্ড নর্থব্রুকের শাসনকালের ইতিহাস); লিটন্‌-নামাহ্‌ (বিগত বড়লাটের শাসনকালের ইতিহাস) নামে আর একখানি পুস্তক তিনি লিখতে আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু শেষ করে যেতে পারেন নি। তিনি কলকাতার জাতীয় মুসলমান সভার সভাপতি ও অন্যান্য বহু (এবং এই শহরের জনগণ পরিচালিত বহু) প্রতিষ্ঠানের সভ্য ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তুরস্কের সুলতান কর্তৃক 'কম্প্যানিয়ন অফ দি অর্ডার অফ ওস্মানলি' পদবীদ্বারা সম্মানিত হন।

পাথুরিয়াঘাটার অনারেব্‌ল অনুকূলচন্দ্র মুখার্জী

মাননীয় অনুকূলচন্দ্র মুখার্জীর পিতামহ দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখার্জীর আদি বাস ছিল হুগলী জেলার ভঙ্গমোরা-গোপীনাথপুর গ্রামে। তিনি বসবাসের জন্য কলকাতা চলে আসেন। বিখ্যাত পণ্ডিত মনোহরচন্দ্র মুখার্জীর অন্যতম বংশধর রামপ্রসাদ মুখার্জীর পুত্র দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখার্জীর চার পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ লক্ষ্মীনারায়ণ ছিলেন হিন্দু কলেজের সম্পাদক। লক্ষ্মীনারায়ণের পাঁচ পুত্রের মধ্যে অনারেব্‌ল অনুকূলচন্দ্র ছিলেন চতুর্থ।

অনুকূলচন্দ্র ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে তিনি জনৈক মুন্সীর নিকট ফার্সী শেখেন। ফার্সী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাংলা এবং সামান্য সংস্কৃতও শেখেন। আট বছর বয়সে তিনি গোবিন্দ বসাকের বিদ্যালয়ে ইংরেজী শিখতে আরম্ভ করেন। এর দু'বছর পর তাঁকে হিন্দু কলেজে ভর্তি করা হয়। এখানে বিশেষ পরিশ্রম সহকারে কয়েক বছর পড়ার পর তিনি সিনিয়র স্কলারশিপ লাভ করতে সমর্থ হন।

প্রথমে তিনি হাওড়া ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে নাজিরের পদে নিযুক্ত হন। এই পদে থাকাকালে তিনি আইন শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন। নাজিরের পদে চার বছর চাকুরী করার পর, প্রাক্তন সদর আদালতের অন্যতম জজ মিঃ ডিক তাঁকে ওকালতি পড়বার পরামর্শ দেন। এই পরামর্শমত প্রস্তুতি করে ১৮৫৫তে ওকালতি পরীক্ষায় (প্লীডারশিপ এগ্‌জামিনেশনে) উত্তীর্ণ হন। পৃষ্ঠপোষকহীনভাবেই তিনি সদর আদালতে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। স্বীয় দক্ষতার জন্য শীঘ্রই তিনি তখন দেশীয়দিগের বার্‌-এর নেতা রমাপ্রসাদ রায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হন; বন্ধুজন, মক্কেল ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসাও তিনি নিজগুণেই অর্জন করেন। ২৪ ডিসেম্বর, ১৮৬৮তে তিনি জুনিয়র গভর্নমেণ্ট প্লীডার পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট হবার জন্য হাইকোর্টের চীফ্‌ জাস্টিসের অনুরোধ অতি বিনীতভাবে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। তবে ১৮৭০-৭১এর ২১ ফেব্রুয়ারী তিনি সিনিয়র গভর্নমেণ্ট প্লীডারের পদ গ্রহণ করেন। তাঁর যোগ্যতা ও জনপ্রিয়তার জন্য শীঘ্রই তাঁকে হাইকোর্টের অন্যতম জাস্টিসরূপে যোগদানের জন্য আহ্বান জানানো হয়—অনারেবল্‌ দ্বারকানাথ মিত্রের মৃত্যুতে পদটি শূন্য

হয়েছিল। তিনি এই উচ্চপদ গ্রহণ করেন। ১৮৭০-এর ৬ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান হয়।

এই কঠিন ও অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ পদে তিনি আট মাস অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময় তিনি তাঁর চিন্তার স্বাধীনতা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। কিছুকালের জন্য তিনি বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ছিলেন। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট তাঁকে ফ্যাকাল্টি অফ্ ল'র সদস্য মনোনীত করেন।

দুর্ভাগ্যবশত মাত্র ৪২ বছর বয়সে, ১৮৭১-এর ১৭ অগাস্ট তিনি পরলোক গমন করেন। হাইকোর্টের মাননীয় জজবৃন্দ, বন্ধুবর্গ ও তাঁর গুণমুগ্ধ ব্যক্তিগণ তাঁর এই অকাল মৃত্যুতে শোকাভিভূত হন। মৃত্যুকালে তিনি দুই পুত্র বাবু রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জী ও বাবু হীরেন্দ্রনাথ মুখার্জীকে রেখে গেছেন।

হাটখোলার দত্ত পরিবার

এই বনেদি সম্ভ্রান্ত পরিবারটি বালির প্রাচীন দত্ত পরিবারের একটি শাখা। এঁদের পূর্বপুরুষ গোবিন্দশরণ দত্ত দিল্লীর কোন বাদশাহের প্রদত্ত জায়গীর লাভ করে আন্দুল থেকে বসবাসের জন্য কলকাতা চলে আসেন।

এর সত্যাসত্য আমাদের অজ্ঞাত, কারণ হাটখোলা ছিল সুতানুটির অন্তর্গত—ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭৮এ সমগ্র সুতানুটি রাজা নবকিষণকে স্থায়ী জমিদারীরূপে (?) দান করেছিলেন। এঁর চার পুত্র বাণেশ্বর, ভুবনেশ্বর, বিশ্বেশ্বর এবং রামনারায়ণ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

বাণেশ্বরের তৃতীয় পুত্র রামচন্দ্র ছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমদানি রফতানি বিষয়ে বেনিয়ান। অভিজাত রামচন্দ্র ভায়েদের সম্মতি নিয়ে তাঁদের জমি জায়গা বাড়ীর পরিবর্তে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট হতে হাটখোলার ভূ-সম্পত্তি গ্রহণ করেন। তখন থেকেই এঁদের পরিচয় হয় হাট খোলার দত্ত পরিবার। রামচন্দ্রের ছিল পাঁচ পুত্র—কৃষ্ণচন্দ্র, মাণিক্যচন্দ্র, ভারতচন্দ্র, শ্যামচন্দ্র এবং গোরাচাঁদ। জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণচন্দ্রের চার পুত্র মদনমোহন, রামশঙ্কর, রামকান্ত ও রামলাল। মধ্যম মাণিক্যচন্দ্রের তিন পুত্র জগৎরাম, কৌতুকরাম ও গুলাবচন্দ্র। কৃষ্ণচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র মদনমোহন রেখে যান চার পুত্র—রামতনু (সাধারণ্যে রামতনুবাবু নামে খ্যাত ছিলেন) ; চৈতন্যচরণ,

রসিকলাল ও হরলাল। মাণিক্যচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র জগৎরামের ছিল তিন পুত্র : কাশীনাথ, রামজয় ও হরসুন্দর। রামজয়ের জীবিত দুই পুত্র বর্তমানে এই প্রাচীন পরিবারের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তি। যশোহর ও হুগলী জেলায় এঁদের জমিদারী আছে।

দত্ত পরিবারের পূর্বপুরুষদের মধ্যে মদনমোহন দত্তের নাম ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয়। তিনি ছিলেন একাধারে সম্ভ্রান্ত জমিদার, ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ী এবং কয়েকখানি জাহাজের মালিক। এঁরই যত্ন ও চেষ্টায় রামদুলাল দে সাধারণ শিক্ষার ও বিপুল বিত্তের অধিকারী হতে পেরেছিলেন। মদনমোহন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন ; ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁর দানও ছিল বিপুল। আমতা, মেদিনীপুর, ঢাকা এবং অন্যান্য স্থানে তিনি পুষ্করিণী ও কূপ খনন করিয়েছিলেন, এবং শিব মন্দির নির্মাণ ও উৎসর্গ করিয়েছিলেন। গয়ার প্রেতশিলা পাহাড়ে চূড়া পর্যন্ত সিঁড়ি নির্মাণ করিয়ে তিনি এদেশে অক্ষয় কীর্তি লাভ করেন। দাতা হিসাবে মাণিক্যরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র জগৎরামের স্থান ছিল মদনমোহনের পরেই। তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে পাটনায় দেওয়ানী করতেন। এখানে তিনি পাটনেশ্বরীর মন্দির নির্মাণ ও উৎসর্গ করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। এই পরিবারের কয়েকজন কোন্নগর ও পানিহাটিতে ঘাট সহ (শিবের) দ্বাদশ মন্দির নির্মাণ করিয়ে দেন। এই ঘাট ও মন্দিরগুলি গঙ্গার বিপরীত তীরে থাকায় এই স্থান দুটির সৌন্দর্য বড় মনোরম হয়েছে।

ঠন্ঠনিয়ার রাজা দিগম্বর মিত্র, সি এস আই

রাজা দিগম্বর মিত্র, সি এস আই-এর জন্ম কোন্নগরের মিত্র পরিবারে। তাঁর জন্ম হয় ১৮১৭খ্রীস্টাব্দে কোন্নগরে। হিন্দু কলেজে পড়বার জন্য তিনি কলকাতায় তাঁর পিতা শিবচন্দ্র মিত্রের নিকট রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটে থাকতেন। ইংরাজী সাহিত্য, গণিত ও দর্শনে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করবার পর তিনি কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

মুর্শিদাবাদের সমাহর্তা মিঃ রাসেলের অধীনে তিনি আমিন রূপে কর্মজীবন আরম্ভ করেন। পরে, রাজা কিষেণনাথের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন ; রাজা কিষেণনাথ সাবালকত্ব লাভ করবার পর দিগম্বর হন রাজার

সুবিস্তৃত জমিদারীর ম্যানেজার। তাঁর কর্তব্যপরায়ণতা ও দক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ রাজা তাঁকে এক লক্ষ টাকা উপহার দেন। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ লাভ করে দিগম্বর শুরু করলেন নীল আর রেশমের ফাটকা; কয়েকবার লোকসান খাবার পর (ঐ ব্যবসায় ছেড়ে দিয়ে) প্রাপ্ত সম্পদ দিয়ে জমিদারী কিনতে লাগলেন; জমিদারী কিনলেন ২৪ পরগণা, যশোহর, বাখরগঞ্জ এবং কটক জেলায়; ফলে, তিনি হয়ে উঠলেন একজন গণ্যমান্য জমিদার।

কলকাতার ঠাকুর পারিবারের সঙ্গে যৌবনেই তাঁর পরিচয় হয়; তিনি রাজনৈতিক শিক্ষা লাভ করেন আদর্শস্থানীয় দ্বারকানাথ ঠাকুরের নিকট। মাননীয় প্রসন্নকুমার ঠাকুর, সি এস আই এবং মহারাজা রামনাথ ঠাকুর, সি এস আই-র তিনি ছিলেন ব্যক্তিগত বন্ধু এবং সহযোগী। গোপাললাল ঠাকুরেরও তিনি ছিলেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হবার পর দিগম্বর তার সহকারী সচিব হন এবং পরে এর কার্যনির্বাহী সভাপতির পদও অলঙ্কৃত করেন। প্রথম জীবনে তিনি বেশী মিশতেন সরকারী নয়, বেসরকারী ইওরোপীয়দের সঙ্গে। তিনি পরিচিত ছিলেন গর্ডন, স্টকেলর, হ্যারী প্রভৃতি বেসরকারী ইওরোপীয় পরিবারের সঙ্গে এবং তাঁদেরই সঙ্গে তিনি তখনকার দিনের রাজনৈতিক সংগ্রামে অংশও নিতেন। তবে নিজে সাধারণত থাকতেন আড়ালে, পিছনে; অন্যান্য সকলকে ঠেলে দিয়ে নিজে এগিয়ে যাবার প্রবৃত্তি তাঁর ছিল না। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের তিনি বুদ্ধিমান ও সক্রিয় সভ্যদের অন্যতম ছিলেন; জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার জন্য তাঁর পরামর্শও ছিল মূল্যবান; কিন্তু সে সময় তিনি সামনের সারিতে এগিয়ে আসতে চাইতেন না। ১৮৫৭র তথাকথিত কালা কানুন (বিরোধী) বিদ্রোহের (Black Act Mutiny) সময় তিনি জনসাধারণের সামনে উপস্থিত হন। সে সভায় বক্তা ছিলেন চার 'মিত্র', মিঃ কব্ হ্যারী তাঁকে ১নং মিত্র নামে অভিহিত করেন। ১৮৬৪তে সরকারী সংক্রামক জ্বর আয়োগে (কমিশনে) তিনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন; সেই সময় থেকেই সরকার তাঁর গুণাবলী ও কর্মদক্ষতার সঙ্গে পরিচিত হন। অনতিবিলম্বে তাঁকে বাংলার আইন পরিষদের সভ্য করে নেওয়া হয়। অবশ্য, এর আগে তাঁকে কলকাতায় জাস্টিস অফ্ দি পীস, অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট এবং ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশনের পরিদর্শক করা হয়েছিল। কার্যত এই সময় থেকেই তাঁকে বিভিন্ন কমিটির সভ্য হবার জন্য সরকার থেকে আহ্বান করা হতে লাগল। পর পর তিন ছোটলাট—স্যার সেসিল বিডন, স্যার উইলিয়াম

গ্রে এবং স্যার জর্জ ক্যাম্পবেল—তাঁকে বেঙ্গল কাউন্সিলের সভ্যরূপে মনোনীত করেন। তাঁর পরামর্শ এঁদের প্রত্যেকের কাছেই প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান বলে গণ্য হত। বেঁচে থাকলে, তিনি খুব সম্ভবত বড়লাটের কাউন্সিলেও সভ্যরূপে মনোনীত হবার সম্মান লাভ করতেন। ১৮৬৬তে দুর্ভিক্ষের সময় তিনি দুঃস্থ জনগণের ত্রাণের জন্য সরকারের সঙ্গে সোৎসাহে সহযোগিতা করেন। ১৮৬০-এ আয়কর আইন, পথ-কর প্রকল্প এবং বাঁধ আইন প্রণয়নে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে তিনি উৎসাহ দিতেন এবং 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতারও তিনি উৎসাহী সমর্থক ছিলেন এবং তাঁর মতে, প্রাচ্যে ব্রিটিশ প্রভুত্ব রক্ষার সবচেয়ে ভাল উপায় হল জনগণকে এই অধিকার ভোগ করতে দেওয়া; কিন্তু তার পর লর্ড লিটন প্রেস অ্যাক্ট প্রণয়ন করাতে তিনি বিশেষ দুঃখ পেয়েছিলেন। ইওরোপ, আমেরিকার শিক্ষা মন্দিরসমূহে ভারতীয় যুবকদের তীর্থযাত্রাকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন এবং এ বিষয়ে তাঁর আগ্রহের প্রমাণস্বরূপ তিনি তাঁর একমাত্র পত্র বাবু গিরিশচন্দ্র মিত্রকে তাঁর শিক্ষা সমাপ্ত করবার জন্য ইংলণ্ডে পাঠান; কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেখানেই তিনি প্রাণত্যাগ করেন।' জেলা দাতব্য প্রতিষ্ঠানে দেশীয়দিগের সমিতির তিনি ছিলেন অবৈতনিক সম্পাদক। ২০ জন গরীব মানুষের মাসিক ভরণ-পোষণের জন্য তিনি নিজ নামে একটি নিধি স্থাপন করেন। শিক্ষা বিস্তারে উৎসাহ দেবার জন্য তিনি প্রতিদিন নিজ বাড়ীতে ৮০ জন ছাত্রকে খেতে দেওয়া ছাড়াও, তাদের বইপত্র এবং স্কুলের মাইনেও যোগাতেন।

মাননীয় যুবরাজের ভারত-দর্শনের সময় তিনি ছিলেন কলকাতার শেরিফ। মহামান্য যুবরাজ ১৮৭৬-এর ১ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত 'Grand Chapter of the Star of India'তে তাঁকে 'Companion of the Most Exalted Order of the Star of India' পদবীতে ভূষিত করেন। ১৮৭৭-এর ১ জানুয়ারী দিল্লীতে অনুষ্ঠিত Imperial Assemblage-এ তাঁকে রাজা খেতাব দান করা হয়।

১৮৭৯ সালে রাজা দিগম্বর মিত্র সি এস আই জর, উদরাময় এবং কণ্ঠনালীতে রক্তক্ষরণের জন্য অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই সকল অসুখেই তিনি ১৮৭৯ সালের ২০ এপ্রিল সকাল ৭-৩৫এ পরলোক গমন করেন। তখন তাঁর বয়স ৬৩ বছর। তিনি রেখে যান বিধবা স্ত্রী এবং বাবু গিরিশচন্দ্রের দুটি নাবালক পুত্রকে। রাজা দিগম্বর মিত্র নিজ চেষ্টাতেই বড় হয়েছিলেন; অর্থ ও যশ তিনি অর্জন করেছিলেন নিজ সাধনায়।

দুঃস্থ অবস্থা থেকে কীভাবে মানুষ সম্পদ ও যশের শীর্ষে উঠতে পারে, তিনি তার একটি উজ্জল আদর্শ দেশবাসীর সামনে রেখে গেছেন।

ঝামাপুকুরের বাবু দুর্গাচরণ লাহা এবং তাঁর দুই ভাই

প্রখ্যাত বাঙালী ধনিক, ব্যবসায়ী এবং জমিদার বাবু দুর্গাচরণ লাহা আর তাঁর দুই ভাই বাবু শ্যামাচরণ লাহা ও বাবু জয়গোবিন্দ লাহা ছিলেন প্রাণকিষেণ লাহার পুত্র এবং রাজীবলোচন লাহার পৌত্র। তাঁদের আদি বাস ছিল হুগলী জেলার চুঁচুড়ায়—স্থানটি একদা ওলন্দাজ উপনিবেশ ছিল। পাটনার নন্দরাম বৈদ্যনাথের কুঠিতে বা মহাজনী কারবারে মাসিক ২৫ টাকা মাইনেতে রাজীবলোচন পোদ্দারের চাকুরী গ্রহণ করে জীবন শুরু করেন। মাইনে কম আর চুঁচুড়ায় পারিবারিক জমিজমার আয়ও অল্প, তবু তিনি ছেলেদের শিক্ষার জন্য ব্যয় করতে কার্পণ্য করেননি। ছেলেরা রোজগার না করা পর্যন্ত তিনি ঐ চাকুরীতেই বহাল ছিলেন। ১৮৩০ সালে ৬২ বছর বয়সে তিনি চুঁচুড়ায় প্রাণত্যাগ করেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর বড় ছেলে প্রাণকিষেণই ঐ মধ্যবিত্ত পরিবারটিকে উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে প্রতিষ্ঠিত করেন।

পিতার দারিদ্র্যের জন্য ইচ্ছা থাকলেও তিনি বেশীদূর লেখাপড়া করতে পারেননি; ইংরেজী শিখেছিলেন প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত। প্রথমে তিনি মিঃ অ্যানড্রুর লাইব্রেরীতে মাসিক ১২ টাকা মাইনের একটি চাকুরী পান; গ্রন্থাগারটি উঠে না যাওয়া পর্যন্ত ঐ চাকুরীই তিনি করতে থাকেন। ঐ চাকুরী যাবার পর, বেকার প্রাণকিষেণ কারও কোন সাহায্য ছাড়াই হুগলী আদালতে শিক্ষানবিশি শুরু করেন; অন্যদিকে তাঁর ইংরেজী শিক্ষাও এগোতে থাকে। এই আদালতেই তিনি আইন কানুন এবং অফিসের কাজকর্ম সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেন; এর পর সুপ্রীম কোর্টের তখনকার প্রভাবশালী অ্যাটর্নি মিঃ হাওয়ার্ডের অফিসে হেড ক্লার্কের চাকরী পেয়ে যান। তাঁর ইংরেজী শিক্ষাও এগোতে থাকে। তাঁর চরিত্রগুণ ও দক্ষতার জন্য তাঁর মাসিক মাইনে ধীরে ধীরে ৩০০ টাকায় ওঠে। তাঁর সততা ও দক্ষতার জন্য ঐ অ্যাটর্নি অফিসের পরবর্তী মালিক মিঃ পিয়ার্ড,

প্রাণকিষেণ অবসর নেবার পর তাঁকে মাসিক ২০০ টাকা পেনশন দিতে থাকেন। মিঃ পিয়ার্ড যতদিন বেঁচেছিলেন, ততদিন প্রাণকিষেণ এই পেনশন পেয়েছিলেন।

অ্যাটর্নি অফিসে হেড ক্লার্ক থাকবার সময়ই প্রাণকিষেণ কোম্পানির কাগজ আর আফিমের ফাটকায় নামেন। এতে প্রচুর অর্থও উপার্জন করেন। এই সময় কলকাতার লটারি কমিটি পরিচালিত লটারির এক লাখ টাকার পুরস্কারের এক তৃতীয়াংশ ৩৩,০০০ হাজার টাকা তিনি পেয়ে যান। কিন্তু ফাটকার ব্যবসায়ে ছ'মাসের মধ্যে টাকাটা লোকসান যায়। বাবু মতিলাল শীল তাঁকে খুব স্নেহ করতেন; তাঁরই সহায়তায়, প্রাণকিষেণ প্রথমে মেসার্স সণ্ডার্স, মে, সার্কিনস অ্যাণ্ড কোম্পানির বানিয়ান নিযুক্ত হন এবং শেষ পর্যন্ত আরও কয়েকটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের বানিয়ান হন। তাঁর নিজেরও একটি ছোট খাট ব্যবসায় ছিল। ১৮৪৭ সালের ব্যবসায়িক মহাসঙ্কটের সময়, তিনিও নানা দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু স্বল্পকালের মধ্যেই তিনি ক্ষয়ক্ষতি সামলে ওঠেন। ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে ৬৩ বছর বয়সে তিনি মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর ১৮৫৯-এ তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রাণকিষেণ ল' নামক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানটির নাম হয় 'প্রাণকিষেণ ল' অ্যাণ্ড কোং'।

সম্ভবত ১৮২৩ সালে বাবু দুর্গাচরণ লাহা চুঁচুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতার শিবু ঠাকুর লেনের গোবিন্দ বসাকের স্কুলে তিনি ইংরেজীর প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। এখানে তিনি সহপাঠী ছিলেন সুপণ্ডিত ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র সি আই ই'র। এই স্কুলে দুবছর পড়ার পর তিনি ভর্তি হন হিন্দু কলেজে এবং সহপাঠীরূপে লাভ করেন রামবাগানের রসময় দত্তের তৃতীয় পুত্র বাবু গোবিন্দচন্দ্র দত্ত ও অনারেবল প্রসন্নকুমার ঠাকুর সি এস আই'র পুত্র গণেশমোহন ঠাকুরকে। এখানে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়বার সময়ই দুর্গাচরণকে কলেজ ত্যাগ করতে হয়। তাঁর বাবা চাইলেন, তিনি ব্যবসায়ের খুঁটিনাটি যত গোপন রহস্য সেগুলিই এখন থেকে শিখতে থাকুন। কর্মজীবন আরম্ভ হল পিতার সহকারীরূপে। পিতার মৃত্যুর পর, তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম, সততা ও অধ্যবসায় দ্বারা প্রতিষ্ঠানটির প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। সম্মানিত জমিদার দুর্গাচরণ কলকাতার বেশ কয়েকটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের বানিয়ানও। লণ্ডন ও ম্যাঞ্চেস্টারে তাঁর নিজস্ব এজেন্সি ছিল। কলকাতা পোর্ট কমিশনার্সের তিনিই একমাত্র দেশীয় সভ্য। তাছাড়া, তিনি কলকাতার জাস্টিস অফ দি পীস, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, কলকাতার মেয়ো হাসপাতালের গভর্নর এবং বঙ্গীয়

আইন পরিষদের সভ্য। ব্যবসায়িক বিষয়ে দুর্গাচরণবাবু বিশেষ বিচক্ষণ ও জ্ঞানী। ব্যবসায় ও ফাটকায় তাঁর দূরদৃষ্টি ও জ্ঞান অতুলনীয়। দেশীয় ও ইওরোপীয় ব্যবসায়ীমহলে তিনি অপরিমেয় খ্যাতি অর্জন করেন। স্বীয় কর্মোদ্যমেই তিনি খ্যাতি ও সম্পদ অর্জন করেছেন। পিতা প্রাণকিষেণ লাহার কাছে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ব্যবসাটির উন্নতিতে বাবু শ্যামাচরণ ও বাবু জয়গোবিন্দও দাদাকে প্রভূত সাহায্য করেছেন।

বাবু শ্যামাচরণ লাহা বাল্যকালে হেয়ার (পূর্বে 'স্কুল সোসাইটির স্কুল' নামে পরিচিত) স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। পরে তাঁকে হিন্দু স্কুলে ভর্তি করা হয়; এখানে তিনি শিক্ষায় দ্রুত উন্নতি করতে থাকেন; বৃত্তিও লাভ করেন। তাঁর পিতা নিজস্ব তত্ত্বাবধানে শ্যামাচরণকে ১৯ বছর বয়স থেকেই ব্যবসায়ে শিক্ষা দিতে থাকেন। ১৮৬৯-এ তিনি নিজস্ব ব্যবসায়ের জন্য ইংল্যাণ্ড যান; এবং ব্যবসায় সংক্রান্ত বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে কলকাতা ফিরে আসেন। দক্ষ ও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হিসাবে তাঁকে কয়েকবারই সাউথ সাবার্বন মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার নিয়োগ করা হয়। তিনিও ২৪ পরগণা জেলার অন্যতম অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। দুর্গাচরণের কনিষ্ঠ ভাই জয়গোবিন্দও কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির অন্যতম কমিশনার এবং ২৪ পরগণার অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন।

সম্ভ্রান্ত এই তিন ভাই-ই বদান্যতা ও জনসেবার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাঁরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ৫০,০০০ টাকা দান করেন; 'এখন' এই পরিবারটি কলকাতার অন্যতম ধনাঢ্য পরিবার হিসাবে পরিচিত।

১৮৮০ সালের ৪ জানুয়ারী ভাইপোর বিয়ে উপলক্ষে বাবু দুর্গাচরণ বিরাট এক 'নাচের' আয়োজন করেন। এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিতদের মধ্যে সস্ত্রীক উপস্থিত ছিলেন বাংলার মাননীয় ছোটলাট, ভারতের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ, প্রধান বিচারপতি, কাউন্সিলের সভ্যবৃন্দ, সরকারের সচিবগণ, উল্লেখযোগ্য বহু অফিসার এবং দেশীয় অভিজাতবর্গ। শহরের পেশাদারী নাচওয়ালীদের নাচে এবং ফুল লতাপাতা গাছ ও আলোক-সজ্জায় তাঁরা সকলেই খুব খুশী হয়েছিলেন বলে মনে হয়। মহা-রাণীর ৭০তম রেজিমেন্ট এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে স্বাগত সুর বাজিয়েছিল।

কুমারটুলির গোবিন্দরাম মিত্র ও তাঁর পরিবারবর্গ

এই প্রাচীন, সম্ভ্রান্ত পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা গোবিন্দরাম মিত্রের পিতার নাম রত্নেশ্বর এবং পিতামহের নাম ছিল হংসেশ্বর।

আনুমানিক ১৬৮৬-৮৭ খ্রীস্টাব্দে গোবিন্দরাম ব্যারাকপুর ও চণকের নিকটবর্তী একটি গ্রাম থেকে এসে গোবিন্দপুরে বাস করতে থাকেন—এই স্থানে বর্তমান ফোর্ট উইলিয়াম অবস্থিত। গোবিন্দরামকে ফার্সী বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন এবং কাজ চালাবার মতো ইংরেজী-জানা দেখে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কলকাতা কুঠির তখনকার গবর্নর জব চার্নক কোম্পানির অধীনে তাঁকে একটি চাকরী দেন। অসাধারণ যোগ্যতার অধিকারী, তীক্ষ্ণ হিতাহিত জ্ঞানসম্পন্ন এবং কর্মোৎসাহী গোবিন্দরাম খুব শীঘ্রই অনারেবল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির উচ্চ পদাধিকারীদের সুনজরে পড়ে গেলেন। ফোর্ট উইলিয়াম নির্মিত হবার কিছু আগে তিনি সপরিবারে কুমারটুলি চলে আসেন। এই অঞ্চলে এখনও তাঁর বেশ কয়েকজন বংশধর বাস করছেন।

কোম্পানি পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করবার পর, গোবিন্দরাম হলেন কোম্পানির ডেপুটি ফৌজদার। 'ব্ল্যাকহোল' পুস্তকে হলওয়েল তাঁকে 'কালা (কৃষ্ণাঙ্গ) ডেপুটি', 'নায়েব জমিদার' কোথাও বা কলকাতার 'মেয়র' বলেছেন। Calcutta Review (Vol. III 1845) লেখেন—

'গোবিন্দরামের সততা সম্পর্কে ১৭৪৮ নাগাদ কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের সন্দেহের উদ্রেক হয়: এই 'কালা জমিদারের' কার্যকলাপে কোম্পানি অপেক্ষা তিনি নিজে বেশী লাভবান হচ্ছেন। কিন্তু ১৭৫২ সালের আগে কোম্পানির অর্থ আত্মসাৎ করার এই স্রোত বন্ধ করার কার্যকর কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল বলে মনে হয় না। ঐ বৎসর হলওয়েলকে জমিদার নিয়োগ করা হয়—প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, ঐ পদে তাঁকে দীর্ঘকাল রাখা হবে। তিনি গোবিন্দরামকে তাঁর কাজ শুরু করার দিন থেকে সেরেস্তার হিসাবপত্র দাখিল করবার আদেশ দিলেন। গোবিন্দরাম জানালেন ১৭৩৮ সালের আগের কাগজপত্র ঝড়ে উড়ে গেছে [১৭৩৭-এর

বিধ্বংসী ঝড়ে কলকাতা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়—অনুবাদক] আর পরবর্তী বছরগুলির হিসাবের কাগজপত্রের অধিকাংশ উই-এ খেয়েছে। গোবিন্দরাম তখনও ক্ষমতায় আসীন, তাই তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করবার মতো একটি প্রাণীও পাওয়া গেল না। যাই হোক অধ্যবসায়ের জোরে, হলওয়েল পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করে অবিলম্বে কাউন্সিলকে জানালেন যে, গোবিন্দরাম বহু জালিয়াতি করে কোম্পানির দেড লাখ টাকার সম্পত্তি আত্মসাৎ করেছেন এবং দাবী জানালেন, উক্ত পরিমাণ অর্থ আদায় না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে কড়া পাহারায় নজরবন্দী করে রাখা হোক, তাঁর বাড়ীতে সামরিক পাহারা বসান হোক, আর তাঁর পুত্র রঘু মিত্রকে পিতার উপস্থিতির জন্য জামিন থাকতে বাধ্য করা হোক। কিন্তু কাউন্সিলের সভ্যদের মধ্যে অনেকেই এই 'কালা জমিদারের' বন্ধু থাকায়, হলওয়েলের উৎসাহ বিশেষ পাত্তা পেল না। কাউন্সিলের সভাপতি তাঁকে গ্রেফতার বা তাঁর সম্পত্তি (সাময়িক ভাবে) বাজেয়াপ্ত না করে, তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলির একটি প্রতিলিপি দিলেন তাঁকে; সাতদিনের মধ্যে গোবিন্দরাম অভি-যোগের দুটি উত্তর দিলেন; উত্তর দুটি লেখা হয়েছিল ইংরেজিতে এবং লিখে দিয়েছিলেন, খুব সম্ভবত, কুঠিরই কোন না কোন (ইংরেজ) ভদ্র মহোদয়। উত্তরে তিনি জানালেন, তাঁর সব কাজকর্মেই উর্ধ্বতন ইওরোপীয় অধিকারীর অনুমোদন ছিল—(অনুমোদন নিতে তিনি কখনও ভুল করেন নি), আর তিনি নিজে যে সব সম্পদ বা সম্পত্তি নিয়েছেন, সে রকম সম্পত্তি ইত্যাদি এদেশের রাজা বা জমিদারের দেওয়ানমাত্রেই নিয়ে থাকেন—তাছাড়া ওটুকু না নিলে, মাসিক মাত্র পঞ্চাশ টাকা মাইনেতে উপযুক্ত ঠাটবাট বজায় রেখে পদমর্যাদা অনুযায়ী চলা সম্ভব নয়। জবাবে হলওয়েল জানালেন, কোন দেওয়ান সম্পত্তির প্রকৃত আয় যদি গোপন করেন, বা বেনামা করেন বা জনগণের উপর জোরজুলুম করে প্রাপ্য অপেক্ষা বেশী অর্থ আদায় করেন, তাহলে এদেশের রীতি অনুযায়ী 'চাবুক, হাতে কড়া পায়ে বেড়িসহ জেল আর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত: এই হল তাঁর তাৎক্ষণিক শাস্তি।' হলওয়েল মন্তব্য করলেন, মিত্র নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তিনি তাঁর দেশের রীতি অনুযায়ী লুঠ চালিয়েছেন, কাজেই তাঁর দেশেব প্রথানুযায়ী তাঁর (উপরিউক্ত) শাস্তি হওয়া দরকার। কিন্তু উপনিবেশের প্রথম এদেশীটিকে 'চাবুক বা কড়াবেড়ির' শাস্তি দিতে কাউন্সিল ইচ্ছুক ছিলেন না। বিচারের বিরুদ্ধে কাউন্সিলই সম্ভাব্য সকল প্রকার ওজর আপত্তি তুলতে লাগলেন; কাজেই সকল অভিযোগই বিফলে গেল। আর দেওয়ান (মিত্র) তাঁর অর্জিত সকল সম্পদ ও সম্পত্তি

ভোগ-দখল করতে থাকলেন।'

[এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশের প্রথম কর্মচারী গোবিন্দরামের মতো বহু এদেশীয় কর্মচারীই অত্যন্ত অল্প বেতন সত্ত্বেও প্রচুর ধনসম্পদ অর্জন করেছিলেন। পলাশীর যুদ্ধের পর সিরাজদ্দৌলার খাস কোষাগারে সঞ্চিত ছিল আট কোটি টাকা; দেওয়ান রামচাঁদ আর মুন্সী নবকৃষ্ণ এবং অন্যান্য কয়েকজন ক্লাইভকে এই অর্থের বিষয় জানাননি। এই প্রসঙ্গে মার্শম্যান তাঁর বিখ্যাত 'হিস্ট্রি অফ্ বেঙ্গল' গ্রন্থে মন্তব্য করেন: মীরজাফর, আমীর বেগ খাঁ, রামচাঁদ এবং নবকৃষ্ণ এই অর্থ আত্মসাৎ করেন। এই আত্মসাতের কাহিনী অবিশ্বাস্য বলে মনে হয় না; কারণ, রামচাঁদ তখন বেতন পেতেন যাট টাকা মাত্র; কিন্তু এর দশ বৎসর পর তিনি যখন মারা যান, তখন তার সম্পত্তির মূল্য এক কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা; আর যাট টাকা মাইনের মুন্সী (পরে রাজা) নবকৃষ্ণ এর (পলাশীর যুদ্ধের) কিছু পরে তাঁর মাতৃশ্রাদ্ধে ব্যয় করলেন ন' লাখ টাকা।]

ধর্মপ্রাণ হিন্দু গোবিন্দরাম চিৎপুরে বিরাট আকারের (মহাদেবের নামে উৎসর্গিত) নবরত্ন বা ন'টি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তখনকার দিনের একটি বাংলা প্রবাদ থেকে জানা যায়, ইংরাজ-রাজের প্রজাদের উপর গোবিন্দ-রামের প্রভাব প্রতিপত্তি কত প্রবল ছিল —

গোবিন্দরামের ছড়ি,
বনমালী সরকারের বাড়ী,
উমিচাঁদের দাড়ি,
আর, জগৎশেঠের কড়ি।

[প্রায় এক শ' বছর আগে বনমালী সরকার নামে কলকাতার এক ধনী ব্যক্তির বাড়ীটিকেই তখন কলকাতার সব চেয়ে বড় বাড়ী বলা হত। এখনও (১৮৮১) প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় বাড়ীটি বর্তমান।]

[তখনকার বিখ্যাত ধনী উমিচাঁদের দীর্ঘ ও দুর্লভ দাড়ি ছিল। ইনিই মুর্শিদাবাদের দরবার ও কলকাতার কাউন্সিলের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদানের মাধ্যম ছিলেন; শোনা যায়, কলকাতা আক্রমণ করবার জন্য তিনিই সিরাজদ্দৌলাকে মন্ত্রণা দিয়েছিলেন। কলকাতার ইওরোপীয় এলাকায় এঁর বেশ কয়েকখানি বাড়ী আর সার্কুলার রোডে (হালসীবাগানে) বাগান ছিল। ১৭৫৬-তে গোলযোগের সূত্রপাতেই তাঁকে এই বাগান বাড়ী থেকে গ্রেফতার করে ফোর্টে বন্দী করে রাখা হয়। আবার জাল দলিল মারফৎ ক্লাইভ এঁকে প্রবঞ্চনা করেন—মেকলে সেজন্য ক্লাইভের নিন্দাও করেছেন।

ক্লাইভের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলবার জন্য ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়েছিল যে, ক্লাইভ (জালিয়াতি করে) তাঁকে তাঁর প্রাপ্য ৩০ লাখ টাকা সম্পর্কে প্রবঞ্চনা করেছেন। এই টাকা না পাওয়ায় উমিচাঁদ প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। প্রচার করা হয়েছিল, এই আঘাতের ফলে অল্পকাল পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। আসলে, তিনি এই ঘটনার পর আরও ছ'বছর বেঁচেছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর বিপুল অর্থের যে উইল করে যান তাতে পাগলামির কোন চিহ্ন ছিল না। উইলে তিনি দানখয়রাত বাবদ বহু অর্থের ব্যবস্থা রাখেন; তাঁর আঘাতকারী ইংরাজদের দাতব্য প্রতিষ্ঠানেও তিনি ২৫,০০০ টাকা দান করে যান।—Calcutta Review, Vol. III, 1845.]

[মুর্শিদাবাদের অধিবাসী জগৎশেঠ ছিলেন তখনকার দিনের সর্বাপেক্ষা ধনী মহাজন।]

১৭৬৬-তে প্রবীণ বয়সেই গোবিন্দরামের মৃত্যু হয়। তিনি রেখে যান তাঁর একমাত্র পুত্র রঘুনাথ মিত্রকে। রঘুনাথের বয়স তখন ২৫ বছর। প্রচুর বিত্তের মালিক হয়ে রঘুনাথ বিলাসব্যসনে মত্ত হয়ে উঠলেন। তবে, ধর্মপ্রাণ হিন্দু হিসাবে প্রচুর ব্যয় করে খুব জাঁকজমকের সঙ্গে দুর্গাপূজা ও কালীপূজা করতে লাগলেন। তাঁর চার পুত্র :—রাধাচরণ মিত্র, কৃষ্ণচরণ মিত্র, রসময় মিত্র ও আনন্দময় মিত্র। এঁদের মধ্যে রাধাচরণ ও রসময় রঘুনাথের জীবিতকালেই মারা যান; রঘুনাথও মারা যান ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দে।

১. রঘুনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাচরণের দুই বিবাহ, প্রথম পক্ষের ছিল এক পুত্র আর দ্বিতীয় পক্ষের দুই পুত্রের অন্যতম অভয়চরণ ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং বিশেষ কর্মদক্ষ। ২৪ পরগণা এবং মীনপুরীর সমাহর্তাদের দেওয়ানরূপে তিনি ওপরওয়ালাদের প্রচুর প্রশংসা পান। পূর্বপুরুষদের ন্যায় তিনিও রাজকীয় জাঁকজমকের সঙ্গে দুর্গা ও কালীপূজা করতেন। গোঁড়া হিন্দু ছিলেন বলে কুলগুরুকে এক লাখ টাকা দান করে দেন; গুরু অত টাকা একসঙ্গে চোখে দেখেননি বলে শিষ্যকে লাখ টাকা একসঙ্গে একবার দেখাবার অনুরোধ করেছিলেন মাত্র, এতেই তিনি গুরুকে লাখ টাকা দান করে দেন। এখনও অভয়চরণ আদর্শ শিষ্য হিসাবে কলকাতায় পরিকীর্তিত। প্রখ্যাত ধনী নিমাইচরণ মল্লিক ও বৈষ্ণবচরণ মল্লিকের সঙ্গে অভয়চরণের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। অভয়চরণ ও তাঁর কাকা কৃষ্ণচরণের মধ্যে দেওয়ানী বিরোধ বাধলে, নিমাইচরণ ও বৈষ্ণবচরণকে সালিস মানা হয়। তাঁদের রায়ে অভয়চরণ বিপুল পরিমাণ অর্থ লাভ করেন। কৃষ্ণচরণ তখন ঐ অর্থ দক্ষিণা হিসাবে প্রার্থনা করবার জন্য কুলগুরুকে নিয়োগ করেন। বিনা বাক্যব্যয়ে অভয়চরণ রায়ে প্রাপ্ত সমস্ত অর্থ গুরুদেবকে

দান করেন; পরোক্ষে জয়ী হন কৃষ্ণচরণ। এই ঘটনার কিছু দিনের মধ্যেই স্বীয় কর্মনৈপুণ্য ও অধ্যবসায়ের গুণে অভয়চরণ পুনরায় বিপুল অর্থ এবং মর্যাদা ও খ্যাতি অর্জন করেন। [১৮০৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি মীনপুরীতে পরলোকগমন করেন—এই মীনপুরীর সমাহর্তার তিনি দেওয়ান ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর ছয় পুত্র বর্তমান ছিলেন।]

২ রঘুনাথের মধ্যমপুত্র কৃষ্ণচরণ ছিলেন ঢাকার সমাহর্তার দেওয়ান। আজ (১৮৮১) থেকে প্রায় ৭০ বছর আগে তিনি নন্দনবাগানে একটি উল্লেখযোগ্য বাসগৃহ নির্মাণ করেন—এখানেই তাঁর বংশধররা বাস করছেন। তাঁর মধ্যমপুত্র রাজচন্দ্রের বিবাহ উপলক্ষে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কর্নওয়ালিস তাঁকে তাঁর বাড়ীতেই দুটি তোপ দাগবার দুর্লভ মর্যাদা দিয়েছিলেন—কেল্লার প্রাচীর থেকেও এই উপলক্ষে তোপধ্বনি করা হয়েছিল। নন্দনবাগান মিত্র বাড়ীতে এখনও দুটি কামান আছে। কৃষ্ণচরণের কনিষ্ঠ পুত্র শম্ভুচন্দ্র ছিলেন ফারাক্কাবাদের সমাহর্তার দেওয়ান। তাঁর পাণ্ডিত্য, দান ও জনহিতৈষণার জন্য কতিপয় ইওরোপীয় ও বহু এদেশীয় তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। মৃত্যুকালে তাঁর দুই পুত্র বিশ্বেশ্বর ও কাশীশ্বর জীবিত ছিলেন। কাশীশ্বরের ইংরেজী ভাষায় বিশেষ দখল ছিল। তিনি হুগলীর প্রধান সদর আমীন হয়েছিলেন। তখনকার আমলাদের মধ্যে তিনি ছিলেন কর্মদক্ষ ও সৎ। তিনি রাজা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বন্ধু ও গোঁড়া ব্রাহ্ম ছিলেন।

৩ রঘুনাথের তৃতীয় পুত্র রসময় ছিলেন অপুত্রক।

৪ রঘুনাথের চতুর্থ পুত্র আনন্দময় ছিলেন রাজশাহীর সমাহর্তার দেওয়ান। এঁর বংশধরগণ 'বেনারসের মিত্র পরিবার' নামে পরিচিত।

জোড়াসাঁকোর বাবু হরচন্দ্র ঘোষ

২৪ পরগণা জেলার বেহালার তালুকদার বিখ্যাত সীতারাম ঘোষের পৌত্র এবং দেওয়ান অভয়চরণ ঘোষের পুত্র হরচরণ ছিলেন কলকাতা স্মল কজ কোর্টের তৃতীয় জজ। এঁরা জাতিতে কায়স্থ।

বাল্যকালে পিতৃহীন হওয়ায়, তিনি আত্মনির্ভর হয়ে ওঠেন। একান্তভাবে নিজ চেষ্টায় তিনি হিন্দু কলেজে ভর্তি হন; সেখানে পড়াশোনায় তাঁর

অধ্যবসায় ও উৎসাহে খুব কম সময়ের মধ্যেই তিনি ডেভিড হেয়ার ও ডঃ উইলসনের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণে এই হিন্দু স্কুলেই নব-জীবনের ও শক্তির সঞ্চার হয়েছিল সামান্য কয়েকজন নবযুবকের মধ্যে— উজ্জ্বল এই সকল নবযুবকের একজন ছিলেন হরচন্দ্র। হরচন্দ্রের সাহিত্যপ্রেমিক কয়েকজন সহপাঠী তাঁরই বাড়ীতে সমবেত হয়ে ইওরোপের দিক্‌পাল সাহিত্যিক ও দার্শনিকদের সৃষ্টিসমূহ নিয়ে সপ্তাহে দু' দিন আলোচনায় বসতেন—নেতৃত্ব দিতেন মিঃ ডিরোজিও। কলেজের প্রতিভাবান ছাত্র হরচন্দ্র প্রতি বৎসরই বাৎসরিক পরীক্ষায় বহু পুরস্কার লাভ করতেন। তাঁরই উদ্যোগে তাঁর আত্মীয়, বন্ধু ও সহপাঠী শ্রীকিষেণ সিংহের মানিকতলা বাগানবাড়ীতে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়; তিনিই হন উক্ত অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক। (উল্লেখ্য এই শ্রীকিষেণ সিংহই পরবর্তীকালে হিন্দু কলেজের গভর্নর হন।) বলা যায়, হিন্দু কলেজ যে-সকল জ্ঞানবীর সৃষ্টি করত, তাঁদের ব্যায়ামাগার ছিল এই অ্যাসোসিয়েশন; এখানেই হরচন্দ্রের সঙ্গে কয়েকজন প্রখ্যাত ইওরোপীয়ের পরিচয় হয়—এই পরিচয় পরে গভীর বন্ধুত্বে পরিণত হয়। এই সময় একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে—হরচন্দ্র তখন সবেমাত্র কলেজের শিক্ষা শেষ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে চলেছেন। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক তখন ভারতের বড়লাট। পাঠকবর্গকে মনে করিয়ে দেওয়া বাহুল্য যে, জনহিতব্রতী এই রাজপুরুষ এদেশীয়দের উন্নতিসাধনে কত ব্যগ্র ছিলেন। একজন শিক্ষিত এদেশবাসীকে নিজ ব্যক্তিগত সচিব, তৎকালীন ভাষায় দেওয়ান, নিযুক্ত করবার অভিলাষে তিনি বাবু হরচন্দ্রকে এই পদ গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে তাঁর সঙ্গে উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ভ্রমণে যেতে বলেন। হরচন্দ্র রাজী হয়ে গেলেন, কিন্তু তাঁর ভবিষ্যতের আর লর্ড বেন্টিঙ্কের প্রশংসনীয় চেষ্টার পথরোধ করে দাঁড়ায় তাঁর বাড়ীর কুসংস্কার। ঈর্ষাপরায়ণ জ্ঞাতিকুটুম্বগণ তাঁর মা'কে বোঝালেন, লাট সাহেবের সঙ্গে গেলে হরচন্দ্রকে জাত খোয়াতে হবে। এই যুক্তিহীন নির্বোধ ধারণার বিরুদ্ধে তিনি মা'কে বহুভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু আজ (১৮৮১) থেকে চল্লিশ বছর আগেকার কোন হিন্দু মা-কে তাঁর মজ্জাগত কুসংস্কার মুক্ত করা ছিল অতি কঠিন। ফলে, খুব দুঃখ পেলেও, চাকুরীটি তিনি নিতে পারলেন না। বড়লাটও বিরক্ত হলেন, কিন্তু হরচন্দ্রের কথা তিনি ভুললেন না। ইতিমধ্যে লর্ড বেন্টিঙ্ক মুন্সেফ আইন পাস করে এদেশীয়দের সামনে চাকুরীর নতুন পথ খুলে দিলেন। হরচন্দ্রকে ডেকে তিনি ঐ চাকুরী নিতে বললেন; কিন্তু হরচন্দ্রের আর্থিক অবস্থা ছিল বেশ সচ্ছল; ঐ সামান্য মাইনের চাকুরী নিতে তিনি অনিচ্ছুক; কিন্তু লর্ড বেন্টিঙ্ক চাকুরীটি নেবার জন্য চাপ দিতে লাগলেন। কী আর করেন,

হরচন্দ্র ১৮৩২ সালের ২৫ এপ্রিল বাঁকুড়ায় ঐ চাকুরীতে বহাল হলেন। বাড়ীতেই তিনি আইন পড়ে নিয়েছিলেন। সুবিচারকের সব গুণই তাঁর ছিল —ধীর, শান্ত, ভাবাবেগবর্জিত, পরিশ্রমী এবং ভালোমন্দ বোঝবার স্বাভাবিক ক্ষমতা। তাঁর কর্মপদ্ধতিও ছিল বিস্ময়কর। প্রাচীনপন্থীদের মতো না করে ঠিক দশটায় তিনি আদালতে যেতেন; তারপর ঘড়ির কাঁটা ধরে বিচার-কাজ পরিচালনা করতেন। সাক্ষ্য এজাহার নিজের হাতে লিখে নিতেন—এই পদ্ধতি সরকার পরে প্রবর্তন করেন। আদালতেই উভয় পক্ষ ও উকিলদের সামনেই তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত বা রায় লিখতেন—ফলে, সকলের মধ্যেই আস্থার সঞ্চার হত।

পরিশ্রমী ও নিয়মানুগ হওয়ায় তাঁর কাজ কখনও জমে যেত না। একদিকে বাদী-বিবাদী সকল পক্ষই তাঁর ওপর আস্থাশীল হয়ে ওঠেন—অপরদিকে ওপরওয়ালাদেরও ধারণা হয় যে, তাঁর সিদ্ধান্ত সঠিক ও যোগ্যতার পরিচায়ক। এক বছর যেতে না যেতেই তাঁকে সদর আমীন পদে উন্নীত করা হয়। বাঁকুড়ায় দু'বছর কাজ করার পর তিনি হুগলীতে বদলী হন ১৮৩৮ সালে। ১৮৪১ সালে তাঁকে ২৪ পরগণার অ্যাডিশনাল প্রিন্সিপ্যাল সদর আমীন পদে উন্নীত করা হয় এবং ঐ পদে পাকা করা হয় ১৮৪৪ সালে। ১৮৪৭ সালে তাঁকে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাও দেওয়া হয়। তাঁর কার্যক্ষমতা এত বেশী ছিল যে, সিভিল জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ একাই করলেও, তাঁর কোন ফাইল বকেয়া পড়ে থাকত না। সেই সে যুগে, এদেশে নিযুক্ত এদেশীয় বিচারকের কাজ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। ইংরাজ সরকারের নীতি উদার হলেও, জেলা জজেরা ভারতীয়দের উচ্চাশা চাপা দিতে বিশেষ তৎপর ছিলেন। সেইজন্য, এদেশে নিযুক্ত এদেশীয় জজদের বিশেষ কঠিন অবস্থার মধ্যে কাজ করতে হত—এঁদের যোগ্য নেতা ছিলেন বাবু হরচন্দ্র ঘোষ। সৌভাগ্যবশত হরচন্দ্র উচ্চতম কর্তৃপক্ষের নিকট সুপরিচিত ছিলেন, সদর কোর্টে ওপরওয়ালার কাছে পাত্তা না পেলেও, তিনি সমর্থন পেতেন সপারিষদ বড় লাটের। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক অবসর নেওয়ার পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত লর্ড অকল্যাণ্ডও হরচন্দ্রের প্রতি একইভাবে সহানুভূতিপূর্ণ-নজর রাখেন। সহৃদয় এবং শক্তিশালী মিত্ররূপে হরচন্দ্র পেয়েছিলেন ছোটলাট লর্ড অকল্যাণ্ডের ব্যক্তিগত সচিব মিঃ জে বি কোলভিনকে; ইনি পরে সদর আদালতের অন্যতম জজ এবং শেষ পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের গভর্নর হয়েছিলেন। এঁরই সাহায্যে হরচন্দ্র এদেশেই নিযুক্ত জজ এবং এদেশীয়দের স্বার্থবিরোধী সদর কোর্টের বহু সার্কুলার অর্ডার রদ করাতে পেরেছিলেন। চাকুরীতে নিজের পদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য তিনি যে-সব সংগ্রাম করেছিলেন,

সে-সব আজ কল্পকাহিনীর মতো শোনায়। কখনও কখনও বিরোধ এত তীব্র হয়ে উঠত যে, সরকারকে হস্তক্ষেপ করতে হত; ফলে, প্রভুত্বকামী জেলা জজই অন্য জেলায় বদলি হয়ে যেতেন। বাবু হরচন্দ্র ছিলেন ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত, তার ওপর কলকাতার মানুষ। ওপরওয়ালাদের সঙ্গে ইংরেজীতে কথাবার্তা বলতেন, চিঠিপত্রও লিখতেন ইংরেজীতে। ইংরাজের আদব কায়দাও ব্যক্তিগত জীবনে মেনে চলতেন। ইওরোপীয় অফিসারদের এসব আদৌ ভাল লাগত না; হরচন্দ্রের সমকক্ষতার ভাব তাঁদের কাছে অসহ্য মনে হত। স্কটল্যাণ্ডবাসী একজন জেলা জজ, ব্যক্তিগত জীবনে সৎ ও ধার্মিক ছিলেন, হরচন্দ্রের কর্মদক্ষতা ও চরিত্রগুণের জন্য তাঁকে শ্রদ্ধাও করতেন; তিনিও একদিন হরচন্দ্রকে ডেকে খোলাখুলি বললেন, 'দেখ হরচন্দ্র, ব্যক্তিগত-ভাবে আমি তোমাকে শ্রদ্ধাও করি, কিন্তু তোমার ইংরেজী শিক্ষা আমার ভাল লাগে না। আমরা এদেশ জয় করেছি, সেইজন্যই আমরা (পরাজিত) এদেশবাসীকে কোন দিক দিয়েই আমাদের সমকক্ষ ভাবতে পারি না। খোলাখুলিভাবেই তোমাকে আমার মনের কথা বললাম, শুনতে তোমার খুব খারাপ লাগবে; কিন্তু জেনে রেখ, মোটামুটিভাবে এই হল সব ইওরোপীয়ের চিন্তাধারা।' হরচন্দ্রের জীবিতকালেই ইওরোপীয়দের এই ভাবধারা বহুলাংশে পরিবর্তিত হয়। বহু সম্মানিত ইওরোপীয় তাঁর বন্ধুস্থানীয় ছিলেন।

সিপাহী বিদ্রোহের ফলে এই পরিবর্তনের ধারা ভীষণভাবে ব্যাহত হল। তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন (ইওরোপীয়) জেলা জজ ও সদর আদালত অত্যন্ত প্রশংসাসূচক যে সকল মন্তব্য করেছিলেন, সে-সব উদ্ধৃত করবার মতো স্থান এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে হবে না—তবে একথা বলা যায়, প্রশংসাগুলি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সম্পর্কে হলেও, তিনি যে পদে ছিলেন, সেই পদে নিযুক্ত সকল এদেশীয়ই ঐ প্রশংসার অংশীদার। তাঁর সম্পর্কে সরকারের এত ভাল ধারণা ছিল যে, লর্ড ডালহৌসি একজন এদেশীয়কে পুলিস বেঞ্চে নিয়োগ করতে মনস্থ করে সদর জজদের মতামত চাইলে, তাঁরা সকলেই একবাক্যে হরচন্দ্রের নাম সুপারিশ করেন। এই পদের জন্য অনেক উমেদার ছিলেন; কিন্তু নিজের জন্য ধরাধরি করা হরচন্দ্রের ধাতুতে ছিল না; তিনি বলতেন, বিচার বিভাগীয় আধিকারিক-দের পদের পিছনে দৌড়ন উচিত নয়, পদই তাঁদের খুঁজে নেবে। নিজের ক্ষেত্রেও তিনি এই আদর্শ মেনে চলতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল গুণের পুরস্কার আছেই; তাঁর নিজের ক্ষেত্রে অন্তত তাঁর এই বিশ্বাস সত্যে পরিণত হয়েছিল। (উচ্চতর) পদের পিছনে তিনি কখনও দৌড়ননি; পদোন্নতির জন্য কখনও ধরাধরিও করেননি। এদেশে নিযুক্ত এদেশীয় বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদিগের তালিকায় তাঁর নামটাই থাকত সর্বপ্রথমে; কাজেই, তাঁর

পদোন্নতিও হত যেন আপনা থেকেই। পুলিশ বেঞ্চে নিয়োগের পূর্বে হরচন্দ্রের ব্যক্তিগত মতামত জানবার জন্য লর্ড ডালহৌসি তাঁকে ডেকে পাঠান। একটি এদেশীয় পরিবার তাঁর প্রতি অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠেন—এ বিষয়ে যত কম বলা যায় ততই ভাল। এছাড়া ঐ পদের উমেদার কয়েকজন ব্যারিস্টার তাঁর নিয়োগে আশাহত হওয়ায় তাঁকে তীব্রভাবে আক্রমণ করে বিভিন্ন সংবাদপত্রে ছদ্মনামে চিঠি লিখতে থাকেন। সংবাদপত্রগুলির পরিচালকবর্গ অবশ্য হরচন্দ্রকেই সমর্থন করতে থাকেন। পুলিশ বেঞ্চে তাঁকে নিয়োগ করার বিরুদ্ধে এই চক্রের কথাই হরচন্দ্র মিঃ হ্যালিডের কাছে উল্লেখ করেন; অতি-কথনে অভ্যস্ত হ্যালিডে এই কথাকেই বহুলাংশে বাড়িয়ে হাউস অফ কমন্স কমিটির কাছে সাক্ষ্য দিলেন—এর জন্য অবশ্য হ্যালিডে বাবু রামগোপাল ঘোষের আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়েছিলেন। প্রসঙ্গান্তরে চলে গেছি, আসল কাহিনীতে ফিরে আসা যাক। লর্ড ডালহৌসি পুলিশ কোর্টের কাজে যোগ দেবার জন্য হরচন্দ্রের কাছে প্রত্যক্ষ ভাবে প্রস্তাব করলে, তিনি সংবাদপত্রে তাঁর বিরুদ্ধে বিরূপ সমালোচনার কথা জানিয়ে পদটি গ্রহণে তাঁর ইতস্ততা প্রকাশ করেন। উত্তরে বরিষ্ঠ রাজনীতিক বললেন, দেখ হরচন্দ্র, সংবাদপত্রগুলি তো আমার বিরুদ্ধে প্রতিদিন আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে, তার জন্য কি আমি আমার কর্তব্য সাধন থেকে বিরত হয়েছি। ওদের সমালোচনায় ক্ষুব্ধ হবার কিছু নেই। তোমার স্বদেশীয়দের উন্নতি ও অগ্রগতি এখন সংকটের মুখে, তোমার নিজের দৃষ্টান্ত দিয়ে তোমাকে দেখিয়ে দিতে হবে যে, ইওরোপীয়দের মতই তোমরাও উচ্চ ও সম্মানিত পদলাভের যোগ্য। হরচন্দ্র পদটি গ্রহণ করলেন। ১৮৫২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারির গেজেটে তাঁর নাম কলকাতার জুনিয়ার ম্যাজিস্ট্রেট-রূপে প্রকাশিত হল। ১৮৫৪ সালে তাঁকে কলকাতা স্মল কজ্ কোর্টের অন্যতম জজরূপে মনোনীত করা হল। সংবাদপত্র সমূহের তীক্ষ্ণ নজর ছিল তাঁর কাজের ওপর, জনগণও তাঁর কাজের দোষত্রুটি ক্ষমা করে নেবে এমন অবস্থা ছিল না, তৎসত্ত্বেও তিনি পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট ও স্মল্ কজ্ কোর্টের অন্যতম জজ রূপে অত্যন্ত সন্তোষজনক ভাবে ষোল বছর তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন; এতেই বোঝা যায়, তাঁর ওপর আস্থা স্থাপন করে লর্ড ডালহৌসি আদৌ কোন ভুল করেননি।

এতক্ষণ আমরা চুম্বকে তাঁর কর্মজীবনের একটা চিত্র দেবার চেষ্টা করলাম। তাঁর পদের তিনি অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন, তাঁর কাজ ও উচ্চ চারিত্রিক গুণের জন্য তিনি সর্বদাই সরকারের প্রশংসা পেয়েছেন। একথা বললেই যথেষ্ট হবে যে, তাঁর দীর্ঘ ছত্রিশ বছরের কর্মজীবনে তিনি বিভিন্ন জজ, সেক্রেটারি ও

গভর্ণরের অধীনে চাকুরী করেছেন, তাঁদের কেউই কখনও তাঁর বিরুদ্ধে কোন বিরূপ মন্তব্য করেন নি। বরং সর্বদাই তিনি তাঁদের সপ্রশংস সমর্থন পেয়েছেন। যে জেলাতেই তিনি কাজ করতে গেছেন, সেখানেই তিনি জনমতের সমর্থন পেয়েছেন। তাঁর সুবিচারের প্রতি জনগণের প্রবল আস্থা ছিল, তাই রায়ে তারা হারুক বা জিতুক, উভয়পক্ষ সমভাবেই সন্তুষ্ট হত। তাঁর এই বিস্ময়কর সাফল্যের মূলে ছিল তাঁর উন্নত নীতিবোধ। তিনি কলেজে পড়বার সময় অন্য ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতা তো নয়ই, উচ্ছলতাতেও যোগ দিতেন না। তখন নতুন জীবন ও নতুন সভ্যতার সংস্পর্শে এসে ছাত্রদের মধ্যে উদ্দাম স্ফূর্তি করবার প্রবল ঝোঁক দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন ভিন্নতর। পরবর্তী জীবনেও তিনি কঠোরভাবে সংযত সরল জীবন যাপন করেছেন; বিনয় ছিল তাঁর স্বাভাবিক গুণ। তিনি ছিলেন সকলপ্রকার কদভ্যাসমুক্ত, সত্যবাদী, সৎ এবং বিবেকবান। এসব বিবেচনা করলে বলতে হয়, তিনি ছিলেন একজন আদর্শ মানুষ। অত উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকলেও, ব্যবহারে তিনি ছিলেন বিনয়নম্র; সর্বসাধারণের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার ছিল মধুর—এরকম একজন আদর্শ মানুষ খুব কম দেখা যায়। মিত্র হিসাবে তিনি ছিলেন হৃদয়বান, আর কোন ভাল কাজ করতে পারলে খুব খুশী হতেন। অপর পক্ষে ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর উচ্ছৃঙ্খল কার্যকলাপ তিনি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করতেন, সুযোগ পেলে তিনি এদের আচার আচরণের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতেন। পাছে পরিচিতজনের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ ওঠে, এইজন্য তিনি মফঃস্বলে থাকবার সময় সেখানকার সমাজকে এড়িয়ে চলতেন আর শহরে অবসরপ্রাপ্তের ন্যায় একক জীবন যাপন করতেন। তবু তাঁর স্বদেশবাসী তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তার জন্য তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। যেস্থান থেকে তিনি বদলী হতেন সেখানকার জনগণ সেটাকে তাদের মহা বিপদরূপে গণ্য করতেন। আত্মপ্রচার বিমুখ হরচন্দ্র নিজ সৎকাজের জন্য কখনও হৈ চৈ করে নিজের ঢাক নিজে বাজাতেন না। গোপনে তিনি সৎকাজ সম্পাদন করতে চাইতেন। বাঁকুড়ায় থাকবার সময় তিনি নিজ ব্যয়ে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন; এর পরিচালন ব্যয়ও তিনি বহন করতেন। বাঁকুড়ার যে সকল ব্যক্তি, (এঁদের মধ্যে অনেক ধনীও ছিলেন) তাঁরই সহায়তায় শিক্ষা লাভ করেছিলেন, তাঁরা সকলেই এইদিকে তাঁর কাজের গুণগান করেন। ২৪ পরগণার সদর আমীন থাকবার সময় তিনি তাঁর পূর্বপুরুষের আবাসস্থল বেহালায় বাস করতেন—এখানেও তিনি একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করে, বহু বৎসর যাবৎ তার ব্যয়ভার স্বয়ং বহন করেন। জজ ছিলেন বলে, কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে যোগ না দিলেও, তিনি রাজনৈতিক আন্দোলন

সমূহের প্রতি বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন। বাংলায় ইংরেজী শিক্ষার জনক ডেভিড হেয়ারের স্মৃতিরক্ষাকল্পে যে আন্দোলন হয়, তিনি সক্রিয়ভাবে তাতে অংশগ্রহণ করেন। হেয়ারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছাত্রজীবন থেকেই। এইজন্য এই মানব প্রেমিকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবার জন্য তিনি টেস্টিমোনিয়াল কমিটির সচিবপদ গ্রহণ করেন। (হিন্দু প্যাটরিয়ট, ৭ ডিসেম্বর ১৮৬৮)

দীর্ঘকালের অর্শরোগী হরচন্দ্র ঐ রোগেই ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দের ৩ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। এদেশবাসীর মর্যাদার ও আদর্শের প্রতীক হরচন্দ্রের মৃত্যুকে দেশবাসী এখনও (১৮৮১) জাতীয় ক্ষতি বলে মনে করে। স্মল কজ কোর্টের নতুন বাড়ীতে এদেশীয়দিগের যোগ্য প্রতিনিধি ও আদর্শস্থানীয় জজ হরচন্দ্রের আবক্ষ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

তাঁর মৃত্যুকালে তাঁর চার পুত্র বর্তমান ছিলেন; জ্যেষ্ঠ প্রতাপচন্দ্র, বি এ কলকাতা রেজিস্ট্রার অফ ডীড্স এবং কয়েকখানি ইংরেজী, বাংলা ও সংস্কৃত পুস্তকের লেখক ছিলেন; তাঁর বিবাহ হয়েছিল কুমারটুলির বিশিষ্ট অধিবাসী বেণীমাধব মিত্রের কন্যার সঙ্গে।

সুকিয়াস স্ট্রিটের পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সি আই ই

১৮২০ খ্রীস্টাব্দে হুগলী জেলার বীরসিংহ গ্রামে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম হয়। তিনি ছিলেন ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। দারিদ্র্যপীড়িত হলেও ঠাকুরদাস ঈশ্বরের শিক্ষার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ১৮২৯-এর ১ জুন তাঁকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করা হয়। ১৮৪১ পর্যন্ত সেখানে তিনি অধ্যয়ন করেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড পণ্ডিত নিযুক্ত হন; মাসিক বেতন হয় ৫০ টাকা। ১৮৪৬-এ স্কুল-পাঠ্য পুস্তক হিসাবে তাঁর বেতাল পঞ্চবিংশতি প্রকাশিত হয়; এবং তাঁকে সংস্কৃত কলেজের সহকারী অধীক্ষক নিয়োগ করা হয়—ঐ পদে তিনি পর বৎসরই ইস্তফা দেন। ১৮৪৯-এর ফেব্রুয়ারিতে তাঁকে মাসিক ৮০ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড ক্লার্ক নিযুক্ত করা হয়। পর বৎসর ডিসেম্বর মাসে মাসিক ৯০ টাকা বেতনে তিনি সংস্কৃত কলেজের অন্যতম অধ্যাপক পদ লাভ করেন। ১৮৫১-র জানুয়ারি মাসে মাসিক ১৫০ টাকা বেতনে ঐ কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ঐ পদে অধিষ্ঠিত

থাকবার সময় ছাত্রদের শিক্ষার পথ সুগম করার জন্য তিনি কঠোর পরিশ্রম করে উপক্রমণিকা, সংস্কৃত ব্যাকরণ কৌমুদির তিনটি খণ্ড এবং সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনুবাদ করে শকুন্তলা প্রকাশ করেন। সহজে ও অনায়াসে সংস্কৃত শিখতে এই বইগুলি আজও ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে সহায়ক।

বিধবা বিবাহের পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে ১৮৫৪-তে তিনি একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন; উত্তম প্রশংসনীয় হলেও এতে কোন ফল হল না। সকল হিন্দুই—সে যুবক বা বৃদ্ধ হউক, ধনী বা দরিদ্রই হউক তাঁকে ঘৃণা করতে লাগল। সে ঘৃণার যেন সীমা ছিল না। বিধবা বিবাহ সম্পর্কে আলোচনা করবার জন্য সারা বাংলার পণ্ডিত-সমাজ সভার পর সভা করতে লাগলেন—তাঁদের সকলেরই মত গেল তাঁর বিরুদ্ধে। প্রথম প্রথম যে-সকল পণ্ডিত তাঁকে সমর্থন করেছিলেন, তাঁরাও পরে মত পরিবর্তন করে তাঁর বিপক্ষে চলে গেলেন; তাঁর মতের বিরুদ্ধে মত দিতে থাকলেন। তিনি কিন্তু স্বীয় মতে দৃঢ় থেকে, বিধবা বিবাহের সপক্ষে পর পর কয়েকটি পুস্তিকা প্রকাশ করে চললেন। সংস্কৃত শাস্ত্র থেকেই অসংখ্য উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করে চললেন, স্মরণাতীত কাল থেকে এদেশে বিধবা বিবাহের প্রচলন আছে। এক্ষেত্রেও কয়েক ব্যক্তি বিরুদ্ধ উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর মত খণ্ডন করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁদের সে চেষ্টা বিফল হল। ১৮৫৬-র জুলাই মাসে সরকারকে দিয়ে তিনি বিধবা বিবাহ আইন পাস করাতে সক্ষম হলেন। ১৮৬৫-র ৭ ডিসেম্বর তাঁরই নেতৃত্বে সুকিয়াস স্ট্রিটে প্রথম বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। ফলে বৃহত্তর হিন্দু সমাজে মহা আলোড়নের সৃষ্টি হয়। বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তিগণ ঘোষণা করে দিলেন, কোন হিন্দু বিদ্যাসাগরের সঙ্গে যোগ দিলে, তাকে হিন্দু সমাজ থেকে বহিষ্কার করা হবে। সুহৃদ ও স্বদেশবাসীরা তাঁকে বর্জন করলেও, তিনি তাঁর মতবাদে অবিচল থেকে অধ্যবসায় সহকারে বিধবা বিবাহের পক্ষে কাজ করে যেতে লাগলেন। বিধবা-বিবাহের ব্যয়ও তিনি নিজেই করতেন; শোনা যায়, এজন্য তাঁর প্রচুর ঋণ হয়ে গিয়েছিল।

১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও নদীয়া জেলার স্কুল পরিদর্শক নিযুক্ত করা হয়; তাঁর মাসিক বেতন হয় ৫০০ টাকা। এই পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতিবিধানে প্রভূত চেষ্টা করেন, উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক, যেমন: বর্ণ পরিচয়, কথামালা, চরিতাবলী প্রভৃতিও রচনা করেন। স্ত্রী শিক্ষার বিষয়ে সবিশেষ আগ্রহী হওয়ায়, তিনি বেশ কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন—কিন্তু সরকারী অনুদানের এবং জনসমর্থনের অভাবে এই সকল বিদ্যালয়ের

অধিকাংশই পরে বিলুপ্ত হয়। ১৮৫৮-র শেষ দিকে তিনি ঐ পদ ত্যাগ করেন; ফলে, হাতে প্রচুর সময় থাকায় তিনি পুস্তক রচনায় মনোনিবেশ করেন; রচিত হয় বাংলায় ব্যাকরণ কৌমুদির চতুর্থ ভাগ, আখ্যান মঞ্জরী, সীতার বনবাস, বাংলা মহাভারতের একটি ভূমিকা, ভ্রান্তিবিলাস প্রভৃতি; এতদ্ব্যতীত মেঘদূত, উত্তর চরিত, শকুন্তলা প্রভৃতি স্বীয় টীকা সহ বাংলায় প্রকাশ করেন।

সে যুগে হিন্দু সমাজে বহু-বিবাহ বহুল প্রচলিত ছিল; ১৮৭১ নাগাদ তিনি এই ব্যাধির মূলেও কুঠারাঘাত করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু এ বিষয়ে সরকারের সমর্থন ও হস্তক্ষেপের অভাবে তিনি বিশেষ অগ্রসর হতে পারেননি।

নিজ ব্যয়ে তিনি স্বগ্রামে একটি ইংরেজী বিদ্যালয় ও একটি দাতব্য ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা করে গ্রামটির প্রভূত উপকার করলেন। তিনি বহু অনাথ ও বিধবার ভরণপোষণ করেন। আর, কেউ বিপন্ন হয়ে তাঁর সহায়তা চাইলে, তিনি সাহায্য করতে সদা প্রস্তুত থাকেন। তিনি সরল জীবন যাপন করেন। তিনি অসাধারণ চরিত্রের অধিকারী। শিক্ষার মহান পৃষ্ঠপোষক ও বান্ধব ঈশ্বরচন্দ্র শিক্ষার উন্নতির জন্য প্রতি মাসে নিজ আয় থেকে প্রচুর ব্যয় করেন। কলকাতায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনকে বাংলা বিহার ওড়িশার শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়গুলির অন্যতমরূপে গণ্য করা হয়; তাঁর গ্রন্থাগারটিকে বহু ব্যক্তি মহামূল্যবান বলে মনে করেন। তাঁকে বর্তমানের শ্রেষ্ঠ ও খ্যাতিমান সংস্কৃতজ্ঞরূপে গণ্য করা হয়; ইংরেজী ও অন্যান্য ভাষাতেও তাঁর সাহিত্যকৃতীর জন্য তিনি বিখ্যাত। ইংল্যাণ্ডে-শ্বরীর, 'ভারত সম্রাজ্ঞী' উপাধি ধারণ উপলক্ষে কলকাতায় ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে ১ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত দরবারে তাঁকে সাম্মানিক প্রশংসাপত্র দেওয়া হয় এবং ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে ১ জানুয়ারি তাঁকে 'কম্প্যানিয়ন অফ্ দি ইণ্ডিয়ান এমপায়ার' পদবীতে ভূষিত করা হয়। তাঁর বর্তমান বয়স প্রায় ৬০ বৎসর। তাঁর একমাত্র পুত্রের নাম শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বড়বাজারের দেওয়ান কাশীনাথের পরিবারবর্গ

কাশীনাথের পিতামহ ঘাসীরাম ছিলেন সম্রাট শাহ্‌জাহানের শাসনকালের শেষ দিকে তাঁর অন্যতম দেওয়ান; বাদশাহী দরবারে তাঁর যথেষ্ট প্রতিষ্ঠাও ছিল। জাতিতে ক্ষেত্রীটুনন্‌ ঘাসীরাম লাহোরে বাস করতেন, সেখানেই তিনি প্রবীণ বয়সে পরলোকগমন করেন। তাঁর বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন তাঁর একমাত্র পুত্র মুলুকচাঁদ। তাঁর বহু বিস্তৃত ব্যবসায় বাণিজ্য চালাবার জন্য মুলুকচাঁদ প্রথমে মুর্শিদাবাদে এবং পরে কলকাতায় বসবাস করতে থাকেন।

মুলুকচাঁদ (বিভিন্ন কারণে) মুর্শিদাবাদ ছেড়ে কলকাতায় বাস করতে আসেন; গোঁড়া হিন্দু মুলুকচাঁদ গঙ্গার সান্নিধ্য পাবার নিশ্চয়তায় কলকাতাকে পছন্দ করেন। ব্যবসায়ী হলেও মুলুকচাঁদ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রকৃত অনুরাগী ছিলেন। তিনিও পরিণত বয়সেই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর একমাত্র পুত্র দেওয়ান কাশীনাথ (সাধারণ্যে কাশীনাথ বাবু নামে সমধিক পরিচিত) বর্তমান ছিলেন।

ব্রিটিশ শাসনের প্রথম যুগে কাশীনাথ কিছুকাল কর্নেল ক্লাইভের দেওয়ান রূপে কাজ করেন। এই সঙ্গে তিনি উত্তর পশ্চিম প্রদেশের এবং ভারতের অন্যান্য অংশের বহু রাজা ও ধনী ব্যক্তির কলকাতাস্থ প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করতে থাকেন।

১৭৭৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি কাশীজুড়ার (কাশীজোড়) রাজার বিরুদ্ধে একটি মামলা রুজু করেন। এই মামলায় ওয়ারেন হেস্টিংস রাজার পক্ষ অবলম্বন করেন। রাজাকে কোর্টের অধিকার স্বীকার করতে নিষেধ করেন, এবং সামরিক ব্যক্তিদের শেরিফের কর্মচারীবর্গকে বাধা দেবার নির্দেশ দেন। গভর্নর জেনারেল হিসাবে তিনি একটি ঘোষণা জারি করে 'সকল জমিদার, তালুকদার এবং চৌধুরীদের আদেশ দেন যে, তাঁরা ব্রিটিশের প্রজা না হলে বা কোন চুক্তিদ্বারা আবদ্ধ না থাকলে, সুপ্রীম কোর্টের রায় যেন না মানেন; প্রাদেশিক শাসকদের নির্দেশ কার্যকর করার জন্য তাঁরা যেন সামরিক সহায়তা না দেন।' উত্যক্ত হয়ে কোর্ট শেষ পর্যন্ত গভর্নর জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিলের সদস্যদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনেন যে, কাশীনাথের

মামলায় তাঁরা কোর্টের অফিসারদের আটক করেছেন, এই অভিযোগ এনে আদালতে হাজির হবার জন্য তাঁদের ওপর সমন জারী করলেন। হেস্টিংস অবিলম্বে জানিয়ে দিলেন যে, পদাধিকার বলে তাঁরা (তিনি ও কাউন্সিলের সভ্যগণ) যে কাজ করছেন, তার জন্য কোর্টের আদেশ মানবেন না। ইতিমধ্যে গভর্নর জেনারেল এবং কলকাতাবাসী বহু ইংরাজ কোর্টের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাবার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে আবেদন জানালেন। এই সকল ঘটনা ঘটে ১৭৮০-এর মার্চ মাসে। বিষয়টি (পার্লামেন্টে) বিশদরূপে আলোচিত হবার পর, একটি নতুন আইন প্রণয়ন করে সারা দেশের উপর বিচার ক্ষমতা প্রয়োগ করা থেকে কোর্টকে বিরত করা হয়—অধিকার লাভের জন্য কোর্ট অবশ্য বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। এই মামলায় দেওয়ান কাশীনাথ প্রভৃত আর্থিক ক্ষতি স্বীকারে বাধ্য হন, কিন্তু তীক্ষ্ণ বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন কাশীনাথ অবশ্য শীঘ্রই এই ক্ষতি পুষিয়ে নেন।

দেওয়ান কাশীনাথ সংস্কৃত, ফার্সী এবং অন্যান্য কয়েকটি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন; কাজ চালাবার মতো ইংরেজী ভাষাও তিনি জানতেন। ধর্মপ্রাণ হিন্দু ছিলেন বলে তিনি বড়বাজারে একটি বিরাট মন্দির নির্মাণ করে শ্যামলজীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন, এবং মন্দিরের ব্যয় নির্বাহের জন্য 'নূতন চক' দান করেন। লক্ষরনাথের মন্দির ও মূর্তিও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। সুন্দরবন থেকে জুম্মা শাহ্ পীর কলকাতা এলে, তাঁর নিবাসের জন্য কাশীনাথ একটি পাকা বাড়ী দান করেন। বাড়ীটি আজও (১৮৮১) বড়বাজারে বর্তমান। পুণ্যার্থে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই এই বাড়ীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে যান। ধার্মিক ও পুণ্যবান বলে এই পীরের তখনকার দিনে বিশেষ খ্যাতি ছিল।

খুব বৃদ্ধ বয়সে দেওয়ান কাশীনাথের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর দুই পুত্র শ্যামল দাস ও শ্যামাচরণ বর্তমান ছিলেন। শ্যামল দাসের পৌত্র দামোদর দাস এখন এই প্রাচীন সম্ভ্রান্ত ও ধনী পরিবারের কর্তা।

বাবু দামোদর দাস সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষা ভালই জানেন। রাজাবাবু নামেই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি ধর্মপ্রাণ ও চরিত্রবান। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের তিনি সভ্য। ইংল্যাণ্ডের রাণীর ভারতসম্রাজ্ঞী পদবী ধারণ উপলক্ষে কলকাতায় অনুষ্ঠিত দরবারে দামোদরবাবুকে সাম্মানিক প্রশংসাপত্র দেওয়া হয়। কলকাতার নূতন চক, কাশীবাবুর বাজার প্রভৃতি সম্পত্তি ছাড়াও মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণায় তাঁর জমিদারী আছে। জানা যায় যে, রাজাকাটরা, কাশীপুর প্রভৃতি কাশীনাথবাবুরই সম্পত্তি ছিল; কলকাতার বিখ্যাত শিখ, কোটিপতি হুজুরীমলের বিস্তৃত মূল্যবান সম্পত্তি

কাশীনাথবাবুই কিনে নিয়েছিলেন। কালীঘাটের প্রাচীন ও প্রখ্যাত মন্দিরটি এই হুজরীমলই নির্মাণ করিয়ে দেন।

জোড়াসাঁকোর রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর, সি আই ই

দি অনারেবল রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শিক্ষারম্ভ হয় ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে। স্বগৃহে কিছুকাল রেভ. মিঃ মর্গ্যানের কাছে শিক্ষালাভের পর তিনি ১৮৫৪-তে হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজে ভর্তি হন। এখানে তিনি ক্যাপটেন ডি এল রিচার্ডসন, ক্যাপটেন এফ্ পামার, ক্যাপটেন হ্যারিস, মিঃ উইলিয়ম কার্ক-প্যাট্রিক এবং মিঃ উইলিয়াম মাস্টার্সের নিকট শিক্ষালাভ করেন। ১৮৫৭তে তিনি কলেজ ত্যাগ করলেও, অধ্যয়নের অভ্যাস ত্যাগ করেননি। তিনি মর্নিং ক্রনিক্ল্, হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার, দি সিটিজেন, দি ফিনিকস, দি হরকরা, দি হিন্দু প্যাট্রিয়ট প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিতভাবে এবং কখনও কখনও দি ইংলিশম্যান পত্রিকাতেও লিখতেন। কানপুর থেকে প্রকাশিত দি সেণ্ট্রাল স্টার নামক পত্রিকার তিনি কলকাতাস্থ সংবাদদাতা ছিলেন।

হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক বাবু হরিশচন্দ্র মুখার্জীর মৃত্যুর পর তিনি উক্ত পত্রিকার সম্পাদক হন (১৮৬০ থেকে ১৮৬১ পর্যন্ত।) তিনি কলকাতা পুরসভার কমিশনার, কলকাতা পুলিশের অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সচিব এবং বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সভ্য ছিলেন। ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দের ১ জানুয়ারি দিল্লী দরবারে তাঁকে রায় বাহাদুর খেতাবে ভূষিত করা হয় এবং ১৮৭৭-এরই ১৪ আগস্ট বাংলার ছোটলাট বাহাদুর বেলভেডিয়ারে তাঁকে নিম্নোদ্ধৃত সনদ দান করেন—

'বাবু,

'দেশীয় জনগণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সর্ববিষয়ে বহু বৎসর যাবৎ আপনি মুখ্য ভূমিকা নিয়েছেন। আপনি উপযুক্তভাবে এবং আগ্রহ সহকারে আপনার স্বদেশীবাসীর স্বার্থ ও অধিকার সম্পর্কে লেখনী চালনা করেছেন এবং আপনি ইঙ্গ-বঙ্গ সংবাদপত্রকে উচ্চ ও প্রভাবশালী স্থান দিয়েছেন; সমভাবেই আপনি বঙ্গীয় আইন পরিষদের সভ্য, পৌর কমিশনার এবং বহু বোর্ড ও

কমিটির সভ্যরূপে (দেশের) সেবা করেছেন ; কোনরূপ বিরক্তি প্রকাশ না করে আপনি বহু মূল্যবান সহায়তা করায় সরকার আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ এবং তারই স্বীকৃতিস্বরূপ আপনাকে 'রায় বাহাদুর' পদবী দান করা হচ্ছে।'

১৮৭৮-এর ১ জানুয়ারি তাঁকে 'কম্প্যানিয়ন অফ দি অর্ডার অফ দি ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার' পদবীতে ভূষিত করা হয়। তাঁর সরল জীবনযাত্রা, শিক্ষা ও জ্ঞানের বিশালতা এবং চরিত্রগুণের জন্য তিনি এদেশে বহু ইওরোপীয় ও দেশীয় ব্যক্তির শ্রদ্ধা অর্জন করেন ; বিদেশেও তাঁর খ্যাতি পরিব্যাপ্ত। দেশবাসীর মঙ্গলের প্রতি তীব্র আগ্রহ থাকায় তিনি জনগণের সকলপ্রকার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। বাবু হরিশচন্দ্র মুখার্জীর মৃত্যুর পর হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকাটি ডুবে যেতে বসেছিল ; কৃষ্ট দাস পাল মহাশয়ের পরিশ্রম, উৎসাহ ও প্রচেষ্টার ফলে পত্রিকাটি নব জীবন লাভ করে। এর ফলে, তিনি সর্বশ্রেণীর জনগণের সবিশেষ আস্থা অর্জন করেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর যশ শুধু সারা দেশে নয়, বহির্ভারতেও পরিব্যাপ্ত ; সামাজিক ক্ষেত্রেও তাঁর সেবামূলক কাজে শুধু বাংলাদেশ নয়, ভারতের অন্যান্য অংশও একান্তভাবে উপকৃত।

রায় কৃষ্ট দাস পাল বাহাদুর, সি আই ই নিজ হাতে ভাগ্য গড়েছেন— এবং পরিশ্রম, সততা ও অধ্যবসায় থাকলে মানুষ জীবনে কত উন্নতি লাভ করতে পারে, দেশবাসীর নিকট তিনি তার জীবন্ত দৃষ্টান্ত।

আমাদের প্রার্থনা, এই মহান মনীষী দীর্ঘ জীবন লাভ করুন।

রেভারেণ্ড কৃষ্টমোহন ব্যানার্জী, এল এল ডি

বাবু জীবনকৃষ্ট ব্যানার্জীর পুত্র রেভারেণ্ড কৃষ্টমোহন ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা হয় পাঠশালায় ; তারপর হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন। এখানে তিনি কয়েক বছর অধ্যয়ন করেন। ১৮২৪-এ তিনি হিন্দু কলেজে ভর্তি হন ; এখানে ডিরোজিওর কাছে পড়ে অল্পকালের মধ্যে তিনি ইংরেজী সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ডিরোজিও তখন ঐ প্রতিষ্ঠানের চতুর্থ শিক্ষক। হিন্দুদের বহু কুসংস্কার, হিন্দুসমাজের অসংখ্য বাধানিষেধ এবং খাদ্যে বাছবিচার দূর করতে অন্যান্য কয়েকজন সহপাঠীর সঙ্গে কৃষ্টমোহনও

ডিরোজিওকে সাহায্যে করতে এগিয়ে আসেন। ডিরোজিওএ এই সব দুষ্কর্মের মূল বিবেচনা করে, কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে বরখাস্ত করেন। এতে কিন্তু তাঁর 'দুষ্কার্যের' অবসান হল না; তিনি একটি একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন, সেখানে এবং তাঁর নিজের বাড়িতেও তাঁর ছাত্র ও শিষ্যরা মিলিত হয়ে 'হিন্দুধর্ম বিরোধী' তাঁর মতবাদ আত্মস্থ করতেন। জাতীয় বিশ্বাসের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানার ব্যাপারে, শোনা যায়, কৃষ্টমোহন সক্রিয় অংশ নিতেন।

১৮২৯-এ কৃষ্টমোহন হেয়ার সাহেবের স্কুলে শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন, এর তিন বছর পর তিনি যীশু খ্রীস্টের ধর্ম গ্রহণ করেন। ১৮৩১-এ তাঁকে খ্রীস্টধর্মের প্রচারক নিযুক্ত করা হয়। সাফল্যের সঙ্গে তিনি ১৫ বছর এই কাজ করার পর, বিশপস্ কলেজে শিক্ষকরূপে যোগদান করেন। এখানে তিনি ১৬ বছর শিক্ষকতা করেন; তাঁর কাজে কর্তৃপক্ষ এবং ছাত্রবর্গ সন্তুষ্ট থাকতেন—ছাত্রগণ তো তাঁর প্রতি একান্তভাবে অনুরক্ত হয়ে ওঠে। মানব-প্রেমী, হিন্দুদের একান্ত সুহৃদ ডেভিড হেয়ারের মৃত্যুর পর তাঁর স্মরণ-সভায় কৃষ্টমোহন সক্রিয় অংশ নেন।

১৮৫৮তে তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম ফেলো নিয়োগ করা হয় এবং তিন বছর তিনি ছিলেন ফ্যাকালটি অফ আর্টসের সভাপতি। তিনি কিছুকাল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভ্য এবং বেথুন সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। বর্তমানে তিনি কলকাতা পৌরসভা ও অন্যান্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সভ্য। তাঁর গভীর সাহিত্যজ্ঞান ও ইংরাজী ও সংস্কৃতে উচ্চশ্রেণীর কয়েকখানি পুস্তক রচনার জন্য ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে এল এল ডি উপাধিদ্বারা ভূষিত করেন। ১৮৪১-৪২এ তিনি স্ত্রীশিক্ষার উপর একখানি বই লেখেন; ১৮৬১-৬২তে প্রকাশ করেন তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি 'ষড়দর্শন সংগ্রহ'। রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, ভট্টিকাব্য, ঋগ্বেদ প্রভৃতি গ্রন্থগুলি তিনি স্বীয় টীকাসহ প্রকাশ করেন। এছাড়া, কতগুলি বাংলা পুস্তকও তিনি রচনা করেছেন। বর্তমান বাংলায় ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতরূপে তিনি গণ্য।

এযুগের প্রায় সকল উল্লেযোগ্য সভাসমিতির সঙ্গে তিনি যুক্ত; এদের প্রতিটির কাজকর্মেই তিনি সক্রিয় অংশ নেন। বর্তমানে তাঁর বয়স ৬৮ বছর, কিন্তু এ বয়সেও তিনি দেশের মঙ্গলের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। সমাজ-সেবার প্রবৃত্তি ও শান্ত প্রকৃতির জন্য তিনি সর্বজনশ্রদ্ধেয়।

শ্যামবাজারের দেওয়ান কৃষ্ণরাম বসুর পরিবারবর্গ

হুগলী জেলার তারা গ্রাম নিবাসী দয়ারাম বসুর পুত্র কৃষ্ণরাম ১৬৫৫ শকাব্দের ১১ পৌষ বা ১৭৩৩ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পারিবারিকভাবে বিপর্যস্ত দয়ারাম তারা ত্যাগ করে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন, কিন্তু পথে হুগলী জেলার বালিতে যাত্রা-বিরতি করে ওখানেই বসবাস করতে থাকেন। কিশোর কৃষ্ণরাম হিন্দু ধর্ম ও পুরাণের বহু কাহিনী বলে ভগ্নহৃদয় পিতাকে সান্ত্বনা দিতে থাকেন। একদিকে পিতৃভক্তি, অন্যদিকে এই ১৪/১৫ বছর বয়সের বালকের মধ্যে হিন্দু ধর্ম ও শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান দেখে স্থানীয় অধিবাসীরা অত্যন্ত বিস্মিত হন। ব্রাণপ্রস্থী এক সন্ন্যাসী কৃষ্ণরামের দেহ-লক্ষণ দেখে তাঁকে দীক্ষা দিতে উৎসুক হয়ে ওঠেন। দয়ারামের অনুমতি নিয়ে সন্ন্যাসী তাঁকে দীক্ষা দিয়ে স্বীয় শিষ্য করে নেন।

কলকাতা এসে কৃষ্ণরাম দেখলেন আর্থিক দিক দিয়েও পিতার সেবা করা প্রয়োজন; ইতিমধ্যে তিনি হিসাবশাস্ত্রেও বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। পিতার কাছে থেকে কিছু অর্থ চেয়ে নিয়ে কৃষ্ণরাম স্বাধীন ব্যবসায় শুরু করলেন। এই সময় তাঁর একটা মস্ত সুযোগ এসে গেল। জনগণের জন্য প্রেরিত লবণের একটা পুরো সরকারী চালান কৃষ্ণরাম কিনে নিয়ে গুদামজাত করলেন। এতে এক দফাতেই তাঁর লাভ হল ৪০,০০০ টাকা। উৎসাহিত হয়ে তিনি ফাটকার ব্যবসায়ে নেমে পড়লেন; অল্পকালের মধ্যেই তিনি বিপুল অর্থের অধিকারী হলেন। এখন তিনি ব্যবসায় ত্যাগ করে, সরকারের অধীনে একটি চাকুরী খোঁজ করতে লাগলেন। সুযোগও এসে গেল। অনারেবল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে তিনি মাসিক ২,০০০ টাকা বেতনে হুগলীর দেওয়ান পদ লাভ করলেন। যোগ্যতার সঙ্গে এই চাকুরী কয়েক বছর করবার পর, পদত্যাগ করে তিনি কলকাতা চলে এসে শ্যামবাজারে বসবাস করতে লাগলেন। এখানে এখনও তাঁর বংশের কেউ কেউ বাস করেন, অন্যেরা বাংলা ও ওড়িশার বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়েছেন। তখন কলকাতার কোটিপতিদের অন্যতম কৃষ্ণরাম, ইতিমধ্যে যশোর, হুগলী ও বীরভূমে জমিদারী কিনেছেন। তাঁর সহৃদয়তা ও দান দুই-ই ছিল অতুলনীয়। একবার লাভ করবার জন্য

তিনি ১,০০,০০০ টাকার চাল কিনে মজুত করেছিলেন। মজুত ভাণ্ডারের একটা দানাও বিক্রী হবার পূর্বে দেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তখন লাভ করার বাসনা ত্যাগ করে তিনি অন্নসত্র খুলে জাতিধর্ম নির্বিশেষে অন্নক্লিষ্ট সকল মানুষকে অন্নদান করতে থাকেন। এই একইভাবে তিনি আরও কয়েকবার মানবতার সেবায় নিজ স্বার্থ ত্যাগ করেন। সব কাজ থেকে অবসর নেওয়ার পর তিনি জনগণ ও সাধু সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। এবং জনগণ যাতে তাঁকে মনে রাখেন তার জন্য তিনি দানধ্যানও করেন। মহাধুমধামের সঙ্গে দুর্গাপূজা করতেন। কথিত আছে বিসর্জনের পর গঙ্গার ঘাট থেকে তাঁর বাড়ী পর্যন্ত (এক মাইল অপেক্ষাও কম) পথে যে-কেউ তাঁকে পূর্ণকলস দেখাত তাঁকেই তিনি একটি করে টাকা দান করতেন; সাধারণত সাত আট হাজার মানুষ তাঁর ঘাট থেকে ফেরার পথের দুধারে সার বেঁধে বসে থাকত—তাঁর দানস্বরূপ কত অর্থ ব্যয় হত এর থেকে তার একটা অনুমান করা যায়। তাঁর পুত্র পৌত্রাদির মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল, তারপর অবস্থা অনুযায়ী পরিমাণ কমতে থাকে—প্রথমে আট আনা, পরে দানের পরিমাণ দাঁড়ায় কলসি প্রতি চার আনা।

দেওয়ান কৃষ্টরামের দান শুধুমাত্র কলকাতাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বাংলা, বিহার, ওড়িশা এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশেও তাঁর দানকার্য বিস্তৃত ছিল। নীচে আমরা তার সামান্য কিছু বিবরণ দিচ্ছি।

মাহেশে মহাধুমধামের সঙ্গে তিনি জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা সম্পন্ন করেন; এই উৎসব আজও তাঁর বংশধরগণ চালিয়ে যাচ্ছেন। যশোরে মদনগোপাল জীউর এবং বীরভূমে রাধাবল্লভ জীউর মন্দির প্রতিষ্ঠা করে নিযুক্ত সেবাইতকে পূজার্চনা চালাবার জন্য তিনি ভূসম্পত্তি দান করেন। তিনি বারাণসীতে কয়েকটি শিব মন্দির এবং ভাগলপুর জেলার জাহাঙ্গীরা গ্রামের নিকট গঙ্গার মধ্যে উচ্চতম পাহাড়টির উপর বিরাট ও অত্যন্ত সুন্দর একটি মহাদেব মন্দির নির্মাণ করেন; এই সকল মন্দিরের পূজার্চনা যাতে চলতে পারে, সম্পত্তি দান করে তারও ব্যবস্থা তিনি করেন। হুগলী জেলার তারা থেকে মথুরাবাটি পর্যন্ত তিনি একটি রাস্তা নির্মাণ করান—রাস্তাটি কৃষ্ট জাঙ্গাল নামে পরিচিত; গয়ার রামশীলা পাহাড়ে তিনি সিঁড়ি নির্মাণ করিয়ে দেন, যাতে পিণ্ডদানেচ্ছু হিন্দুগণ সহজে পাহাড়ে উঠতে পারেন। কটক থেকে পুরী পর্যন্ত বিশ ক্রোশ ব্যাপী পথের উভয় পার্শ্বে তিনি আম গাছ লাগিয়েছিলেন, যাতে তীর্থযাত্রীরা ছায়া ও ফল পেতে পারেন। পুরীতে প্রবেশ পথের পাশে, জগন্নাথ দেবের মন্দিরের নিকট একটি দীঘি খনন করান এবং পুরীতে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রার রথযাত্রায় বার্ষিক ব্যয় নির্বাহ করবার জন্য

তিনি পুরীর রাজার কাছে বিপুল পরিমাণ অর্থ গচ্ছিত রাখেন।

দান, ধর্মানুষ্ঠান ও পরোপকারে দিন যাপন করে ৭৮ বছর বয়সে কৃষ্টরাম পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর দুই পুত্র মদনগোপাল ও গুরুপ্রসাদ জীবিত ছিলেন। পিতার মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ পর মদনগোপালের মৃত্যু হয়। এঁর বংশধরগণ বাংলার বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়লেও, এঁদের সম্পর্কে আমাদের বিশেষ কিছু জানা নাই।

গুরুপ্রসাদের তিন স্ত্রী; প্রথমার কোন সন্তান ছিল না; দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কালাচাঁদ বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন; কালাচাঁদের একমাত্র পুত্র রাজেন্দ্রনারায়ণ পিতার জীবিতকালেই মারা যান। রাজেন্দ্রনারায়ণের তিন পুত্র বিশ্বম্ভর, রাধারমণ ও কৃষ্টচন্দ্র। রাধারমণ মারা গেছেন। বিশ্বম্ভরের আর্থিক অবস্থা বেশ সচ্ছল, তিনি শ্যামবাজারে বাস করেন। কনিষ্ঠ কৃষ্টচন্দ্র দাদার মতই বিনয়ী ও বুদ্ধিমান; তিনি এখন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ছেন।

দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ও তাঁর সন্তানদের শ্যামবাজারে রেখে, গুরুপ্রসাদ তাঁর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী ও তার সন্তানদের নিয়ে ওড়িশায় চলে যান। সেখানে বালেশ্বর জেলার ভদ্রক মহকুমায় একটি জমিদারী কিনে সপরিবারে বাস করতে থাকেন। কয়েকবৎসর পর কটক জেলার জাজপুরে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুকালে বর্তমান ছিলেন তাঁর দুই পুত্র বিন্দুমাধব এবং রাধামাধব।

বিন্দুমাধবের তিন পুত্র, রায় নিমাইচরণ বসু বাহাদুর, হরিবল্লভ বসু বি এ, বি এল এবং অচ্যুতানন্দ বসু। নিমাইচরণ জমিদারী দেখাশোনা করেন; তিনি কোঠারের অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট; কয়েকটি ক্ষেত্রে তাঁর দানের জন্য (সরকার) তাঁকে রায় বাহাদুর খেতাব দান করেন। মধ্যম পুত্র হরিবল্লভ বসু এখন কটকে সরকারী উকিল। কনিষ্ঠ অচ্যুতানন্দ কলকাতায় স্বাধীন জীবন যাপন করেন। এই তিন ভাই-ই খ্যাতিমান।

রাধামোহন বসুর বয়স ৬৫, এখনও তিনি সংস্কৃত ভাষা ও ধর্মালোচনায় ব্যাপৃত থাকেন। তাঁর দুই পুত্র বলরাম ও সাধুপ্রসাদ। জ্যেষ্ঠ বলরাম যৌবনেই পিতার ন্যায় ধর্মকর্ম নিয়ে লোকলোচনের আড়ালে থাকতে চান; আর কনিষ্ঠ সাধুপ্রসাদ বর্তমানে প্রেসিডেন্সি কলেজের মেধাবী ছাত্র।

পারশ্যের কলিকাতাস্থ কনসাল, মানকজী রুস্তমজী মহাশয়

যে-সকল বিদেশী জাতি ভারতবর্ষকে আপন দেশ করে নিয়ে এখানেই স্থায়ীভাবে বাস করছে, তাদের মধ্যে পার্শী সম্প্রদায় বুদ্ধি, ব্যবসায়িক উদ্যোগ এবং জনসেবায় অগ্রগণ্য স্থান করে নিয়েছে। বোম্বাই-কেন্দ্রিক এই সম্প্রদায়টির উন্নতি ও অগ্রগতির ইতিহাসের সঙ্গে বোম্বাই প্রদেশের ইতিহাসও মোটামুটিভাবে জড়িত। কলকাতাকেও, অবশ্য, এই সম্প্রদায় উপেক্ষা করেনি। আজ (১৮৮১) থেকে প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে ভারতের এই (পূর্ব) অঞ্চলের পার্শী সম্প্রদায়ের সর্বজনস্বীকৃত নেতা রুস্তমজী কাওয়াসজীর নাম এই প্রাসাদ নগরীতে সর্ব-সম্প্রদায়ের মানুষের কাছেই বিশেষ পরিচিত ছিল। এমন কোন আন্দোলন সে যুগে হয়নি যাতে রুস্তমজী নেতারূপে অংশ না নিতেন। তাঁর বিপুল বিত্ত সবসময় সাধারণভাবে দেশবাসী ও কোন ব্যক্তি বিশেষের দুঃখদুর্দশা দূর করবার জন্য উন্মুক্ত থাকত। তিনি ছিলেন অতিথিপরায়ণ। আজ ভারতের ছোটবড় শহরে ভারতীয় ও ইওরোপীয়গণের মধ্যে মেলামেশার যে পরিবেশ গড়ে উঠেছে, এতেও তাঁর সেবা-পরায়ণতার দান বড় কম নয়। ভারত-চীন বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাঁর নেতৃত্বাধীন রুস্তমজী কাওয়াসজী অ্যাণ্ড কোং এই শহরের অগ্রগণ্য ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ছিল। কিন্তু এই শতাব্দীর চারের দশকে যে অর্থনৈতিক সঙ্কট বহু ব্যবসায়ীকে ভীষণ-ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তার প্রভাব থেকে এই প্রতিষ্ঠানটিও অব্যাহতি পায়নি। বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য ব্যক্তি মানকজী রুস্তমজী তখন এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক।

পিতার জীবিতকালেই মানকজী চীনের সঙ্গে বাণিজ্যসূত্রে কয়েক বৎসর চীনে অবস্থান করেন এবং চীন কলকাতা ও বোম্বাইয়ের মধ্যে সে যুগে পরিচালিত ব্যবসায় বাণিজ্যে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে থাকেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, তাঁর পিতার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানটি চীনের সঙ্গে ব্যবসায়ের জন্য অনেকগুলি জাহাজের মালিক ছিল। পিতার ব্যবসায়ের অংশীদাররূপে ১৮৩৭-এ মানকজী কলকাতা আসেন ; তখন থেকেই তিনি এখানকার অধিবাসী। তাঁর চরিত্রগুণ, তাঁর সন্দেহাতীত রাজভক্তি এবং সমাজসেবা তাঁকে পার্শী সম্প্রদায়ের নেতারূপে সহজেই প্রতিষ্ঠিত করেছে—সমাজসেবামূলক কোন কাজে অগ্রণী হতে তিনি পশ্চাৎপদও নন। তাঁর অনুসন্ধিৎসা, নিরপেক্ষতা এবং নির্ভুল বিচারবুদ্ধির

জন্য তিনি সর্বশ্রেণীর জনগণের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন; এই কারণেই বিপদে আপদে তাঁর পরামর্শ এদেশীয় বন্ধুবান্ধবদের নিকট অপরিহার্য; তাঁদের বিবাদ-বিরোধের নিষ্পত্তি করবার জন্য তাঁকে মধ্যস্থতাও করতে হয়। বর্তমানে ব্যবসায় বাণিজ্যে তাঁর আর বিশেষ আগ্রহ না থাকলেও, তিনি এখনও বহু জয়েন্ট-স্টক কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত, তার বেশ কয়েকটির তিনি ডিরেক্টরও।

মানকজী রুস্তমজী কলকাতা ও তার উপকণ্ঠসমূহের অন্যতম জাস্টিস অফ দি পীস, অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট এবং মিউনিসিপ্যাল কমিশনার। তিনি পারস্যের কলকাতাস্থ দূতও। তিনি প্রথম ভারতীয় যাঁকে কলকাতার শেরিফ পদে নিযুক্ত করে সম্মানিত করা করা হয়। ১৮৪৭-এ তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত হন।

মানকজী রুস্তমজীর দুই পুত্র: হীরাজীভাই মানকজী এবং কাওয়াসজী মানকজী রুস্তমজী—দুজনেই বিশেষ বুদ্ধিমান। জ্যেষ্ঠ হীরাজীভাই কলকাতার জাস্টিস অফ দি পীস এবং অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট। কলকাতার উচ্চ সমাজের উল্লেখযোগ্য ও প্রতিনিধিস্থানীয় এই পরিবারটির অতি সংক্ষিপ্ত এই বিবরণ শেষ করবার আগে দি ইণ্ডিয়ান শ্যারিভারি পত্রিকায় মিঃ বাকের মন্তব্য উদ্ধৃত না করে পারছি না। তিনি বলেছেন:

'যেমন চীনা যুদ্ধের সময় এবং ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি তাঁর সমস্ত সম্পদ সরকারের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, তেমনি আজও তাঁর মহাসমৃদ্ধির দিনের মতই, দুঃস্থের দুঃখ দূর করতে তাঁর ভাণ্ডার সদা উন্মুক্ত; আজও তিনি বন্ধুদের বিবাদ-বিরোধের নিষ্পত্তি করে থাকেন এবং আজও তিনি তাঁর পরিচিত জনের শ্রদ্ধা ভক্তি পেয়ে থাকেন।...

'কলকাতা যা ছিল এবং আজ যা হয়েছে, তার যোগসূত্ররূপে এখনও যে সামান্য কয়েকজন বর্তমান, তিনি তাঁদের অন্যতম। আশা করব, দীর্ঘকাল জীবিত থেকে তিনি তাঁর মূল্যবান অভিজ্ঞতা দিয়ে আমাদের উপকৃত করবেন।'

কলুটোলার মতিলাল শীল ও তাঁর পরিবারবর্গ

চৈতন্যচরণ শীলের পুত্র বাবু মতিলাল শীল ছিলেন বাংলার সুপরিচিত ধনী ও জমিদার। জাতিতে এঁরা সুবর্ণবণিক। ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় তাঁর জন্ম

হয়। শৈশবে, মাত্র পাঁচ বৎসর বয়সে, তিনি পিতৃহীন হন। বাংলা এবং ইংরাজীতে তিনি কাজ চালাবার মতো জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। বাবু বীর চাঁদ শীল তাঁর বিবাহ দেন বাবু মোহন চাঁদ দে-র এক কন্যার সঙ্গে।

তিনি ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ামের মিলিটারি অফিসারদের মালপত্র সরবরাহের কারবার শুরু করেন; কিছু দিন তিনি আবগারী দারোগারূপেও কাজ করেন। ১৮২০তে তিনি স্মিথসন এবং আরও সাত-আটটি ইওরোপীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের বেনিয়ানের কাজ শুরু করেন। মেসার্স মূর হিকি অ্যাণ্ড কোং নাম দিয়ে তিনি প্রথম নীল ব্যবসায়ের একটি প্রতিষ্ঠান খোলেন এবং ফাটকা ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন। এই সবের মাধ্যমে তিনি প্রচুর অর্থ উপায় করেন। এরপর তিনি বাংলাদেশে কয়েকটি জমিদারী কেনেন; কলকাতা এবং আশেপাশে বেশ কয়েকটি বাড়ী প্রভৃতিও নির্মাণ করেন।

সকলেই জানেন বাবু মতিলাল শীল নিজ ভাগ্য নিজে গড়ে তুলেছিলেন। সীমাহীন দান ও ধর্মকর্মের জন্য তিনি সকলেরই সুপরিচিত ছিলেন। ১৮৪১-এ তিনি বেলঘরিয়ায় একটি ভিক্ষুক নিবাস স্থাপন করেন; এটি এখনও চালু আছে। 'কলকাতা ফিভার হাসপাতাল' নির্মাণের জন্য বিস্তৃত একখণ্ড জমি তিনি সরকারকে দান করেন; এই জন্য তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে একটি ওয়ার্ড তাঁর নামে উৎসর্গ করা হয়; ওয়ার্ডটির নামকরণ করা হয় 'মতিলাল শীলস্ ওয়ার্ড'। বিদ্যোৎসাহী মতিলাল নিজ নামে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন; এবং এর পরিচালনার জন্য 'জেসুইট্' মিশনারীদের হাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ প্রদান করেন; এই কলেজটি এখনও শীলস্ কলেজ নামে পরিচিত। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহের সময় তিনি দেওয়ানী অপরাধে অপরাধী কয়েদীদের কারামুক্ত করান। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। অপরপক্ষে, সঙ্গীত, এঞ্জিনিয়ারিং ও স্থাপত্যবিদ্যায় তাঁর জ্ঞান ছিল।

১৮৫৪-র ২০ মে বাবু মতিলাল পরলোক গমন করেন। তাঁর মৃত্যুকালে পাঁচ পুত্র হীরালাল, চুনিলাল, পান্নালাল, গোবিন্দলাল ও কানাইলাল বর্তমান ছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্বে প্রথম তিনজন পরলোক গমন করেন। মতিলালের মধ্যম পুত্র চুনিলাল ফিভার হাসপাতালকে ৫০,০০০ টাকা দান করেন।

ধরমতলার নতুন পৌরবাজারটি এই পরিবারেরই সম্পত্তি ছিল। মানী এই পরিবারের এখনও কলকাতা ও শহরতলীতে বিস্তৃত ভূসম্পত্তি আছে।

পাথুরিয়াঘাটা ও চোরবাগানের মল্লিক পরিবার

এই পরিবারটি অতি প্রাচীন। জাতিতে এঁরা সুবর্ণ বণিক; দেশীয় প্রথা ও রীতি অনুযায়ী এঁরা মহাজনী কারবার ও ব্যবসায়িক উদ্যোগকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এই পরিবারটি (মল্লিক) স্মরণাতীত কাল থেকে তাঁদের ধনসম্পদ, ব্যবসায়িক উদ্যোগ ও দান-ধর্মের জন্য বিখ্যাত। সামাজিক মর্যাদা এই পরিবারটির এত বেশী যে, সুবর্ণ-বণিক জাতির বহু পরিবারই এই মল্লিক পরিবারকে 'দলপতি' হিসাবে গণ্য করেন। তাছাড়া এই জাতির তিনটি কুলীন পরিবারের অন্যতম এই মল্লিক পরিবার—তাঁরা 'প্রামাণিক'। এঁদের পারিবারিক পদবী শীল; বংশের ত্রয়োদশ পুরুষ যাদব শীলকে মুসলিম সরকার পুরুষানুক্রমে ব্যবহারের অধিকার সহ 'মল্লিক'* উপাধিতে ভূষিত করেন। শীল পদবীটি ধর্মীয় ও বৈবাহিক অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়।

এই জাতিকে সুবর্ণ-বণিক নামে অভিহিত করার ইতিহাস নিম্নরূপ :

সে বহু শতাব্দী পূর্বের কথা। অযোধ্যা রাজ্যের রামগড় নিবাসী সনক আঢ্য ছিলেন যেমন ধার্মিক, পণ্ডিত এবং বেদজ্ঞ, তেমনি বিপুল বিত্তের অধিকারী। তিনি অযোধ্যা থেকে বাংলার তদানীন্তন রাজা আদিশূরের রাজসভায় চলে আসেন।

তীর্থযাত্রী ও ব্যবসায়ী সনকের ব্যবহারে আদিশূর এতই মুগ্ধ হন যে, তিনি সনককে ব্রহ্মপুত্র নদীতীরে একখানি গ্রাম দান করেন। সেখানে সনক ও তাঁর পুরোহিত জ্ঞানচন্দ্র মিশ্র সপরিবারে বসবাস করতে থাকেন। সনক আঢ্যের ব্যাপক ব্যবসায় বাণিজ্যের ফলে, সেই ক্ষুদ্র অজ্ঞাত গ্রামটি অনতিবিলম্বে বিরাট এক বাণিজ্য-কেন্দ্রে পরিণত হয়। সেই স্বর্ণ-ব্যবসায়ীর সম্মানে আজও স্থানটি সুবর্ণগ্রাম বা সোনার গাঁও নামে পরিচিত; অবশ্য, গ্রামটি এখন ধ্বংসস্তূপমাত্র। আদিশূর গ্রামদানের সুফল দেখে এত সন্তুষ্ট হন যে, তিনি সনক আঢ্যকে একটি তাম্রপত্র দান করেন; তাতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উৎকীর্ণ ছিল :

"স্বর্ণবাণিজ্য কারিত্বাদত্রস্থিত বিশাংময়া।
সুবর্ণ বণিগিত্যাখ্যা দত্তা সম্মান বর্দ্ধয়ে ॥"

---

* ফার্সী ভাষার শব্দটির অর্থ রাজা আমীর বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। মুসলিম শাসকগণ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে এই পদবীতে ভূষিত করতেন। গয়ানুল লোগট ও তাজুল লোগট দ্রষ্টব্য।

অর্থাৎ স্বর্ণ ব্যবসায়ে ব্যাপৃত এই স্থানের বৈশ্যগণের সম্মান বর্ধনার্থ, আমি তাঁহা–দিগকে সুবর্ণবণিক পদবী দান করছি (দ্রষ্টব্য : আনন্দ ভট্ট রচিত বল্লাল চরিত)।

সুবর্ণ বনিকগণ দীর্ঘকাল যাবৎ রাজ-অনুগ্রহ ভোগ করতে থাকেন। কিন্তু রাজা বল্লাল সেনের সঙ্গে সনক আঢ্যের তদানীন্তন বংশধর বল্লভানন্দ আঢ্যের ভুল বোঝাবুঝি হয়। বল্লভানন্দই তখন সুবর্ণ বণিক জাতির প্রধান। বল্লাল সেনের জীবনী লেখকের মতে রাজ্যে তখন সর্বাপেক্ষা ধনী ব্যক্তি—তিনি তখন ১৪ কোটি স্বর্ণমুদ্রার মালিক। মণিপুর যুদ্ধের সময় বল্লাল সেন তাঁর কাছে বিপুল পরিমাণ অর্থ ঋণস্বরূপ গ্রহণ করেন ; এই ঋণ পরিশোধের ব্যাপারেই তাঁদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। এর সঙ্গে অন্যান্য কারণ যুক্ত হয়ে মনান্তরকে গভীরতর করে তোলে। প্রতিশোধ নেবার জন্য বল্লাল সেন সুবর্ণ বণিক জাতির উপবীত ধারণের অধিকার রদ করেন ; মনুর বিধান অনুযায়ী সুবর্ণ বণিক জাতি (বৈশ্য)-ও উপবীত ধারণের অধিকারী, কেননা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের ন্যায় তাঁরা দ্বিজ।

মহান ইতিহাসবেত্তা টি ট্যালবইজ হুইলার এ সম্পর্কে লিখেছেন, 'বেনেদের জাতির কাছে হেয় করবার বল্লালী চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁদের সম্পদ ও ব্যবসায়িক উদ্যোগের জন্য বেনেদের ধনগৌরবান্বিত একটি অভিজাত শ্রেণী গড়ে উঠেছে ; জাতির কাছে এই সম্প্রদায়ের সম্মান ও মর্যাদা প্রচুর ; এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল বর্তমানের মল্লিক পরিবার। বহু বেনে পরিবারই গৌড় থেকে মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও বর্ধমান জেলা হয়ে হুগলী জেলার সাতগা বা সপ্তগ্রামে চলে আসেন। (এঁদের একটা শ্রেণী এখনও সপ্তগ্রামিয়া সুবর্ণ-বণিক নামে পরিচিত।) দুঃসাহসী বণিক এই বেনেরাই ষোড়শ শতাব্দীতে হুগলীর পর্তুগীজদের সঙ্গে, সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে চুঁচুড়ার ওলন্দাজ, চন্দননগরের ফরাসী এবং কলকাতার ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসা করতেন। এই সব পরিস্থিতি বিবেচনা করলে বলা যায়, এই বেনেরাই (ভারতীয়দের মধ্যে) সর্বপ্রথম স্ত্রীজাতির প্রতি সুসংস্কৃত আচরণে অনুপ্রাণিত হন—এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে ভারতের অন্যান্য শ্রেণীর অধিবাসীদের আরও বিলম্ব হয়েছিল।'

যতদূর সংগ্রহ করা যায় এই বংশের ২২ পুরুষের একটি বংশলতিকা নিচে দেওয়া হল :

পাথুরিয়াঘাটা ও চোরবাগানের মল্লিক পরিবারের বংশ সরণী*

লিখিত তথ্য অনুযায়ী ১ম পুরুষ—মথু শীল

২য় „ —গঙ্গাশীল ও এগার ভাই

* পরিবারটি ২৪শ পুরুষে পৌছলেও ২৩শ ও ২৪শ পুরুষের বংশধরগণের নাম এখানে দেওয়া হল না।

৩য় পুরুষ—সুমাইর শীল আর দুই ভাই
৪র্থ ,, —বারণ শীল
৫ম ,, —বাজো শীল
৬ষ্ঠ ,, —তেজ শীল
৭ম ,, —প্রযাগ শীল
৮ম ,, —নাগর শীল
৯ম ,, —নিত্যানন্দ শীল ও দুই ভাই
১০ম ,, —নারায়ণ শীল
১১শ ,, —মদন শীল ও ছয় ভাই
১২শ ,, —বনমালী শীল
১৩শ ,, —যাদব শীল ও দুই ভাই (এই যাদব শীল মল্লিক উপাধি লাভ করেন)
১৪শ ,, —কান্তরাম মল্লিক ও চার ভাই
১৫শ ,, —জয়রাম মল্লিক ও তিন ভাই
১৬শ ,, —পদ্মলোচন মল্লিক ও পাঁচ ভাই
১৭শ ,, —শ্যামসুন্দর মল্লিক

১৮শ : রামকৃষ্ণ — গঙ্গাবিষ্ণু

১৯শ : আনন্দলাল — বৈষ্ণবদাস — সনাতন (রামকৃষ্ণের পুত্র)
১৯ : নীলমণি (গঙ্গাবিষ্ণুর পুত্র)
২০ : রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক, বাহাদুর (নীলমণির পুত্র)

২০ : বীর নরসিংহ (আনন্দলালের পুত্র)
স্বরূপচন্দ্র — দীনবন্ধু — ব্রজবন্ধু — গোষ্ঠবিহারী (বৈষ্ণবদাসের পুত্র)

২১শ : তুলসীদাস — সুবলদাস (বীর নরসিংহের পুত্র)
২১শ : নন্দলাল (দীনবন্ধুর পুত্র)
২১শ : কুঞ্জবিহারী (গোষ্ঠবিহারীর পুত্র)

২২শ : গোপীমোহন (সুবলদাসের পুত্র)
২২শ : বলাইদাস — গয়াপ্রসাদ (তুলসীদাসের পুত্র)

২১শ : আশুতোষ — গোবিন্দলাল — গোপাললাল — বনমালী — মোতিলাল (ব্রজবন্ধুর পুত্র)

২১শ : দেবেন্দ্র — মহেন্দ্র — গিরীন্দ্র — সুরেন্দ্র — যোগেন্দ্র — মনেন্দ্র (রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের পুত্র)
২২শ : নগেন্দ্র (দেবেন্দ্রের পুত্র)

পরিবারটির দলিল দস্তাবেজ থেকে দেখা যায় যে, এঁদের আদিবাস ছিল সুবর্ণরেখা নদীর তীরে, তারপর সপ্তগ্রামে, আরও পরে হুগলী ও চুঁচুড়ায় (হুগলী ও চুঁচুড়ায় এখনও পরিবারটির বাস্তুভিটার সন্ধান পাওয়া যায়) ; এখন এঁরা বাস করছেন কলকাতায়। বর্গীর হাঙ্গামা থেকে বাঁচবার অভিপ্রায়ে ১৫শ পুরুষ জয়রাম মল্লিক প্রথম কলকাতা চলে আসেন ; তখনও কলকাতায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আলোচ্য পরিবারটি জয়রামের চতুর্থ পুত্র পদ্মলোচনের বংশ ; কিন্তু জয়রাম তাঁর পূর্বপুরুষগণ, পদ্মলোচন বা পদ্মলোচনের পুত্র শ্যামসুন্দরের জীবনী সম্বন্ধে কিছু জানা যায় নি ; তবে একথা কতকটা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে, তাঁরা এমনভাবে তাঁদের ব্যবসায় ও জীবন পরিচালনা করেছিলেন, যাতে তাঁদের পূর্বপুরুষের যশ ও অর্থ অটুট থাকে এবং বংশধরগণের সামনে একটা উচ্চ আদর্শ স্থাপিত হয়। বংশটির প্রকৃত প্রামাণিক ইতিহাস আরম্ভ হয়েছে শ্যামসুন্দরের দুই পুত্র রামকৃষ্ণ ও গঙ্গাবিষ্ণু মল্লিক থেকে। এই দুই ভাই পাথুরিয়াঘাটার পৈতৃক বাসভবনে একত্রে থেকে চিরাচরিত মহাজনী কারবারের সঙ্গে সারা বাংলা, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ছাড়াও চীন, সিঙ্গাপুর ও অন্যান্য অনেক বিদেশী বন্দরে ব্যবসায় পরিচালনা করতেন। তাঁদের পারিবারিক জীবনযাপন প্রণালীও ছিল আদর্শস্থানীয় ও শ্রদ্ধেয়। নিজেদের আত্মীয় অনাত্মীয় বহু পোষ্য তো তাঁদের ছিলই, তাঁদের বাড়ীর সামনেই প্রতিষ্ঠিত ধরমশালায় প্রতিদিন বিরাট সংখ্যক অনাথ আতুর বুভুক্ষু মানুষকে তাঁরা অন্নদান করতেন। বহু আত্মীয়কে ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য, তাঁরা যথোপযুক্ত অর্থ সাহায্য করতেন ; কখনও বা তাঁরা যাতে লাভজনক ও দায়িত্বপূর্ণ পদ পেতে পারেন, তার জন্য জামিন দাঁড়াতেন। এইসবের মধ্যেই তাঁদের দান ও উদারতা সীমাবদ্ধ ছিল না। তখনও এদেশে ইওরোপীয় পদ্ধতির ঔষধ বিতরণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় নি ; তাই দরিদ্রদের বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধলাভের সুবিধার্থে তাঁরা বহু সংখ্যক সুশিক্ষিত চিকিৎসক নিয়োগ করে আয়ুর্বেদীয় ওষুধ তৈরী করাতেন। ১১৭৬ বঙ্গাব্দ (১৭৭০ খ্রীস্টাব্দ)-এর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময় শহরে অসংখ্য অনশনক্লিষ্ট মানুষ উপস্থিত হয়েছিল ; জাতিধর্ম নির্বিশেষে তাদের প্রতিদিন রান্না করা খাবার বিতরণের জন্য তাঁরা শহরের বিভিন্ন স্থানে আটটি অন্নসত্র প্রতিষ্ঠা করেন—এগুলির সম্পূর্ণ ব্যয়ভার তাঁরা নিজেরাই বহন করতেন। অন্নসত্রগুলি শহরের বিভিন্ন অংশে মল্লিকদের আত্মীয় ও বন্ধুদের বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—তাঁরা স্বেচ্ছায় তাঁদের এই সৎকার্যে সহযোগিতা করতেন। অবশ্য শহরের দক্ষিণাংশেও অন্যান্য ব্যক্তি ও পরিবারের বদান্যতায় এইপ্রকার আরও বহু অন্নসত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ভ্রাতৃদ্বয়ের দান ধর্ম এই শহরে বা প্রদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না ; বৃন্দাবনে তাঁরা একটি 'ছত্তর' প্রতিষ্ঠা করেন, এখানে হিন্দুশাস্ত্র অনুযায়ী প্রতিদিন মহাধূমধামের সঙ্গে পূজা

অর্চনা হত এবং বহু সংখ্যক দরিদ্র ব্যক্তিকে অন্নদান করা হত। পূর্বেই বলা হয়েছে, বহু সুবর্ণ বণিক পরিবার মল্লিকদের 'দলপতি' বলে মান্য করতেন, বিবাদ-বিসংবাদে তাঁরা এই দুই ভাইয়ের কাছে আসতেন বিরোধের মীমাংসা করে দেবার জন্য ; বিবাহাদি ব্যাপারেও তাঁরা এই দুই ভাইয়ের পরামর্শ নিতেন।

একমাত্র পুত্র নীলমণিকে রেখে গঙ্গাবিষ্ণু মল্লিক ১৭৮৮-র ৭ ফেব্রুয়ারী পরলোকগমন করেন। রামকৃষ্ণ মল্লিকের মৃত্যু হয় ১৮০৩-এর ডিসেম্বর মাসে ; তাঁর মৃত্যুকালে দুই পুত্র : বৈষ্ণবদাস ও সনাতন জীবিত ছিলেন ; জ্যেষ্ঠ পুত্র আনন্দলালের মৃত্যু হয় পিতার জীবিতকালেই।

নীলমণির জন্ম হয় ১৭৭৫-এর ১০ সেপ্টেম্বর, বৈষ্ণবদাসের ঐ বৎসরই ৮ অক্টোবর এবং সনাতন জন্মগ্রহণ করেন ১৭৮১-এর ৪ সেপ্টেম্বর। এঁরা পাথুরিয়াঘাটার পৈতৃক বাসভবনে একান্নবর্তী সংসারে বাস করতেন। সনাতন মল্লিক মারা যান ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে ; তাঁর কোন পুত্রসন্তান ছিল না। তখন অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে দুই জ্ঞাতি ভাই মিলে সংসার ও ব্যবসায় বাণিজ্য পরিচালনা করতে থাকেন ; ফলে পরিবারটির মান মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

নীলমণি মল্লিক ছিলেন ধর্মপরায়ণ এবং ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের প্রতিমূর্তি ; মহৎ হৃদয়, ক্ষমাশীল এই ভদ্রলোক ছিলেন আর্তজনের বন্ধু, তাদের দুঃখে সহানুভূতিশীল, তাদের সুখে হতেন আনন্দিত। সংসারের ওপর তাঁর নির্দেশ ছিল, খাদ্য না পেয়ে যেন কোন ক্ষুধার্ত মানুষ দরজা থেকে ফিরে না যায় ; অন্য খাবার না থাকলে আমার খাবার তাকে দিও। অসংখ্য দান ও পরোপকারিতার জন্য তিনি স্মরণীয় ব্যক্তি হয়েছিলেন—তাঁর ধর্মপরায়ণতা ও পরহিতৈষণার মাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্ত আমরা এখানে দেব। তিনি মামাবাড়ীর সূত্রে জগন্নাথদেবের প্রতি ভক্তিভাবাপন্ন হয়েছিলেন ; ভক্তিবশত তিনি চোরবাগানে জগন্নাথ মন্দির ও মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন ; এই মন্দিরের সংলগ্ন একটি অতিথিশালাও নির্মাণ করান ; নামে অতিথিশালা হলেও, এখানে বহু দরিদ্র নারায়ণের সেবায় রান্না করা খাবার বিলি করা হত ; এখনও (১৮৮১) কাঙালী ভোজন নিত্যনিয়মিত চলে। রথযাত্রার নয় দিন তিনি সর্বশ্রেণীর বণিকদের এখানে নিমন্ত্রণ করতেন। এই ক'দিন বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সেবা ও বিদায় পেতেন ; প্রতিদিনের দরিদ্রনারায়ণের সেবা তো ছিলই। পুরীতে তাঁর তীর্থযাত্রা দানের জন্য বিখ্যাত হয়ে উঠত। পুরীর গৌরবাড়ীশাহী ও হরচণ্ডীশাহীতে আগুন লেগে বহু কুটির পুড়ে যায়। এই দরিদ্র হতভাগ্যদের প্রকৃতির অকরুণ আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার এবং আবার নিজ নিজ কুটির নির্মাণ করে নেবার জন্য তিনি তাদের অর্থ দিয়ে সাহায্য করেন। সেকালে পুরীতে প্রবেশ করতে হলে তীর্থযাত্রীদের একটা কর দিতে হত। একবার এই কর দিতে না পারায় বহু তীর্থযাত্রী আঠার নালায় আটকে যান ;

তিনি তখন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ব্যবস্থা করেন যে, তীর্থযাত্রীদের সমুদয় কর তিনি স্বয়ং দিয়ে দেবেন ; ঐ করের পরিমাণ শেষ পর্যন্ত এত বৃদ্ধি পায় যে, তাঁর কাছে যে পরিমাণ অর্থ ছিল, তার দ্বারা ঐ কর মেটান সম্ভব ছিল না ; তখন তিনি স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে তাঁর কলকাতায় অবস্থিত ভাই বৈষ্ণবদাস মল্লিকের নামে প্রদত্ত ড্রাফট নিতে অনুরোধ করেন। বহু ব্যয়ে তিনি দৌতনে জগন্নাথ দেবের একটি নাটমন্দির, নির্মাণ করান। দেউলিয়া আইন এদেশে বিধিবদ্ধ হবার পূর্বে তিনি ঋণের দায়ে কারারুদ্ধ ব্যক্তিদের ঋণের টাকা শোধ করে দিয়ে তাদের কারামুক্ত করেন। সে যুগে বহু গরীব মানুষ এবং সন্ন্যাসী প্রভৃতি ধর্মাশ্রয়ী ব্যক্তি কলকাতায় ভীড় করতেন। এঁদের জন্য তিনি নীলমণি মল্লিক ঘাটের নিকট একটি আশ্রয় নির্মাণ করান ; এখানে বর্তমানে তাঁর পুত্রের পান পোস্তা বাজার অবস্থিত। ইষ্টক নির্মিত এই ঘাটটি ছিল সুপ্রশস্ত ; এতে পুরুষ ও মহিলা-গণের জন্য পৃথক পৃথক ব্যবস্থা ছিল। পুরাতন স্ট্র্যাণ্ড রোড ও ব্যাঙ্ক রোড নির্মাণের পর ঘাটটি অব্যবহার্য হয়ে পড়ে। এখানে যে-সব তীর্থযাত্রী আসতেন তাদের শুধু আশ্রয় নয়, অন্ন-পথ্য-বস্ত্রও দেওয়া হত। বৈষ্ণবচরণও সাধু প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন। ধর্ম-কর্ম ও দানধ্যানে তাঁর সময় কাটত। এই দুই ভাই মিলে পাথুরিয়া-ঘাটার পৈতৃক আবাসে একটি সদাব্রত স্থাপন করেন, সেখানে অনাথ-আতুর সাধুসন্ন্যাসী যে-কেউ দিনের যে-কোন সময় এলে যথোপযুক্ত সিধা পেতেন এবং বাড়ীর সামনে পূর্বপুরুষদের আমল থেকেই একটা ঘেরা জায়গায় রান্না করে খেতে পারতেন ; জ্বালানি প্রভৃতিও তাঁদের দেওয়া হত। দারিদ্র্যের জন্য যাঁরা মৃত স্বজনের সৎকার করতে পারতেন না, এই দুই ভাইয়ের কাছে এলে তাঁরা সৎকারের খরচও পেতেন—এই শ্রেণীর প্রার্থীর সংখ্যাও কম ছিল না। নিকট আত্মীয়, নির্ভরশীল পরিবার ও প্রতিবেশীদের ছেলেদের শিক্ষার জন্য তাঁরা নিজ ব্যয়ে একটি বাংলা আর একটি ইংরাজী পাঠশালা চালাতেন। এছাড়া, পারিবারিক ধর্মকর্মেও তাঁদের পারিবারিক প্রথাগত জাঁকজমক ও দানের উদার ব্যবস্থা ছিল। পারিবারিক দুর্গাপূজায় জাঁকজমক, দরিদ্রনারায়ণ ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে সেবা ও দান তো ছিলই, তার ওপর দেশীয় ও ইওরোপীয় বহুসংখ্যক ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করে আপ্যায়িত করা হত। দুর্গাপূজা উপলক্ষে ১৫ দিন ধরে নাচগানের আসর বসত ; এই সব অনুষ্ঠানে, বড়লাট, সুপ্রীম কোর্টের জজ প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে অনুষ্ঠানের গৌরব বাড়াতেন ; গায়ক-গায়িকা ও নর্তক-নর্তকীরাও যথোপযুক্ত উপহারাদি পেতেন। শ্রীপঞ্চমী উপলক্ষে মল্লিক বাড়ীতে মাইফেল বসত ; প্রথম সারির সঙ্গীতজ্ঞগণ তাতে অংশগ্রহণ করে নিজ নিজ গুণ ও প্রতিভার পরিচয় দিতেন। যোগদানকারী প্রতিটি শিল্পীকেই উদারভাবে ইনাম দেওয়া হত। তিনি 'ফুল আখড়াই' গান বাজনা পদ্ধতির প্রবর্তন করেন।

ঐ উচ্চাঙ্গ ও মার্গ সঙ্গীতের সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রের ঐকতান থাকত। উপযুক্ত গুণী সঙ্গীতশিল্পীর অভাবে গত পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ এই পদ্ধতি অপ্রচলিত হয়ে গেছে; এর জায়গা নিয়েছে অসংস্কৃত হাফ-আখড়াই পদ্ধতি। সঙ্গীতাচার্য রামনিধি গুপ্তর (সাধারণ্যে নিধুবাবু নামে পরিচিত) জীবনীতে সংক্ষেপে নীলমণি মল্লিকের উক্ত প্রচেষ্টার উল্লেখ আছে। বৈষ্ণবদাসের ঝোঁক ছিল ভিন্নমুখী, তিনি ভালবাসতেন প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য। তিনি এই সাহিত্যের একটি চমৎকার সংগ্রহশালা গড়ে তোলেন। তাঁর আর একটি প্রিয় ঝোঁক ছিল দরিদ্র রোগীদের মধ্যে বিতরণের জন্য সঠিক শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে (আয়ুর্বেদীয়) ওষুধ তৈরী করান। সমসাময়িক স্বজাতিবর্গ এই দুই ভাইকেই অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। তাঁদের মধ্যে বহুজনই বহু সংকটজনক অবস্থায় তাঁদের উচ্চ হৃদয় ও বন্ধুত্বের পরিচয় পেয়েছিলেন; সরকারের খাজনা যথাসময়ে দিতে না পারায় বা ঐ প্রকার সংকটে বহু জমিদারী নিলামের মুখে পড়েও তাঁদের আর্থিক সহায়তায় রক্ষা পেয়ে যায়; বন্ধুজনকে ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তাঁরা অর্থ দিয়ে সাহায্য করতেন; প্রয়োজনে উচ্চস্তরের চাকরী প্রার্থীর জন্য দুই ভাই-ই জামিনদার হতেন। অল্প কথায়, সাধ্যানুসারে তাঁরা অর্থীপ্রার্থী সকলকেই সাহায্য করতেন। বিবাদ-বিসংবাদে মধ্যস্থতা করা তো ছিলই।

এঁদের জ্ঞাতিকুটুম্ব বহু পরিবারের এবং পোষ্যবর্গের বর্তমান বংশধরগণ আজও (১৮৮১) পূর্বে-প্রাপ্ত সাহায্যের কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন। দলপতিহিসাবে তাঁরা কয়েকটি সংস্কার প্রবর্তন করে আত্মীয়স্বজনসহ বেশ কয়েকটি পরিবারকে সমাজচ্যুতি হতে রক্ষা করেন। নীলমণি মল্লিক পরলোকগমন করেন ১৮২১-এ। মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পূর্বে তাঁর আদেশমত ভৃত্যবর্গ তাঁকে তাঁর ঠাকুরবাড়ী নিয়ে যায়, সেখানে প্রার্থনা ও পূজার্চনা করবার পর, তাঁরই আদেশে তাঁকে পূতসলিলা ভাগীরথী তীরে তাঁর ঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়, যাবার পথে অন্যান্যের সঙ্গে তিনি নিজেও শাস্ত্রীয় শ্লোক আবৃত্তি করতে থাকেন। শান্তভাবে আপন ও বন্ধুজনের কাছে বিদায় এবং অজ্ঞাতে কোন অপরাধ করে থাকলে তার জন্য সকলের কাছে ক্ষমা চান। উপস্থিত সকলে কান্নায় ভেঙে পড়লে, তিনি তাঁদের কাতর না হয়ে শান্ত হতে এবং তাঁকেও শোকাচ্ছন্ন না করবার জন্য অনুরোধ করেন।

তাঁর খ্যাতি ও যশ এতই প্রসার লাভ করেছিল যে, তাঁর মৃত্যুর ২০/৩০ বৎসর পরও ভক্তগণ কলকাতা এসে সাহায্যের জন্য তাঁদের পারিবারিক আবাসের সামনে দাঁড়িয়ে ধ্বনি দিত 'নীলমণি মল্লিক কী জয়'। নীলমণিবাবুর মৃত্যুর ৫৩ বছর পর, ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে বাংলার তদানীন্তন ছোটলাট বাহাদুরের ব্যক্তিগত সচিব নীলমণি বাবুর একমাত্র পুত্র (পোষ্য পুত্র) রাজা রাজেন্দ্র লাল মল্লিক বাহাদুরকে একখানি চিঠি লিখে জানান, 'ছোটলাট বাহাদুর আপনাকে জানাইতে চান যে, আপনার

পিতা অনাথআতুরের সেবায় যে সকল সৎকার্য করিয়াছেন সে সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ ওয়াকেফ্‌হাল।' নীলমণি মল্লিক রেখে যান তাঁর বিধবা পত্নী ও তিন বৎসর বয়স্ক (পোষ্য) পুত্র রাজেন্দ্রলালকে। কিছুদিনের মধ্যেই এঁরা পাথুরিয়াঘাটার পৈতৃক আবাস ছেড়ে চোরবাগান চলে যান। ভাইয়ের মৃত্যুর পর বহু বৎসর যাবৎ বৈষ্ণবদাস সংসারের প্রধান ছিলেন; পরিবারের মর্যাদা ও সুনাম তিনি অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন; ঈশ্বরের আশীর্বাদে পুরুষানুক্রমে এই সুনাম ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ আছে। আজও পাথুরিয়াঘাটা ও বৃন্দাবনে তাঁর বংশধরগণ সেই দান ও সেবার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

পরিচিত সকলেই বাবু বৈষ্ণবদাসকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন; ১৮৪১-এর ১০ মার্চ তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুতে হিন্দুসমাজ মহান একজন ভক্ত হারায়। তিনি রেখে যান পাঁচ পুত্র: বীর নরসিংহ, স্বরূপচন্দ্র, দীনবন্ধু, ব্রজবন্ধু এবং গোষ্ঠবিহারী। এঁরা সকলে একত্রে পৈতৃক বাসভবনে বাস করতেন। জ্যেষ্ঠ বীর নরসিংহ ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী যশস্বী ছিলেন। তাঁর সংস্পর্শে যাঁরাই আসতেন তাঁরাই তাঁর মহানুভবতা, প্রজ্ঞা, নৈতিক দৃঢ়তা এবং অন্যান্য সদ্‌গুণের জন্য তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। বিপদে-আপদে বহুজনই তাঁর পরামর্শ ও সহায়তা চাইতেন, তিনিও সাগ্রহে তাঁদের সাহায্য করতেন। পূর্বপুরুষদের মতো তিনিও আর্থিক সংকটে বা মামলায় জড়িয়ে-পড়া বহু জমিদারকে রক্ষা, দান ও সেবার কাজ অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। পাঁচ ভাই পরস্পরকে খুব ভালবাসতেন; বৈষয়িক ও সাংসারিক কাজকর্ম তাঁরা একমত হয়ে আদর্শভাবে পরিচালনা করতেন। এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু এবং প্রকৃত ভদ্রলোক। প্রথম মারা যান স্বরূপচাঁদ (২৫ নভেম্বর, ১৮৪৭); তাঁর কোন পুত্রসন্তান ছিল না। বীর নরসিংহের মৃত্যু হয় ২৩ জুলাই, ১৮৪৯। মৃত্যুকালে দুই পুত্র তুলসীদাস ও সুবলদাস বর্তমান ছিলেন। কনিষ্ঠ গোষ্ঠবিহারী একটি শিশুপুত্র রেখে ১৮৫১তে মারা যান। বীর নরসিংহের মৃত্যুর পর মল্লিক পরিবারের এই শাখাটির পরিচালন দায়িত্ব পড়ে দীনবন্ধু মল্লিকের উপর। তিনিও পূর্বের মতই দর্পনারায়ণ ঠাকুর স্ট্রীটের পূর্ব প্রান্তটিকে বাড়িয়ে নূতন সরকার গার্ডেন লেনের সঙ্গে যুক্ত করেন; অবশ্য, এ-বিষয়ে তাঁর বুদ্ধিমান ভাইপো তুলসীদাসের প্রভূত চেষ্টা ও পারিবারিক চাঁদাও ছিল প্রচুর।

তাঁর মৃত্যুর পর সংসার ও বিষয়কর্মের দায়িত্ব পড়ে চতুর্থ ভাই ব্রজবন্ধুর উপর। তিনি ধর্মপ্রবণ দয়ালু মানুষ ছিলেন। ন্যস্ত দায়িত্ব তিনি সসম্মানে ও যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেছিলেন। পরিবারের সকল সুখসমৃদ্ধিরও তিনি ব্যবস্থা করেছিলেন। ক্লাইভ স্ট্রীট এলাকায় একটি নতুন রাস্তা তৈরী করবার জন্য অত্যন্ত মূল্যবান একখণ্ড জমি তিনি ছেড়ে দেন। এই রাস্তাটিই ক্লাইভ রো নামে পরিচিত। রাস্তাটির পাশে তিনি কয়েকটি বহুমূল্য অট্টালিকা নির্মাণ করান। উদারভাবে তিনিও দানে

অভ্যস্ত ছিলেন—তাই যোগ্য কারণেই সম্মান অর্জন করেছিলেন। ১৮৬৯-এর আগস্ট মাসে ৫০ বছর বয়সে তিনি মারা যান। মৃত্যুকালে তাঁর পাঁচ পুত্র আশুতোষ, গোবিন্দলাল, গোপাললাল, বনমালী এবং মতিলালকে রেখে যান। বীর নরসিংহ মল্লিকের জ্যেষ্ঠপুত্র তুলসীদাস ছিলেন বৈষয়িক ব্যাপারে দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তি। ইংরাজী ভাষায় তাঁর জ্ঞান ছিল প্রগাঢ়, বিচারবুদ্ধিও ছিল গভীর। সাংসারিক বিষয়ে পিতৃব্যদের তিনি ছিলেন প্রধান উপদেষ্টা। লোকে প্রায়ই তাঁর পরামর্শ চাইতে আসত, সুপরামর্শ দিয়ে তাদের সহায়তা করতে তিনিও সদা প্রস্তুত থাকতেন। সরকার কলকাতায় অনারারী ম্যাজিস্ট্রেটদের বেঞ্চ তৈরী করার পর তিনি হন প্রথম অনারারী ম্যাজিস্ট্রেটদের অন্যতম। দুই পুত্র বলাইদাস ও গয়াপ্রসাদকে রেখে তিনি ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে মারা যান। ব্রজবন্ধুবাবুর মৃত্যুতে মল্লিক পরিবারের প্রধান হন সুবলদাস। অমায়িক বন্ধুবৎসল সুবলদাস সকলকে সাহায্য করতে সদা প্রস্তুত থাকতেন। বন্ধু ও পোষ্যবর্গ তাঁর দয়ামায়ার পরিচয় পর্যাপ্ত-ভাবেই পেতেন। বস্তি উন্নয়নের জন্য স্বেচ্ছায় অগ্রসর হয়ে এদেশীয় ভদ্রলোকদিগের মধ্যে তিনি উচ্চ আদর্শ স্থাপন করেন। তিনি কলকাতার জাস্টিস অফ দি পীস এবং অনানারী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি রেখে যান তাঁর এক পুত্র গোপীমোহনকে।

নীলমণি মল্লিকের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই, বৈষ্ণবদাস ও নীলমণির বিধবা পত্নীদের মধ্যে শরিকানা মামলা শুরু হয় ১৮২২-এ। নীলমণির পত্নী চার বছর বয়সের পুত্র রাজেন্দ্রের অভিভাবিকারূপে এই মামলার একটি পক্ষ হন। রাজেন্দ্র মল্লিক বয়ঃপ্রাপ্ত না-হওয়া পর্যন্ত মাতাপুত্র চোরবাগানের সংলগ্ন বাড়ীতে বাস করতে থাকেন —বাড়ীটি নীলমণি মল্লিকই নির্মাণ করেছিলেন। নাবালকের সমস্ত বিত্ত ও সম্পত্তি আদালতের তত্ত্বাবধানে থাকায় ঠাকুরবাটীর ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানের এবং নীলমণি মল্লিক প্রতিষ্ঠিত দান ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যয় নির্বাহ অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে, কারণ আদালত এসব কাজের জন্য কোন ব্যয় অনুমোদন করেননি। নিদারুণ এই সঙ্কটকালে উন্নতমনা এই বিধবা নিজস্ব সম্পত্তি হয় বিক্রী বা বন্ধক দিয়ে যথাসাধ্য ঐ সব প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ করে থাকেন। তাঁরও দান ও দয়া ছিল আদর্শস্থানীয়। পোষ্যগণের নিকট তিনি ছিলেন মায়ের মতো; তাঁদের অনেককেই তিনি এই শহরে পাকা বাড়ী দিয়েছিলেন যাতে তারা ছেলেপুলে নিয়ে সুখে শান্তিতে থাকতে পারে। যে-সব অন্নপ্রার্থী ও দুঃখী ঠাকুরবাটীতে উপস্থিত হত, তাদের আহার্য প্রস্তুত করতে তিনি নিজেও হাত লাগাতেন; দ্বারে আগত প্রতিটি ক্ষুধার্ত মানুষ তৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি অন্নগ্রহণ করতেন না। রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুরের জন্ম ১৮১৯-এ; তিনি সাবালকত্ব প্রাপ্ত হন ১৮৩৫-এ। (প্রাক্তন) সুপ্রীম কোর্ট নাবালক রাজেন্দ্রের অভিভাবক নিযুক্ত করেন মিঃ

(পরবর্তীকালে স্যার) জেমস ওয়েব হগকে। মিঃ হগ্ অতি যত্নসহকারে রাজা রাজেন্দ্রর বিষয়সম্পত্তি রক্ষা ও তাঁর মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রেখেছিলেন। নম্র বিনীত স্বভাবের জন্য রাজা রাজেন্দ্র তাঁর জীবনী সম্পর্কে কিছু জানাতে অস্বীকার করায়, আমরা তাঁর সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দিতে অক্ষম। যা হোক, অন্যান্য সূত্র থেকে আমরা যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি, সেইটুকুই এখানে দেব, তবে আমাদের আশঙ্কা, এতে তাঁর মহান নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের প্রতি সুবিচার করা হবে না।

১৮৬৬-৬৭-র মহা মন্বন্তরে উল্লেখযোগ্য সেবাকাজের জন্য সরকার থেকে তাঁকে প্রথমে ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করা হয়। প্রায় সকলেই জানেন যে, ঐ দুর্ভিক্ষের সময় তিনি চোরবাগান ও চিৎপুরে দুটি বিরাট আকারের অন্নসত্র খুলে বুভুক্ষু নরনারীকে ভিক্ষা ও রান্না করা খাবার জোগাতেন। রাজা তাঁর চোরবাগানের আবাসে প্রতিদিন জাতিনির্বিশেষে বহু কাঙালীকে অন্নদান করেন। এই সব দান খয়রাৎ ও অন্যান্য অনেক মহৎ কাজের জন্য, ইংল্যাণ্ডেশ্বরীর ভারতসম্রাজ্ঞী উপাধিধারণ উপলক্ষে ১৮৭৭-এর ১ জানুয়ারী কলকাতায় অনুষ্ঠিত দরবারে সাম্মানিক প্রশংসাপত্র দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করা হয়। ১৮৭৮-এর ১ জানুয়ারী উপরাজ ও বড়লাট লর্ড লিটন তাঁকে রাজা বাহাদুর খেতাব দ্বারা সম্মানিত করেন—এই উপলক্ষে তাঁকে একখানি সনদ ও মর্যাদার প্রতীকস্বরূপ খেলাৎরূপে দেওয়া হয় বড় আকারের হীরার আঙটিও। প্রকৃতিবিজ্ঞানে তাঁর গভীর জ্ঞানের জন্য তিনি বহু ইওরোপীয় সোসাইটি থেকে মেডেল ও ডিপ্লোমা দ্বারা সম্মানিত হয়েছেন; তিনি এইসব সোসাইটির পত্র-সভ্য।

তাঁর নির্মিত চমৎকার মার্বল বৈঠকখানাটি প্রাচ্য স্থাপত্য ও বাস্তুবিদ্যার একটি সুন্দর নিদর্শন—এই সব বিদ্যায় তাঁর দক্ষতা ও জ্ঞানের প্রমাণ তাঁর এই বৈঠকখানাটি। তিনি একটি পশুশালা করেছেন, এখানে, অবশ্য পশুপক্ষী দুই-ই রাখা হয়। কিছু পশুপাখী তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আনিয়েছেন। পশুশালাটি দেখতে কোন দর্শনী লাগে না; এটি দেখতে শুধু এই শহরের মানুষই নন, দূর-দূরান্তর থেকেও বহু লোক দল বেঁধে আসেন। ইওরোপের এবং এদেশেরও কয়েকজন সম্মানিত ব্যক্তি এই পশুশালা এবং তাঁর দেশীয় শিল্প সংগ্রহ দেখে মুগ্ধ হয়েছেন।

কলকাতার চিড়িয়াখানাকে তিনি কয়েকটি মূল্যবান পশু উপহার দিয়েছেন; সেই সঙ্গে উদারভাবে অর্থ-সাহায্যও করেছেন। এই সকল দানের স্বীকৃতিস্বরূপ ঐ চিড়িয়াখানার একটি অট্টালিকার নাম দেওয়া হয়েছে 'মল্লিক'স হাউস'। ইওরোপের কয়েকটি পশুশালাকে তিনি মূল্যবান পশুপাখী উপহার দেওয়ায়, ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ তাঁকে মেডাল ও ডিপ্লোমা দিয়ে সম্মানিত করেছেন; তাঁদের কেউ কেউ তাঁকে মূল্যবান পাখীও উপহার দিয়েছেন। তাঁর আবাসগৃহের

সংলগ্ন বাগানে এবং কলকাতার উপকণ্ঠস্থ তাঁর বাগানবাড়ীতে তিনি যে দুর্লভ ও বহুমূল্য গাছ লাগিয়েছেন, তাই থেকেই বোঝা যায় যে, উদ্ভিদবিদ্যাতেও তাঁর জ্ঞান কত গভীর। তিনি সৌখিন চিত্রশিল্পী এবং উচ্চমানের সঙ্গীতজ্ঞ। সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় ভাল দখল থাকায়, তিনি হিন্দু দেবদেবীর উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক শাস্ত্রীয় সঙ্গীত রচনা করেছেন। ইংরাজী ভাষায় তাঁর কাজ চালাবার মতো জ্ঞান আছে; ফার্সী ভাষায়ও তাঁর মোটামুটি দখল আছে।

তিনি অত্যন্ত ভদ্র, দয়ালু এবং উদারহৃদয়। আত্মীয়, বন্ধু ও প্রতিবেশীদের তিনি ভালবাসেন। তাঁর পোষাক-পরিচ্ছদ অত্যন্ত সাদাসিধা; এমনিতে তিনি নিরামিষাশী,—তবে অসুস্থ হয়ে পড়লে এবং চিকিৎসক তেমন পরামর্শ দিলে, তিনি মাছ আহার করেন। তিনি একান্তভাবেই ধর্মাশ্রয়ী; তাই, তাঁর দুটি বয়ঃপ্রাপ্ত সুশিক্ষিত পুত্র কুমার গিরীন্দ্র ও কুমার সুরেন্দ্র মারা গেলে তাঁর শোকের আদৌ কোন বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি। যেসব বন্ধু ও আত্মীয় তাঁর এই শোকে সমবেদনা জানাতে গিয়েছিলেন, তারা তাঁর নৈতিক দৃঢ়তা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন; তাঁরাই বরং তাঁর কাছে মৃত্যু ও ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ লাভ করেন।

কয়েকটি নূতন রাস্তা নির্মাণ করে চোরবাগান পল্লীটির উন্নয়নের জন্য তিনি সরকারের হাতে কোনপ্রকার মূল্য বা ক্ষতিপূরণ না নিয়ে স্বেচ্ছায় কয়েক খণ্ড জমি তুলে দেন। জনস্বার্থে এই দানের জন্য তাঁকে অনেকেই ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন বলে মনে হয়।

রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুরের চিকিৎসা শাস্ত্রে কিছু জ্ঞান আছে। গরীবদের প্রতি দয়াবশত তিনি বাড়ীতেই ওষুধ তৈরী করিয়ে, অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ দ্বারা পরীক্ষা করিয়ে, গরীবদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করেন। এ বিষয়ে তাঁর পিতা দাতব্য চিকিৎসার যেসব ব্যবস্থা করেছিলেন, তার ওপর তিনি জ্বরের মহামারী রোধের জন্য পেটেণ্ট অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ, সিভিল সার্জনদের মত নিয়ে বিতরণ করেন। সাহায্যের আশায় শত শত লোককে আমরা প্রতিদিন তাঁর দরজায় উপস্থিত হতে দেখি। ঈশ্বর এই মহান মানবপ্রেমিক ও যোগ্য নাগরিককে দীর্ঘ জীবন দান করুন—এই কামনা।

তাঁর জীবিত চার পুত্র কুমার দেবেন্দ্র মল্লিক, কুমার মহেন্দ্র মল্লিক, কুমার যোগেন্দ্র মল্লিক এবং কুমার মনেন্দ্র মল্লিক তাঁদের সৎ ও শ্রদ্ধেয় পিতার বহু সদগুণের অধিকারী। জ্যেষ্ঠ কুমার দেবেন্দ্র মল্লিকের ইংরেজী ভাষায় গভীর জ্ঞান আছে; সংস্কৃতও তিনি জানেন। তিনি কলকাতা পুলিসের অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট এবং জাস্টিস অফ দি পীস; এ ছাড়াও তিনি কলকাতার বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সভ্য। পিতার মতই তাঁরও চিত্রাঙ্কন ও বাস্তুবিদ্যায় বিশেষ দক্ষতা আছে। তাঁর পুত্র কুমার নগেন্দ্র মল্লিকও ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষাদুটি

ভালভাবেই শিখেছেন। পুত্র ও পৌত্রগণসহ রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর অত্যন্ত নিষ্ঠাবান হিন্দু। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনে তাঁদের প্রতিদিন অনেকখানি সময় অতিবাহিত হয়। তাঁর ছেলেরা ও পরিবারের অন্য সকলে ঠাকুরবাটী গিয়ে শাস্ত্রানুযায়ী প্রার্থনাদি করেছেন কিনা রাজা বাহাদুর প্রতিদিন সকালে নিয়মমত সে খোঁজ নেন।

বড়বাজারের মল্লিক পরিবার

এই প্রাচীন সম্মানিত সুবর্ণ-বণিক পরিবারটির জাতিগত পদবী 'দে', মুসলমান সরকার তাঁদের মল্লিক পদবী দান করেন।

সম্রাট আকবরের আমলে এই পরিবারের বনমালি মল্লিক হুগলী জেলার ত্রিবেণীতীরে সপ্তগ্রামে (ব্যবসায় করে) সঙ্গতিসম্পন্ন হয়ে ওঠেন। নদীয়া জেলায় কাঁচড়াপাড়ায় তাঁর একটি 'আবাদ' ছিল, আবাদের পাশে একটি খাল কাটিয়েছিলেন। আজও এই খালটি মল্লিকের খাল নামে পরিচিত। দানশীল বনমালি নদীয়া জেলায় একটি অতিথিশালা স্থাপন করেছিলেন।

বনমালি মল্লিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারীরূপে বালক পৌত্র কৃষ্টদাস মল্লিককে রেখে ১৬০৮ খ্রীস্টাব্দে পরলোক গমন করেন। কৃষ্ণদাসের জন্ম হয় ১৬০১-এ। কৃষ্টদাস ছিলেন বিচক্ষণ ও উৎসাহী বণিক, আবার দানশীল ও ধার্মিকও ছিলেন। হুগলী নদীর তীরে বল্লভপুরে তিনি একটি মন্দির ও ত্রিবেণীতে একটি অতিথিশালা স্থাপন করেন। তিন পুত্র রাজারাম, প্রাণবল্লভ ও কালীচরণকে রেখে তিনি ১৬৮০ খ্রীস্টাব্দে মারা যান।

রাজারামের জন্ম হয় ১৬৩৬ খ্রীস্টাব্দে। তিনি উর্দু, ফার্সী ও বাংলা ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। দুই পুত্র দর্পনারায়ণ মল্লিক ও সন্তোষ মল্লিককে রেখে রাজারাম ১৭০২ খ্রীস্টাব্দে মারা যান। সন্তোষ মল্লিক নিঃসন্তান ছিলেন।

কৃষ্টদাসের মধ্যম পুত্র প্রাণবল্লভের জন্ম হয় ১৬৩৯ খ্রীস্টাব্দে। তিনি তাঁর একমাত্র জীবিত পুত্র সুখদেবকে রেখে মারা যান। সুখদেবের আট পুত্রের মধ্যে রাইহরি রাম মল্লিক (জন্ম ১৭০৭) ছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ঢাকাস্থ রায় রায়ান অর্থাৎ এজেন্ট। তিনি নিঃসন্তাম অবস্থায় মারা যান। যাদবচন্দ্র, বিনোদচাঁদ প্রভৃতি সুখদেবের বর্তমান বংশধর।

রাজারাম মল্লিকের জ্যেষ্ঠপুত্র দর্পনারায়ণ ১৬৭২ খ্রীস্টাব্দে হুগলী জেলার ত্রিবেণীতে জন্মগ্রহণ করেন। ধর্মনিষ্ঠ দর্পনারায়ণ দানের জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি বারাণসী, হুগলী ও নদীয়া জেলায় অতিথিশালা স্থাপন করেন। তদানীন্তন মুসলিম সরকারের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাবার জন্য তিনি ১৭০৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁর খুড়তুত ভাই সুখদেবকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতা চলে আসেন। একমাত্র পুত্র নয়নচাঁদকে রেখে ১৭৪০-এ দর্পনারায়ণ মারা যান।

নয়নচাঁদ ১৭১০-এ কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বারাণসী, শ্রীরামপুরের নিকট মাহেশ ও অন্যান্য বহু স্থানে ধর্মশালা স্থাপন করেন। বড়বাজারে একটি পাকা রাস্তা নির্মাণ করে তিনি সেটি অনারেবল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দান করেন। হুগলী, নদীয়া এবং ২৪ পরগণা জেলায় তাঁর বহু জমিদারী ছিল। গৌরচরণ, নিমাইচরণ এবং রাধাচরণ এই তিন পুত্র রেখে ১৭৭৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন। তিন ভাই মিলে বিপুল ব্যয়ে পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন। কনিষ্ঠ রাধাচরণের কোন পুত্রসন্তান ছিল না।

গৌরচরণ ও নিমাইচরণ মিলিতভাবে কাঁচড়াপাড়ায় একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। গৌরচরণের চার পুত্র : বিশ্বম্ভর, রামলোচন, জগমোহন ও রূপলাল। জ্যেষ্ঠ বিশ্বম্ভর দানের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। কনিষ্ঠ রূপলাল ছিলেন সাদাসিধা মানুষ। তাঁর চার পুত্র : প্রাণকৃষ্ট, শ্রীকৃষ্ট, নবকুমার ও শ্যামাচরণ। এঁরা সকলেই জনসেবার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত 'খণ্ড বৃন্দাবন' নামে খ্যাত সপ্তদীঘি সে যুগের সকল ইওরোপীয়ের কাছে সুপরিচিত ছিল। রূপলালের বর্তমান বংশধর নন্দলাল বর্তমানে এই উদ্যানবাটির মালিক। দেশীয় সম্ভ্রান্ত সমাজ ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে এখানেই মহামান্য ডিউক অব এডিনবর্গকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। উল্লেখ্য যে, মহামান্য ডিউক এই উদ্যান ও দীঘিসমূহ দেখে খুব খুশী হয়েছিলেন।

নয়নচাঁদের মধ্যমপুত্র নিমাইচাঁদ কলকাতার বড়বাজারে ১৭৩৬ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তখন অবশ্য বড়বাজারের নাম ছিল কমল নয়নের বেড়। নিমাইচাঁদ ছিলেন বহু গুণের অধিকারী ; বাংলা, ফার্সী এবং ইংরাজী ভাষা তিনি ভালই জানতেন। অন্যদিকে তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু। উত্তরাধিকারসূত্রে পিতার কাছ থেকে তিনি চল্লিশ লক্ষ টাকা পেয়েছিলেন ; নিজ চেষ্টায় এই অর্থ থেকেই তিনি বিশেষ সমৃদ্ধ হয়ে ওঠেন। পাথুরিয়াঘাটার মল্লিক পরিবারের গঙ্গাবিষ্ণু ও রামকৃষ্ণের ভগিনীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। গঙ্গাবিষ্ণু পাথুরিয়াঘাটার বীর নরসিংহের পিতামহ আর রামকৃষ্ণ ছিলেন চোরবাগানের রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুরের পিতামহ। নিমাইচরণ বল্লভপুরে একটি মন্দির এবং ভাই গৌরচরণের সঙ্গে মিলিতভাবে কাঁচরাপাড়ায় কৃষ্ণরায়জীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এইসকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ব্যয়

নির্বাহের জন্য তিনি তদানীন্তন সুপ্রীম কোর্টের নিকট পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ জমা রাখেন। তিনি বিপুল ব্যয়ে চৈতন্যমঙ্গল গান, পারায়ণ, তুলট প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পাদন করেন। এইসব উপলক্ষে তিনি ব্রাহ্মণ, গোস্বামী প্রভৃতিদের সোনার হার, মুক্তার হার, রূপোর থালা দান করতেন ; তাছাড়া অন্নবস্ত্র ও কিছু দানসহ কাঙালী-বিদায় তো ছিলই। শ্রীশ্রীসিংহবাহিনীর পূজার পালা পড়লে, তিনি ঋণের দায়ে কারারুদ্ধ ব্যক্তিদের ঋণের টাকা পরিশোধ করে তাদের মুক্ত করতেন। এতেই তাঁর বদান্যতা সবচেয়ে বেশী প্রকাশ পেত। তিন কোটিরও বেশী টাকা ও তালুক প্রভৃতি ভূসম্পত্তি রেখে ১৮০৭ খ্রীস্টাব্দে ৭১ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁর ছিল দুই মেয়ে ও আট ছেলে : রামগোপাল, রামরতন, রামতনু, রামকানাই, রামমোহন, হীরালাল, স্বরূপচন্দ্র এবং মতিলাল।

১. নিমাইচরণ মল্লিকের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামগোপালের জন্ম হয় ১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দে। তিনি ১৮২৫-এ গৃহদেবতা শ্রীশ্রীগোবিন্দজীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন অবৈতনিক মধ্যস্থ ; তাঁর সিদ্ধান্তে বিবদমান দুই পক্ষই খুশী হতেন। তিনি ১৮৩০-এ শুঁড়িবাগানের ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে অনুষ্ঠিত কর্মসভার সভাপতি হয়েছিলেন। বীরচরণ, অদ্বৈতচরণ প্রভৃতি পুত্রদের রেখে তিনি ১৮৩৩-এ মারা যান।

২. নিমাইচরণ মল্লিকের মধ্যম পুত্র রামরতন তাঁর পুত্র পিতাম্বরের বিবাহে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। সেই অনুষ্ঠান উপলক্ষে তিনি কলকাতার কয়েকটা পথে গোলাপজল ছড়ান। ১৮১০-এ তিনি ব্রাহ্মণদের ডবল-বহরের বস্ত্র দান করেন। যাই হোক, লবণের একচেটিয়া কারবারের ফাটকার ব্যবসায়ে তাঁর বিপুল লোকসান হয়। তাঁর মৃত্যু হয় ১৮৪১ সালে।

৩. নিমাইচরণ মল্লিকের তৃতীয় পুত্র রামতনু বহু সৎ কাজের জন্য তাঁর সময়ে বিখ্যাত ছিলেন। দুই পুত্র রমানাথ ও লোকনাথকে রেখে ১৮৫৩-তে তিনি মারা যান। জ্যেষ্ঠ রমানাথ মারা যান ১৮৬৫-তে। তাঁর তিন পুত্র : কালীচরণ, ভগবতীচরণ এবং বিনোদবিহারী। ভগবতীচরণ ছিলেন ২৪ পরগণার অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট। কলকাতায় মহারাণীর ভারতসম্রাজ্ঞী উপাধিধারণ উপলক্ষে তাঁকে একটি সম্মানসূচক প্রশংসাপত্র দান করা হয়।

৪. নিমাইচরণ মল্লিকের চতুর্থ পুত্র রামকানাই আফিমের ব্যবসায় করতে গিয়ে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাঁর মৃত্যু হয় ১৮২৭-এ। বর্তমানে তাঁর পৌত্রগণ : গঙ্গানারায়ণ, নকুড়চন্দ্র, ধনঞ্জয়, শ্যামচাঁদ, নরসিংহদাস প্রভৃতি এই শাখার প্রতিনিধি। প্রপিতামহ নিমাইচরণের গচ্ছিত অর্থ থেকে গঙ্গানারায়ণবাবু পুরীতে জনসাধারণের জন্য একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন।

৫. নিমাইচরণের পঞ্চম পুত্র রামমোহন জন্মগ্রহণ করেন কলকাতায় ১৭৭৯-র অক্টোবরে। তিনি তাঁর পূত চরিত্র, হৃদয়বত্তা, শিক্ষা এবং চিকিৎসা ও জ্যোতিষীতে গভীর জ্ঞানের জন্য জনসাধারণের মধ্যে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি সংস্কৃত, বাংলা, ফার্সী ও উর্দু জানতেন—কাজ চালাবার মতো ইংরাজী জ্ঞানও তাঁর ছিল। মহাজনী কারবার করে তিনি বিপুল বিত্তের মালিক হয়েছিলেন। তাছাড়া উত্তরাধিকারসূত্রেও তিনি বিস্তৃত সম্পত্তি পেয়েছিলেন। এই সম্পত্তি পাবার পর তিনি পিতৃপুরুষের প্রতিষ্ঠিত দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলি সুচারুরূপে চালাবার দিকে মনোনিবেশ করেন। পরিবারের রীতি অনুযায়ী সিংহবাহিনী দেবীর পূজার পালা পড়লে মহা ধুমধামের সঙ্গে তিনি সেটি সম্পন্ন করতেন। পূজো উপলক্ষে স্মল কজ কোর্ট কর্তৃক ঋণের দায়ে দণ্ডিত ব্যক্তিদের তিনি প্রতিবারই মুক্ত করতেন। ১৮৪৩-এ অষ্টাদশ পুরাণ পাঠের অনুষ্ঠান করে তিনি আরও খ্যাতি অর্জন করেন। তিন মাস ধরে এই পাঠ-উৎসব চলত, সে-সময় তিনি প্রতিদিন ব্রাহ্মণ ও গোস্বামীদের সোনা ও মুক্তার হার, রূপোর থালা, কাপড়, শাল প্রভৃতি দক্ষিণা দিতেন আর ব্রাহ্মণ-সেবা ও কাঙালী ভোজন তো চলতই। তাঁর সময়ে গঙ্গানদীর তীরভূমির অবস্থা ছিল অতীব শোচনীয়, ফলে উত্তর কলকাতার গঙ্গাস্নানার্থীদের অসুবিধার অন্ত ছিল না। এই অসুবিধা দূর করবার উদ্দেশ্যে প্রচুর অর্থব্যয় করে তিনি একটি ঘাট নির্মাণ করেন। হুগলী ব্রীজের নিকট এখনও (১৮৮১) ঘাটটি বর্তমান। নির্মিত ঘাটের জমিটি ছিল মিউনিসিপ্যালিটির সম্পত্তি; ঐ জমির বিনিময়ে ক্লাইভ স্ট্রীটে অধিকতর মূল্যবান এক খণ্ড জমি তিনি মিউনিসিপ্যালিটিকে দান করেন। তাঁর এক কন্যা ও পাঁচ পুত্র: দ্বারকানাথ, তারকনাথ, প্রেমনাথ, ভোলানাথ এবং হরনাথ। প্রতিটি সন্তানের বিবাহে তিনি প্রচুর অর্থব্যয় করেন। পরিণত বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়; মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। সে-সময় জীবিত ছিলেন তাঁর তিন পুত্র: তারকনাথ, প্রেমনাথ ও ভোলানাথ। এঁরা তিন ভাইয়ে মিলে মহা ধুমধামের সঙ্গে পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন।

ক. রামমোহন মল্লিকের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বারকানাথ পিতার জীবিতকালেই ১৮৫৮ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি অপুত্রক ছিলেন; মৃত্যুর পূর্বে তিনি দত্তক গ্রহণ করেন, তাঁর দত্তকপুত্রের নাম অটলবিহারী।

খ. রামমোহনের মধ্যমপুত্র তারকনাথ পিতার মৃত্যুর দু'বছর পর, ১৮৬৬-তে মারা যান; মৃত্যুকালে রেখে যান পাঁচ পুত্র: ব্রজনাথ, যদুনাথ, বৈকুণ্ঠনাথ, বরেন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্রনাথ।

গ. রামমোহনের তৃতীয় পুত্র প্রেমনাথের জন্ম হয় ১৮১৪ সালে। তিনি তাঁর ভাই ভোলানাথের সঙ্গে একত্রে পুরীতে জগন্নাথ দেবের রন্ধনশালাটি সংস্কার করে দেন; তাছাড়া, পিতৃপুরুষগণের প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতিসাধন

করেন। দুই ভাইয়ে মিলিতভাবে বৃন্দাবনের গোবর্ধন ধারের নিকট প্রস্তরনির্মিত ত্রিতল একটি কুঞ্জবাটী খরিদ করেন, এই বাড়ীটির পূর্বনাম ছিল গোস্বামীর হাভেলি। প্রেমনাথবাবু অত্যন্ত নিষ্ঠাবান হিন্দু, পূজার্চনাতেই তাঁর বহু সময় ব্যয়িত হয়। তাঁর তিন পুত্র : প্রসাদদাস, নিত্যলাল এবং মন্নুলাল। প্রসাদ দাস বাবু আজ থেকে প্রায় ২২ বছর আগে একটি পারিবারিক সাহিত্য ক্লাব স্থাপন করেন ; তিনিই তাঁর উৎসাহী সম্পাদক। এই ক্লাবের সমগ্র ব্যয়ভার তিনিই বহন করেন।

ঘ. রামমোহন মল্লিকের চতুর্থ পুত্র ভোলানাথের জন্ম হয় ১৮১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে। বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় তাঁর দখল আছে। অত্যন্ত সহজে তিনি বাংলা ভাষায় কবিতা রচনা করতে পারেন। তিনি জন-সেবাপরায়ণ, দরিদ্রদের অন্নবস্ত্র দান করা তাঁর স্বভাব। তাঁর একমাত্র পুত্র বলাইচাঁদ সাদাসিধা সরল যুবক।

ঙ. রামমোহন মল্লিকের পঞ্চম পুত্র হরনাথ দুটি বুদ্ধিমান পুত্র রেখে পিতার জীবিতকালেই ১৮৪৮ সালে মারা যান। তাঁর পুত্রদের নাম তুলসীদাস ও মহেশচন্দ্র।

চ. নিমাইচরণ মল্লিকের ষষ্ঠ পুত্র হীরালাল যৌবনেই মারা যান। তিনি রেখে যান চার কন্যা : শ্রীমতী রঙ্গনমণি দাসী, জয়মণি দাসী, অপর্ণা দাসী এবং নবীন কুমারী দাসী। এঁদের মধ্যে জয়মণি দুই পুত্র রেখে মারা যান ; তাঁরা হলেন হরিদাস দত্ত ও সিংহীদাস দত্ত। হরিদাস দত্ত একটি দত্তক পুত্র রেখে মারা যান।

ছ. নিমাইচরণ মল্লিকের সপ্তম পুত্র স্বরূপচন্দ্র বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি দুখানি বাংলা উপন্যাস রচনা করেন। তিনি দুই পুত্র নিত্যানন্দ ও চৈতন্যচরণকে রেখে ১৮৪৮-এ মারা যান। চৈতন্যচরণের মৃত্যু হয় ১৮৭৫-এ। তাঁর একটি দত্তক পুত্র ছিল ; তাঁর নাম যোগেন্দ্রনাথ মল্লিক।

জ. নিমাইচরণ মল্লিকের অষ্টম পুত্র মতিলাল বৃন্দাবনে একটি কুঞ্জবাটী নির্মাণ করেন। পুরাণ পাঠের জন্য ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণাদানে শ্রীশ্রীসিংবাহিনীর ও তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধাশ্যামজীর পূজা উপলক্ষে তিনি প্রচুর ব্যয় করতেন। দত্তক পুত্র যদুলাল মল্লিককে রেখে তিনি ১৮৪৬-এ মারা যান। মতিলালের বিধবা স্ত্রী মাহেশে একটি কুঞ্জবাটী নির্মাণ করেন ; সেখানে প্রতিদিন দরিদ্র নারায়ণের সেবা করা হয়।

পিতার মৃত্যুকাল থেকে আজ পর্যন্ত বাবু যদুলাল মল্লিক কয়েকটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নিয়মিতভাবে করে আসছেন। ১৮৭৮-এ তিনি বিপুল ব্যয়ে মায়ের তুলা ও পারায়ণ সম্পন্ন করেন। তিনি কলকাতা ও ২৪ পরগণার অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট

ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভ্য। বহু জনের কাছেই তিনি শিক্ষিত, বুদ্ধিমান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরূপে পরিচিত। ইংল্যাণ্ডেশ্বরীর ভারত সম্রাজ্ঞী খেতাব ধারণ উপলক্ষে ১৮৭৭-এর ১ জানুয়ারী কলকাতায় অনুষ্ঠিত দরবারে তাঁকে সাম্মানিক প্রশংসা-পত্র দেওয়া হয়।

১৮৮০-র ১০ জানুয়ারী বাবু যদুলাল মল্লিক হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত তাঁর দক্ষিণেশ্বরের জমকালো উদ্যানবাটীতে বিশেষ আনন্দময় একটি মিলনোৎসবের অনুষ্ঠান করেন। স্যার রিচার্ড গার্থ্, মিঃ ডব্লু এম সাউটার, মিঃ এ. ম্যাকেঞ্জী, দি অনারেবল মিঃ সি টি বাকল্যাণ্ড, দি অনারেবল মিঃ ইঙ্গলিস, দি অনারেবল মিঃ কলভিন, দি অনারেবল মিঃ ফিল্ড, মিঃ পীকক, দি অনারেবল মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর সি এস আই, মহারাজা কমল কৃষ্ণ বাহাদুর, মহারাজা নরেন্দ্র কৃষ্ণ বাহাদুর, ডাঃ রাজেন্দ্র লালা (?) মিত্র, সি আই ই, দি অনারেবল রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর, সি আই ই এবং আরও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানের আর একটি আনন্দদায়ক কর্মসূচি ছিল মেয়ো হাসপাতাল থেকে দক্ষিণেশ্বরের উদ্যানবাটী এবং সেখান থেকে মেয়ো হাসপাতাল পর্যন্ত স্টিমারে অতিথিবর্গের প্রমোদ-ভ্রমণ। বাবু যদুলালের ইওরোপীয় ও দেশীয় অতিথিগণকে অতি উপাদেয় ভোজ্য দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়েছিল। এই উৎসব উপলক্ষে উদ্যানবাটীটিকে অত্যন্ত সুরুচিপূর্ণভাবে আলো, মালা, ফুলপাতা ও পতাকা দিয়ে সাজান হয়েছিল; তার সঙ্গে ছিল নাচ, দেহ সৌষ্ঠব ও ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন। সব মিলিয়ে অতিথিবর্গ সেদিন প্রচুর আনন্দ পেয়েছিলেন।

বাগবাজারের নন্দলাল বসু ও পশুপতিনাথ বসু

এই দুই সম্ভ্রান্ত জমিদার দশরথ বসুর ২৪তম অধস্তন পুরুষ। এঁরা কলকাতার শ্যামবাজার এলাকার কাঁটা পুকুর পল্লীর বিশিষ্ট বসু পরিবারের কর্তা জগৎচন্দ্র বসুর পৌত্র এবং মাধবচন্দ্র বসুর পুত্র। মাধবচন্দ্র বসুর বিবাহ হয় ২৪ পরগণা জেলার বারাসতের জমিদার মিত্র পরিবারের রায় রামসুন্দর মিত্রের পৌত্রী এবং রায় নীলমণি মিত্রের কন্যার সঙ্গে। মাধবচন্দ্র অত্যন্ত ধার্মিক, সৎ ও সরল ছিলেন। তিন পুত্র মহেন্দ্রনাথ বসু, নন্দলাল বসু এবং পশুপতিনাথ বসুকে রেখে ১৮৫৯

করতেন, অনেকে তাঁর ভীষণ শত্রুও হয়ে পড়েন। অবশ্য, উচ্চ, মুক্ত, সম্মানপূর্ণ এই জীবন থেকে শীঘ্রই তাঁর পতন হল। নিজেরই পৈতৃক সম্পত্তির ব্যাপারে জালিয়াতির অভিযোগে জড়িয়ে পড়ায় ১৪ বৎসরের জন্য তাঁর দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। শাস্তির পূর্ণ সময় আন্দামানে কাটাবার পর, পোর্ট ব্লেয়ার থেকে ফেরার পথে দুর্ভাগ্যবশত জাহাজে তাঁর মৃত্যু হয়। শ্যামবাজারের দেওয়ান কৃষ্টরাম বসুর মতো তিনি নির্বাসনের পূর্বে হুগলী জেলার মাহেশের রথযাত্রার ব্যয় নির্বাহের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন; তাঁর দত্তক পুত্র ননীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সৎ চরিত্রের মানুষ; যুবক হলেও ইতিমধ্যে তিনি বাংলা, সংস্কৃত, ইংরাজী ও ফার্সী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেছেন। তিনি হিন্দু ধর্ম শাস্ত্রের বিধি মেনে চলেন। তিনি দুই পুত্রের পিতা —দুজনই এখনও শিশু।

বাগবাজারের মহারাজা রাজবল্লভের পরিবারবর্গ

'স্বরাজ উদ্-দৌলা' বাংলার নবাব নাজিম হবার পূর্বে নবাব সরকারের বক্সী অর্থাৎ ফৌজদারের বাহিনীর বেতনদাতা ছিলেন মহারাজা দুর্লভরাম; তাঁর পিতা মহারাজা জানকী রামকে দিল্লীর বাদশাহ্ পাটনার সুবাদার নিযুক্ত করেছিলেন। এঁরা জাতিতে কায়স্থ, বাংলার সম্ভ্রান্ত সোম পরিবার ভুক্ত। মহারাজা রাজবল্লভ বাহাদুর, রায় রায়ান, উক্ত মহারাজ দুর্লভরামের পুত্র।

পিতা ও পিতামহের প্রভাবে মহারাজা রাজবল্লভ নবাব সরকারের অত্যন্ত সম্মানজনক উচ্চপদ লাভ করেন; তিনি হন নবাবের সিরাজুদ্দৌল্লার রায় রায়ান অর্থাৎ অর্থমন্ত্রী, 'খালসা' (সম্পত্তি)-র মোহরাধ্যক্ষ এবং মুর্শিদাবাদের একটি জায়গীরের মালিক। ভারতে ব্রিটিশ শক্তি প্রতিষ্ঠায় তিনি লর্ড ক্লাইভকে সবিশেষ সহায়তা করেন।

পলাশী যুদ্ধের এবং স্বেচ্ছাচারী কুখ্যাত নবাব সিরাজুদ্দৌলার নিধনের পর, মহারাজা রাজবল্লভ কলকাতা চলে এসে সুতানুটির বাগবাজারে বাস করতে থাকেন। এই সময় লর্ড ক্লাইভ অনারেবল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে মহারাজার উল্লেখযোগ্য সহায়তার স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে কিছু মূল্যবান উপহার দিতে চান, কিন্তু মহারাজা রাজবল্লভ নিজ পদমর্যাদা সম্বন্ধে এত সচেতন ছিলেন যে, পুরস্কারস্বরূপ কোন কিছু নিতে তিনি অস্বীকৃত হন। তিনি কিছুকাল অনারেবল ইস্ট ইণ্ডিয়া

কোম্পানির কাউন্সিলের অবৈতনিক সভ্য ছিলেন। তিনি বাগবাজারে একটি ঘাট নির্মাণ করেন। এটি মহারাজা রাজবল্লভের ঘাট নামে পরিচিত। এখনও একটি রাস্তা আছে রাজা রাজবল্লভ স্ট্রীট নামে। তাঁর উত্তরাধিকারীরূপে তিনি রেখে যান তাঁর প্রয়াত পুত্র মুকুন্দবল্লভের বিধবা স্ত্রী এবং ভাগিনেয় কাশীপ্রসাদ মিত্র প্রভৃতিদের।

রাজা মুকুন্দ বল্লভের দত্তকপুত্র রাজা গৌর বল্লভের পুত্র রুক্মিনী বল্লভ এখন এই বংশের কর্তা। তিনিও বাগবাজারে বাস করছেন, অবশ্য তাঁদের অবস্থা পড়ে গেছে।

কাশীপ্রসাদ মিত্রের দুই পুত্র রামপ্রসাদ ও গোপাললাল। রায় রামপ্রসাদ মিত্র বাহাদুর ছিলেন সরকারী তোষাখানার অধীক্ষক ; এখন তিনি পেনসনভোগী। বাবু গোপাললাল মিত্র হাইকোর্টের উকিল। রায় রামপ্রসাদ মিত্র বাহাদুর শ্যামবাজারে বাস করেন। বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে চাকরী করার জন্য সরকার ১৮৬২ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারী তাঁকে রায় বাহাদুর পদবীতে ভূষিত করেন।

সিমলার রামদুলাল দে-র পরিবারবর্গ

বাবু রামদুলাল দে, দুলাল সরকার নামেই অধিক পরিচিত। তিনি সেই সব দুর্লভ মানুষদের একজন যাঁরা দরিদ্রতম অবস্থা থেকে ঐশ্বর্য ও খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করতে সক্ষম হয়েছেন। জাতিতে এঁরা কায়স্থ। তাঁর বাবা বলরাম সরকার বাস করতেন দমদমের নিকবর্তী রেকজানি গ্রামে। সেখানে গ্রামের গরীব চাষী বাড়ীর ছেলেদের বাংলা লিখতে শিখিয়ে যে সামান্য পারিশ্রমিক পেতেন তাতেই নিজের ও স্ত্রীর দিন গুজরান হত। বর্গীর হাঙ্গামার সময় (১৭৫১—৫২ খ্রী.) তিনি স্ত্রীকে নিয়ে গ্রাম ত্যাগ করেন ; এই সময় তাঁর স্ত্রী অন্তঃস্বত্তা ছিলেন ; এক নির্জন স্থানে তিনি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেন—এই সন্তানই ভবিষ্যতের কোটিপতি রামদুলাল। অতি শৈশবেই রামদুলাল মাতৃপিতৃহীন হন। তাঁকে লালন পালন করবার ভার নেন তাঁর মাতামহ ও মাতামহী। মাতামহ ছিলেন ভিক্ষাজীবী। বেশ কয়েক বৎসর তাঁর মাতামহী দুঃখ দারিদ্র্যের ও কায়িক শ্রমের জীবন যাপনের পর, বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী বাবু মদনমোহন দত্তের বাড়ীতে রাঁধুনীর কাজ পান ; রামদুলালকেও সেখানে থাকতে দেওয়া হয়। মনিব

বাড়ীর ছেলেদের সঙ্গে লেখাপড়া করে রামদুলাল কিছু বাংলা আর জাহাজের সাহেব ক্যাপটেন, মেট প্রভৃতির সঙ্গে কথা বলবার মতো মোটামুটি ইংরাজী ভাষা শেখেন। মদনবাবু তাঁকে প্রথমে মাসিক পাঁচ টাকা বেতনে বিল-সরকার হিসাবে নিয়োগ করেন। এই চাকুরীতে তাঁর দক্ষতায় সন্তুষ্ট হয়ে মদনবাবু তাঁর পদোন্নতি করে মাসিক দশ টাকা বেতনে জাহাজ-সরকারের পদ দেন। এই সময় তিনি মনিবের পক্ষ থেকে মেসার্স টুলোহ্ অ্যাণ্ড কোম্পানির নীলামে উপস্থিত থাকতেন; কী খেয়ালে ডুবে যাওয়া একটা জাহাজ ১৪,০০০ টাকায় তিনি কিনে ফেললেন। নীলামের আনুষ্ঠানিক কাজকর্ম সেরে, টাকা দিয়ে তিনি বেরিয়ে আসছেন, এমন সময় একজন ইংরেজ এসে জাহাজটি তাঁর কাছে বিক্রী করবার জন্য রামদুলালের সঙ্গে দর কষাকষি করতে থাকেন; একমাত্র এই ইংরেজ ভদ্রলোকই জাহাজটি ও তার অভ্যন্তরস্থ মালের মূল্য জানতেন; শেষ পর্যন্ত এক লক্ষের সামান্য কিছু কমে জাহাজটি তিনি কিনে নেন। রামদুলাল ভাবেন তাঁর মনিবই পুরো এই অর্থ পাবার অধিকারী, সেই বিবেচনা অনুযায়ী তিনি মনিবকে মবলগ টাকা দিয়ে দেন। রামদুলালের সততা ও বিবেকবুদ্ধি দেখে মদনবাবু এত খুশী হলেন যে, তিনি পুরো টাকা নেবার জন্য রামদুলালকে হুকুম করলেন। এই টাকাই রামদুলালের ভবিষ্যৎ উন্নতির ভিত্তি।

অল্পকালের মধ্যেই রামদুলাল কয়েকটি মার্কিন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে এজেণ্ট হিসাবে কাজ শুরু করলেন এবং মেসার্স আশুতোষ দে অ্যাণ্ড নেফিউ নামে একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেন; এটি এখন কলকাতার দয়ালচাঁদ মিত্রের ভাই-রা পরিচালনা করেন।

রামদুলাল মেসার্স ফেয়ারলি ফার্গুসন অ্যাণ্ড কোম্পানিরও বেনিয়ান হন। এই সময় তিনি উন্নতির চরম শিখরে ওঠেন। তখন বাজারে তাঁর অসীম ইজ্জৎ। শুধু তাঁর নাম করলেই লোকে শ্রদ্ধার সঙ্গে আস্থা স্থাপন করে। তাঁর দান এবং উদারতাও ছিল অতুলনীয়। প্রবাদের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁর দয়া, ধর্ম-প্রাণতা এবং নম্রতা। মাদ্রাজে দুর্ভিক্ষগ্রস্তদের ত্রাণের জন্য কলকাতা টাউন হলে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়; সেখানে, সভাস্থলেই রামদুলাল কাঁচা টাকায় (মুদ্রায়) এক লক্ষ টাকা দান করেন। হিন্দু কলেজ স্থাপনের জন্য তিনি দান করেন ৩০,০০০ টাকা। যে-সব দুঃস্থ ব্যক্তি তাঁর অফিসে এসে সাহায্যপ্রার্থী হত, তাদের দান করবার জন্য তিনি দৈনিক ৭০ টাকা সরিয়ে রাখতেন। মাইনে দিয়ে তিনি তিনজন কবিরাজ রেখেছিলেন, তাঁদের প্রতি নির্দেশ ছিল আর্ত রুগ্ণ দরিদ্র মানুষের বাড়ী বাড়ী গিয়ে তাঁরা চিকিৎসা করবেন এবং তাঁরই ব্যয়ে ঔষধপত্র দেবেন। বেলগাছিয়ায় তিনি একটি অতিথিশালা স্থাপন করেছিলেন; সেখানে অভাবী ব্যক্তিদের উদারভাবে খাদ্য দেওয়া হত। এই প্রতিষ্ঠানটি এখনও

চালু আছে। বারাণসীতে তিনি ১৩টি শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে তাঁর ব্যয় হয় ২,২২,০০২ টাকা। ৬৯ বৎসর বয়সে তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েন ; (চিকিৎসায়) এই রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করলেও, তখন থেকেই তাঁর স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়ে। ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দের ১ এপ্রিল ৭৩ বছর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন। খুব ধুমধামের সঙ্গে তাঁর শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়, এতে ব্যয় হয় প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা। তাঁর দুই স্ত্রী—একজন নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান, অপর জনের ছিল পাঁচ কন্যা ও দুই পুত্র : আশুতোষ ও প্রমথনাথ ; এঁরা সাতু (ছাতু) বাবু ও লাটু বাবু নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। এঁরা বাপের সুনাম অনেকাংশেই রক্ষা করেছিলেন। আশুতোষ বাবু (ওরফে সাতু বাবু) পুরী বা জগন্নাথধামে এবং উত্তর পশ্চিম ও পশ্চিম প্রদেশের বহুস্থানে ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তিনি ছিলেন বিশেষ সঙ্গীতপ্রিয় ; তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ সেতারীদের তিনি অন্যতম ছিলেন। সারা দেশের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে গুণী সঙ্গীতজ্ঞগণ তাঁর চারদিকে ভীড় লাগিয়েই থাকতেন—তিনিও উদার ভাবে তাঁদের উৎসাহিত করতেন। প্রমথনাথ বা লাটুবাবু তাঁর শারীরিক শক্তি ও পুরোপুরি ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। এই দুই ভাই যেমন ছিলেন দানশীল, তেমন বিলাসী ; তাঁদের এই দানশীলতা ও বিলাসিতার জন্য তাঁরা সর্বত্র বাংলার 'বাবু' নামে পরিচিত ছিলেন। সেকালে 'বাবু' বলতে অত্যন্ত ধনী ও খ্যাতি সম্পন্ন ব্যক্তিকে বোঝাত। আশুতোষের একমাত্র পুত্র গিরিশচন্দ্র দুটি কন্যাসন্তান রেখে পিতার জীবিতকালেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। আশুতোষও দুই কন্যা রেখে যান : তাঁদের একজন চারুচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের মাতা এবং অপরজন রামবাগানে শ্রদ্ধেয় ও সি দত্তের স্ত্রী। প্রমথনাথের দুই বিধবা : তাঁরা দুজনেই একটি করে দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন : মন্মথনাথ ও অনাথনাথ।

রামদুলাল বিপুল বিত্ত (শোনা যায়, এক কোটি তেইশ লক্ষ টাকা) রেখে গিয়েছিলেন। তাঁর পুত্রদ্বয় এই সম্পদ আশা মিটিয়ে ভোগ করেন।

পরবর্তী বংশধরগণ ছিলেন অমিতব্যয়ী। তাছাড়া ছিল ব্যবসায়িক ক্ষতি। এই সকল কারণে এই পরিবারের সম্পদ ক্ষীণ হয়ে আসে। তাঁর (রামদুলালের) ভেঙে পড়া বিপুল বিস্তৃত সম্পত্তি থেকে কলকাতার বহু ধনী পরিবার গড়ে উঠেছে।

টনটনিয়ার (ঠনঠনিয়ার) বাবু রামগোপাল ঘোষ

বাবু রামগোপাল ঘোষের পিতা গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ ছিলেন কলকাতার একজন ব্যবসায়ী এবং কুচবিহারের মহারাজার কলকাতাস্থ এজেন্ট। এঁরা জাতিতে কায়স্থ। ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে কলকাতায় রামগোপালের জন্ম হয়; মিঃ শোরবোর্নের স্কুলে তিনি প্রাথমিক ইংরাজী শিক্ষা লাভ করেন। তের বছর বয়সে তাঁকে হিন্দু স্কুলে ভর্তি করা হয়; এখানে মিঃ এইচ এল ভি ডিরোজিওর অধীনে শিক্ষা লাভ করে তিনি (শিক্ষায়) অসাধারণ উন্নতি করেন। অবস্থা পড়ে যাওয়ায় তাঁকে স্কুল ছাড়তে হয়; এই সময় ডেভিড হেয়ারের জোর সুপারিশের ফলে কলকাতায় ইহুদী ব্যবসায়ী মিঃ যোসেফের প্রতিষ্ঠানে তাঁর একটি চাকরী হয়।

তাঁর বিশ্বস্ততাপূর্ণ কাজের ফলে এবং তিনি বাংলার (কৃষিজ) দ্রব্যের ও শিল্পজাত পণ্যের একটি বিবরণ এবং তৎসহ রফতানি বাণিজ্যে তাদের স্থান সম্পর্কে কার্যকর একটি প্রতিবেদন তৈরী করেন, তার ফলে মিঃ যোসেফ অত্যন্ত খুশী হয়ে, কিছুকালের জন্য ইংল্যাণ্ড যাবার সময় তাঁকে ব্যবসায় পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে যান। এত সাবধানতার সঙ্গে তিনি ব্যবসায় পরিচালনা করেন যে, মিঃ যোসেফ ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরে দেখেন তাঁর ব্যবসায়ে প্রভূত লাভ হয়েছে। কিছুকাল পরে মিঃ কেলসাল এই প্রতিষ্ঠানে অংশীদাররূপে যোগদান করেন; রামগোপাল কিন্তু তাঁদের সহকারী হিসাবে থেকে যান। যোসেফ ব্যবসায় থেকে অবসর নেবার পর, কেলসাল রামগোপালকে প্রতিষ্ঠানের অংশীদার করে নেন; প্রতিষ্ঠানটির নতুন নামকরণ হয় মেসার্স কেলসাল অ্যাণ্ড ঘোষ।

কেলসাল ও রামগোপালের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হয়ে যায়, রামগোপাল ১৮৪৬ সালে ২,০০,০০০ টাকা নিয়ে কোম্পানির সংস্রব ত্যাগ করেন। এই সময় সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে স্মল কজ কোর্টের দ্বিতীয় জজের পদে নিয়োগ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়; কিন্তু 'কোম্পানির মুন খাব না' তাঁর এই স্থির সিদ্ধান্তের জন্য তিনি ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

বাবু রামগোপাল ঘোষ এর পর নিজেই একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তিনি আরাকান চাল রফ্‌তানি করে অল্পকালের মধ্যে ধনাঢ্য হয়ে ওঠেন।

আকিয়াব এবং রেঙ্গুনেও তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠানের শাখা স্থাপন করেন। ব্যবসায়ী হিসাবে তিনি সম্ভ্রান্ত ইওরোপীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে এত বিখ্যাত হন যে, ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দের ২৬ নভেম্বর তাঁকে বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের সভ্য করে নেওয়া হয়। ১৮৫৪-তে মিঃ ফিল্ড তাঁর অংশীদার হন; কিন্তু এর কিছুকাল পরেই রামগোপালবাবু ব্যবসায় থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

১৮৪৭-এর ব্যবসায়িক সংকটের সময় কলকাতার বহু ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান উঠে যায়; কিন্তু রামগোপাল দৃঢ়ভাবে স্বীয় ব্যবসায় ধরে রাখেন। এই সময় তাঁর কিছু 'শুভানুধ্যায়ী' ইংল্যাণ্ড থেকে পাওনা বিলগুলিকে বেনামা করবার পরামর্শ দেন যাতে বিলের টাকা পরিশোধ না হলে, তাঁর প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে পড়ে। উত্তরে তিনি জানান, 'পাওনাদারদের ঠকানোর পরিবর্তে তিনি তাঁর পরনের শেষ ন্যাকড়াখানি বরং বেচে দেবেন।' এমনই ছিল তাঁর সততা, নৈতিক সাহস ও ঔচিত্যবোধ।

কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি বিশেষ ধনবান হয়ে ওঠেন। কামারহাটিতে একটি ভিলা নির্মাণ করে সেখানে তিনি বসবাস এবং বন্ধুবর্গকে মাঝে মাঝে আপ্যায়ন করতে থাকেন। এই সমগ্র সময়ের কখনই তিনি তাঁর সাহিত্যকর্ম বন্ধ রাখেননি। 'সিভিস' ছদ্মনামে তিনি জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকায় ভারতীয় রপ্তানি পণ্যের শুল্ক সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। তিনি ডিগ্‌লট নামক একখানি পত্রিকা সম্পাদনা, স্পেক্টেটর নামক একখানি পত্রিকা প্রতিষ্ঠা এবং মিঃ জর্জ টমসনের সহযোগে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি স্থাপন করেন। রামগোপালবাবু বিশেষ বিদ্যোৎসাহী এবং সমাজসেবী মানুষ ছিলেন। বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি ডেভিড হেয়ারের সঙ্গে সহযোগিতা করে, উপহার ও পুরস্কার দিয়ে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের উৎসাহদান, মেডিক্যাল কলেজের বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ এবং বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে সহযোগিতা করে বিভিন্ন পেশায় শিক্ষালাভের জন্য চারজন ছাত্রকে ইংল্যাণ্ডে প্রেরণ করেন। মাননীয় বেথুনের অনুরোধে তিনি ১৮৪৫-এর সেপ্টেম্বরে শিক্ষা পরিষদের সভ্যপদ গ্রহণ করেন এবং বাংলায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অনুদান দেবার ব্যাপারে সরকারকে সাহায্য করেন। কলকাতায় একটি স্ত্রীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বালিকা বিদ্যালয়) স্থাপনের বিষয়ে তিনি মাননীয় বেথুনকে সাহায্য করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ডঃ মাউণ্টকে কার্যকর সুপরামর্শ দান করেন। রাজনীতিতে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল; ভারতে রেলওয়ে প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবকে তিনি বিপুলভাবে সমর্থন করেন এবং বিধবা বিবাহ আন্দোলনেও হস্তক্ষেপ করেন। লর্ড হার্ডিঞ্জকে সম্মান প্রদর্শনের বিষয়ে কলকাতার অধিবাসীদের এক সভায় লর্ড হার্ডিঞ্জের একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হোক, রামগোপাল তাঁর এই প্রস্তাব, মিঃ টারটন, মিঃ ডিকেন্স ও মিঃ হিউম এই তিন জন ইংরাজ ব্যারিস্টারের

বিরোধিতা সত্ত্বেও পাস করিয়ে নিতে সক্ষম হন। পরদিন জন বুল পত্রিকা লেখেন, 'এক যুবক বাঙালী বাগ্মী তিনজন ইংরাজ ব্যারিস্টারকে ভূমিসাৎ করেছেন'; তার সঙ্গে তাঁকে 'ভারতের ডিমস্থিনিস' আখ্যায় ভূষিত করেন।

১৮৫৩-র জুলাইয়ে কলকাতা টাউন হলে চার্টার সম্পর্কিত সভায় প্রদত্ত রামগোপালের বক্তৃতাকে (লণ্ডন) টাইমস পত্রিকা প্রশংসা করে লেখেন 'বাগ্মিতার অতি উৎকৃষ্ট নিদর্শন'। মহারাণীর ঘোষণা উপলক্ষে প্রদত্ত রামগোপালের বক্তৃতার সুখ্যাতি করে ইণ্ডিয়ান ফিল্ড পত্রিকায় মিঃ হিউম লেখেন, বাবু রামগোপাল ঘোষ জাতিতে ইংরাজ হলে মহারাণী তাঁকে নাইট খেতাবে ভূষিত করতেন। তাঁর কালা কানুন বিরোধী বক্তৃতার জন্য তাঁকে রয়্যাল এগ্রি-হর্টিকালচার সোসাইটি থেকে বহিষ্কৃত করা হয়; বিরোধীদের এই কাজের জবাব দিয়ে তিনি জোরালো একখানি পুস্তিকা লেখেন। ডাঃ গ্র্যাণ্ট তো বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না যে, কোন (ইংরেজের) সহায়তা না নিয়ে এদেশীয় কোন ব্যক্তি এরকম ইংরেজী ভাষা লিখতে পারেন। শ্মশান ঘাট প্রশ্নে কলকাতার জাস্টিসদের সভায় তাঁর প্রদত্ত বক্তৃতা হিন্দু সমাজ চিরকাল কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবেন। কী লেখা, কী বক্তৃতা উভয় ক্ষেত্রেই ইংরেজীর বাগ্‌বৈশিষ্ট্যের উপর তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ পেত। একথা বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে উঠত যে ইংরেজী ভাষা, তার ভাব ও প্রকাশ ভঙ্গী তাঁর কাছে বিদেশী ভাষা, ভাব বা প্রকাশভঙ্গী; একথাও বিশ্বাস করা কঠিন ছিল যে, তিনি ইংল্যাণ্ডের গৃহস্থ বাড়ীতে লালিত পালিত হননি। মিঃ কোচরেন একবার মন্তব্য করেন, 'স্বদেশবাসীর মঙ্গল হতে পারে এমন কোন বিষয়ে (রামগোপালবাবু যে বক্তৃতা দিতেন) তার মতো বাগ্মিতা বা আত্যন্তিক উৎসাহ তিনি আর কখনও কোথাও (বা কারও মধ্যে) দেখেননি।' রামগোপালবাবু ছিলেন বঙ্গীয় আইন পরিষদের সভ্য, কলকাতার অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট ও জাস্টিস অব দি পীস, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভ্য এবং জেলা দাতব্য সমিতির সভাপতি। তিনি সভ্য ছিলেন ১৮৪৫-এর পুলিশ কমিটির, ১৮৫০-র স্মল পক্স কমিটির; তাছাড়া সেন্ট্রাল কমিটি ফর দি কলেকশন অব ওয়ার্কস অব আর্ট অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রী, ১৮৫১-র লণ্ডন এগজিবিশনের, ১৮৫৫ ও ১৮৬৭-র প্যারিস এগ্‌জিবিশন দুটির এবং ১৮৬৪-র (কমিটি ফর দি) বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল এগজিবিশনের। কি সরকার, কি বিশিষ্ট ইওরোপীয় ভদ্রলোক, সকলেই রামগোপালবাবুর স্বাভাবিক গুণাবলী সম্পর্কে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। মিঃ থিওডোর ডিকেন্স (যিনি রামগোপাল সম্পর্কে শত্রুতার ভাব পোষণ করেন বলে অনেকের ধারণা ছিল)-কে বিদায়-ভোজে আপ্যায়ন করার আগে মাননীয় প্রসন্নকুমার ঠাকুর

রামগোপালকে ঐ ভোজসভায় আমন্ত্রণ জানানো সম্পর্কে ডিফেন্সের আপত্তি আছে কিনা জানতে চান; উত্তরে ডিফেন্স জানান, না, কোন আপত্তি নাই। পূর্বের বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও, মিঃ ডিফেন্স উক্ত ভোজসভায় রামগোপালবাবুর স্বাস্থ্য কামনা করে অত্যন্ত প্রশংসা সূচক এক বক্তৃতায় মন্তব্য করেন, হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতার পদ গ্রহণের একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি—বাবু রামগোপাল ঘোষ।

রামগোপাল বাবু ছিলেন স্বভাবতই দয়াবান; তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করে যান ৪০,০০০ টাকা; জেলা দাতব্য সমিতিকে ২০,০০০ টাকা, এবং তাঁর কাছে ঋণী ব্যক্তিদের মোট ঋণ ৪০,০০০ টাকা মকুব করে দিয়ে যান। দেশের মহা উপকারী বন্ধু ও দেশের গৌরব বাবু রামগোপাল ঘোষ ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারী পরলোক গমন করেন। তাঁর মৃত্যুতে কি ধনী কি দরিদ্র সকলেই শোকে অভিভূত হন। তাঁর পুত্র সন্তান ছিল না: মৃত্যুকালে তিনি তাঁর একমাত্র বিবাহিতা কন্যাকে রেখে যান। এই কন্যা নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান।

পাথুরিয়াঘাটার দেওয়ান রামলোচন ঘোষের পরিবারবর্গ

রামলোচন ঘোষ থেকেই আমরা এই বংশের সূচনা ধরছি। রামলোচনের এক ভাই কৃপারাম অত্যন্ত ধনী ছিলেন, কিন্তু আজ আর তাঁর বংশের কেউ জীবিত নাই। কায়স্থ বংশীয় রামলোচন ছিলেন লেডী হেস্টিংসের অন্যতম সরকার। ওয়ারেন হেস্টিংসেরও তিনি প্রিয়পাত্র ছিলেন, সাধারণভাবে তাঁকে হেস্টিংসের দেওয়ান বলা হত। দশসালা বন্দোবস্তে এই রামলোচনেরও হাত ছিল। তিনি প্রচুর ধনসম্পদ অর্জন করেন। তাঁর তিন পুত্র: শিবনারায়ণ, দেবনারায়ণ ও আনন্দনারায়ণ—এঁরা প্রত্যেকেই প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী জমিদাররূপে খ্যাত ছিলেন। শিবনারায়ণের তিন পুত্র: কালীপ্রসন্ন, দুর্গাপ্রসন্ন এবং গুরুপ্রসন্ন। ধর্মভীরু, দানশীল, উদার দেবনারায়ণের পুত্রের নাম খেলাৎচন্দ্র—এই খেলাৎচন্দ্র ছিলেন কলকাতার গণ্যমান্য নাগরিকদের অন্যতম। তিনি অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট ও জাস্টিস অব দি পীস ছিলেন। মহা ধুমধামের সঙ্গে তিনি তাঁর জন্মদিন পালন করতেন। গোঁড়া হিন্দু খেলাৎচন্দ্র ছিলেন সনাতন ধর্ম-রক্ষিণী সভার সভ্য। খেলাৎচন্দ্রের দত্তক পুত্রের নামও আনন্দনারায়ণ; ইনিই ধর্মতলা বাজারের মালিক

এবং নিজের নাম অনুসারে বাজারটির নামকরণ করেন 'আনন্দবাজার'। তাঁর তিন পুত্র : গিরীন্দ্রচন্দ্র, নগেন্দ্রচন্দ্র ও মুনীন্দ্রচন্দ্র। এঁদের মধ্যে নগেন্দ্রচন্দ্র এখন পরলোকগত।

রামলোচনের আর এক ভাই রামপ্রসাদের দুই পুত্র : রামনারায়ণ ও জয়নারায়ণ। রামনারায়ণের দুই পুত্র : রাজবল্লভ ও রামচন্দ্র। রামচন্দ্রের দুই পুত্র : কৈলাসচন্দ্র ও হরিমোহন—উভয়েই ছিলেন সঙ্গীতপ্রেমিক। হরিমোহন এখনও জীবিত। কৈলাসচন্দ্রের পুত্র বাবু নবকৃষ্ণ সুশিক্ষিত ভদ্রলোক। জয়নারায়ণের পুত্র বাবু শম্ভুনাথ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর। কথিত আছে, ইনিই বীরভূম জেলায় অ্যারারুট আবিষ্কার করে সেখানে এর চাষ করান। কৃষি-বিজ্ঞানে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। তাঁর পুত্র প্রসন্নকুমার বর্ধমান মহারাজের কাউন্সিলের সভ্য।

সুকিয়াস স্ট্রীটের রাজা রামমোহন রায়ের পরিবারবর্গ

রামকান্ত রায়ের পুত্র রাজা রামমোহন রায় ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে বর্ধমান জেলার রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। স্বগৃহে বাংলা শেখার পর তিনি পাটনা যান—সেখানে তিনি শেখেন ফার্সী, ভূগোল এবং আরবী ভাষায় লিখিত অ্যারিস্টটলের রচনাবলী। তারপর তিনি যান বারাণসী ; সেখানে কয়েক বৎসর থেকে খুব ভালভাবে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে তিনি প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধতা করে (একখানি পুস্তিকা) লেখেন। বারাণসী থেকে তিনি যান তিব্বত ; সেখানে বৌদ্ধ ধর্ম ও এর লামাবাদ সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করেন। দেশে যখন ফিরলেন, তখন তাঁর বয়স মাত্র ২২ বৎসর ; এই সময় ইংরাজী শিখতে আরম্ভ করে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি এই ভাষা অত্যন্ত নির্ভুলভাবে শেখেন ও উন্নতিও করেন খুব কম সময়ের মধ্যে। ১৮০৩-এ তাঁর পিতার মৃত্যু হলে, রংপুরের কালেক্টর মিঃ জন ডিগবির অধীনে তিনি করণিকের চাকরী নিতে বাধ্য হন। তাঁর গুণাবলী উপলব্ধি করতে ডিগবির বিলম্ব হয় না ; অল্পকালের মধ্যেই তিনি রামমোহনকে দেওয়ানের পদে আসীন করেন। এই পদে আসীন থাকাকালে তিনি বেশ কিছু অর্থ উপার্জন ও সঞ্চয় করেন এবং বার্ষিক দশ হাজার টাকা আয়ের একটি ভূসম্পত্তি ক্রয় করেন। এখন তিনি গণিত-শাস্ত্রের উচ্চতর

শাখাসমূহ ও ল্যাটিন ভাষা এবং সাহিত্য শিখতে আরম্ভ করেন। রংপুর থেকে তাঁকে তারপর (বিহারের) রামগড় ও ভাগলপুরে বদলী করা হয়। এই দুইস্থানে তিনি কিছুকাল বাস করেন। শেষ পর্যন্ত ১৮১৪ নাগাদ তিনি কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। সর্বজাতির পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে এই সময় তিনি ফার্সী, আরবী ও বাংলায় গ্রন্থ রচনা করেন; ফলে, তাঁর কয়েকজন ইওরোপীয় বন্ধু ব্যতীত অন্য সকলেরই তিনি বিরাগভাজন হন। মাতার তিরস্কার এবং দেশবাসীর বিরুদ্ধতা তিনি ধীরভাবে গ্রহণ করেন।

খ্রীস্টীয় শাস্ত্র ভালভাবে জানবার জন্য তিনি গ্রীক ও হিব্রু ভাষা শেখেন। (ঐ দুই ভাষা মারফৎ খ্রীস্টীয় ধর্মশাস্ত্র ভালভাবে শিখে) তিনি ইংরাজী, সংস্কৃত ও বাংলায় লেখকের নাম না দিয়ে একখানি বই লেখেন; বইটির নাম : **The Precepts of Jesus, the Guide to Peace and Happiness** (যীশুখ্রীস্টের উপদেশাবলী, শান্তি ও সুখের পথপ্রদর্শক)। **Friend of India** পত্রিকায় ডাঃ মার্শম্যান এর কয়েকটি সমালোচনা প্রকাশ করেন। **A Friend to Truth, Second Appeal** ও **Final Appeal** নামে কয়েকটি যোগ্য উত্তরও রাজা দেন। উত্তর প্রত্যুত্তর যাই হোক, তাঁর সম্পর্কে ইণ্ডিয়ান গেজেট লেখেন, 'স্বজাতীয়দের মধ্যে জাতি, পদমর্যাদা ও সম্ভ্রান্ততায় তিনি বিশিষ্ট; সকল মানুষের মধ্যে তিনি তাঁর মানবপ্রেম, গভীর বিদ্যাবত্তা এবং সাধারণভাবে উচ্চ সংস্কৃতি-মানসের জন্য চিরকাল বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী হয়ে থাকবেন।' তাঁর **Precepts of Jesus** পুস্তকের জন্য যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়, সে সম্পর্কে উক্ত পত্রিকার সম্পাদক মন্তব্য করেন, 'এর দ্বারা আরও ভালভাবে তাঁর (রাজার) সূক্ষ্ম বিচারবোধ, বৌদ্ধিক তর্কশক্তি এবং সর্বোপরি অতুলনীয় শালীনতার সঙ্গে বিতর্ক চালাবার ক্ষমতা' প্রকাশ পাচ্ছে। এর ফলে আজ উপস্থিত হয়েছেন, 'ধর্মীয় বিতর্কের ক্ষেত্রে বিরাট ব্যক্তিত্বময় প্রতিদ্বন্দ্বী, যাঁর সমকক্ষ, দুঃখের সঙ্গে বলছি, এখনও কেউ নেই।'

রাজা রামমোহন রায় স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষ অবলম্বন করেন; বহুবিবাহকে তিনি আইনত দণ্ডার্হ অপরাধ বলে মনে করতেন। তিনি বেদান্ত অনুবাদ করেন হিন্দুস্তানী, বাংলা ও ইংরেজীতে। স্যার এডওয়ার্ড ইস্টের পক্ষ থেকে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব এলে এদেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা জানিয়ে দিলেন, এ বিষয়ে রাজা রামমোহন রায়ের কোন সংস্রব থাকলে, তাঁরা একে সমর্থন করবেন না। তিনি সংস্রব রাখলে তাঁর প্রিয় দেশবাসীর পক্ষে কল্যাণকর এই কাজটি বন্ধ হয়ে যাবে বুঝতে পেরে, তিনি সানন্দে ঐ প্রস্তাবের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করে, নিজে একটি ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। স্বরচিত গ্রন্থগুলি মুদ্রণের উদ্দেশ্যে তিনি দি ইউনিটেরিয়ান প্রেস নামে একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন।

'Conference between an advocate for, and an opponent of, the Practice of Burning Widows alive' (বিধবাদিগকে জীবন্ত দগ্ধ করার পক্ষাবলম্বী ও বিপক্ষাবলম্বীর আলোচনাবৈঠক) বইটি তিনি ইংরাজী ও বাংলায় প্রকাশ করেন ১৮২০তে। এর দু'বৎসর পর ঐ একই বিষয়ে তিনি আর একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন ; এখানি তিনি মার্সিওনেস অব হেস্টিংসকে উৎসর্গ করেন। (তাঁর এই সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কিন্তু) ১৮২৯-এর পূর্বে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ সাধন করেননি। ঐ মহান বড়লাটকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য যে প্রতিনিধি দলটি গঠিত হয়, তাতে যোগ দিলে, জাতিচ্যুত হতে হবে জেনেও, রাজা তাতে যোগদান করেন। ১৮২৮-এ তিনি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন ; ব্রহ্মণ্যবাদের উপর কয়েকটি পুস্তিকা এবং বাংলায় কয়েকটি গান রচনা করেন ; ধর্মীয় সমাবেশে গেয় এই গানগুলি আজও শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়। ডাঃ ডাফের শিক্ষা পরিকল্পনায় তিনি সহায়তা করেন এবং স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি ইউস্ট্যাস কেরিকে জমি দান করেন।

Society Asiatique নামক প্রখ্যাত পণ্ডিতসমাজ কর্তৃক ১৮২৬-২৭ খ্রীস্টাব্দে প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত কর্নেল ল্যানচান রাজাকে উক্ত সমাজের সাম্মানিক সদস্যপদসূচক উপাধিপত্র প্রদান করেন। ব্রিটিশ ও ফরেন ইউনিটেরিয়ান সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশনে, ইতিপূর্বে, সভাপতি কর্তৃক উত্থাপিত একটি প্রস্তাবে রাজার স্বাস্থ্য কামনা করা হয়।

রাজার বহুদিনের বাসনা ছিল ইংল্যাণ্ডে যাবেন। এতদিনে সে বাসনা পূর্ণ হল। দিল্লীর বাদশাহ্ ১৮৩০-এর ১৫ নভেম্বর একটি ফরমান দ্বারা তাঁকে রাজা খেতাব দিয়ে স্বীয় অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে ইংল্যাণ্ডের রাজার নিকট আপীল করবার জন্য তাঁকে ইংল্যাণ্ড প্রেরণ করেন। ১৮৩১-এর ১৮ এপ্রিল তিনি লিভারপুল পৌছলে সেখানে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান মাননীয় উইলিয়ম র‍্যাথবোস, ডাঃ স্পারঝেইম, মিঃ রস্‌কো এবং অন্যান্য বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক। লণ্ডন যাত্রাকালে তিনি মিঃ রস্‌কোর নিকট থেকে লর্ড ব্রাউহামের উদ্দেশে লিখিত একটি পরিচয়পত্র নিয়ে যান। তাঁর ইংল্যাণ্ড গমনের এই সময়টি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৩১-৩২-এ হাউস অব কমন্সের ভারত বিষয় সম্পর্কিত একটি কমিটির অধিবেশন চলছিল। কাজেই ভারত বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের আনুপূর্বিক কার্যপ্রণালী ও আলোচ্য বিষয়াবলী নিয়ে তাঁর সময় ও চিন্তা ব্যয়িত হতে থাকল। কমিটির প্রয়োজন পড়লেই তাঁর ডাক পড়ত ; তিনি প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শ দিতেন। এজন্য রাজাকে প্রায়ই পার্লামেণ্ট ভবনে যাতায়াত করতে দেখা যেত। ভারতের দেশীয় ভাষার সংবাদপত্র সম্পর্কে তিনি প্রিভি কাউন্সিলকে কয়েকটি স্মারকপত্র লেখেন। কলকাতার সুপ্রীম কোর্টের কার্যকলাপ

ও ভারতে লবণ ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকার সম্পর্কেও কয়েকটি (স্মারক) পত্র লেখেন। (ইংল্যাণ্ডের) সপারিষদ রাজার নিকট প্রেরিত ভারতস্থ গোঁড়া হিন্দুদের আর্জি যে, সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক যে আইন বিধিবদ্ধ করেছেন তা রদ্ করা হোক। রাজা রামমোহন এই ঘৃণিত প্রথা রক্ষা করার আর্জির বিরুদ্ধে আপীল করেন; ফলে প্রিভি কাউন্সিলের রায় যায় আর্জির বিরুদ্ধে। কোম্পানির বোর্ড অব ডিরেক্টরস তাঁকে সবিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেন। ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাহিত্যিক বহু প্রতিষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে বিভিন্ন বিষয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য এত সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেন যে সকলেই প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন। লণ্ডন ব্রীজ উদ্বোধন উপলক্ষে প্রদত্ত ভোজসভায় ইংল্যাণ্ডের মহামান্য রাজা তাঁকে একটি ভোজসভায় আপ্যায়িত করেন। অনারেবল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে কোর্ট অফ ডিরেক্টরসও ১৮৩৩-এর ৬ জুলাই একটি ভোজসভায় নিমন্ত্রণ করে সম্মানিত করেন। ব্রিটিশ অ্যাণ্ড ফরেন 'ইউনিটেরিয়াল অ্যাসোসিয়েশন' এক সভায় তাঁকে সাদর সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

রাজা রামমোহন রায় ১৮৩২-এ ফ্রান্সে যান। সেখানে (রাজা) লুই-ফিলিপের কাছে তিনি হৃদ্য আচরণ লাভ করেন। মহামান্য এই রাজা তাঁকে দু'বার ভোজসভায় আপ্যায়িত করেন। এখানে ফরাসী ভাষা শিখে, ১৮৩৩-এ তিনি ইংল্যাণ্ডে ফিরে যান। ব্রিস্টলের নিকট স্টেপলটন গ্রোভে মিস ক্যাসল্ তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। তাঁর বাড়ীটি তিনি রাজার ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দেন। এখানে তাঁর সঙ্গে নিত্য সাক্ষাৎ করতে আসতেন মিঃ জন ফস্টার ও ডঃ কার্পেণ্টার। তিনি আয়ারল্যাণ্ড ও অন্যান্য বহু স্থান থেকে প্রেরিত সংবর্ধনাপত্র পান। দিল্লীর বাদশাহের পক্ষ থেকে তিনি ইংল্যাণ্ডের মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করে সফল মীমাংসায় উপনীত হন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর চিকিৎসা করেন ডাঃ প্রিচার্ড এবং ডাঃ ক্যারিক। কিন্তু চিকিৎসায় কোন ফল হয় না। ১৮৩৩-এর ২৭ সেপ্টেম্বর তিনি ব্রিস্টলে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইতালীয় ভাস্কর পাগের (Pugh) এক সঙ্গী (তিনিও ইতালীয়) রাজার মুখমণ্ডল ও মাথার ছাঁচ তুলে নেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি কুমারী ক্যাসল্‌কে বলে যান, ইংল্যাণ্ডেই যদি তাঁর মৃত্যু হয় তাহলে যেন এক টুকরো সুন্দর নিষ্কর জমি কিনে তাতে তাঁকে সমাহিত করা হয়; সমাধির উপর যেন নির্মিত হয় সুন্দর একটি কুটির এবং সেটি দেখাশোনা করবার জন্য তাতে বাস করবেন কোন পণ্ডিত অথচ দুঃস্থ ব্যক্তি। ১৮৩৩-এর ১৮ অক্টোবর সুন্দর একখণ্ড জমিতে তাঁকে সমাহিত করা হয়। এই জমি দান করেন কুমারী ক্যাস্‌ল্। ১৮৪৩-এর ২৯ মে তাঁর অকৃত্রিম বন্ধু প্রখ্যাত দ্বারকানাথ ঠাকুর ঐ স্থান থেকে ব্রিস্টলের নিকটবর্তী আর্নস্ ভেল নামক স্থানে নির্মিত সুদৃশ্য একটি

সমাধিতে তাঁর শবাধারটি স্থানান্তরিত করে পরের বছর তার ওপর চমৎকার একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করেন।

রাজার মৃত্যুকালে বর্তমান ছিলেন তাঁর একমাত্র পুত্র রমাপ্রসাদ রায় (সাধারণ্যে রাজা রমাপ্রসাদ নামে পরিচিত)। তিনি পুরাতন হিন্দু স্কুলে শিক্ষা লাভ করেন, বাংলা, সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষা বেশ ভালই শিখেছিলেন। পিতার মতো তিনি বহু সদ্‌গুণের অধিকারী ছিলেন। স্বীয় অধ্যবসায় ও পরিশ্রমে তিনি তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি বাড়িয়ে তোলেন। হাইকোর্টের সরকারী উকিল হিসাবে তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধা অর্জন করেন এবং তাঁকে ঐ আদালতেরই প্রথম দেশীয় জজরূপে মনোনীত করা হয়। তাঁর দুই পুত্র হরিমোহন ও পিয়ারীমোহন। এঁরা কলকাতার সুকিয়াস স্ট্রীটের পৈতৃকভবনে বাস করেন। তাঁদের জমিদারী আছে ২৪ পরগণা এবং অন্যান্য কয়েকটি জেলায়।

রামবাগানের রসময় দত্তের পরিবারবর্গ

উচ্চ শিক্ষা ও সম্মানজনক সরকারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকার জন্য এই বংশের ব্যক্তিগণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রসময়ের পিতামহ নীলমণি তাঁদের হুগলী জেলার স্বগ্রাম ছেড়ে কলকাতা চলে আসেন। এঁরা জাতিতে কায়স্থ। নীলমণির তিন পুত্র রসময়, শ্রীরাম ও পীতাম্বর।

১. রসময় সে-সময়ে অত্যন্ত প্রতিপত্তিসম্পন্ন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় মেসার্স ডেভিডসন অ্যাণ্ড কোম্পানির হিসাবরক্ষক হিসাবে। পরে তিনি কোর্ট অব রিকোয়েস্টস্ (পরিবর্তিত নাম, স্মল্ কজেজ কোর্ট)-এর কমিশনার (জজ) নিযুক্ত হন। তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি বিচার বিভাগীয় এত উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ছিলেন হিন্দু কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, কাউন্সিল অব এডুকেশন (শিক্ষা সংসদ) ও সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক এবং জেলা দাতব্য সমিতির অপরিহার্য সভ্য। তাঁর পাঁচ পুত্র: কৃষ্টচন্দ্র, কৈলাসচন্দ্র, গোবিন্দচন্দ্র, হরচন্দ্র এবং গিরীশচন্দ্র; এঁদের মধ্যে শেষোক্ত তিনজন 'এখনও' জীবিত আছেন; এঁরা খ্রীস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছেন।

কৃষ্টচন্দ্র কিছুকাল বোর্ড অব রেভেন্যুজ (রাজস্ব পর্ষদ)-এর সহকারী ছিলেন, পরে, দীর্ঘকাল যাবৎ ট্রেজারীর খাজাঞ্চি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর দুই পুত্র:

হেমচন্দ্র ও চারুচন্দ্র; হেমচন্দ্র খাজাঞ্চি পদে পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। ঐ বিভাগটির বিলোপের পর, তাঁকে করা হয় টাকশালের সোনারুপার বাঁট রক্ষক (বুলিয়ন কীপার) এবং পদাধিকারবলে পেপার কারেন্সি ডিপার্টমেন্টের ও পরবর্তী-কালে, রিজার্ভ ট্রেজারীরও ট্রেজারার। এই সকল পদে তিনি এখনও সগৌরবে অধিষ্ঠিত আছেন। চারুচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি এ ও বি এল পাস করেন। কিছুকাল তিনি টাকশালের ডেপুটি বুলিয়ন কীপার ছিলেন। তারপর ইংল্যাণ্ড থেকে ব্যারিস্টারি পাস করে এসে 'এখন' কলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি করছেন। তিনি খ্রীস্টধর্মে গ্রহণ করেছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালেই কৈলাসচন্দ্র হিন্দু পায়োনিয়ার নামক একটি সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন আবগারি বিভাগের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট, কলকাতার ডেপুটি কালেক্টর, এবং কিছুকালের জন্য পদাধিকারী কালেক্টর। তাঁর একমাত্র পুত্র উমেশচন্দ্র (Omesh Chandra) ছিলেন সরকারী সেভিংস ব্যাঙ্কের অ্যাকচুয়ারী; কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান। বর্তমানে তিনি কলকাতার পুরসভার কালেক্টর পদে অধিষ্ঠিত আছেন। তাছাড়া তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট এবং জাস্টিস অব দি পীস। ফরাসী ও জার্মান ভাষায় তাঁর বিশেষ দখল আছে। তিনি খ্রীস্টান।

গোবিন্দচন্দ্র ছিলেন যথাক্রমে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, ট্রেজারির ডেপুটি খাজাঞ্চি, (কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পর) কিছুদিনের জন্য খাজাঞ্চি, সরকারী সেভিংস ব্যাঙ্কের অ্যাকচুয়ারী গভর্নমেণ্ট এজেন্সির হেড অ্যাসিস্ট্যাণ্ট এবং প্রথমে কলকাতা ও পরে বোম্বাইয়ের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল। তাঁর দুই সন্তান অরু দত্ত ও তরু দত্ত; স্ত্রী ও কন্যাদ্বয়কে নিয়ে গোবিন্দচন্দ্র ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স ভ্রমণে যান। অরু ও তরু ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে শিক্ষা লাভ করেন। দুই বোনই খুব ভালভাবে ইংরাজী ও ফরাসী ভাষা শিখেছিলেন। এঁরা চমৎকার কবিতা রচনা ও অনুবাদ করেছেন। জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার জন্য এঁরা সকলেরই প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। একই অসুখে (যক্ষ্মায়) দুজনের মৃত্যু হয়। গোবিন্দচন্দ্র ইংরাজী, ফরাসী ও জার্মান ভাষায় সুপণ্ডিত; প্রাচীন কয়েকটি ভাষাও তিনি জানেন। (কার্যে) তাঁর দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তা বিস্ময়কর। নিঃসন্তান এই ভদ্রলোক বর্তমানে সকলের সঙ্গে সব সংস্রব ত্যাগ করে সম্পূর্ণ একা থাকেন।

হরচন্দ্র ছিলেন ট্রেজারীর খাজাঞ্চি ও সরকারী সেভিংস ব্যাঙ্কের অ্যাকচুয়ারী। লেখার অভ্যাস তিনি বজায় রেখেছেন। এখন মাঝে মাঝে ধর্ম সম্বন্ধীয় পুস্তিকা লেখেন।

গিরীশচন্দ্র ছিলেন সরকারী এজেন্সীর সহকারী এবং স্মল কজেজ কোর্টে জজের করণিক। কিছুদিন পূর্বে তিনি সস্ত্রীক ইংল্যাণ্ড ভ্রমণে গিয়েছিলেন।

তিনি কবি। তাঁর কবিতা কোমলতা ও সৌন্দর্যের জন্য সবিশেষ প্রশংসিত। তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত ভাষার বিশুদ্ধতাও উচ্চ প্রশংসিত।

২. নীলমণির মধ্যম পুত্র শ্রীরামের চার পুত্রের মধ্যে দুজন শ্রীকৃষ্ণ ও রাজকৃষ্ণ জীবিত আছেন। শ্রীকৃষ্ণ টাকশালের বুলিয়ন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আর রাজকৃষ্ণ পুরসভার সহকারী।

৩. নীলমণির তৃতীয় পুত্র পীতাম্বর ছিলেন ট্রেজারীর ডেপুটি খাজাঞ্চি। তাঁর দুই পুত্র ঈশানচন্দ্র ও শশীচন্দ্র।

ঈশানচন্দ্র দীর্ঘকাল রেভেন্যু সার্ভে বিভাগের ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন। তাঁর তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ যোগেশচন্দ্র বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটে একজন সহকারী; মধ্যম রমেশচন্দ্র সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। কনিষ্ঠ অবিনাশচন্দ্র ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরে এসে বর্তমানে হুগলী কলেজের অধ্যাপক।

পীতাম্বরের দ্বিতীয় পুত্র শশীভূষণ ছিলেন বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটের অতি প্রয়োজনীয় একজন সহকারী। তিনি এখন অবসরপ্রাপ্ত ও পেনসন ভোগী। তাঁর সুযোগ্য সেবার স্বীকৃতিতে সরকার তাঁকে 'রায় বাহাদুর' খেতাবে ভূষিত করেছেন (২৫ এপ্রিল, ১৮৭৩)। তিনি জাস্টিস অব দি পীস এবং কয়েকখানি ইংরাজী পুস্তকের লেখক। স্বগুণেই পুস্তকগুলি উচ্চ প্রশংসিত।

উল্লেখযোগ্য যে, সরকার এই পরিবারটিকে সর্বদাই শ্রদ্ধা করতেন এবং তাঁদের কয়েকজনকে সম্মান ও বিশ্বাসের পদে নিযুক্ত করেছিলেন। এই পরিবারের বৈশিষ্ট্য হল অধ্যয়নস্পৃহা এবং সমাজে মেলামেশা করার অনিচ্ছা। এই পরিবারে এমন ব্যক্তি কমই ছিলেন বা আছেন, যিনি সমসাময়িক পত্র পত্রিকায় না লিখেছেন। বিভিন্ন সময়ে এই পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণ যে সকল কবিতা রচনা করেছেন সেগুলির সংকলন হল 'দত্ত ফ্যামিলি অ্যালবাম।' তাঁদের কবিতা-প্রিয়তার জন্য ক্যাপটেন রিচার্ডসন এই পরিবারটিকে বলতেন 'গায়ক পক্ষীদের কুলায়।'

জোড়াসাঁকোর দেওয়ান শান্তিরাম সিংহীর পরিবারবর্গ

মিঃ মিডলটন ও স্যার টমাস র্যামবোল্ডের অধীনে প্রথমে পাটনা ও পরে মুর্শিদাবাদ জেলায় দেওয়ানী করেন শান্তিরাম সিংহী। শান্তিরামই পরিবারটিকে সমৃদ্ধ করে তোলেন।

শান্তিরাম জাতিতে ছিলেন কায়স্থ; ধর্মপরায়ণ শান্তিরামের অধিকাংশ সময় ধর্মকর্মেই ব্যয়িত হত। বারাণসীতে বড় একটি মন্দির তিনি শিবের নামে উৎসর্গ করেন। তিনি দুই পুত্র: প্রাণকৃষ্ণ ও জয়কৃষ্ণকে রেখে মারা যান।

প্রাণকৃষ্ণ ছিলেন জেনারেল ট্রেজারীর দেওয়ান; তাঁর তিন পুত্র: রাজকৃষ্ণ, নবকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ। জয়কৃষ্ণের একমাত্র পুত্রের নাম নন্দলাল।

প্রাণকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজকৃষ্ণের পুত্রের নাম মহেশচন্দ্র; মহেশচন্দ্র মারা যান তাঁর একমাত্র পুত্র হরিশ্চন্দ্রকে রেখে। এবং হরিশ্চন্দ্রের একমাত্র পুত্রের নাম বলাইচাঁদ সিংহী। এই বলাইচাঁদই বর্তমানে বিরাট ও সম্রান্ত এই পরিবারের কর্তা।

প্রাণকৃষ্ণের মধ্যম পুত্র নবকৃষ্ণ ছিলেন নিঃসন্তান। প্রাণকৃষ্ণের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীকৃষ্ণের পুত্রের নাম যাদবকৃষ্ণ। যাদবকৃষ্ণ মারা যান একটি মাত্র কন্যা রেখে—এই কন্যা এখন দেওয়ান শান্তিরাম সিংহীর বিপুল বিষয়সম্পত্তির এক অংশের মালিক।

জয়কৃষ্ণের পুত্র নন্দলাল মারা যান তাঁর এক পুত্র প্রখ্যাত কালীপ্রসন্ন সিংহীকে রেখে। কালীপ্রসন্ন সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এদেশীয় সাহিত্যের প্রতিও তাঁর অশেষ প্রীতি ছিল। সর্বোত্তম বাংলা উপন্যাস (?) 'হুতোম প্যাঁচা' (র-নক্সা) তাঁরই লেখা। তাঁর রচিত (অনূদিত) 'মহাভারত' একখানি অমূল্য গ্রন্থ। শেষোক্ত গ্রন্থখানি প্রকাশের ব্যয় নির্বাহ করতে গিয়ে তিনি ঋণজালে জড়িয়ে পড়েন; ফলে, তাঁর ওড়িশার জমিদারী, কলকাতার অনেক ভূ-সম্পত্তি ও বেঙ্গল ক্লাব বাড়ীটি বিক্রী করে দিতে তিনি বাধ্য হন।

অনেকে অবশ্য বলেন যে তাঁর এই বিপুল ঋণের অন্যতম কারণ ছিল তাঁর উচ্ছৃঙ্খল ও অনিয়মিত জীবনযাপন; কিন্তু সে যাই হোক, বহু প্রথিতযশা মানুষ ও তাঁর অন্তরঙ্গদের মতে, তিনি বহু দুর্লভ গুণের অধিকারী ছিলেন।

শোভাবাজারের রাজ পরিবারবর্গ

অতি সম্মানিত এই পরিবারটির ইতিহাস বেশ প্রাচীন। এঁরা 'চিত্রপুরের মৌলিক কায়স্থ দেব বংশ'। এই বংশের প্রথম পুরুষ শ্রীহরিদেব মুর্শিদাবাদের

কর্ণসুবর্ণ বা কানসোনার অধিবাসী ছিলেন। তাঁরই এক বংশধর, পীতাম্বর দেব, মোগল সরকারে চাকরী করে 'খান বাহাদুর' খেতাবে ভূষিত হন। পীতাম্বরের এক বংশধর রুক্মিণীকান্ত দেব ছিলেন ঐ সরকারের 'ব্যবহর্তা' (সরকারী কার্যপরিচালক)। রুক্মিণীকান্তের অন্যতম পৌত্র রামচরণ ছিলেন নবাব মহবৎ জঙ্গের অধীনে মুড়াগাছা পরগণার রাজস্ব আধিকারিক (কমিশনার), লবণ আধিকারিক, পরে সমাহর্তা এবং সর্বশেষে হন কটকের দেওয়ান। স্থানীয় সুবাদার মনিরুদ্দীন একদিন কিছু সৈন্য পরিচালনা করছিলেন; তাঁর সঙ্গে ছিলেন দেওয়ান রামচন্দ্র। হঠাৎ একদল পিণ্ডারী গোপন স্থান থেকে তাঁদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে; অতর্কিত আক্রমণে সুবাদার প্রথমেই নিহত হন; লড়াই করে নিজ হাতে কয়েকজনকে নিপাত করেও পিণ্ডারীদের সংখ্যাধিক্যের জন্য রামচন্দ্র পরাজিত ও নিহত হন।

দেওয়ান রামচরণের তিন পুত্রের জ্যেষ্ঠ ছিলেন রামসুন্দর আর কনিষ্ঠ নবকৃষ্ণ। পিতা রামচরণ মুড়াগাছা ছেড়ে পরিবারবর্গ নিয়ে গোবিন্দপুরে বাস করতে চলে আসেন। পরে এই গোবিন্দপুরে ফোর্ট উইলিয়াম নির্মিত হয়।

রামসুন্দর ছিলেন পঞ্চকোট বা পাঞ্চেতের, পরে অন্যান্য স্থানের অবেক্ষক (সুপারভাইজার)। এইভাবে তিনি কয়েক বৎসর সংসার প্রতিপালন করেন। ১৭৭৬-এ দিল্লীর বাদশাহ তাঁকে 'রায়' উপাধিতে ভূষিত করেন এবং 'মনসব' (এক হাজার সেনা পরিচালক) মর্যাদা দান করেন; পাঁচশত সওয়ার (অশ্বারোহী সৈন্য) রাখবার অধিকার তাঁকে দেওয়া হয়।

কোম্পানি সরকার ফোর্ট উইলিয়াম নির্মাণের জন্য গোবিন্দপুরের জমি অধিগ্রহণ করলে, দেব পরিবার সুতানুটিতে বাড়ি কিনে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। এই বসত বাটী থেকে সেখানে পরে গড়ে ওঠে শোভাবাজার রাজবাটীর অট্টালিকাসমূহ।

মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর

শোভাবাজার রাজপরিবারের প্রবর্তনকারী মহারাজা নবকৃষ্ণ প্রথমাবধি উচ্চমনের পরিচয় দিয়েছিলেন। অল্প বয়সেই তিনি ফার্সী ভাষায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন; কিছু ইংরাজীও শিখেছিলেন। মুর্শিদাবাদে তিনি তাঁর শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ওয়ারেন হেস্টিংসের বিচারের সময়, নবকৃষ্ণ সম্পর্কে লর্ড থারলো বলেন, 'সেই ১৭৫০-এ তিনি ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংসের ফার্সী ভাষার গুরু—তখন তাঁরা দুজনেই ছিলেন যুবাবয়সী।

এর ছ'বছর পরের কথা। মুর্শিদাবাদের কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মিঃ ড্রেকের কাছে ফার্সী ভাষায় একখানি পত্র লেখেন। নবকৃষ্ণ বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে ইংরাজীতে এই পত্রের অর্থও ব্যাখ্যা করে দেন; তার উত্তরও তিনি ফার্সীতে লিখে দেন সমান দক্ষতার সঙ্গে। তাঁর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে অনারেবল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাঁকে মুন্সি পদে নিয়োগ করেন।

এইভাবে শুরু হয় নবকৃষ্ণের মুন্সিগিরি। এই কাজে তিনি এমন দক্ষতার পরিচয় দেন, যে কর্নেল ক্লাইভ তাঁকে বহু গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক কাজ দিতে থাকলেন; কাজটা দাঁড়াল (স্বাধীন সরকারের) বিদেশ সচিবের সমতুল। কলকাতার ওপর দ্বিতীয় আক্রমণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে সিরাজ-উদ্-দৌলা তখন হালসি বাগে ছাউনি ফেলেছেন; বহু উপঢৌকন দিয়ে তাঁর কাছে নবকৃষ্ণকে পাঠান হল। নবাবের ছাউনির সব খবর নিয়ে নবকৃষ্ণ ফিরে এলেন; মীর জাফর ও কর্নেল ক্লাইভের মধ্যে সম্পাদিত ষড়যন্ত্রের, যার ফলে সিরাজ-উদ্-দৌলা ধ্বংস হয়ে যান, মাধ্যম ছিলেন নবকৃষ্ণ; তাঁদের (মীর জাফর ও কর্নেল ক্লাইভের) মধ্যে সুবেদারীর শর্তসমূহ নবকৃষ্ণের মাধ্যমেই স্থিরীকৃত হয়। মীর কাশিমের সঙ্গে কোম্পানির যুদ্ধ বাধলে নবকৃষ্ণ মেজর অ্যাডামসের সহকারী হন; এবং অ্যাডামসের প্রয়োজনীয় বহু কাজ করে দেন; কিন্তু লুঠেরা নবাবী ফৌজের হাত থেকে কোন প্রকারে রক্ষা পেয়ে যান; তখন মেজরকে নিরাপদে কলকাতা আনবার দায়িত্ব পড়ে তাঁর ওপর; কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রেই তিনি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। বাদশাহ শাহ আলম ও অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্-দৌলার সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারেও তাঁকে নিয়োগ করা হয়েছিল। বারাণসীর মহারাজা বলবন্ত সিংহ এবং বিহারের সিতাব রায়ের সঙ্গে বন্দোবস্তের ব্যাপারেও তাঁর হাত ছিল। এর পর তাঁকে নাবালক বর্ধমানের রাজ তেজচন্দ্র বাহাদুরের অভিভাবক এবং তাঁর বিস্তৃত জমিদারীর কমিশনার নিয়োগ করা হয়। তাঁর সুপরিচালনায় ঐ জমিদারী বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। ১৭৭৫-এ লর্ড ক্লাইভের সঙ্গে নবকৃষ্ণ এলাহাবাদ গেলে বাদশাহ্ শাহ আলম তাঁকে তিন হাজার সওয়ার 'পঞ্চহাজারী মনসব' (দারের) মর্যাদা এবং তার সঙ্গে 'পাল্কী ঝালরদার, টোগ, নখারা' প্রভৃতি ব্যবহারের অনুমতি দান করেন।

তাঁর কাছে কোম্পানি যে মূল্যবান সেবা ও উপকার পেয়েছিলেন তার জন্য এবং আর্কটের নবাবের কাছে তাঁর উচ্চ বংশের পরিচয় পেয়ে মহামান্য বাদশাহ্ আলমের কাছ থেকে তাঁর জন্য চার হাজার সওয়ারীর অধিকারী, 'মনসব

ষষহাজারী' ও মহারাজা বাহাদুর খেতাব পাইয়ে দেন। এছাড়া তাঁর মহামূল্যবান সেবার কথা ফার্সীতে খোদাই করে তাঁকে একটি সোনার পদক উপহার দেন; এছাড়াও লর্ড ক্লাইভ তাঁকে সাম্মানিক পোশাক, হীরে, জহরৎ, তরবারী, ঘোড়া, হাতী প্রভৃতি উপহার দেন; আর তাঁর তোরণদ্বার পাহারা দেবার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক সিপাহীর বন্দোবস্ত করে দেন। তাঁকে খেলাৎ দান অনুষ্ঠানের শেষে লর্ড ক্লাইভ তাঁকে স্বয়ং হাতীর হাওদা পর্যন্ত নিয়ে যান; অনুষ্ঠানটির পর মহা আড়ম্বরপূর্ণ এক শোভাযাত্রা করে তাঁকে বাড়ী পৌঁছে দেওয়া হয়।

তাঁর মূল্যবান সেবার পুরস্কার স্বরূপ ১৭৭৮-এ ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁকে সুতানুটির চিরস্থায়ী তালুকদারী অর্পণ করেন; (বর্তমানকালে তার সীমানা: উত্তরে মারাঠা খাল, দক্ষিণে টাকশাল, পশ্চিমে হুগলী নদী ও পূর্বে সার্কুলার রোড); ফলে কলকাতা প্রশাসনের মধ্যে তিনি অনারেবল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একমাত্র পার্শ্ববর্তী তালুকদার হলেন। সুতানুটির তালুকদারী এইভাবে হস্তান্তর করার বিরুদ্ধে শহরের সকল ধনী ও বিশিষ্ট অধিবাসী প্রতিবাদ করলে তাঁদের নির্দেশ দেওয়া হয় যে, কোম্পানি যে-সকল সুযোগ সুবিধা ও অধিকার ভোগ করতেন, মহারাজকে এখন সেই সকল সুযোগ সুবিধা ও অধিকার ভোগের ক্ষমতা কোম্পানি তাঁকে দান করছেন; কাজেই সকলে যেন তাঁকে কোম্পানির স্থানাপন্ন প্রকৃত তালুকদার রূপে মান্য করেন।

মহারাজা কোম্পানি সরকারে যে সকল আধিকারিক পদ অলঙ্কৃত করেন সেগুলি হল: মুন্সী দফ্‌তর (ফার্সী সচিবের অফিস), আর্জবেগী দফতর (আবেদনপত্র গ্রহণের অফিস), জাতিমালা কাছারী (জাতপাঁত সম্পর্কিত মামলার শুনানী ও নিষ্পত্তি করবার আদালত); 'বিত্তশালা' কোম্পানীর তোষাখানা; সে যুগে নাম ছিল 'দি মণি গোদাম', 'মাল আদালত' (২৪ পরগণার দেওয়ানী বা অর্থসংক্রান্ত আদালত) ও তহ্‌শিল দফতর (২৪ পরগণার কলেক্টরি)। এই সকল দফ্‌তর পরিচালিত হত শোভাবাজার রাজবাড়ীর বিভিন্ন অট্টালিকায় (এই এলাকার পূর্ববর্তী নাম ছিল 'পাবনার বাগান')। এই সকল অট্টালিকার মধ্যে রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীটের উত্তর দিকে অবস্থিত পুরাতন রাজবাটী নামে পরিচিত হর্ম্যটি রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের অন্যান্য বংশধরসহ রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের অধিকারে আছে; আর উক্ত পথের দক্ষিণের হর্ম্যগুলি আছে রাজা রাজকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের বংশধরগণের অধিকারে। পুরাতন রাজবাটীর দেওয়ানখানাটি মহারাজা নির্মাণ করেছিলেন পলাশী যুদ্ধে বিজয়ের স্মারকরূপে; এই অট্টালিকার উদ্বোধন উৎসবে স্বয়ং লর্ড ক্লাইভ উপস্থিত ছিলেন।

রাজা নবকৃষ্ণ ছিলেন বিদ্যোৎসাহী। তাঁর ভবনে বঙ্গদেশ ও পশ্চিমী প্রদেশ-

সমূহের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের প্রায়ই আগমন ঘটত। তাঁর সভার অলঙ্কার ছিলেন সে যুগের প্রখ্যাত পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ও বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার। দুর্লভ সংস্কৃত ও ফার্সী পুঁথি সংগ্রহে উদারহস্তে তিনি অর্থব্যয় করতেন। সুন্দর হস্তাক্ষর বিশিষ্ট পণ্ডিতদের দিয়ে সংগৃহীত পুঁথিগুলি নকল করিয়ে রাখতেন। তাঁর উত্তরাধিকারিগণ উত্তরাধিকার সূত্রে যে সব সম্পদ লাভ করেছিলেন, তার মধ্যে তাঁর এই গ্রন্থাগারটিই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা মূল্যবান।

পুরাতন সমাধিস্থলের ও সেণ্ট জন গীর্জার জমি তাঁরই দান, বেহালা থেকে কুলপি পর্যন্ত তিনি একটি রাস্তা নির্মাণ করিয়েছিলেন—এটি 'রাজার জাঙ্গাল' নামে পরিচিত। পুরাতন ও নূতন রাজবাড়ীর মধ্যে তিনি আর একটা রাস্তা নির্মাণ করিয়েছিলেন—তাঁরই নামানুসারে এর নামকরণ হয়েছে রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট।

গভর্নর ভেরেলেস্ট তাঁর 'ভিউ অব বেঙ্গল' গ্রন্থে সরকারী আধিকারিকরূপে রাজার দক্ষতার উচ্চ প্রশংসা করে লিখেছেন, 'নবকৃষ্ণ ভারতীয় হিন্দু; মীরজাফরকে সুবাদার পদে উন্নীত করবার পূর্ববর্তী অশান্তিময় সময়ে তিনি ইংরাজদের স্বার্থ রক্ষার বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন'। মীর 'কসিম'-এর সঙ্গে যুদ্ধ বাধলে নবকৃষ্ণ মেজর অ্যাডামসের সঙ্গে থাকেন, প্রদেশসমূহ থেকে মীর 'কসিম' বিতাড়িত না হওয়া পর্যন্ত তিনি (নবকৃষ্ণ) মেজরের সহচর হয়ে থাকেন। ইংরাজদের প্রতি তাঁর সেবা ও শ্রদ্ধার জন্য তিনি লর্ড ক্লাইভের মনোযোগ আকৃষ্ট করায় তিনি নবকৃষ্ণকে ‑কমিটির 'বেনিয়ান' করেন (অর্থাৎ, দেশীয় রাজন্যবর্গের সঙ্গে কোম্পানির রাজনৈতিক আলাপ আলোচনার জন্য তাঁকে কোম্পানির এজেন্ট বা প্রতিনিধি করা হয়)। ভেরেলেস্টের কার্যকালে, অর্থাৎ তিন বৎসর, তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

লর্ড মার্লোর বর্ণনানুযায়ী, 'ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনকালে বেতন ও রাজনৈতিক প্রভাবের দিক থেকে তাঁর (নবকৃষ্ণের) স্থান ছিল মহম্মদ রেজা খাঁর পরেই'।

১৭৭৪ থেকে ১৭৯৩ পর্যন্ত সময়কালে ইংল্যাণ্ড থেকে লেডি ক্লাইভ, জন নট এবং স্ট্র্যাচি পরিবার মহারাজাকে যে সকল চিঠি লেখেন, সেগুলি থেকে ইংরাজ স্বার্থ রক্ষায় তাঁর দক্ষ সেবা, তাঁর প্রভাব এবং নিঃস্বার্থ শ্রদ্ধা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পুত্রসন্তান না থাকায়, মহারাজা তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 'রায়' রামসুন্দর দেবের পুত্র গোপীমোহনকে দত্তকরূপে গ্রহণ করেন; পরবর্তীকালে তাঁর একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। ইনিই রাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুর নামে পরিচিত। শোভাবাজার রাজ পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ নবকৃষ্ণ ১৭৯৭-এর ২২ নভেম্বর পরলোক

গমন করেন। সুপ্রীম কোর্টে পর্যন্ত দীর্ঘ শরিকানা মামলা লড়ে তাঁর দুই পুত্র গোপীমোহন ও রাজকৃষ্ণ ঐ রাজকীয় সম্পত্তির সমান সমান অংশ লাভ করেন। পুরাতন রাজবাড়ী পেলেন গোপীমোহন এবং নূতন রাজবাড়ী পেলেন রাজকৃষ্ণ। এইভাবে, গোপীমোহনের বংশধরগণ হলেন বড় তরফ, আর রাজকৃষ্ণের বংশধরগণ হলেন ছোট তরফ। রাজা রাজকৃষ্ণের পুত্রদের মধ্যে এখন জীবিত আছেন মহারাজা কমলকৃষ্ণ ও মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ।

বড় তরফ : রাজা গোপীমোহন দেব বাহাদুর

সুপ্রীম কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য মিঃ জন স্টেব্‌লসের, প্রথম কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল স্যার জেমস রিভেট কারন্যাক, বার্ট, এবং গভর্নর জেনারেল স্যার জে মাক্‌ফার্সন-এর দেওয়ান ছিলেন রাজা গোপীমোহন দেব বাহাদুর। তাঁর দক্ষতা ও সেবায় এঁরা সকলেই সন্তুষ্ট ছিলেন।

লর্ড বেন্‌টিঙ্কের শাসনকালে তাঁকে রাজা বাহাদুর পদবীতে ভূষিত করা হয়; তাঁর সঙ্গে সশস্ত্র রক্ষীবাহিনী রাখার অধিকারও দেওয়া হয়; লর্ড বেন্‌টিঙ্ক তাঁকে যেমন ভালবাসতেন, শ্রদ্ধাও করতেন তেমনি, বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁর পরামর্শও নিতেন। রাজা বাহাদুর অসাধারণ দক্ষতার অধিকারী ছিলেন; দেশের ও দশের মঙ্গলচিন্তাও তিনি করতেন। ফার্সী ভাষায় তাঁর বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল; ন্যায় ও দর্শনশাস্ত্রের আলোচনায় তাঁর গভীরতা লক্ষ্য করে পণ্ডিতগণ অত্যন্ত বিস্মিত হতেন। তিনি ভূগোল ও জ্যোতির্বিদ্যা অধ্যয়ন ও আলোচনায় বিশেষ আনন্দবোধ করতেন; তাঁরই নির্দেশে ও পরিচালনায় হিন্দু পদ্ধতিতে পৃথিবীর একটি মানচিত্র অঙ্কিত হয়েছিল; বৎসর, সপ্তাহের •মাস, দিন, তিথি ও নক্ষত্র জানা যেতে পারে এমন একটি অদ্ভুত যন্ত্র নির্মাণে তিনি হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু শেষ করে যেতে পারেননি। তিনি বিখ্যাত ধর্মসভার প্রতিষ্ঠাতা; তিনি বিদ্যোৎসাহীও ছিলেন। অনাথ, আতুর, অসহায় সব সময়ই তাঁর অকৃপণ সাহায্য পেয়েছে। আবার সর্বশ্রেণীর মানুষই তাঁর পরামর্শ 'চাইতেন; হিন্দুসমাজের মঙ্গলজনক সকল বিষয়েরই নির্দেশদাতা ছিলেন তিনি এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারসমূহের বিবাদ-বিসম্বাদে তিনিই মধ্যস্থতা করতেন। একমাত্র পুত্র রাধাকান্ত দেবকে রেখে ১৮৩৭-এর ১৭ মার্চ তিনি পরলোক গমন করে। শোকবার্তায় লর্ড অকল্যাণ্ড বলেন, 'এই চমৎকার মানুষটির মৃত্যুতে সমাজ ও জনগণের যে ক্ষতি হল, তার জন্য আমি আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করছি'—ইত্যাদি ইত্যাদি।

রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, কে সি এস আই

রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, কে সি এস আই ১৭০৫ শকাব্দে ১ চৈত্র (১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দের ১১ মার্চ) কলকাতার সিমলায় তাঁর মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। জ্ঞানার্জনের প্রবল ইচ্ছা তাঁর বাল্যকাল থেকেই প্রকাশ পেতে থাকে; তার জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে অল্পকালের মধ্যেই তিনি সংস্কৃত, আরবী ও ফার্সী ভাষায় পণ্ডিত হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন; সে যুগে হিন্দুদের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন বিশেষ না থাকলেও তিনি ইংরাজী ভাষাও ভালভাবে আয়ত্ত করেন। বিশপ হেবার তাঁর জার্নালে লিখেছেন, 'তিনি রাধাকান্ত দেব, চেহারায় সুদর্শন, ইংরাজী বলেন চমৎকার, আর বহু ইংরাজ গ্রন্থকারের পুস্তক, বিশেষ করে ইতিহাস ও ভূগোল তিনি অধ্যয়ন করেছেন।' রিকার্ডস্ ভারত সম্পর্কিত তাঁর পুস্তকে, এদেশবাসীদের উন্নত মানসিক গুণের কথা বলতে গিয়ে রাধাকান্তের উচ্চগুণাবলীর উল্লেখ করেছেন।

রাজা রাধাকান্ত দেবের বিবাহ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি সামাজিক ঘটনা। পিতামহ মহারাজা নবকৃষ্ণ অনেক চেষ্টা করে সেযুগের প্রখ্যাত গোষ্ঠীপতি গোপী-নগরের গোপীকান্ত সিংহ চতুর্ধুরীণ মহাশয়ের কন্যার সহিত রাধাকান্তের বিবাহ দেন; ফলে, ঘটকদের কঠোর কারিকা অনুযায়ী, প্রথম গোষ্ঠীপতি শ্রীমন্ত রায়ের পর পর্যায়ক্রমে রাধাকান্ত হলেন ত্রয়োদশ গোষ্ঠীপতি অর্থাৎ হিন্দু সমাজের সকল সামাজিক সমাবেশে তিনি শ্রেষ্ঠের সম্মানস্বরূপ সর্বপ্রথম পুষ্পচন্দনে ভূষিত হতেন।

ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আন্তরিক ভক্তি রাধাকান্ত লাভ করেছিলেন উত্তরাধি-কার সূত্রে, কাজেই স্বীয় ক্ষেত্রে তিনি ইংরাজের মত ও উদ্দেশ্য (স্বার্থ) সিদ্ধির জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছিলেন; তার সঙ্গে তিনি তাঁর যথাসাধ্য করেছিলেন এদেশীয়দের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারের জন্য। তাঁর অদম্য চেষ্টা ও শ্রমের ফলেই কলকাতার কয়েকটি প্রধান গুরুত্বপূর্ণ (শিক্ষা) প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত ও প্রথম অবস্থায় উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পেরেছিল। স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইস্ট, বার্ট-এর সহযোগিতায় তিনি হিন্দু কলেজ (বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত) প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তিকে কাজে লাগিয়েছিলেন,

পরিশ্রমেরও অন্ত ছিল না। উদার ইংরাজী শিক্ষা নেবার জন্য যেমন তিনি একদিকে দেশবাসীকে উৎসাহিত করবার চেষ্টা করেছেন, অপর দিকে তেমনি পরিচালক সমিতির সদস্যরূপে তিনি এইচ এইচ উইলসনকে সাহায্য করেন যাতে প্রতিষ্ঠানটি সবিশেষ উন্নতি করতে পারে। জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশের চৌত্রিশটি বৎসর তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন কলকাতা গভর্নমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের অবৈতনিক সম্পাদক ও পরীক্ষক ; প্রায়ই তিনি এই প্রতিষ্ঠানে যেতেন ; এর শিক্ষার উচ্চমান আরও উন্নত করবার দিকে তাঁর যত্নের অবধি ছিল না।

স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হবার পর, তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হতে থাকল, তাদের মধ্যে এদেশীয় ধর্ম বিরোধী কিছু থাকে এই আশঙ্কায় এদেশীয় (হিন্দু)-গণ ঐ সকল পুস্তক কিনতে ভয় পেতেন ; রাধাকান্ত এই সমিতির পরমোৎসাহী সভ্য হয়ে ঘোষণা করলেন যে, তাঁদের আশঙ্কার কোন কারণ নাই এবং এইভাবে তিনি বিদ্যালয়সমূহে ও সমাজে ঐ সকল পুস্তক প্রচারের পথ প্রশস্ত করলেন। স্কুল সোসাইটির অবৈতনিক সম্পাদকরূপে তিনি মহান মানবপ্রেমিক ডেভিড হেয়ারের সহযোগিতায় এদেশে দেশীয় ভাষা শিক্ষার পথ প্রশস্ত করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন ; এদেশীয় পাঠশালাগুলিতে নিয়ম শৃঙ্খলা প্রবর্তনের জন্য নিয়মিত ও প্রকৃত তত্ত্বাবধান, পরিদর্শন এবং পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করলেন। স্কুল সোসাইটির হেডপণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারকে তিনি 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়িকা' নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশে সাহায্য করলেন ; এতে স্ত্রীশিক্ষার গুরুত্ব ও স্ত্রীশিক্ষা যে হিন্দুশাস্ত্রসম্মত তা ব্যাখ্যা করা হল। ১৮২০তে তিনি ইংরাজী রীতি অনুযায়ী প্রথম বাংলা নীতিকথা ও বাংলা বানান বহি বা পাঠ্য পুস্তক প্রকাশ করেন ; পুস্তক দুখানি ইংল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডের রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির উচ্চ প্রশংসা লাভ করে এবং বর্তমানে ভারতীয় ছাপাখানাগুলি থেকে যে বহু পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হয়ে চলেছে তাদের আদর্শ ঐ পুস্তক দুখানি। সাধারণ বিদ্যালয়ে না হলেও, স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে তিনি এতই সচেষ্ট হয়েছিলেন যে, ড্রিংকওয়াটার বীটন একবার তাঁকে লেখেন, 'এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগকে নিরক্ষর অজ্ঞতার অন্ধকারে রেখে দেওয়ার মধ্যে যে নির্বুদ্ধিতা ও নিষ্ঠুরতা বিদ্যমান, সে বিষয়ে জনগণের দৃষ্টি ভারতীয়গণের মধ্যে আপনিই সর্বপ্রথম আকৃষ্ট করার জন্য আমি আপনাকে আপনার প্রাপ্য প্রশংসা জ্ঞাপন করছি।'

এগ্রিকালচারাল অ্যাণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি (কৃষি ও উদ্যান বিষয়ক সমিতি)-র উপসভাপতিরূপে তিনি সমিতির উদ্দেশ্য প্রসারিত করার জন্য বহু প্রকারে চেষ্টা করেন এবং বাংলার কৃষির উপর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন,

সেগুলি উক্ত সমিতির ট্র্যানজ্যাকশন্‌স্ (কার্য বিবরণীসমূহের) প্রথম দিকের সংখ্যা-গুলিতে প্রকাশিত হয়।

তিনি রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটি অব গ্রেট ব্রিটেন অ্যাণ্ড আয়ারল্যাণ্ডের পত্র আদান-প্রদানকারী সভ্য ছিলেন ; তাছাড়া সাম্মানিক সভ্য ছিলেন বার্লিনের রয়্যাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস, কোপেনহেগেনের রয়্যাল সোসাইটি অব সায়েন্সেস, বোস্টনের আমেরিকান ওরিয়েণ্টাল সোসাইটি এবং ভিয়েনার কাইজার-লিশেন অ্যাকাডেমির। এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলেরও তিনি সভ্য ছিলেন। প্রাচ্য বিদ্যাবিষয়ে তিনি কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন ; সেগুলি ঐ সকল সমিতির কোন না কোনটির পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থকার হিসাবে রাজা রাধাকান্ত দেবের খ্যাতি প্রধানত তাঁর সুবৃহৎ চারখণ্ডে প্রকাশিত সংস্কৃত শব্দকোষ 'শব্দকল্পদ্রুম'-এর জন্য। এই গ্রন্থটিতে তিনি তাঁর জীবনের চল্লিশটি বৎসর ব্যয় করেন এবং সম্পদেরও একটি বৃহৎ অংশ এর প্রকাশে ব্যয়িত হয়। এতে একই সঙ্গে আছে সংস্কৃত শব্দার্থ, বিশ্বকোষের মতো বিশদ ব্যাখ্যা এবং সংস্কৃত সাহিত্য বিজ্ঞানের সকল বিভাগের নির্ঘণ্ট। এই শ্রেণীর একখানি গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশে যে সীমাহীন শ্রম, পাণ্ডিত্য, ব্যাপক ও বিস্তৃত গবেষণা করতে হয়েছিল তার তুলনা নাই, বিশেষ করে ভারতে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার সেই প্রথম যুগে ; প্রভূত ব্যয়ও অনুমেয়। তিনি নিজস্ব ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন ; নিজস্ব প্রয়োজনের টাইপ নির্মাণ ও ঢালাই করান ; ঐ শ্রেণীর অক্ষরকে এখনও রাজা টাইপ নামে অভিহিত করা হয়। প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয় ১৮২২তে এবং শেষটি ১৮৫৮এ। প্রকৃত ব্যবহারকারীকে এবং পৃথিবীর যে সকল দেশে সংস্কৃতের পঠনপাঠন বা সংস্কৃতের গুরুত্ব উপলব্ধ হয় সে সকল দেশের প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠানসমূহকে পুস্তকখানি বিনামূল্যে বিতরণ করে তিনি সবিশেষ আনন্দ পেতেন। পাণ্ডিত্য, শ্রম ও ব্যয়ের জন্য প্রাপ্য প্রশংসা তিনি তাঁর দীর্ঘ জীবনে প্রচুর পেয়েছেন। ভাষাতত্ত্বের পত্রপত্রিকা ও পুস্তকসমূহে গ্রন্থখানির উচ্চ প্রশংসা প্রকাশিত হতে থাকে এবং ভারতবর্ষ, ইওরোপ ও আমেরিকার পণ্ডিতগণ পুস্তকখানি পাবার জন্য উৎসুক হয়ে ওঠেন। ইওরোপ ও আমেরিকার বিদ্বৎসমাজ স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে তাঁকে সাম্মানিক বা পত্রব্যবহারকারী সভ্য করে নেন। রাশিয়ার জার, ডেনমার্কের রাজা সপ্তম ফ্রেডারিক প্রভৃতি ইওরোপীয় রাজন্যবর্গ তাঁকে রাজকীয় সম্মান ও অনুগ্রহ জ্ঞাপন করে আনন্দ লাভ করেন। সপ্তম ফ্রেডারিক তাঁর জ্ঞানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে পদক দ্বারা সম্মানিত করেন ; সুবৃহৎ চেন সমন্বিত এই পদকটির এক পিঠে ছিল উক্ত রাজন্যের প্রতিকৃতি এবং অপর পিঠে মাল্যধারী বিজ্ঞান দেবতার প্রতিকৃতির উপরিভাগে লিখিত ছিল 'প্রো মেরিটিস্' ; পর্যায়ক্রমে একটি করে "FVII" এবং একটি মুকুট দ্বারা চেনটি নির্মিত হয়েছিল। পদকটি

প্রাপকের নিকট প্রেরিত হয় কোর্ট অব ডিরেক্টরস মারফৎ।

তিনি সাহিত্য আলোচনা ও রচনায় প্রচুর পরিশ্রম করতেন ও সময় দিতেন। এতেই তাঁর সমস্ত সময় ও মনোযোগ সীমাবদ্ধ ছিল না। সে যুগের রাজনীতিতে তিনি সক্রিয় অংশ নিতেন; দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক বা সরকারকে সমর্থন করে এমন সকল আন্দোলনে তিনি ছিলেন অগ্রণী। এদেশীয় বা ইওরোপের যে স্থানেরই হোক যোগ্য প্রার্থী হলেই তাঁর দান অকৃপণভাবে প্রসারিত হত।

১৮৫৫তে সরকার যে দু'জন ভারতীয়কে জাস্টিস অব দি পীস্ এবং মেট্রোপলিস-এর অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করেন, তিনি তাঁদের অন্যতম ছিলেন। বহু বৎসর যাবৎ তিনি ঐ পদদুটির কর্তব্য বিশ্বস্ততার সঙ্গে সম্পাদন করেন।

১৮৫১তে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হবার সময় সর্বসম্মতিক্রমে তিনি এর সভাপতি নির্বাচিত হন; আমৃত্যু তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। প্রয়োজনীয় এই প্রতিষ্ঠানটি যে সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা নিতেন সে সকলের নেতৃত্বে থাকতেন রাধাকান্ত। ১৮৩৭এ তাঁর পিতা রাজা গোপীমোহন দেব বাহাদুরের মৃত্যু হলে অল্প দিনের মধ্যেই সরকার রাধাকান্তকে রাজা বাহাদুর পদবী, খেলাৎ (অর্থাৎ সাম্মানিক সজ্জা, মণিরত্ন, তরবারী ও ঢাল) উপহার দিলেন। এই উপলক্ষে সরকার ১৮৩৭-এর ১০ জুলাই লেখেন, 'আপনার পূর্বপুরুষদিগের উচ্চ মর্যাদা, আপনার স্বদেশবাসীগণের মধ্যে আপনার উল্লেখযোগ্য অনুসন্ধিৎসা ও জ্ঞানের গভীরতা এবং জনগণের মঙ্গল হইতে পারে, এমন সকল কার্যে আপনার অশেষ আগ্রহ বিবেচনা করিয়া সপারিষদ-গভর্নর-জেনারেল সানন্দে আপনাকে এই মর্যাদা দান করিতেছেন।'

১৮৫৯-এ মহামান্যা মহারাণী ভিক্টোরিয়া চমৎকার একটি পদক উপহার দিয়ে বিশেষ রাজকীয় অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন; পদকটির এক পিঠে অঙ্কিত মহারাণীর মুখ এবং অপর পিঠে লেখা ছিল 'মহামান্যা রাণী ভিক্টোরিয়ার নিকট থেকে রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরকে।' এই উপলক্ষে সেক্রেটারী অব স্টেট (মন্ত্রী) স্যার চার্লস উড্ রাজাকে লেখেন, 'মহারাণীকে উপহার স্বরূপ আপনার প্রেরিত শব্দকল্পদ্রুম মহারাণীর নিকট উপস্থাপিত করা হইয়াছে এবং যে রাজভক্তি সহকারে আপনি এই উপহার প্রেরণ করিয়াছেন, মহামান্যা অনুগ্রহপূর্বক এবং সম্পূর্ণতঃ তাহা উপলব্ধি করিয়া উপহারস্বরূপ এই পদকটি আপনাকে প্রেরণ করিবার জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন।'

১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দ। রাজার বয়স তখন ৮৪ বৎসরের বেশি। কর্মবহুল জীবন থেকে বিদায় নিয়ে ঐ বৎসর তিনি নির্জনে ভগবদ্ চিন্তা করবার উদ্দেশ্যে পবিত্র বৃন্দাবনধামে চলে যান; কিন্তু ১৮৬৬তে নতুন স্টার অব ইণ্ডিয়া খেতাব দান উপলক্ষে আগ্রায় ভাইসরয় যে মহাদরবারের অনুষ্ঠান করেন, সেখানে 'নাইট কমাণ্ডার অব দি মোস্ট এগ্‌জলটেড অর্ডার অব দি স্টার অব ইণ্ডিয়া' খেতাব

গ্রহণের জন্য রাজাদেশ অনুযায়ী রাজা রাধাকান্ত দেবকে উপস্থিত হতে হয়; তাঁকে নাইটের প্রতীক চিহ্ন, ২১টি পর্চার খেলাৎ, একটি হাতী ও একটি ঘোড়া উপহার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। জনশ্রুতি যে, রাজা রাধাকান্ত দরবার কক্ষে প্রবেশ করলে স্বয়ং ভাইসরয় স্যার জন লরেন্স দাঁড়িয়ে উঠে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান এবং মহারাণী ও ডেনমার্কের রাজা কর্তৃক উপহৃত পদক দুটি সাগ্রহে দেখতে থাকেন— পদক দুটি রাজা ঐ সময় ধারণ করে গিয়েছিলেন। ভাইসরয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমবেত সকল করদ নৃপতি, সম্ভ্রান্ত ও শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ দাঁড়িয়ে উঠে রাজা রাধাকান্তকে দরবার কক্ষে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন; এরূপ সম্মাননার দৃষ্টান্ত দুর্লভ।

সকলেরই পরিজ্ঞাত যে, রাজা রাধাকান্ত দেব কখনও সম্মান পাবার চেষ্টা করেননি; সম্মান এসেছে আপনা থেকেই। মহারাণীর নির্দেশে তাঁকে নাইট কমাণ্ডার অব দি মোস্ট এগজলটেড অর্ডার অব দি স্টার অব ইণ্ডিয়া পদবীতে ভূষিত করা হবে জেনে তিনি কলকাতায় আত্মীয়স্বজনকে লেখেন যে, এতে তিনি খুব সম্মানিত বোধ করছেন, কিন্তু ঐ সম্মান গ্রহণ করবার জন্য তিনি বৃন্দাবন ছেড়ে কলকাতা যেতে পারবেন না বলে দুঃখও বোধ করছেন। তাঁর এই চিঠির কথা জানতে পেরে স্যার সেসিল বিডন তাঁকে দার্জিলিং থেকে নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি লেখেন:

প্রিয় রাজা,

গভর্নর -জেনারেল বাহাদুর চান যে, আগামী নভেম্বরে আগ্রায় অনুষ্ঠিতব্য দরবারে সকল নব সৃষ্ট 'নাইটস্ অব দি স্টার' যেন উপস্থিত থাকেন।

আপনি ঐ দরবারে উপস্থিত থাকলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হব; মথুরা থেকে (আগ্রার) দূরত্ব বেশি নয়, তাই আশা করব আপনার স্বাস্থ্য বা অন্য কোন কারণে আপনার যাওয়া বন্ধ হবে না।

আশা করছি, ১০ নভেম্বর নাগাদ আমি আগ্রা যেতে পারব; দরবার শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখানে থাকবার ইচ্ছা আছে।

ইতি ভবদীয়
(স্বা) সেসিল বিডন

এই পত্র পাবার পর রাজা পণ্ডিতবর্গের পরামর্শ চান; তাঁদের মতে, আগ্রা বৃন্দাবন ক্ষেত্রের মধ্যেই পড়ে, কাজেই ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী আগ্রার দরবার অনুষ্ঠানে রাজার যোগদান প্রশস্ত। পণ্ডিতবর্গের অনুমতি পেয়ে রাজা উক্ত দরবারে উপস্থিত হন।

আমাদের বিশ্বাস, দরবার কলকাতায় অনুষ্ঠিত হলে, রাজা সে দরবারে নিশ্চয়ই আসতেন না; তাই বাংলার এই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে সম্মান জানাবার জন্যই মহামান্য ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেল দরবারের স্থান পরিবর্তন করেন।

রাজার উচ্চ শিক্ষা, জনহিতৈষী জীবন, আদর্শস্থানীয় পদমর্যাদা এবং সম্ভ্রান্ত

বংশ, আর তার সঙ্গে হিন্দু ধর্মের প্রতিটি নির্দেশের প্রতি তাঁর দ্বিধাহীন আনুগত্য, ব্যক্তিগত চারিত্র্য গুণ, প্রবীণ বয়স, সংস্কৃতিবান কিন্তু সারল্যপূর্ণ প্রকৃতির জন্য তিনি সর্ব সম্প্রদায়ের কাছে জনপ্রিয়তা, মর্যাদা ও সম্মান পেয়েছেন। এরূপ সম্মানীয় জীবন বিরল।

স্বাভাবিকভাবে এবং যুক্তিযুক্ত কারণেই রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরকে কলকাতার হিন্দু সমাজের নেতারূপে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল; তাঁকে শ্রেষ্ঠ হিন্দুর মর্যাদা দেওয়া হত। তাঁর জীবনের আদর্শ ছিল 'ঈশ্বর, রাজা ও মাতৃভূমি'। কায়স্থ সমাজের গোষ্ঠীপতির কর্তব্যেও তিনি কখনও অবহেলা করেন নি। এই সব কারণে তিনি কলকাতার মিশ্র সমাজের সর্বজনগ্রাহ্য নেতার স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। তিনি তাঁর পৌত্রের বিবাহে এবং অন্যান্য উপযুক্ত অবকাশে 'একজাই' অনুষ্ঠানটি মহা সমারোহে সম্পন্ন করেন। ঐসব উৎসব-অনুষ্ঠানে একদিকে যেমন গভর্নর জেনারেলসহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ অফিসার উপস্থিত থাকতেন, তেমনি অতি সাধারণ জনের জন্যও সে সময় তাঁর প্রাসাদের দ্বার অবারিত থাকত। 'দিল্লী পুনরুদ্ধার, লখ্‌নৌয়ের ত্রাণ এবং ভারতের শাসনব্যবস্থা ইংল্যাণ্ডেশ্বরী র হস্তে স্থানান্তর' উপলক্ষে রাজা যে বল্ নাচ ও ভোজের আয়োজন করেছিলেন, সে উৎসব তাঁর পূর্ববর্তী সকল উৎসবকে ম্লান করে দিয়েছিল। এই উপলক্ষে ইওরোপীয়দিগের পরিচালনায় রাজবাড়ীটিকে আলোক ও অন্যান্য সজ্জায় যে মহাসমারোহের সঙ্গে সজ্জিত করা হয়েছিল, যে শ্রেণীর অতিথিবর্গ উপস্থিত হয়েছিলেন, বল্ নাচের চমৎকারিত্ব, ভোজ্যের তালিকা ও উপাদেয়তা সমসাময়িক সংবাদপত্রে উচ্চ প্রশংসিত হয়। নীচে ওভারল্যাণ্ড ইংলিশম্যান থেকে একটি উদ্ধৃতি দেওয়া হচ্ছে—

'ব্রিটিশ রাজের অধীনস্থ এতদূরবর্তী একটি দেশে একজন সেদেশবাসীর পক্ষ থেকে ব্রিটিশ শক্তির প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার প্রকাশ এই প্রথম; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, রাজার প্রাসাদটি এই প্রথম (ইংরাজের জয়ে) জয়ধ্বনি ও আনন্দ কলরবে মুখর হয়ে উঠল না। (ইতিহাসের) এ এক দুর্লভ সংঘটন যে, (পুরা এক শতাব্দী পূর্বে) এই শোভাবাজার রাজবাড়ীতেই পলাশী যুদ্ধের বিজয়ী বীর ক্লাইভ ও অন্যান্য বীরের জয়ধ্বনি ও আনন্দ কোলাহলের প্রতিধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত হয়ে উঠেছিল: ব্রিটিশ স্বার্থরক্ষার এমনি আগ্রহ ও ব্রিটিশ শক্তির প্রতি ভক্তির প্রকাশ সেদিনও এইভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই, একই পল্লীতে একই প্রাসাদে শতবর্ষ পূর্বে তাঁর পূর্বপুরুষ (ইংরাজ) বীরদের সম্মান জানিয়ে যে আনন্দ লাভ করেছিলেন, আজ বংশগত রাজভক্তিতে এই সৎ শ্রদ্ধেয় প্রবীণ রাজা সেই (ইংরাজ) বীরগণের বংশধরগণকে সম্মান জানাতে পেরে গর্ব বোধ করেছেন। সে সময় থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর বংশে বহু প্রকারের পরিবর্তন ও

সুযোগ এসেছে, কিন্তু পুরাতন ইংল্যাণ্ডের প্রতি তাঁর বংশের যে অবিচল রাজভক্তি প্রকাশ পেয়ে চলেছে, তাঁর মধ্যে দিয়ে সেই রাজভক্তি আজ প্রকাশ হতে পারায় তিনি গর্ব বোধ করছেন। মহার্মহিমান্বিতা, মঙ্গলময়ী মাধুর্যময়ী মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে (এদেশের) শাসনভার নেওয়ার মুহূর্তে জনগণের রাজভক্তি ও অনুরাগ তাঁর মাধ্যমে সর্বপ্রথম প্রকাশ করতে পারার সৌভাগ্যলাভের জন্য তিনি দীর্ঘায়ু হউন এবং এই সৌভাগ্যের জন্য তিনি অধিকতর গর্ব বোধ করেছেন'।

১৮৬০-এ রাজা ঐরূপ একটি উৎসবের আয়োজন করেন; উপলক্ষ ছিল দেশে শান্তি স্থাপন। এই উপলক্ষে অধিকতর জৌলুসের জন্য ক্রোমোর্নে নিযুক্ত প্রফেসরদের নিয়োগ করা হয় বাজী পোড়ানো প্রদর্শন করবার জন্য। বল্ নাচের আয়োজন তো ছিলই। এই নাচ ও অতিথি আপ্যায়নের বর্ণনায় ইংলিশম্যান পত্রিকা লেখেন, 'কি ব্যাণ্ডের বাদ্যে, কি আতশবাজি, কি সুরুচিপূর্ণ উদ্যানের আলোক সজ্জায়—সামগ্রিকভাবেই রাজার উদ্যানটি যেন আরব্য রজনীর এক স্বপ্নলোকে পরিণত হইয়াছিল আর প্রস্তর চত্বরসমন্বিত আলোকোদ্ভাসিত বিস্তৃত জলরাশি দেখিয়া মার্টিন অঙ্কিত বেলৎশ্যাজারের ভোজসভার চিত্র বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল।'

এদেশীয় শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজ এবং রাজার গুণমুগ্ধ ব্যক্তিগণ তাঁর বিদ্যাবত্তা ও গুণাবলীর স্বীকৃতিতে ১৮৬০এ তাঁকে একখানি মানপত্র দেন। তাছাড়া, মানপত্র দানকারীদের প্রদত্ত চাঁদায় শিল্পী হাডসনকে দিয়ে তাঁর একটি পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি আঁকান হয়; প্রতিকৃতিখানি এখন এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের হলঘরে টাঙান আছে। মানপত্রে স্বাক্ষরদানকারী এবং চাঁদাদাতাদের মধ্যে অনারেবল অ্যাশলি ইডেন (বর্তমানে বাংলার ছোটলাট) ও রাজার অন্যান্য ইওরোপীয় বন্ধুগণও ছিলেন।

সকলকে শোকাচ্ছন্ন করে শ্রদ্ধেয় রাজা ১৮৬৭-র ১৯ এপ্রিল তাঁর বৃন্দাবনের আশ্রমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর কে সি এস আই-র শেষ সময়ের একটি প্রতিবেদন 'দি ফ্রাইডে রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এটি ছিল আদর্শ মৃত্যু, আদর্শ সৎকার। পত্রিকাটি লিখেছেন—'সকলেই জানেন যে, মৃত্যুর তিন দিন আগে থেকে রাজা ভয়াবহ সর্দিতে ভুগছিলেন। মৃত্যুর পূর্বরাত্রে শরীর ভারী বোধ হওয়ায় তিনি কোন আহার্য গ্রহণ করেন নি, সকালে উঠে প্রাতঃকৃত্যাদি সম্পন্ন করে তিনি তাঁর উপাসনা-গৃহে প্রবেশ করেন। এই সময় তাঁর বৈবাহিক তাঁকে ঔষধ খাবার পরামর্শ দিলে তিনি বলেন, ঔষধ রোগ নিরাময় করে, মৃত্যুর পথ রোধ করতে পারে না। যে ঔষধ সেবনে শাশ্বত জীবন লাভ করা যায়, তেমন কোন ঔষধ আপনার জানা থাকলে দিন।' এই প্রকারের আর দু-চারটি কথা বলার পর, তিনি জপে

মনোনিবেশ করেন, মালা জপ করা শেষ হলে, তিনি তাঁর প্রিয় ভৃত্যকে বলেন, 'নবীন, দুর্বল বোধ করছি, আমাকে দুধ খেতে দে'। দুধ খেয়ে তিনি জপমালা হাতে বসবার ঘরে যান। কিছুক্ষণ পরে আবার দুধ আনতে বলেন; এবার কিন্তু কোন কিছু গিলতে কষ্ট হওয়ায় তিনি আর বেশি দুধ খেতে পারলেন না। তারপর নবীনকে বললেন, 'আজ আমি দেহত্যাগ করব; এজন্য দো-তলায় আর আমার থাকা উচিত নয়। পুরোহিতকে ডেকে পাঠা। (প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যায়, বৃন্দাবনে পৌছে একজন স্থানীয় পণ্ডিতকে তিনি পুরোহিত নিযুক্ত করেছিলেন. বহু পরিশ্রম করে বহুশাস্ত্র থেকে শেষকৃত্যের তিনি যে গুহ্যতত্ত্ব সংগ্রহ করেছিলেন, সে সবই তিনি পুরোহিতকে শিখিয়েছিলেন।) পুরোহিত এলে, শেষকৃত্য সম্পর্কে আরও শিক্ষা দিলেন। ঐ আসনে উপবিষ্ট থেকেই তিনি নবীনকে বললেন, 'আমার মৃত্যুর পর, দেহের সৎকার কিভাবে করতে হবে তোকে আগেই বলেছি। আবার তোকে বলছি, ভালভাবে শুনে নে। মৃত্যুর পর দেহটিকে ভালভাবে স্নান করাবি তারপর সেটিকে নতুন ধুতি পরাবার পর, তাতে গন্ধমাল্য ও বিভিন্ন প্রকারের ফুল সাজিয়ে দিবি। তারপর দেহ নিয়ে যমুনা তীর পর্যন্ত শোকযাত্রা হবে, সঙ্গে হরিনাম সংকীর্তন করতে করতে যাবেন বৈষ্ণব সমাজ। ঘাটে দেহটিকে আবার স্নান করাবি, আর পুরোহিতকে শেষকৃত্য সম্পর্কে যে উপদেশ দিয়েছি, এখনও বললাম, সেইমত প্রাতিটি অনুষ্ঠান যেন সুচারুরূপে করা হয়। চিতা সাজাবি কেবলমাত্র তুলসী ও চন্দন কাঠ দিয়ে, অন্য কোন রকম কাঠ যেন দেওয়া না হয়, দেখবি (উল্লেখ করা যায় যে, তিনি নিজেই এই উদ্দেশ্যে প্রচুর শুষ্ক তুলসী সংগ্রহ করে রেখেছিলেন)। জীবিত অবস্থায় আমি যে-ভাবে শুই, ঠিক সেই ভাবে চিতায় আমার দেহ শোয়াবি, চিতার চার কোনে চারটে বেশ উঁচু বাঁশ পুঁতে তাতে আমার মশারী টাঙিয়ে দিবি; কিন্তু তাতে চিতার আগুন যাতে ধরে যেতে না পারে সেই রকম উঁচুতে মশারিটা খাটাবি। তারপর আমার দেওয়া উপদেশ অনুযায়ী দাহকার্য হবে। দেহের এক সের মাত্র যখন অবশিষ্ট থাকবে, সেই সময় চিতা নিবিয়ে ফেলবি। না-পোড়া এই দেহাবশেষটিকে তিন ভাগে ভাগ করে, একভাগ কচ্ছপদের খাওয়াবি, এক অংশ যমুনার গভীর জলে বিসর্জন দিবি আর শেষ অংশটি বৃন্দাবনের মাটিতে সমাধি দিবি; কিন্তু সাবধান, সমাধির গর্ত যেন বেশ গভীর হয়, যাতে কোন জন্তু জানোয়ার সেটা মাটি খুঁড়ে তুলতে না পারে। দাহকার্য শেষ হবার পর নিঃশব্দে বাসায় ফিরে আসবি; বাসায় যেন সেদিন কোন রান্না না হয়; খুব খিদে পেলে অন্য কোথাও গিয়ে কিছু খেয়ে নিবি। আমার মৃত্যুর দশদিন পর যমুনায় দশটি পিণ্ড দিয়ে বৃন্দাবনের ব্রাহ্মণদের ভালভাবে ভোজন করাবি; এই সব শেষ হলে তোরা দেশে ফিরতে পারিস।'

এই সব কথা বলে রাজা নীচে নামবার উদ্যোগ করছেন, সেই সময় তাঁর বৈবাহিক এবং বৃন্দাবনের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। তাঁর স্বাভাবিক শিষ্টাচার সহকারে তাঁদের অভ্যর্থনা জানিয়ে তিনি তাঁদের সঙ্গে নিয়ে নীচে নেমে এলেন। আঙিনায় তৈরী তুলসী বাগানে একটি তুলসী গাছের পাশে বৃন্দাবনের রজঃ দিয়ে একটি শয্যা প্রস্তুত করতে বলেন। এরপর জীবন্মুক্ত রাজা শিরোদেশে শালগ্রাম শিলা রেখে সে শয্যায় শুয়ে মালাজপ করতে থাকেন। এরপর আর কোন মানুষের সঙ্গে তিনি কোন বাক্যালাপ করেননি। এই ভাবে, দুই ঘণ্টা যাবৎ ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকার পর তিনি দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর সমগ্র মুখমণ্ডল যেন হাস্যোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাঁর মৃত্যুতে বৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে হরিধ্বনি ওঠে। তার মারফৎ তাঁর মৃত্যু সংবাদ কলকাতা পৌঁছে যায়। পল মল গেজেট যাঁকে 'হিন্দু রোমান ক্যাথলিক' নামে অভিহিত করে, এই ভাবেই তিনি পরলোক গমন করেন।

তাঁর মৃত্যুর পর ১৮৬৭র ১৪ মে বেলা পাঁচটায় কলকাতার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে একটি শোক-সভা অনুষ্ঠিত হয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, তাঁর একটি প্রতিকৃতি, (কটিদেশ পর্যন্ত) একটি প্রস্তর-মূর্তি এবং শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত ভাষার ছাত্রকে বাৎসরিক একটি স্বর্ণপদক দেবার জন্য একটি নিধি স্থাপিত হবে। এই উদ্দেশ্যে বড়লাট বাহাদুর থেকে শুরু করে বিদ্যালয়ের ছাত্র পর্যন্ত সকল শ্রেণীর জনগণ চাঁদা দেন। মূর্তিটি এখন টাউন হলের একটি কুলুঙ্গিতে রক্ষিত আছে, পদকটি দেওয়া হয় সরকারী সংস্কৃত কলেজের শ্রেষ্ঠ স্নাতক ছাত্রকে, আর তাঁর প্রতিকৃতিটি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলের শোভা বর্ধন করছে।

পরলোকগত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর কে সি এস আই-র স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বহু সম্ভ্রান্ত ইওরোপীয় ও ভারতীয় ভদ্রলোক বক্তৃতা করেন; আমরা এখানে এরূপ কয়েকটি বক্তৃতা সংক্ষেপে উদ্ধৃত করছি।

সভাপতি বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, সি এস আই, যে শোকাবহ ঘটনার জন্য এই সভা আহুত তাতে তিনি দুঃখ প্রকাশ না করে পারেন না। কিন্তু একটা সান্ত্বনা এই যে, যাঁকে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন, তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে পারছেন। সংস্কৃত কলেজে তাঁর ছাত্রাবস্থায় রাজা রাধাকান্ত ছিলেন ঐ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম পরিচালক; বক্তার মনে পড়ছে, প্রতিষ্ঠানটির মঙ্গলের দিকে রাজার কি গভীর আগ্রহ ছিল। পরবর্তীকালে তিনিও সংস্কৃত কলেজের অন্যতম পরিচালক হন; তখন এবং জনহিতকর অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে একসঙ্গে কাজ করবার সময় তিনি দেখেছেন ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের উন্নতি বিধানে রাজার কি পরিমাণ আগ্রহ ছিল। আজ দেশে সংস্কৃত শিক্ষার তেমন মর্যাদা নেই,

কিন্তু রাজার যৌবনকালে সংস্কৃত শিক্ষাকে সম্মান দেওয়া হত। অল্প বয়সেই তিনি সংস্কৃত পণ্ডিত হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর শব্দ-কল্পদ্রুম এক বিরাট কীর্তি। গ্রন্থটি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যিক বিশ্বকোষ; এতে নিহিত আছে অশেষ পাণ্ডিত্য ও পরিশ্রম। ইওরোপে এইরূপ একটি গ্রন্থ সংকলন করতে বহু পণ্ডিতের প্রায় শতাব্দীকালের পরিশ্রম প্রয়োজন হয়। প্রাথমিক পুস্তকসহ অন্যান্য পুস্তক রচনা করে মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রসারেও তিনি বিশেষ সহায়তা করেন। এদেশীয়দের রাজনৈতিক উন্নতি বিধানের জন্য যত আন্দোলন হয়েছে তিনি সব সময় সে-সবের নেতৃত্ব দিয়ে এসেছেন। লাখেরাজ পুনঃগ্রহণের বিরুদ্ধে এদেশে এক বিরাট আন্দোলন হয়েছিল; (সরকারের) এই চেষ্টার প্রতিবাদে টাউন হল-এ মহতী এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সে সভায় কমপক্ষে আট হাজার মানুষ সমবেত হয়েছিলেন; রাজা সে আন্দোলনেও সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। জমিদার সভার তিনি অন্যতম প্রধান সভ্য এবং প্রারম্ভ হতেই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সম্মানিত সভাপতি ছিলেন। তিনি স্ত্রীশিক্ষা প্রসারেও উৎসাহী ছিলেন। সেই যুগেও তিনি তাঁর গৃহ স্ত্রীশিক্ষার জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। 'আজ আপনারা সেই মাননীয় মানুষটিকে সম্মান জানাতে সমবেত হয়ে নিজেদেরও সম্মানিত করেছেন।'

বাবু (পরে, মহারাজা এবং সি এস আই) রমানাথ ঠাকুর বলেন:

'আমার মনে হয়, রাজা রাধাকান্তর মৃত্যু জাতির পক্ষে এক বিরাট ক্ষতি। কি প্রবীণ কি নবীন, কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত সকলেই তাঁর মৃত্যুতে সমভাবে অশ্রুপাত করছেন; যে-কোন দিকে ফিরলেই শুনতে পাই সকল স্তরের মানুষের বিলাপ ধ্বনি। সত্যসত্যই তাঁর মৃত্যু আমাদের কাছে বিরাট এক দুঃখবহ ঘটনা।

'রাজা রাধাকান্ত ১৭০৫ শকাব্দের ১ চৈত্র তাঁর মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করে-ছিলেন। সেখানেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। ধনী অভিজাত পরিবারে তাঁর জন্ম; কিন্তু ধনী পরিবারের সন্তানদের যে-সকল আচার আচরণের ফলে আমাদের বহু পরিবার ধ্বংস হয়ে গেল, তিনি সে-সব দিকে যান নি, এটা বিস্ময়কর। তরুণ বয়সে তিনি ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষায় আত্ম-নিয়োগ করেন এবং অল্পকালের মধ্যে সংস্কৃত ভাষার বিশিষ্ট পণ্ডিতরূপে পরিচিত হন। সে-যুগের বিবেচনায় তাঁর ইংরাজী শিক্ষাও যথেষ্ট প্রশংসার যোগ্য। বেশ কয়েকখানি বাংলা পুস্তক, অধিকাংশই প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক, তিনি রচনা ও প্রকাশ করেন, তার ফলে এদেশে শিক্ষা বিস্তারে অনেক সুবিধা হয়। তাঁর শেষ ও মহৎ রচনা, যে রচনার জন্য তাঁর নাম সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে চিরকাল যুক্ত থাকবে, সে হল 'শব্দকল্পদ্রুম।' সংস্কৃতে আমার কোন

পাণ্ডিত্য না থাকায়, এই পুস্তকটির গুণাগুণ সম্বন্ধে কিছু বলার অধিকার আমার নেই; তবে, এরূপ একখানি পুস্তক বিচার বিবেচনা করবার যোগ্যতা যাঁদের আছে, সে-সব পণ্ডিত একবাক্যে স্বীকার করেন যে, পুস্তকখানি হিন্দু সাহিত্যের স্তম্ভস্বরূপ। এই পুস্তকখানির রচনায় তিনি জীবনের প্রায় পঞ্চাশটি বৎসর অতিবাহিত করেন, তাঁর এই আয়াস ও শ্রমের জন্য তিনি, আমাদের প্রিয় মহারাণী সহ ইওরোপের বহু রাজন্যের ও পণ্ডিতমণ্ডলীর মুগ্ধ প্রশংসা অর্জন করেছেন।

'রাজা রাধাকান্ত নিষ্ঠাবান হিন্দু হলেও, সংকীর্ণমনা ছিলেন না। মতবাদে ও চিন্তায় তিনি ছিলেন উদার। উদাহরণস্বরূপ আমি একটি দৃষ্টান্ত দিতে চাই; এদেশীয় কোন এক ভদ্রলোক বর্তমান সর্বোৎকৃষ্ট সভ্যতার মহান দিকগুলি স্বচক্ষে দেখবার ও স্বদেশবাসীর সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপনের উদ্দেশ্যে ইংল্যাণ্ড গিয়েছিলেন। তাঁর প্রত্যাবর্তনে একদল গোঁড়া লোক তাঁর সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করবার অনুরোধ জানাতে রাজার নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন; রাজা তাঁদের কথা শোনার পর, পরের দিন আসতে বলেন। পরের দিন তাদের তিনি বলেন, ভদ্রলোককে অসম্মান তো দূরের কথা, সম্মান জানান উচিত; 'আমি তাঁকে কখনও বর্জন করবো না। দেশের মঙ্গলের জন্যই তিনি ইংল্যাণ্ড গিয়েছিলেন; এই ধরনের মানুষদের সামাজিকভাবে অমর্যাদা করা উচিত নয়।' ভদ্রলোকের প্রতি তাঁর নিজেরও শ্রদ্ধা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। গোঁড়ারা বলতে থাকেন, 'ঘোর কলিযুগ, তা নইলে রাজার মতো অমন ঋষিতুল্য মানুষও কি এমন বিচার করতে পারেন'? সভাপতি মশায় পূর্বেই উল্লেখ করেছেন, রাজা স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে উৎসাহী ছিলেন, উৎসাহী তিনি অবশ্যই ছিলেন, কিন্তু তিনি চাইতেন না যে, মেয়েরা সাধারণ বিদ্যালয়ে যাক, চাইতেন গৃহের উপদেশের মারফৎ তারা শিক্ষিত হয়ে উঠুক।

'আপনারা সকলেই জানেন, রাজাকে ইওরোপীয় ও ভারতীয়গণ সমভাবে সম্মান করতেন; এই সভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এটা মহা বিস্ময়কর যে, রাজা রাধাকান্তর কোন শত্রু ছিল না। তিনি ছিলেন মূর্তিমান সজ্জনতা। তার মতো একজন ব্যক্তিকে সম্মান জানাতে পেরে, দেশবাসী নিজেদেরই সম্মানিত করল' (উচ্চ-করতালি ধ্বনি)।

বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র (বর্তমানে ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রায় বাহাদুর এবং সি আই ই) বলেন:

'এই সভায় এমন কেউ উপস্থিত নেই, যিনি শ্রদ্ধেয় রাজাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন না। এমন কেউ নেই যিনি মনে করেন না যে, রাজা দেশের যে সেবা

করে গেছেন তার প্রতি সম্মান জানাবার জন্য এই সভায় উপস্থিত হয়ে উচিত কাজ করেছেন। এইভাবে মিলিত হয়ে আমরা উপযুক্ত কাজই করেছি, আর যাঁরা আমাদের মঙ্গলসাধন করে গেছেন, তাঁদের গুণকীর্তন করাও আমাদের উচিত। মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের রীতি চলে আসছে সর্ব যুগে সর্ব দেশে সর্ব সমাজে; যাঁরা মানবজাতির মঙ্গলসাধন করে গেছেন, এই সম্মান লাভের অধিকারী তাঁরা আরও বেশী। যোগ্যতার প্রতিই এই সম্মান, এ সম্মান প্রদর্শন আমাদের কর্তব্য। শুধুমাত্র লাভ লোকসানের হিসাবকারী নিম্নরুচির মানুষের পক্ষেও এই সম্মান প্রদর্শন উপকারজনক; কারণ মৃতব্যক্তিগণ এতদ্দারা উপকৃত হন, বা না হন, জীবিত ব্যক্তিরা এর দ্বারা বেশী উপকৃত হন। রাজা রাধাকান্তর স্মৃতি অবশ্যই এই মর্যাদা দাবী করতে পারে। উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের অনেকেই, বিশেষত সভাপতি মহাশয় স্বয়ং, রাজার সঙ্গে আপনাদের দীর্ঘদিনের এবং ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের কারণে, তাঁর সম্বন্ধে আমা অপেক্ষা অনেক বেশী কথা আরও ভালভাবে বলতে পারবেন; তবে, আমি তাঁর সঙ্গে পঁচিশ বৎসরব্যাপী বন্ধুত্বের সুযোগ পেয়েছি; এটুকু বলতে পারি যে, এই সময়কালে তাঁর উচ্চগুণাবলী দেখতে ও উপলব্ধি করতে আমি ভুল করিনি।

'রাজার বাল্য-কৈশোর-যৌবনকালের কথা আমার বিশেষ কিছু জানা নেই; যেটুকুও বা জানি, তার আভাস ইতিপূর্বে বাবু রমানাথ ঠাকুর দিয়েছেন। রাজার বালক বয়সের যুগে বিদ্যালয়ে গিয়ে লেখাপড়া শেখা ছিল অসম্মানের বিষয়, অবশ্য কিছু পাঠশালা ব্যতীত সেযুগে উচ্চশিক্ষার বিদ্যালয়ও ছিল না; আর সে পাঠশালাগুলিও ছিল আদিম অবস্থায়। কিন্তু তাঁর যোগ্য পিতা ইংরাজদের সঙ্গে বহু মেলামেশার ফলে বিদ্যালয়ের শিক্ষালাভের উপকারিতা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তাই সেযুগের অসুবিধা সত্বেও পুত্রকে তিনি ইংরাজ বিদ্যালয়ে ভর্তি করেছিলেন। তার সঙ্গে বাড়ীতে তাঁর আরবি, ফার্সী ও মাতৃভাষা শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়েছিল—সমাজে উচ্চস্থলাভিষিক্তের উপযুক্ত শিক্ষার কোন ত্রুটি রাখা হয় নি। আর তিনিও এই সব প্রচেষ্টার অনুপযুক্ত ছিলেন না। পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান, স্বাস্থ্যবান, প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী রাধাকান্ত পুস্তকে গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন; গৃহশিক্ষকদিগের প্রদত্ত শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ তিনি গ্রহণ করেন। মিঃ কামিংসের বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করবার সময় তিনি গৃহে শিক্ষালাভ অপেক্ষা বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের উপযোগিতা ও উপকারিতা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন, সেইজন্য পরবর্তী জীবনে তিনি ইংরাজী ধরনের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য কঠোর পরিশ্রম ও উৎসাহ প্রদর্শন করেন। সে যুগে রাজকুমার ও অভিজাত ব্যক্তিদের পক্ষে চাকুরী বা পদ গ্রহণ স্বাভাবিক ছিল না, কিন্তু রাজা ঐসব

প্রচলিত চালচলনে আস্থাশীল ছিলেন না। এ-দেশে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দ্বারা শিক্ষার প্রসার ও উন্নতির জন্য পরলোকগত ডেভিড হেয়ার কর্তৃক পরিকল্পিত স্কুল সোসাইটির তিনি সম্পাদক পদ গ্রহণ করেন। এই পদে থাকাকালে তিনি কঠোর পরিশ্রম করে আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতিমূলক বহু পরিবর্তন সাধন করেন। বেশ কয়েকটি বিদ্যালয় তাঁর পরিচালনাধীন ছিল; প্রায়ই তিনি এই সকল বিদ্যালয পরিদর্শনে যেতেন, তাদের উপযোগিতা বৃদ্ধির জন্য অনেক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন; বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য পাঠ্যপুস্তকসমূহ রচনা করেন—আমাদের ভাষায় এই প্রকারের পুস্তক এই প্রথম রচিত ও প্রকাশিত হয়। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘ চৌত্রিশ বৎসরকাল অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে ও কঠোর পরিশ্রম সহকারে এর গভর্নরের দাযিত্বভার বহন করেন। তিনি এই পদ থেকে অবসর গ্রহণ করলে কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন এক সাধারণ সভায় তাঁর অপরিমেয (ঐ পদে) সেবামূলক কাজের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কেবলমাত্র বালকদের শিক্ষাপ্রসারেই তাঁর মনোযোগ ও চেষ্টা সীমাবদ্ধ ছিল না। এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত দুরবস্থা প্রথমাবধিই তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল; অনারেবল্ মিঃ বেথুনের ভাষায়, এদেশীয় স্ত্রীলোকদের আজীবন অজ্ঞতার অন্ধকারে রেখে দেওয়ার মধ্যে যে নির্বুদ্ধিতা ও দুর্বুদ্ধিতা আছে একথা ভারতীযদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেছিলেন। এদেশের ইতিহাসে সবপ্রথম তাঁরই বাড়ীতে বিভিন্ন বালিকা বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রীদের পুরস্কার গ্রহণের জন্য সমবেত হওয়ার আনন্দময দৃশ্য দেখা গিয়েছিল। এ বিষয়ে তিনি যে পরিপূর্ণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, তার জন্য তিনি উচ্চ প্রশংসার দাবী অবশ্যই করতে পারেন। আবার, হিন্দু সমাজের নেতা ও প্রতিনিধিরূপে তিনি তাঁর পরিশীলিত ব্যবহার, ঔদার্য ও একান্ত সততার জন্য তাঁর সম্প্রদাযের সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিযেশনের সভাপতিরূপে তিনি সাধারণভাবে সর্বসম্প্রদায়ের মঙ্গলের জন্য যেরূপ উৎসাহ ও আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, তার জন্য দীর্ঘকাল স্বদেশবাসী তাঁকে স্মরণ করবে। প্রায় প্রতিটি জনসভার তিনি ছিলেন সভাপতি এবং এদেশবাসীর সামাজিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের প্রতিটি আন্দোলনে তিনি ছিলেন অগ্রণী। এদেশের কিছু কিছু তথাকথিত সমাজ সংস্কারক তাঁর মধ্যে যে সকল বৈশিষ্ট্য আশা করেছিলেন, তার সব কিছুই হয়তো তাঁর মধ্যে ছিল না, তাঁদের বহু কাজেরই হয়তো তিনি বিরোধিতা করেছিলেন; পূর্বপুরুষদের (গোঁড়া) ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে প্রতিপালিত তিনি হয়তো, শিশু ও বালকবালিকাদের ধর্মান্তরের প্রতি বিমুখ ছিলেন; অবশ্যই তিনি গো-হত্যার বিরোধিতা করেছিলেন; মদ্যপানের বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে তিনি তাঁর তীব্র বিরূপতা প্রকাশ করেছেন, অনেকের কাছে আবার তাঁর

এই মনোভাব ছিল সংস্কারের প্রথম পদক্ষেপ। কিন্তু মহাশয়, যে কাজের দ্বারা সমাজের প্রকৃত উপকাব হতে পারে, তিনি কখনও তার বিরোধিতা করেননি: কুসংস্কারগ্রস্তের গোঁড়ামিও তাঁর মধ্যে ছিল না। প্রকৃত সমাজ-সংস্কারকদের প্রতি তিনি শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন না। মেডিক্যাল কলেজে শব ব্যবচ্ছেদকে তিনি দোষাবহ মনে করেননি। গোঁড়া ধর্মীয় বিষয়ে তিনি যেমন উদার হস্তে অর্থ ব্যয় কবেছেন, ঠিক তেমনি ঔদার্যের সঙ্গে তিনি চিকিৎসা বিদ্যায় উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য যাঁরা ইংল্যাণ্ড যেতে চেয়েছেন, তাঁদের জন্যও অর্থব্যয় করেছেন। হিন্দু সমাজের উপর তাঁর অসীম প্রভাবকে তিনি এ বিষয়ে যে ভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন, তার জন্য তিনি সর্বোচ্চ প্রশংসার অধিকারী। কোন কারণেই কারও কাছে তাঁর বিবেকের তিনি স্বাধীনতা বর্জন করেননি—স্বাধীনমনা কেই-বা তা করে? কিন্তু তাই বলে তিনি মুষ্টিমেয় সেই সব মানুষদেরও একজন ছিলেন না, যাঁরা নিজেদের পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগের নামে সমগ্র জাতির বিবেককে পদদলিত করে চলেন। নিজ নিজ মতবাদ বা বিশ্বাসে দৃঢ় থেকেও অপরের মতবাদে বা বিশ্বাসে আঘাত না করার মধ্যে যে মহত্ত্ব নিহিত আছে, সেটা যে-কারও মতো আমিও ভালভাবে উপলব্ধি করি; উপলব্ধি কবতে পারি না সেই সব মানুষের মতবাদের দৃঢ়তা, যাঁরা স্বীয় মতবাদ রক্ষার জন্য অনুরূপ মতবাদীর উপর অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করেন—রাজা রাধাকান্ত তাঁদের মতো ছিলেন না। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান হিন্দু হয়েও যে অন্যমতাবলম্বীর প্রতি উদার ছিলেন, এ বিষয়ে আমার সঙ্গে আপনারা একমত হবেন বলেই আমার ধারণা। তাঁর কঠোর সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও ঔচিত্যবোধ সম্বন্ধে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বলে যেতে পারি, কিন্তু তার প্রয়োজন নেই, কেননা আপনারা সকলেই এ-বিষয়ে আমার মতই বিস্তারিত ভাবে জানেন। আচার আচরণে তিনি ছিলেন জনপ্রিয় ও আদর্শস্থানীয়—এ-বিষয়ে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন চীফ জাস্টিস স্যার লরেন্স পীল ঠিকই বলেছিলেন, 'তাঁর (রাজা রাধাকান্তর) পরিশীলিত শিষ্টাচারবোধ আমাদের সকলেরই অনুকরণযোগ্য।'

'এখন আমি তাঁর পাণ্ডিত্য সম্পর্কে কিছু বলব। দুঃখের বিষয়, এখন এদেশে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় না; কাজেই, এদেশে প্রচলিত প্রাচীন ভাষা সমূহে তিনি যে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, অনেকেই হয়তো সেটা উপলব্ধি করতে পারবেন না। আমি সামান্য ব্যক্তি হলেও, যেহেতু ভারতীয় সাহিত্যের উপর কিছু কাজ করছি, সেই অধিকারে আপনাদের বলতে পারি যে, তাঁর এই ক্ষেত্রের কাজ ছিল উচ্চতম মানের। প্রতিভাধর বা ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার অধিকার বলতে যা বোঝায়, রাজা তা ছিলেন না। তাঁর পাণ্ডিত্য অনায়াসলব্ধ ছিল না। 'আমার কথা ফুটেছিল কবিতার

মধ্য দিয়েই, কেননা কবিতা আমার মধ্যে এসেছিল স্বাভাবিকভাবেই' একথা বলার অধিকারী তিনি ছিলেন না। অন্যদের পক্ষে যেমন, তাঁর পক্ষেও তেমনি জ্ঞানার্জনের কোন রাজপথ ছিল না। প্রচুর পরিশ্রম করেই তাঁকে পথ করে নিতে হয়েছিল। ধন সম্পদের মধ্যেই তাঁর জন্ম হয়েছিল, কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে অন্যরা যেমন আরাম আয়েসের জীবন-যাপন করেন, তিনি তা করেন নি। পাণ্ডিত্য অর্জনের জন্য তিনি বেছে নিয়েছিলেন কঠোর পরিশ্রমের জীবন; আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের গভীরে প্রবেশের জন্য তিনি সারাটা জীবন ব্যয় করেছেন। বহু বৎসরের অবিরাম পরিশ্রমে—একটানা চল্লিশ বৎসরের পরিশ্রমে—তিনি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'শব্দকল্পদ্রুম' প্রকাশ করেছিলেন—যিনিই এই বিরাট সাহিত্যকীর্তি প্রত্যক্ষ করেছেন, তিনিই এর প্রশংসা না করে পারেন নি। আমাকে আপনারা বিশ্বাস করেন বলেই, এবিষয়ে আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করতে বলছি না। ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কিত রচনার গুরুত্ব উপলব্ধি করবার যোগ্যতা যাঁদের সর্বাধিক, পাণ্ডিত্যের রাজ্যে যাঁদের অভিভাবকরূপে গণ্য করতে পারি, অনেক বিচার বিবেচনার পর যাঁরা কোন রচনার প্রশংসা করেন, অর্থাৎ ইওরোপের সেই পণ্ডিতসমাজ সর্বপ্রথম রাজার এই অভিধানখানির উচ্চ প্রশংসা করেন এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁদের মতামত দিতেও তাঁরা বিলম্ব করেন নি। সেণ্ট পিটারবর্গের ইম্পিরিয়্যাল অ্যাকাডেমি, বার্লিনের রয়্যাল অ্যাকাডেমি, ভিয়েনার কাইজারলিশেন অ্যাকাডেমি, গ্রেট ব্রিটেনের রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটি এবং উত্তরাঞ্চলের পুরাতত্ত্ব-বিষয়ক রয়্যাল অ্যাকাডেমি তাঁকে হয় সাম্মানিক ডিপ্লোমা দেন বা পত্রায় সদস্য করে নেন। এইসব প্রশংসাপত্রের মূল্য সন্দেহাতীত। এ ছাড়া ইওরোপের রাজন্যবর্গও তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন। রাশিয়ার প্রাক্তন জার ও ডেনমার্কের রাজা সপ্তম ফ্রেডারিক তাঁকে পদক দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন; সর্বোপরি আমাদের মহামহিমময়ী সম্রাজ্ঞী তার প্রদত্ত সম্মানসমূহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্মান 'দি অর্ডার অব দি মোস্ট এগ্‌জলটেড স্টার অব ইণ্ডিয়া' দ্বারা তাঁকে সম্মানিত করেন। কোষগ্রন্থখানির যোগ্যতা না থাকলে, এত সম্মান তিনি নিশ্চয়ই লাভ করতে পারতেন না। রাজা রাধাকান্ত আজ আর নেই; পরিণত বয়সে রাজন্যবর্গ ও পণ্ডিতমণ্ডলী প্রদত্ত সম্মাননা ও সাধারণের শ্রদ্ধার মধ্যে তিনি পরলোকগমন করেছেন। কিন্তু তাঁর কীর্তি বর্তমান—যতদিন পর্যন্ত সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা হবে, ততদিন তাঁর অপরিমেয় পরিশ্রমে সার্থক এই কীর্তিও অক্ষয় থাকবে।'

জন কোক্‌রেন বলেন :

'ইতস্তত করছিলাম যে বক্তৃতা করব কিনা, ইতস্ততার আরও কারণ এই যে, আজকের বিষয়বস্তুটা একান্তই আপনাদের, কিন্তু ভেবে দেখলাম এই

বহৎ ব্যক্তি, পুণ্যবান ব্যক্তি কোন জাতি বিশেষের নিজস্ব সম্পত্তি নন, তিনি ছিলেন সকলের, সর্বজাতির সাধারণ সম্পত্তি।

'জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি তাঁর দেশের সাহিত্য ও শিক্ষার উন্নতির জন্য চেষ্টা করে গেছেন। এই শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত ব্যক্তি আজ আর আমাদের মধ্যে নেই, তিনি আজ সেই লোকে অবস্থান করছেন, যেখানে দুর্বৃত্তরা আর জ্বালাতন করতে পারে না, ক্লান্ত ব্যক্তিগণ পান বিশ্রাম।

'আপনারা সমবেত হয়েছেন তাঁকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য, স্মরণ করবার জন্য নয়—তাঁকে স্মরণ করার প্রশ্ন ওঠে না, কেননা মনে হয়, তিনি তাঁর সেই প্রশান্ত, নম্র, শান্ত মূর্তিতে—আভিজাত্যের প্রতীকস্বরূপ হয়ে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

'আজ আপনারা যে সম্মান প্রদর্শন করছেন, ভবিষ্যৎ বংশধরগণ শ্রদ্ধার সঙ্গে তা স্মরণ করবেন।

'বহু বৎসর যাবৎ তাঁর সঙ্গে পরিচিত থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল—অতি সঙ্কট ও সমস্যার মধ্যেও তাঁকে আমি দৃঢ় থাকতে দেখেছি—মনে হয়েছে এদেশবাসীদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।

'প্রাচীন গ্রীক বাগ্মী বলেছিলেন, 'পাণ্ডিত্যই আমাদের ভালমন্দ বিচার করতে শেখায়,' কিন্তু রাজা রাধাকান্তর মানবতাবোধ, দয়া, শিষ্টাচার—মানুষ মাত্রেরই প্রতি তাঁর প্রেম ছিল সহজাত, হৃদয়জাত, শিক্ষা ও পাণ্ডিত্যসঞ্জাত নয়। দু' একজন বাদে এদেশবাসীদের মধ্যে আর কেউই তাঁর মতো স্বাভাবিক উচ্চস্থানের অধিকারী ছিলেন না—সর্বসাধারণের ভালবাসা ও শ্রদ্ধাও তাঁর মতো আর কেউ লাভ করেন নি। স্বদেশবাসীকে তিনি ভালবেসেছিলেন। কিছু বলব বলে আজকের সভায় আমি আসিনি, কিন্তু আসার পর, প্রয়াত শ্রদ্ধেয়কে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন না করে পারলাম না। তাঁর মতো ধার্মিক ও মহাপ্রাণ ব্যক্তি হয়তো আর আমরা পাব না।'

বাবু কিশোরীচাঁদ বলেন :

'যে মহাপ্রাণ ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য আমরা এখানে সমবেত হয়েছি, তাঁর স্মৃতির প্রতি আমার সবিনয় শ্রদ্ধা নিবেদনের এই সুযোগের জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমাদের সমাজে (সম্প্রদায়ে) তাঁর মতো এমন সরল, নিষ্কলঙ্ক, সম্মানিত ও প্রশংসাধন্য জীবন খুব কম ব্যক্তিই যাপন করেছেন। যাতে স্বদেশের মঙ্গল হয়, তার প্রতি তাঁর নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টা সব সময়ই বিদ্যমান ছিল, (করতালি)। সম্পন্ন সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁর জন্ম, কিন্তু এইরূপ একটি পরিবারের ভোগোন্মত্ত মাত্র নগণ্য পুরুষরূপে তিনি ভবিষ্যৎ বংশধরগণের নিকট পরিচিত হয়ে থাকতে চাননি। অলস এশিয়াবাসীর নিকট যে সকল প্রলোভন অপ্রতিরোধ্য, তিনি সেই সকল

প্রলোভন ও 'বাবু প্রথার' বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে নিজেকে সাহিত্যের কাজে উৎসর্গ করেছিলেন, নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন দেশে শিক্ষাবিস্তারের মহান কাজে। মানব সেবাই হল মানব জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ, এই আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, সংস্কৃত শিক্ষার প্রসার এবং প্রতীচ্যের জ্ঞানবিজ্ঞান প্রসার কেন্দ্র 'মহাবিদ্যালয়'টির প্রতিষ্ঠাতা ও সমর্থকদের সঙ্গে সহযোগিতা দ্বারা তিনি তাঁর এই উচ্চ আদর্শকে সার্থকতা দিতে পারবেন। পরবর্তীকালে হিন্দু কলেজ নামে পরিচিত প্রতিষ্ঠানটির বিকাশ ও উন্নতিতে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। শিক্ষা প্রসারে যাঁকে আমরা দেবদূত বলতে পারি সেই ডেভিড হেয়ার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বহু প্রাথমিক ও সহায়ক পাঠশালার উন্নতির প্রতিও তাঁর সবিশেষ দৃষ্টি ছিল। এই সকল পাঠশালায় নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রচলিত করে সক্রিয়ভাবে ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক পরিদর্শনের ব্যবস্থা করে এবং নির্দিষ্ট সময়ান্তরে সেগুলির জন্য স্বগৃহে পরীক্ষার ব্যবস্থা করে তিনি এগুলির সবিশেষ উন্নতি বিধান করেন। নব প্রতিষ্ঠিত স্কুল বুক সোসাইটিকে তিনি তাঁর সাগ্রহ পরামর্শ ও সহায়তা দিয়েছিলেন যাতে উক্ত সোসাইটি কোমলমতি বালক বালিকাদিগের জন্য উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে পারে। কিছুকাল তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অবৈতনিক দেশীয় সম্পাদকও ছিলেন। সংস্কৃত কলেজের সম্পাদকরূপে, হিন্দু কলেজের পরিচালক সমিতির সভ্য হিসাবে, স্কুল বুক সোসাইটির সম্পাদক এবং ডেভিড হেয়ারের পাঠশালাসমূহের পরিদর্শকরূপে তিনি এদেশের শিক্ষা বিস্তারে যে বিপুল কাজ করে গেছেন, তার জন্য দেশবাসী কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁকে চিরকাল স্মরণ করবে।

'তাঁর সময়ে স্ত্রীশিক্ষা ছিল বিতর্কিত বিষয়; তিনি মধ্যপন্থা গ্রহণ করে সম্ভ্রান্ত পরিবারের জন্য বিদ্যালয়ের পরিবর্তে 'জেনানা' ব্যবস্থা সুপারিশ করেন। এর থেকে বোঝা যায় যে, তিনি মেয়েদের অজ্ঞ ও অলস করে রেখে মানুষ করার কুফল সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। কিন্তু রাজার খ্যাতি পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে তাঁর প্রখ্যাত সংস্কৃত কোষগ্রন্থখানির জন্য—পূর্ববর্তী বক্তাগণ এ সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে বলেছেন। বহু পরিশ্রমসাধ্য এই পুস্তকখানি রচনায় তাঁর জীবনের সর্বোত্তম সময় ব্যয়িত হয়েছে। এই পুস্তকখানিই তাঁর স্মৃতির জয়স্তম্ভ হয়ে থাকবে। সংস্কৃতশাস্ত্র ও সাহিত্য অধ্যয়ন যাতে সুগম হয় সেইভাবেই গ্রন্থখানিকে ব্যাপক ও বিশদ করা হয়েছে।

'একাধিক বক্তা রাজার ধর্মমত বিষয়ে বক্তব্য বলেছেন। এ বিষয়টির আলোচনা আমার মনোমত বিষয় নয়; কারণ, স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্কের এই বিষয়টি জনসভায় আলোচিত না হলেই ভাল হয়। রাজার উচ্চ গুণাবলী অপর কোন ব্যক্তি অপেক্ষা আমি কম হৃদয়ঙ্গম করি না; কিন্তু বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র যেভাবে প্রশংসার বান ডাকিয়ে দিয়েছেন, সেটা আমি তো নই-ই, রাজার আত্মাও সম্ভবত সমর্থন করবেন না। বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র রাজাকে

এমনভাবে বর্ণনা করলেন, যেন রাজা রাধাকান্তর মধ্যে মানবতার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল, যেন তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ মানব ; তাঁর কু-সংস্কারসমূহকে তিনি এমনভাবে বর্ণনা করলেন, যেন সেগুলি প্রগতির পক্ষে বাধাস্বরূপ না হয়ে সহায়ক হয়ে উঠেছিল। উনি আমাদের বোঝাতে চাইলেন যে, রাজা যেন সব সময়েই সমাজের প্রগতির জন্য কাজ করে গেছেন—তাঁর কোন কাজই যেন প্রতিক্রিয়াপন্থী ছিল না। এই ধরনের উক্তির বিরোধিতা না করলে, আমি আমার বিবেকের কাছেই অপরাধী হয়ে থাকব। এ কথা স্বীকার করতেই হবে, লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের সতীদাহ প্রথা বিরোধী আইনের বিরোধিতা করে, 'ধর্মসভা'র পৃষ্ঠপোষকতা করে, বা 'লেক্স-লসি' (ধর্মান্তরিত হলেও পৈতৃক সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার রক্ষা সম্পর্কিত আইন)-এর বিরুদ্ধতা করে, বা 'বান্ধবসমাজে'র বহুবিবাহ-বিরোধী আন্দোলন দ্বারা সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে গণস্বাক্ষরযুক্ত আবেদনপত্র পেশ করে রাজা রাধাকান্ত প্রগতিশীল কাজ করেন নি। এ সব কাজ করবার সময় তিনি অবশ্যই ভেবেছিলেন যে, তিনি আপন বিবেক অনুযায়ী কাজ করছেন, কিন্তু যত না বুঝেই হক, তিনি যে প্রগতি-ঘড়ির কাঁটা পিছনে ঘোরাচ্ছিলেন, এতে তো কোন সন্দেহ নেই। সত্য কথা বলতে কি, তাঁর সময়ের অপর কয়েকজন সুপণ্ডিত ব্যক্তির মতো তিনি তাঁর পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও, যে ভাবধারার মধ্যে তাঁরা মানুষ হয়েছিলেন, সেই ভাবধারাই তাঁরা আজীবন আঁকড়ে ধরেছিলেন। আসল কথা, তিনি সেই সব বিধিব্যবস্থা, অভ্যাস ও সংস্কার কাটিয়ে উঠতে পারেন নি—এ সবের প্রতি তাঁর আসক্তি ও শ্রদ্ধা, তাঁর শিক্ষা সংস্কার ও প্রসার ও অন্যান্য উদার চিন্তা ও কাজের মতই কর্মোন্মাদনায় পূর্ণ। কিন্তু হিন্দু ধর্মে তাঁর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা তাঁকে অন্য ধর্মাবলম্বীর প্রতি অনুদার করে তোলেনি। প্রকৃতপক্ষে তিনি আপন বিবেকের আলোকে আপন পথে চলেছেন। অকপট বিশ্বাস যে-কোন মানুষেরই সর্বোচ্চ গুণরূপে পরিগণিত হয়। ধর্মের প্রতি তাঁর এই অকপট বিশ্বাসকে সেই মর্যাদা অবশ্যই দিতে হবে। তিনি যা বলতেন, যা বিশ্বাস করতেন, কাজও করতেন সেই অনুযায়ী—এ বৈশিষ্ট্য তাঁর আরও কিছু উচ্চশিক্ষিত স্বদেশবাসী সম্পর্কে অবশ্যই বলা যায় না—যারা সকালে পূজা-আহ্নিক করেন, আর বিকালে নিষিদ্ধ মাংস দিয়ে আহার সমাধা করেন—তাঁরা মুখে বলেন এক, করেন আর এক। পরলোকগত রাজার ধর্মমত ও বিশ্বাসের সঙ্গে আমার ধর্মমত ও বিশ্বাসের অবশ্যই পার্থক্য ছিল, কিন্তু তাঁর ছিল আদর্শের প্রতি একাত্মতা, গভীর বিবেকবোধ, শিক্ষা প্রসারের প্রতি অকৃত্রিম আগ্রহ, এবং সংস্কৃতিসম্পন্ন মানবতাবোধ—এই সকল কারণে, আমি একান্ত বিনীতভাবে এই মহান পুরুষের স্বর্গত আত্মার প্রতি আমার বিনীত শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।'

(উচ্চ অভিনন্দন)

মিঃ মনুত্রো :

'বাপ্পা মিঃ কোকরেন যে ভাব ও ভাষায় তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন, তার সঙ্গে সহমত হলেও, আমি সামান্য দু'চার কথায় আমার বক্তব্য রাখব। বেশ কয়েক বৎসর যাবৎ রাজার বন্ধুত্বলাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সত্য সত্যই একজন প্রকৃত মহৎ ও সৎ মানুষের তিরোধান ঘটল। পূর্ববর্তী বক্তাগণ পরলোকগত রাজার ধর্মমত সম্পর্কে বক্তব্য রাখলেও, এ সম্পর্কে আমি অল্প দু'একটি কথা বলতে চাই। তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের অনুসৃত প্রতীকী মরমীয়াবাদের প্রতি গভীরভাবে আস্থাশীল ছিলেন। রাজার নৈষ্ঠিক হিন্দুত্ব আগাগোড়া ছিল সামঞ্জস্য-পূর্ণ। আজ এখানে স্বর্গত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য খ্রীস্টিয়ান ধর্মগুরু-গণও সমবেত হয়েছেন দেখে, আমি সভায় একটি প্রশ্ন রাখতে চাই, যাঁরা তাঁকে জানতেন বা তাঁর মন ও চরিত্র বোঝবার সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁদের কেউ কি কখনও তাঁকে কুসংস্কারগ্রস্ত বলে মনে করেছেন? ধর্মে নিষ্ঠা বা গোঁড়ামি ছিল তাঁর নিজস্ব ব্যাপার—তাঁর বিশ্বাস, তাঁর সংস্কার ছিল (যেমন হওয়া উচিত প্রতিটি মানুষের) তাঁর ঈশ্বর ও তাঁর বিবেকের মধ্যে যোগাযোগের বিষয়। তাঁর ধর্ম সম্পর্কিত বিষয়ে আমরা শুধু তাঁর পবিত্রতা, মানব হিতৈষণা, ঐকান্তিকতা ও সক্রিয় গুণাবলী নিয়ে আলোচনা করতে পারি—তাঁর এই সকল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আলোক দূর দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। স্বীকার করতেই হবে, 'সময়ের বালুতটে তাঁর পদচিহ্ন পড়েছে' আরও বহু স্মরণীয় বিষয়ে। তাঁর জীবনের সক্রিয় ধর্মাচরণ তাঁর ক্লান্তিহীন সহানুভূতি ও দান এবং তাঁর চিন্তা ও আচরণের সম্ভ্রান্ততার জন্যই তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর আসন আজ শূন্য; জীবিত-দের আমি ছোট করতে চাই না; কিন্তু আজ রাজা রাধাকান্তর আসন কে নেবেন? তিনি ছিলেন সকলের সামনের স্থানে, ছিলেন স্বাভাবিক ভাবেই সর্বজন স্বীকৃত স্বীয় জাতির নেতা। নিষ্ঠাবান হিন্দুদের তিনি ছিলেন পথপ্রদর্শক ও শাসক—তাঁর মৃত্যুতে এঁদের অপূরণীয় ক্ষতি হল; অপরাপরের কাছে, বিশেষত প্রগতিশীলদের (প্রগতি বলতে যাঁরা গোমাংস ভোজন ও শ্যাম্পেন পান বোঝেন; তাঁদের কথা বলছি না।) নিকট, তিনি ছিলেন হিন্দুমতাদর্শের আলোকবর্তিকা—পবিত্র ও সম্মানিত ব্যক্তি। প্রকৃতই তিনি ছিলেন একজন প্রতিনিধিস্থানীয় মানুষ। শুনতে অদ্ভুত লাগলেও একথা সত্য যে, রাজা ছিলেন সনাতনী মতবাদী ও আধুনিকতাবাদীদের মধ্যে সংযোজক ও সীমারেখা। সব সময় তাঁর নামই ছিল শক্তির স্তম্ভ। তাঁর মধ্যে হিন্দুধর্ম মূর্তি লাভ করেছিল, আর সেই জন্যই তিনি কি হিন্দু, কি খ্রীস্টান, আর কি দার্শনিক, সকলেরই—সকল চিন্তাশীল মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। আমি চাই এই মহান বিরাট মানুষটির একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হোক। শিক্ষাপ্রসার বা দাতব্য উদ্দেশ্যে তাঁর নামে নিধি স্থাপনের আমি

বিরোধী নই, কিন্তু আমি চাই যে, আদর্শ স্থানীয় মানুষ রাজার মহান্ গুণাবলী ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য মর্মরে রূপায়িত হয়ে থাক।'

রেভঃ (বর্তমানে ডঃ) কে এম ব্যানার্জী :

'বক্তৃতা করবার উদ্দেশ্য আমার নেই, কিন্তু রাজা রাধাকান্তর যে সকল মহৎ গুণাবলী ব্যক্তিগতভাবে আমার জানা, সেই সম্পর্কে এবং তাঁর বিদ্যোৎসাহিতার ফলে আমি ব্যক্তিগতভাবে যে উপকার পেয়েছি, তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাতে দু'একটি কথা বলতে চাই। তাঁর ও ডেভিড হেয়ারের যুগ্ম সম্পাদকত্বে পরিচালিত (প্রাক্তন) ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটির অন্যতম বিদ্যালয় সেণ্ট্রাল ভার্নাকুলার স্কুলে আমি আমার প্রাথমিক শিক্ষা পাই ; আর আমার উচ্চতর শিক্ষা হিন্দু কলেজের জন্য—এই প্রতিষ্ঠানের তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপক। রাজার জনহিতৈষণার যে সকল কাজের জন্য আমি, অন্যান্য অনেকের মতো, তাঁর নিকট ঋণী, সর্বপ্রথম আমি তার জন্য আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাঁর মহান সাহিত্যকীর্তি 'শব্দকল্পদ্রুম' সম্পর্কে আমি এইটুকু বলতে চাই যে, এ বিষয়ে পূর্ববর্তী বক্তাগণ যা বললেন, তার সঙ্গে আমি সহমত। তার বেশী বলতে গেলে আপনাদের ধৈর্যশক্তির উপর অত্যাচার করা হবে। তবে, এ বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা বলতে চাই। কয়েকমাস পূর্বে মাদ্রাজে জনৈক হিতৈষী ভদ্রলোক আমাকে জানান যে, তিনি দাক্ষিণাত্যের জনগণের উপকারার্থে তেলুগু লিপিতে শব্দকল্পদ্রুমখানি মুদ্রিত করতে চান—এর জন্য, রাজার প্রয়োজনীয় অনুমতিপত্র নিয়ে যেন তাঁকে পাঠিয়ে দিই। রাজা তখন কলকাতায় ছিলেন না ; মাদ্রাজের এই বন্ধুকে তাই আমি লিখে জানালাম, আনুষ্ঠানিক অনুমতি নেওয়া না হলেও, আমার মনে হয় না যে, রাজা তাঁর এই মহান সংকল্পে কোনরূপ আপত্তি করবেন। বাঙালী হিসাবে আমরা একটু গর্ববোধ না করে পারি না যে, আমাদের বঙ্গলিপিতে প্রকাশিত এই বিরাট বিশ্বকোষ জাতীয় পুস্তকখানি এই মুহূর্তে মাদ্রাজে একজন ধনী ব্যক্তি দ্রাবিড় ব্রাহ্মণদের উপকারার্থে তেলুগু লিপিতে প্রকাশ করছেন। দেশ ও জাতি আজ এই মহান সৃষ্টির মহান স্রষ্টাকে হারিয়েছে। রাজার ধর্মমত সম্পর্কে বলতে গিয়ে এখানে কিছু অপ্রীতিকর মন্তব্য করা হয়েছে, বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, এখানে এই ধরনের মন্তব্য হওয়ায় আমি দুঃখিত বোধ করছি। মিশ্র মত ও পেশার জনগণ ও সুধীবৃন্দ প্রয়াত মানুষটির বন্ধু ও গুণমুগ্ধ রূপে তাঁর মহান গুণাবলী স্মরণ করবার একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে সমবেত হয়েছেন—উদ্দিষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ এই স্মৃতিসভায় সঙ্গতিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে এরূপ উক্তি অত্যন্ত দুঃখজনক। রাজার প্রতিক্রিয়াশীলতা প্রগতির পথে তৎসৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির কথা বলা অত্যন্ত অযৌক্তিক, কারণ এর দ্বারা, তাঁর চেয়ে পঞ্চাশ বছর পরে জন্মেছেন এমন সব মানুষের

চিন্তাধারার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে—এটা অযৌক্তিক। ঠিক যেমন যুক্তিহীন উক্তি হবে মিঃ পিটের মতো বিগত যুগের কোন বিজ্ঞ রাজনীতিককে এ-যুগের আলোকে বিচার করে বলা যে, তিনি আদৌ কোন সংস্কারক ছিলেন না বা তিনি সকল গৃহের জন্য ভোটাধিকার দান করেন নি। একমাত্র সমসাময়িকদের কাজ ও চিন্তার সঙ্গেই মাত্র কোন মানুষের কাজ ও চিন্তার তুলনা চলতে পারে। এই মানদণ্ডে বিচার করলে, স্বীকার করতেই হবে যে, রাজা তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে প্রতিক্রিয়াপন্থীতো ছিলেনই না, বরং বলা যায় প্রগতিশীল ছিলেন।

'আপনারা কিভাবে নেবেন জানি না, তবে একটি বিশেষ ঘটনার কথা আমি উল্লেখ করতে চাই। একবার রাজার প্রাসাদে খ্রীস্টিয়ান গীর্জা-সংস্থার একজন উচ্চপদাধিকারীর দেখা পাই—এঁর সঙ্গে পরে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। কলকাতার আর্চডীকন (পরে মাদ্রাজের বিশপ) মিঃ কোরি সেদিন রাজারবাড়ীতে বিদ্যালয় সমূহের পরীক্ষা নিচ্ছিলেন। পরবর্তীকালে, তাঁর নিজের মুখ থেকে অনেকবার শুনেছি যে, তিনি রাজার গুণাবলীতে মুগ্ধ এবং তাঁর গুণাবলীর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এমনই একজন শ্রদ্ধেয় মানুষের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি।'

বাবু কইলাশ চন্দার (কৈলাশ চন্দ্র) বসু :

'বিগত কয়েক বৎসর রাজা সামাজিক ও অন্যান্য কাজকর্ম, ঘর-সংসার ত্যাগ করে বৃন্দাবনের ছায়াময় সুরভিত আশ্রমে অবস্থান করছিলেন, তবুও বলতে পারি, কলকাতার ভারতীয় সমাজের স্বাভাবিক নেতা রাজা আমাদের কাছে থেকে দূরে অধ্যাত্ম সাধনায় মগ্ন থাকলেও, আমরা তাঁর প্রভাব সব সময়ই অনুভব করেছি (করতালি)। গোঁড়া হোক বা বহু দেবদেবীর ধর্মে বিশ্বাসী, উদারনীতিক হোক বা রক্ষণশীল—সকলেই তাঁর কাছে নত হতেন। প্রকৃত মহৎব্যক্তির পরিচয় এখানেই—আপন পরিবার বা সমগ্র জাতির মধ্যে বহু মত বহু রুচি বহু ধর্মমত সত্ত্বেও সকলেই এইরূপ ব্যক্তির মহত্ত্বকে স্বীকার করে নেন (করতালি)। বর্তমান যুগের মতামত, রুচি বা ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে রাজা রাধা-কান্তের ধর্মমত, রুচি বা অন্যান্য বিষয়ে মতের সামঞ্জস্য অবশ্যই ছিল না। আজ 'এগিয়ে চল' মতের মানুষ প্রশংসনীয় উদ্যমে আমাদের সমাজে প্রচলিত বহু কুসংস্কার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করছেন—'এগিয়ে চল' মতের মানুষেরা বিধবা বিবাহের প্রচলন, জাতপাতের উচ্ছেদ, বহুবিবাহ রোধ, প্রভৃতি আইনের সাহায্য নিয়ে হলেও করতে চান—এঁরা হয়তো মুমূর্ষু মা বাবার অন্তর্জলির ব্যবস্থা করবেন না, তাঁদের মৃতদেহ চিতায় দাহ না করে এঁরা সানন্দে সেগুলিকে সমাধিস্থ করবেন—এঁদের মতের সঙ্গে রাজা রাধাকান্তর মতের অবশ্যই বিরোধ ছিল। আমার ধারণা সম্ভবত ঠিক যে, এই সভা তাঁদের দ্বারা

অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যাঁরা বিধবা বিবাহ ও অন্যান্য প্রকারে সমাজ সংস্কারের প্রবক্তা—স্বধর্ম ও বিশ্বাসের জন্য রাজার মত এঁদের বিরুদ্ধেই ছিল। তথাপি সকলে যে সমবেত হয়েছেন এতেই কি সপ্রমাণ হয় না, এটাই কি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, সর্ব মতের মানুষ তাঁর তিরোধানে শোক প্রকাশের জন্য এখানে সমবেত হয়েছি? ধর্মে অবিশ্বাসীরাও যখন গোঁড়া ব্যক্তির তিরোধানে শোক প্রকাশের জন্য সমবেত হন, তখন প্রমাণ হয় যে, ধর্মীয় ও সামাজিক সকল প্রকার বিরোধেরও উপরে স্থান পায় প্রকৃত মহত্ব।

'তিনি বিরাট পণ্ডিত বা সংস্কৃত বিশ্বকোষের রচয়িতা, বা নিষ্ঠাবান হিন্দু, বা সহৃদয় অমায়িক ব্যক্তি ছিলেন বলে নয়, আমরা সেই প্রয়াতকে সম্মান জানাচ্ছি এই জন্য যে, তাঁর মধ্যে অন্তর ও মেধার সমন্বয়ে যে মহত্ব প্রকাশ পেয়েছিল, সেরূপ মহত্ব সর্ব দেশে সর্ব যুগে সকল মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করে (উচ্চ অভিনন্দন)। এদেশের কোন ব্যক্তি সম্পর্কে যদি বলা যায় যে, যিনি স্বভাবে ছিলেন রাজকীয়, যাঁর মুখাবয়বে প্রতিভাত হত দাতার মহিমা, যাঁর অন্তরে ছিল জ্বলন্ত দেশপ্রেম তাহলে সত্য ও ন্যায়ের খাতিরে স্বীকার করতেই হবে যে, তিনি ছিলেন সেই শ্রদ্ধেয় ও ধার্মিক রাজা রাধাকান্ত। তিনি আজ প্রয়াত, তাঁর দেহাবশেষ আজ পুণ্যতোয়া সুরধুনীর পুতসলিলে বিলীন। প্রার্থনা করি, তাঁর আত্মা শান্তি লাভ করুক।'

রেভঃ মিঃ ড্যাল:

'রাজা রাধাকান্ত দেব বহু বৎসর যাবৎ শুধু ইংল্যাণ্ড ও ইওরোপেই পরিচিত ছিলেন না, আমেরিকাতেও তিনি বিশেষ পরিচিত ছিলেন। পৃথিবীপৃষ্ঠে ভারতের প্রায় বিপরীত দিকেও বহুসংখ্যক এমন পণ্ডিত বর্তমান যাঁরা আজকের এই সভায় রাজার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এবং তাঁর মতো একজন মনীষীকে পৃথিবীতে প্রেরণের জন্য ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে পারলে নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করতেন—এখানে আর কোন মার্কিন নাগরিক না থাকায় এই কথাগুলি বলা আমার কর্তব্য বলে আমি মনে করি। প্রায় বার বৎসর যাবৎ আমি এই মনীষীর সঙ্গে মেলামেশা করবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। এই প্রবীণ এমন একজন মানুষ ছিলেন, যাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কিছুদিন মিশলেই, তাঁর প্রতি পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা এসে যেত। বহুবারই তিনি তাঁর বাণী মার্কিন মনীষীদের নিকট প্রেরণে, বিশ্বাস করে আমার উপর ভার দিয়েছেন, আবার তাঁর মহাগ্রন্থখানি মার্কিন দেশের বহু গ্রন্থাগারে আমার মারফৎই উপহার-স্বরূপ প্রেরণ করেন, যাতে সে-দেশের যে-সব পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষার মধ্যে নিহিত প্রাচ্যের সত্য সম্পর্কে পরিচিত হতে আগ্রহী তাঁরা গ্রন্থখানি ব্যবহারের সুযোগ লাভ করেন। আমেরিকায় যে-সব গ্রন্থাগার শব্দ-

কল্পদ্রুমের শেষ খণ্ডটিও লাভ করেছেন, তাদের মধ্যে মার্কিন দেশের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন কেমব্রিজ ও নিউহাভেন বিশ্ববিদ্যালয় দুটি এবং নিউ ইয়র্কের অ্যাস্টর লাইব্রেরীও আছে। আমেরিকান ওরিয়েণ্টাল সোসাইটির দূত হিসাবে বহুবার তাঁদের জার্নাল এনে রাজাকে উপহার দেবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, সেগুলি তিনি স্মিতহাস্তে গ্রহণ করে বলতেন 'সেলাম'। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সৌজন্য-পূর্ণ এমনি আরও পত্রপত্রিকা তাঁরই নামে প্রেরিত হয়েছিল। মার্কিন পণ্ডিত-মহলে তাঁর মৃত্যু প্রিয়জন বিয়োগরূপেই পরিগণিত হবে; যেন ব্যক্তিগত বন্ধুর মৃত্যু; জ্ঞানরাজ্যের অধিবাসী এবং শিক্ষাজগতের সুনাগরিকরূপে তো বটেই। তাঁর সম্পর্কে এত কথা বলতে বাকী আছে যে, কোনটা বলব আর কোনটা ছাড়ব, সেটা স্থির করাই আমার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠেছে। এই যুগ তাঁর জীবন থেকে যে শিক্ষা পেতে পারে, তা হল—অধ্যয়নে দীর্ঘকালব্যাপী শ্রম। এমন একটা ক্ষেত্রে তিনি বিরামহীন পরিশ্রম করে গেছেন, এদেশে সেটা যেমন অসাধারণ, তেমনি অন্তহীন সুযোগপূর্ণ। এ বিষয়ে অনেকেই বলেছেন, তাই আমি বিষয়ান্তর নিয়ে বলব। গত অর্ধশতাব্দী ধরে কাউন্সিলারের পর কাউন্সিলার, গভর্নরের পর গভর্নর এসেছেন—এই শোভাযাত্রার সকলেই তাঁকে পেয়েছেন স্বাভাবিক, দয়ালু এবং বিজলী আলোর মতো প্রেরণাদায়ক—লর্ড বেণ্টিংক (বা তাঁর আগে) থেকে ক্যানিং, এলগিন ও লরেন্স, হেবার থেকে বিশপ কটন—কি সরকারী আর কি চার্চ সংগঠনের—সকল প্রধানই তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন—তাঁর ভদ্র আচরণ, সহজলভ্যতা এবং আন্তরিকতা সকলকেই সমভাবে আকৃষ্ট করেছিল। মণিমুক্তাহীন শুভ্র বেশ এই বৃদ্ধের মধ্যে একটা স্নেহপরায়ণ গোষ্ঠীপতিভাব ছিল—যে ভাবের সুবাস ছিল তাঁর উদ্যানের বেলা আর ম্যাগনোলিয়ার মতো—উল্লেখ্য তাঁর বাগানের এই ফুলগাছগুলির পাশে পাশে ভ্রমণের সময় তিনি বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে ভাল-বাসতেন। তাঁর চরিত্রের বিশেষ একটা দিক হল—প্রার্থনায় না হোক, আত্ম-নিবেদন, অনন্তের নিকট নিজেকে নিবেদিত করে রাখা—সকল ধর্মেরই গূঢ় তত্ত্ব তো এই-ই। মাননীয় সভাপতি কতকটা কৌতুকের জন্য বললেন, রাধাকান্ত পৌত্তলিক ছিলেন। যাঁরা তাঁকে পৌত্তলিক ভাবেন, তাঁদের কাছে আমার বিশেষ একটু বক্তব্য আছে। আমি যেন তাঁকে বলতে শুনছি, 'সকলকে বলুন: সত্যকে তারা জানুক; সকলকে জানিয়ে দিন, কোন্ ধর্ম সারা জীবন আমাকে আমার সকল কাজে শক্তি জুগিয়েছে।' তাঁর প্রাঙ্গণে তিনি কৃষ্ণের যে সুন্দর মন্দিরটি নির্মাণ করিয়েছেন, শুনেছি তার মধ্যে মূল্যবান ন'টি ধাতু দ্বারা গঠিত দেবমূর্তি আছে। শ্রদ্ধেয় এই বন্ধুকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আচ্ছা রাজা, আপনি কি ঐ প্রতিমাটির পূজা করেন?' উত্তরে বললেন 'না—মানুষ কখনও

প্রতিমার পূজা করে না। এগুলি তো আমাদের ছোটদের জন্য।' তারপর একটু হেসে বললেন, 'আপনারা বাচ্চাদের পুতুল দেন?' বললাম, 'হ্যাঁ দিই, তবে পূজা করবার জন্য নয়, খেলবার জন্য।' তিনি বললেন, 'আমাদের বাচ্চারা প্রতিমা ছাড়াই পূজা করতে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত আমরা তাদের পুতুল দিই।' জিজ্ঞেস করলাম, 'পুতুল পূজা করেন না বলছেন, তাহলে আপনি কার পূজা করেন'? উত্তরে তিনি বললেন, 'আমার পূজা, আমার ধর্ম—সালোক্য: ঈশ্বরের সাথে সর্বসময় একই লোকে বা স্থানে অবস্থান করা; সামীপ্য: ঈশ্বরের নিকট থেকে নিকটতর হওয়া; সাযুজ্য: ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ; নির্বাণ: ঈশ্বরে বিলীন হওয়া ঠিক যেমন শুকতারা অরুণ কিরণে মিলিয়ে যায়।' আমি বললাম, 'রাজা, আমার ধর্মও তো তাই। খ্রীস্টিয়ান শিশু হিসাবে আমি আমার খ্রীস্টিয়ান মায়ের কাছে গাইতে শিখেছিলাম—

মানুষ কিছুই না, মানুষ শূন্য;
তুমি, হে ঈশ্বর, তুমিই সং, তুমিই শুধু পূর্ণ।

'বন্ধুগণ, এই থেকেই আমি বুঝেছিলাম, রাধাকান্ত পুতুল বা প্রতিমাপূজক ছিলেন না—জীবনের দুর্যোগে যা তাকে শক্তি জুগিয়েছে, ভ্রান্তি থেকে যা তাকে উদ্ধার করেছে, কামনার দাসত্ব থেকে যা তাকে মুক্তি দিয়েছে, মহৎ জীবন-যাপনে যা তাকে আজীবন সাহায্য করেছে এবং যার জন্য তিনি সারা জগতের কাছে সম্মানিত হয়েছেন—সে হল ধর্মের—সব ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্য, সর্ব মানবের অন্যনিরপেক্ষ ধর্ম, পরমাত্মার সঙ্গে মিলনের জন্য আত্মার ব্যাকুলতা, স্রষ্টা ও পিতার সঙ্গে চিরন্তন ও চিরনবীন মিলন। বলা বাহুল্য, এ হল সেই সর্বব্যাপীর সংজ্ঞাহীন পূজা। আমার মনে হয়, এটা বলা আমার কর্তব্য, দায়িত্বও যে, রাজার ধর্ম ছিল বাইরের নয়, অন্তরের বস্তু। তিনি চাইতেন সব জাতির সর্ব মানব একদিন এই ধর্ম অনুসরণ করবেন; তাঁর এই ভাব অনেক সময়ই প্রকাশ পেত—একটা দৃষ্টান্তই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি। রাণী ভিক্টোরিয়া ভারত সম্রাজ্ঞী হলে তিনি বিপুল এক উৎসবের আয়োজন করেন; এই উপলক্ষে তাঁর রাজভক্তির প্রশংসা করে যে-সব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাদের একটিতে আপনাদের পরিচিত নিম্নলিখিত মন্তব্যটি পড়ে তিনি বিশেষভাবে মুগ্ধ হয়েছিলেন: 'কোন অজ্ঞাত অতীতে এতেই এক মহাজ্ঞানের প্রকাশ হল যে দেবতাগণ একটি মানব হতে বহুমানব সৃষ্টি করলেন, যেমন হাতকে বিভক্ত করেন অঙ্গুলীতে, যাতে হাত বেশী কাজ করতে সক্ষম হয়।' এইটি পড়ে রাজা আমাকে বলেন, 'এই হল ব্যাপার, এই হল আসল কথা। মনে হয়, কথাটা আপনি বুঝতে পেরেছেন।' আরও ব্যাখ্যা করে বলেন, 'মনে হয়, বিশ্বের প্রকৃত ধর্মের বিস্তৃতির জন্য ঈশ্বর পৃথিবীর সর্বজাতির মধ্যে শ্রম বিভাজনের মতো একটা

কিছু করেছেন।'

'এইভাবেই তিনি প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জন করেছিলেন, লাভ করেছিলেন প্রকৃত পণ্ডিতের মর্যাদা—সে শুধু তাঁর স্বদেশ ভারতে নয়, ইংল্যাণ্ড এবং আমেরিকাতেও। ভবিষ্যতের মানুষ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে এই ভক্ত ও চিন্তাবিদকে স্মরণ করবেন।'

বাবু গিরীশচন্দ্র ঘোষ বলেন :

'রাজা রাধাকান্ত দেব শুধু যে সাহিত্য ও রাজনীতি ক্ষেত্রে বিখ্যাত ছিলেন তাই নয়, তিনি ছিলেন একান্তভাবে নিরীহ মানুষ, নৈতিক দিক থেকে সমসাময়িক যে-কোন ব্যক্তি অপেক্ষা তাঁর স্থান ছিল অনেক উর্ধ্বে। চাঁদেও কলঙ্ক থাকে কিন্তু এই মহতী সভায় আমি জোর গলায় বলতে পারি, যে ব্যক্তির স্মরণের জন্য এই সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তাঁর চরিত্রে কোন কলঙ্ক বা ত্রুটি ছিল না। নৈতিক দিক থেকে মহৎ ছিলেন বলেই তিনি সতীপ্রথা রোধকারী আইনের বিরুদ্ধে তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর এই বিরোধিতা স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন গোঁড়ামি থেকে উদ্ভূত হয়নি ; আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বিধাতা তাঁকে পুরুষ না করে যদি স্ত্রীলোকরূপে সৃষ্টি করতেন, আর তাঁকে যদি বিধবার ঐ করুণ ভাগ্যের সম্মুখীন হতে হতো, তাহলে তিনি তাঁর বিশ্বাসের স্বর্গলাভের জন্য স্বেচ্ছায়, স্বেচ্ছায় কেন, মহানন্দে ওভাবে আত্মবিসর্জন দিতেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, সতীপ্রথা দমনের আইন দ্বারা ওঁর দেশের ধর্মপ্রাণা মহিলারা ক্ষুব্ধ হবেন, এই সরল বিশ্বাস থেকেই তিনি ঐ প্রথার বিরোধিতা করেছিলেন। পরিশেষে আইন ব্যবসায়ী, ধর্মযাজক ও স্বদেশীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ যে আন্তরিকতা ও আগ্রহ নিয়ে বর্তমান ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ হিন্দুর প্রতি সম্মান জানালেন, তাঁদের প্রতি আমার গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।'

রাজা রাধাকান্ত তিন পুত্র রেখে যান ; ১. কুমার মহেন্দ্রনারায়ণ দেব, ২. কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব এবং ৩. কুমার দেবেন্দ্রনারায়ণ দেব। জ্যেষ্ঠ ছিলেন নিঃসন্তান ; আর কনিষ্ঠের দুই সন্তান রাজেন্দ্রনারায়ণ ও সুরেন্দ্রনারায়ণ। সুরেন্দ্রনারায়ণ জীবিত আছেন।

রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব, বাহাদুর

রাজা রাধাকান্ত দেব, বাহাদুর, কে সি এস আই-এর মধ্যম পুত্র রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব, বাহাদুরের জন্ম হয় ১৮১৫-র জুন মাসে। মহারাজা নবকৃষ্ণের বংশের বড় তরফের সন্তান, এবং দেব পরিবারের জীবিত পুরুষদের মধ্যে প্রবীণতম ব্যক্তি রাজেন্দ্রনারায়ণকে সরকার 'রাজা' পদবী ও মর্যাদা দিয়ে সম্মানিত করেন। 'খিলাত' অর্থাৎ ঢাল তলোয়ার ও রত্নও যথারীতি পদবীর সঙ্গে দেওয়া হয়। এ বিষয়ে সরকারী পত্রের সারসংক্ষেপ নিম্নে দেওয়া হল :

'বর্তমান শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও বিশিষ্টতম এদেশীয় ভদ্রলোক ছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেব ; কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব তাঁর একমাত্র জীবিত পুত্র। পাণ্ডিত্যের জন্য রাজা (রাধাকান্ত) শুধু এদেশেই নয়, ইওরোপেও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন ; কিন্তু তা ছাড়াও তিনি তাঁর চারিত্রিক মাহাত্ম্য ও পবিত্রতার জন্য সর্ব সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত ছিলেন। ছোটলাট-বাহাদুর বিশ্বাস করেন যে, এরূপ সমুন্নত গুণাবলী সমন্বিত পিতার সন্তানকে (রাজা) পদবীতে ভূষিত করলে এদেশীয় জনগণ আনন্দিত হবেন। পিতার গুণাবলীর অধিকারী তিনি নন, একথা সত্য, তবু পুত্রকে সম্মানিত করারও যথোপযুক্ত কারণ আছে বলে ছোট লাটবাহাদুর মনে করেন। এজন্য তিনি সুপারিশ করছেন যে, যে-বংশের প্রধান পুরুষকে পুরুষানুক্রমে রাজাবাহাদুর পদবীতে ভূষিত করে আসা হচ্ছে, সেই বংশের একমাত্র জীবিত বংশধরকে এই পদবী-দ্বারা সম্মানিত করা সব দিক দিয়েই যুক্তিযুক্ত ও উপযুক্ত।'

১ মে, ১৮৬৯-এর গেজেট অব ইণ্ডিয়াতে প্রকাশিত ৩০ এপ্রিল ১৮৬৯-এর ৫৯৩ সংখ্যক (রাজনৈতিক) বিজ্ঞপ্তিটি ছিল নিম্নরূপ :

'পরলোকগত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, কে সি এস আই-এর গুণাবলীর এবং ব্রিটিশ রাজের প্রতি এই বংশের সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ, সপারিষদ ভাইসরয় তথা গভর্নর জেনারেল তাঁর (রাধাকান্তর) পুত্রকে ব্যক্তিগত সম্মাননা হিসাবে 'রাজা বাহাদুর' পদবী দ্বারা ভূষিত করিতেছেন।'

১৮৭০-এর সরকারী একটি আদেশ-বলে রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণকে যে-কোন

দেওয়ানী আদালতে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত না হবার অধিকার দেওয়া হয়। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান হিন্দু এবং তাঁর পূর্বপুরুষদের ধর্ম সংরক্ষণে তাঁর উৎসাহ ও উদ্যমের জন্য তিনি হিন্দু সম্প্রদায়ের নিকট অত্যন্ত প্রিয়। সংস্কৃত পণ্ডিতদের তিনি বিশেষরূপে পৃষ্ঠপোষকতা করেন; তাঁর ভদ্র, নম্র এবং অমায়িক ব্যবহারের জন্য তিনি সর্বসাধারণের ভালবাসা ও শ্রদ্ধার পাত্র। তিনি 'কায়স্থ কুল সজ্জ রক্ষিণী সভা'র সভাপতি, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভ্য এবং কিছুকালের জন্য 'সনাতন ধর্ম রক্ষিণী সভা'র অন্যতম সহকারী সভাপতি। তাঁর জমিদারীতে তিনি বেশ কয়েকটি পুষ্করিণী খনন করিয়েছেন এবং তাঁর রায়তদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য বহু পাঠশালা স্থাপন করেছেন। কলকাতার কুমারটুলিতে একটি শ্মশানঘাট নির্মাণের জন্য তিনি উদারভাবে অর্থ সাহায্য করেন। জনগণের মঙ্গলজনক কাজে তাঁর উদার দানের হস্ত সব সময়ই প্রসারিত থাকে। রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের বয়স এখন ৬৬ বছর।

তাঁর একমাত্র পুত্র কুমার গিরীন্দ্রনারায়ণ দেব বর্ধমানে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের সরকারী চাকরী করছেন।

ছোট তরফ:

রাজা রাজকৃষ্ণ দেব, বাহাদুর

মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের পুত্র রাজা রাজকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের জন্ম হয় ১৭৮২ খ্রীস্টাব্দে। মাত্র পনের বছর বয়সে তিনি পিতৃহারা হন; ফলে তিনি বিপুল ধনসম্পদ ও বিস্তৃত সম্পত্তির মালিক হওয়ায় রাজপুত্র বা আমীর ওমরাহ্'র মতো জীবন-যাপন করতে থাকেন। তাঁর বিবাহ হয় ১৭৯১ সালে; বিবাহের শোভাযাত্রায় বড়লাট, প্রধান সেনাপতি থেকে শুরু করে উচ্চপদস্থ বহু আধিকারিক যোগদান করেন; তাছাড়া মহারাজা নবকৃষ্ণ যে চার হাজার 'সওয়ার' রাখবার অধিকারী ছিলেন, তারাও এই শোভাযাত্রায় যোগদান করায় যে জাঁকজমকের সঙ্গে এই শুভ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার শোভা অত্যন্ত দর্শনীয় হয়েছিল।

রাজা রাজকৃষ্ণ অত্যন্ত রূপবান এবং দক্ষ অশ্বারোহীও ছিলেন। তিনি বাংলা, হিন্দী ও ফার্সী ভাষা ভালই জানতেন। তাঁর সময়ের সঙ্গীত ও সংস্কৃত শিক্ষার তিনি শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর দান ও উদারতা ছিল সীমাহীন। কুলীন

কায়স্থদের বংশলতিকা ও মেলবন্ধনের উপর তিনি বাংলায় একখানি বই লেখেন॥ তিনি উর্দু ও ফার্সী এই উভয় ভাষাতেই 'দেওয়ান রাজা' ও 'মসনবী রাজা' নামক দু'খানি পুস্তক রচনা করেন। তিনি কাস্টমস হাউস ও কতকগুলি থানা নির্মাণের জন্য সরকারকে জমি দান করেন, এছাড়া ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড নির্মাণের জন্য তিন মাইল দীর্ঘ ভূমি দান করেন। বিভিন্ন স্থানে তিনি একশ'টি পুকুর খনন করিয়েছিলেন। আর খড়দহ থেকে নাটাগড় পর্যন্ত একটি খাল খনন করিয়ে দিয়েছিলেন।

তাঁর পিতার মৃত্যুর পর, ভারতের তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল সার জন ম্যাকফার্সন তাঁকে রাজা উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দের অগাস্ট মাসে মাত্র ৪২ বছর বয়সে রাজা রাজকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি রেখে যান আট পুত্র : ১. শিবকৃষ্ণ, ২. কালীকৃষ্ণ, ৩. দেবীকৃষ্ণ, ৪. অপূর্বকৃষ্ণ, ৫. মাধবকৃষ্ণ, ৬. কমলকৃষ্ণ, ৭. নরেন্দ্রকৃষ্ণ এবং ৮. যাদবেন্দ্রকৃষ্ণ। এঁদের মধ্যে দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ এবং সপ্তম পুত্রের জীবনী এখানে আলোচিত হবে।

রাজা কালীকৃষ্ণ দেব, বাহাদুর

রাজা কালীকৃষ্ণ দেব, বাহাদুর রাজা রাজকৃষ্ণ দেব, বাহাদুরের মধ্যমপুত্র। ১৮৩৩-এ ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক তাঁকে রাজা পদবী, স্বর্ণপদক ও খিলাত দ্বারা সম্মানিত করেন। তাঁর স্বনামধন্য জ্যেঠতুত দাদা রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের মৃত্যুর পর তিনিই হিন্দু ধর্মের মর্যাদা রক্ষা ও প্রসারিত করেন। তিনি রাসেলা, পে'র ফেব্‌লস এবং আরও কয়েকখানি পুস্তক বাংলায় অনুবাদ করেন। মহান সংস্কৃত গ্রন্থ 'মহানাটক' বাংলায় অনুবাদ করে মহামান্যা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অনুমতি নিয়ে তাঁর নামে উৎসর্গ করেন। তাঁর এই সকল অনুবাদের স্বীকৃতিস্বরূপ মহারাণী স্বহস্তে স্বাক্ষর করে তাঁকে একখানি প্রার্থনা পুস্তক উপহার দেন। এ ছাড়া জার্মানীর সম্রাট, ফরাসীদের সম্রাট, বেলজিয়ামের মহামান্য রাজা, অস্ট্রিয়ার মহামান্য সম্রাট এবং অযোধ্যার রাজা সংস্কৃত ভাষায় তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁকে স্বর্ণপদক দ্বারা সম্মানিত করেন। নেপালের মহামান্য সম্রাট তাঁকে 'নাইট অব দি গুর্খা স্টার' খেতাবে ভূষিত করেন।

তিনি গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ারল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সের রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির পত্র-সদস্য ছিলেন। তিনি নিম্নলিখিত পদগুলি অলংকৃত করেন: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, কলকাতা শহরের জাস্টিস অব দি পীস, মেয়ো নেটিভ হাসপাতালের গভর্নর, গভর্নমেণ্ট বেথুন ফিমেল স্কুলের ম্যানেজার এবং সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভার সভাপতি।

রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর, কুমার উদয়কৃষ্ণ বাহাদুর এবং কুমার অমরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর—এই তিন পুত্র রেখে ৬৬ বছর বয়সে ১৮৭৪এর ১১ এপ্রিল তিনি পবিত্র বৃন্দাবনধামে পরলোকগমন করেন।

কুমার অপূর্বকৃষ্ণ দেব, বাহাদুর

মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব, বাহাদুরের পৌত্র এবং রাজা রাজকৃষ্ণ দেব, বাহাদুরের চতুর্থ পুত্র কুমার অপূর্বকৃষ্ণ দেব, বাহাদুর ফার্সী ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। তাছাড়া তিনি ইংরেজী ও সংস্কৃতও জানতেন। কাব্য রচনাতেও তাঁর সবিশেষ দক্ষতা ছিল। স্পেনের রাজা তাঁকে 'নাইট' খেতাব দ্বারা সম্মানিত করেন। ইওরোপের অভিজাত ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত পত্রালাপ ছিল। আচরণে তিনি ছিলেন ন্যায়নিষ্ঠ ও অমায়িক। সর্বোপরি, তিনি মিতব্যয়ী ছিলেন। কুমারকৃষ্ণ ও উপেন্দ্রকৃষ্ণ এই দুই পুত্র রেখে তিনি ১৮৬৭ সালে পরলোকগমন করেন।

মহারাজা কমলকৃষ্ণ দেব, বাহাদুর

মহারাজা কমলকৃষ্ণ দেব, বাহাদুর শোভাবাজার রাজপরিবারের রাজা রাজকৃষ্ণ দেব, বাহাদুরের ষষ্ঠ পুত্র এবং তাঁর জীবিত পুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। তিনিই বর্তমানে

শোভাবাজার রাজপরিবারের ছোট তরফটির কর্তা। ১৮২০ খ্রীস্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং শিক্ষালাভ করেন ভূতপূর্ব হিন্দু কলেজে। কলেজে অধ্যয়ন সমাপ্ত হবার পর তিনি সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর প্রিয় বিষয় ছিল হিন্দুশাস্ত্র। 'গুণাকর' ও 'ভাস্কর' নামক বাংলা পত্রিকা দু'খানি তিনিই প্রকাশ করতেন। এ দু'খানি পত্রিকার প্রধান লেখকও ছিলেন তিনি। ফলে, তিনি বাংলা ভাষায় বিশিষ্ট লেখক হয়ে ওঠেন। কোথায় কখন কী করতে হবে এ সম্বন্ধে তাঁর বিচারবুদ্ধি ছিল তীক্ষ্ণ, আচরণ ছিল আভিজাত্যপূর্ণ আর দানশীলতা ছিল তাঁর স্বাভাবিক। জেলা দাতব্য সমিতিতে তিনি স্থায়ী নিধি সৃষ্টি করে ১২ জন বিধবার স্থায়ী ভরণপোষণের ব্যবস্থা করেন। ত্রিপুরা জেলায় রাস্তা নির্মাণের জন্য জমি, খড়দা পৌর দাতব্য ডিসপেন্সারির জন্য বাড়া, মেয়ো হাসপাতালের বাড়ী নির্মাণে ২০০০ টাকা দান ছাড়াও বার্ষিক চাঁদা-দানের ব্যবস্থা করেন। তিনি ইণ্ডিয়ান সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনকে এককালীন ২০০০ টাকা দান ছাড়াও মাসিক ২৫ টাকা চাঁদা দেবার ব্যবস্থা করেন। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির ছাত্রদের তিনি বার্ষিক বৃত্তি দেন এবং এর গৃহ নির্মাণকল্পে ২০০০ টাকা চাঁদা দিতে চেয়েছেন। ১৮৬৬ ও ১৮৭৪এর দুর্ভিক্ষের সময় তাঁর দানশীলতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। পূর্বোল্লিখিত বৎসর তিনি তাঁর শোভাবাজার বাটিতে বিরাট আকারে এক অন্নসত্র খোলেন ; তাছাড়া এই উপলক্ষে তিনি বাসন, বস্ত্র, কম্বল দান ছাড়াও চাঁদা দিতেন। পরবর্তী দুর্ভিক্ষের সময় তিনি তাঁর খড়দা বাগানবাড়ীতে একটি ত্রাণ-শিবির খোলা ছাড়াও, কেন্দ্রীয় ত্রাণ ফাণ্ডে এককালীন ১০,০০০ টাকা দান করেন। ইণ্ডিয়ান ফেমিন ফাণ্ডে তিনি ২,২০০ টাকা দান করেছেন।

শোভাবাজার রাজপরিবার ব্রিটিশ অধিকার কায়েম হবার সময় থেকে রাজ-ভক্তির যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিলেন তার মধ্যে সেই রাজভক্তির পরিচয় পেয়ে এবং জমিদার হিসাবে তাঁর দানশীলতার স্বীকৃতিরূপে লর্ড লিটন দিল্লীতে ১৮৭৭-এর ১ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত ইম্পিরিয়্যাল অ্যাসেমব্লেজে ব্যক্তিগত সম্মান হিসাবে তাঁকে 'রাজা' খেতাব দ্বারা ভূষিত করেন।

১৮৭৭-এর ১৪ অগাস্ট বেলভেডিয়ারে অনুষ্ঠিত দরবারে বাংলার মাননীয় লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্নর তাঁকে নিম্নলিখিত সনদ প্রদান করেন :

'রাজা, শিষ্টাচারবশত এবং সাধারণভাবে জনগণের মধ্যে আপনি এতদিন রাজা খেতাবেই সম্বোধিত হয়ে আসছেন ; আপনার স্বদেশবাসীর মঙ্গলের জন্য সর্বপ্রকার উদ্যোগে আপনার উদার দানশীলতার জন্য এখন আপনাকে সরকারীভাবে 'রাজা' খেতাব দ্বারা সম্মানিত করা হল। কলকাতার দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহে আপনার উদার দানের পরিমাণ বহুল, আপনার সম্পদের বিরাট অংশ আপনি ডিসপেন্সারি, বিদ্যালয়, রাস্তা ও জনগণের মঙ্গলজনক অন্যান্য কাজের জন্য দান

করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, বিগত দুর্ভিক্ষ ত্রাণের জন্য আপনি ১০,০০০ টাকা, আপনার দেশবাসীর মঙ্গলের জন্য সংগঠিত মেয়ো হাসপাতালের গৃহ নির্মাণের জন্য ২,০০০ টাকা এবং বর্ধমান রিলিফ ফাণ্ডে ১,০০০ টাকা দান করেছেন। কলকাতায় এমন কোন চাঁদা তোলা হয় নি, যেখানে আপনার কাছ থেকে চাঁদা পাওয়া যায়নি—এইভাবে কলকাতার একটি পুরাতন পরিবারের দানের ঐতিহ্য আপনি বজায় রেখেছেন।'

১৮৮০-র ২৩ ফেব্রুয়ারী তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি ও বড়লাট বেলভেডিয়ারে অনুষ্ঠিত দরবারে তাঁকে 'মহারাজা' খেতাবেও ভূষিত করেন। এই উপলক্ষে তাঁকে সনদ এবং খেলাৎ হিসাবে বড় একটি হীরের আংটি এবং প্রথানুযায়ী অন্যান্য উপহার দেওয়া হয়।

১৮৫৭-র সিপাহী বিদ্রোহের সময় মহারাজা ত্রিপুরার গঙ্গামঙ্গল জেলার জমিদাররূপে সরকারকে প্রভূতভাবে সাহায্য করেন। তাঁর দুই পুত্র : ১. কুমার নীলকৃষ্ণ এবং কুমার বিনয়কৃষ্ণ। এঁদের বিবাহের সময় মহামান্য প্রধান সেনাপতি, মাননীয় ছোটলাট বাহাদুর, প্রধান বিচারপতি প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ইওরোপীয় ও দেশীয় ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন।

মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, বাহাদুর

রাজা রাজকৃষ্ণ দেব, বাহাদুরের সপ্তম পুত্রের নাম নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব। তিনি কিছুকাল বিভিন্ন জেলায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের চাকরি করার পর সরকারী কাজে ইস্তফা দেন। তিনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি এবং শহর কলকাতার কমিশনার। প্রতিটি জনসভায় তিনি সক্রিয় অংশ নেন এবং দেশবাসীর সামাজিক, নৈতিক, রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য যে-কোন আন্দোলনে তিনি অগ্রণী। ভাইসরয়ের কাউন্সিলেরও তিনি সভ্য ছিলেন। প্রথমে তাঁকে রাজা খেতাবে ভূষিত করা হয়; পরে দিল্লীতে ১ জানুয়ারী ১৮৭৭-এ অনুষ্ঠিত সামাজিক সমাবেশে তাঁকে 'মহারাজা' খেতাব, পদক ও অন্যান্য সম্মান দ্বারা সম্মানিত করা হয়। ঐ বৎসর ১৪ অগাস্ট মাননীয় ছোটলাট বাহাদুর তাঁকে নিম্নোদ্ধৃত সনদটি উপহার দেন :

মহারাজা,

বঙ্গদেশের প্রাচীন ও অতীব সম্মানিত প্রতিনিধি হিসাবে এবং গভর্নর-জেনারেলের কাউন্সিলের সভ্য ও মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনাররূপে আপনি জনগণের যেরূপ সেবা করেছেন, তার স্বীকৃতিস্বরূপ আপনাকে ইতিপূর্বে 'মহারাজা' খেতাব দ্বারা ভূষিত করা হয়েছে। আমি এখন ঐ খেতাবের আনুষ্ঠানিক সনন্দ আপনাকে প্রদান করছি।

ইংরাজীতে মহারাজার গভীর পাণ্ডিত্য আছে; তাঁর চরিত্রও অতি মহৎ। ইওরোপীয় ও দেশীয় এই উভয় সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ তাঁকে বিশেষ সম্মান করেন। দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও জনগণের জন্য সৃষ্ট নিধিসমূহে তিনি দান খয়রাৎ করেন।

মহারাজার সাত পুত্র। এঁদের মধ্যে মধ্যমজন, কুমার গোপেন্দ্রকৃষ্ণ, এম এ বি এল, এখন বহরমপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের সরকারী চাকুরী করছেন।

রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, বাহাদুর

রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের জ্যে ত্র। ১৮৫১-তে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকুরী নিয়ে বঙ্গ প্রদেশের বিভিন্ন জেলায় চাকুরী করেন এবং পদোন্নতিক্রমে প্রথম শ্রেণীর সাবর্ডিনেট এক্জিকিউটিভ সার্ভিস লাভ করেন। বাংলার ছোটলাট বাহাদুরগণ তার কাজের উচ্চ প্রশংসা করেন; তাঁকে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সভ্য নিয়োগ করা হয়। ১৮৭৪-এর ৪ জুন তাঁকে রাজা পদবীতে ভূষিত করা হয়। বর্তমানে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং ফ্যাকাল্টি অব আর্ট অ্যাণ্ড ল'র সভ্য। এখন তিনি সরকারী চাকুরী থেকে অবসর নিয়ে পেন্সন ভোগ করছেন। তাঁর দুই পুত্র।

শোভাবাজার রাজপরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ :

রাজা সীতানাথ বোস, বাহাদুর

রাজা সীতানাথ বোস, বাহাদুর কৃষ্ণনগরের কুলীন কায়স্থ বাবু মদনমোহন বোসের পুত্র। ইনি মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব, বাহাদুরের ভ্রাতুষ্পুত্র ব্রজমোহন দেবের দৌহিত্র; এঁর লালনপালন ও শিক্ষণ তাঁরই কাছে।

সরকারের বিচার বিভাগে মুন্সেফের চাকুরী নিয়ে রাজা সীতানাথের কর্ম-জীবন শুরু হয়। পরবর্তীকালে তিনি সরকারী তোষাখানার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হন; উদ্যম ও বিজ্ঞতার সঙ্গে এই পদের কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করার জন্য তিনি শীঘ্রই ওপরওয়ালাদের প্রশংসা অর্জনে সক্ষম হন। দুর্বৃত্ত মুসলিম সভাসদদের ষড়যন্ত্রে বাংলার বর্তমান নাবালক নবাব নাজিমের বিষয়-সম্পত্তি তছনছ হচ্ছে দেখে, সরকার রাজা সীতানাথ বোস, বাহাদুরকে নবাব নাজিমের দেওয়ান নিয়োগ করেন। তাঁর কর্মদক্ষতা ও অর্থনৈতিক সুনিয়ন্ত্রণের ফলে নবাব নাজিমের এস্টেটে আবার শৃঙ্খলা ফিরে আসে; তাঁর এই কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ সরকার তাঁকে রাজা বাহাদুর খেতাব ও খেলাৎ দ্বারা সম্মানিত করেন। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে সারাজীবনের পরিশ্রমের ফল ভোগ করবার জন্য তিনি চাকুরী থেকে অবসর নেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর একমাত্র কন্যাকে রেখে যান; তিনিই রাজা বাহাদুরের সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী।

রাজা প্রসন্ননারায়ণ দেব, বাহাদুর

ইনি মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব, বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীনারায়ণ দেবের প্রপৌত্র।

সরকারের বৈদেশিক বিভাগীয় সচিবের দফতরের সঙ্গে যুক্ত সরকারী

তোষাখানায় ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেন্টরূপে তিনি তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। তাঁর জ্ঞাতি ভ্রাতা রাজা সীতানাথ বোস বাহাদুর উক্ত অফিসের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট পদ ত্যাগ করলে, তাঁকে তাঁর কর্মদক্ষতা, বুদ্ধিমত্তা এবং সততার জন্য উক্ত পদে উন্নীত করা হয়।

তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সততার জন্য তিনি লর্ড এলেনবরো ও লর্ড হারডিঞ্জ-এর মতো গভর্নর-জেনারেলদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেন; তাছাড়া স্যার হার্বার্ট ম্যাডক, অনারেব্‌ল্ মিঃ টমসন, স্যার এফ কারি এবং স্যার হেনরি এলিয়টের মতো চীফ সেক্রেটারিগণও তাঁর সম্পর্কে এই উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন যে, তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও উচ্চ গুণের অধিকারী। তাঁর এই সকল গুণের জন্য তিনি ১৮৪৭-এ রায় বাহাদুর এবং পরবর্তীকালে রাজাবাহাদুর খেতাব দ্বারা ভূষিত হন।

রাজা প্রসন্ননারায়ণ দেব, বাহাদুরের চরিত্রবত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড হারডিঞ্জ নিম্নোদ্ধৃত মত প্রকাশ করেন :

কলকাতা ৩ জানুয়ারী, ১৮৪৮

তোষাখানার অধীক্ষক (রাজা) প্রসন্ননারায়ণ দেব, (বাহাদুরের) অতি উচ্চমানের সেবার কথা লিখতে আনন্দ বোধ করছি। বেশ কয়েকবার এই অফিসারটি তাঁর বিভাগ নিয়ে আমার সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে গেছেন এবং বহুবারই আমি প্রকাশ্য দরবারে ও অন্যত্র তাঁর সেবার প্রশংসা করেছি। শতদ্রু অভিযানের সময় এবং আপার প্রভিন্সে আমার অবস্থানের সমগ্র সময় বিশেষত আমার লাহোরে অবস্থান কালে 'রায়' আমার সঙ্গে ছিলেন ; ঐসব সময় অতীব দায়িত্বপূর্ণ কাজ তাঁকে দেওয়া হয়েছিল ; যে কর্তব্যপরায়ণতার সঙ্গে তিনি ঐ সকল কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন, তাতে আমি পূর্ণ সন্তোষ লাভ করেছিলাম।

গত বৎসর তাঁকে আমি রায় বাহাদুর খেতাব দ্বারা ভূষিত করেছিলাম ; আমার ঘোষণা সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর মহান গুণসমূহ তাঁর উন্নত ব্যক্তিগত চরিত্র, তাঁর সম্ভ্রান্ত বংশ পরিচয় ও সম্মানিত পারিবারিক সম্পর্ক বিবেচনা করে, আমি তাঁকে রাজা খেতাব ও মর্যাদার সম্পূর্ণ যোগ্য বলে বিবেচনা করি।

কিন্তু তিনি বর্তমানে যে পদে চাকুরী করছেন, তাতে এখনই তাঁকে উক্ত খেতাব দ্বারা সম্মানিত না করে তাঁর অবসর গ্রহণ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত হবে।

ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ আমার এই মন্তব্য ; এর একটি প্রতিলিপি আমি

'রায়'কে দিয়ে যাচ্ছি। আমার ইচ্ছা, আমি ইংল্যাণ্ড ফিরে গিয়ে তাঁকে উপযুক্ত খোদিত মন্তব্যসহ একটি স্বর্ণপদক উপহার হিসাবে পাঠাব।

স্বাঃ হারডিঞ্জ

রাজা সীতানাথ ঘোস, বাহাদুরের মৃত্যুর পর সরকারের সুপারিশে নবাব নাজিমের দেওয়ানের পদে রাজা প্রসন্ননারায়ণ দেব বাহাদুরকে নিযুক্ত করা হয়। বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে তিনি এই পদের কর্তব্য সম্পাদন করেন। নবাবের এস্টেটের কার্যপরিচালনার ব্যাপারে তিনি যেসব পরিবর্তন সুপারিশ করেন, সেগুলি সরকার ও নবাব উভয় তরফ থেকেই অনুমোদিত হয় : অতীতে অযোগ্য পরিচালনার জন্য নিজামতটি ধ্বংস হবার উপক্রম হয়েছিল; তাঁর সুপরিচালনায় সেটি রক্ষা পায়।

মহামান্য নবাব নাজিমের অনুমতি নিয়ে, সরকার প্রসন্ননারায়ণ দেব, বাহাদুরকে বৈদেশিক বিভাগের সহকারী সচিব নিয়োগ করে মাননীয় গভর্নর জেনারেলের সঙ্গে লখ্‌নৌ ও কানপুর প্রেরণ করেন। সরকারদত্ত সম্মান বেশী দিন ভোগ করবার জন্য তিনি জীবিত ছিলেন না। ১৮৭০এ তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি কুমার যোগেন্দ্রনারায়ণ ও কুমার যতীন্দ্রনারায়ণ এই দুই পুত্র রেখে যান। কুমার যোগেন্দ্র-নারায়ণের মৃত্যু হয় ১৮৭৯ সালে।

কলুটোলার সেন পরিবার

কলুটোলার সেন বংশের আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আছে। এঁদের আদি নিবাস হুগলী শহরের বিপরীত তীরে অবস্থিত ২৪ পরগণা জেলার গরিফায়। জনগণ এই পরিবারটিকে শ্রদ্ধা করে এই কারণে যে, এঁরা খ্যাতি অর্জন করেছেন সাহিত্য, শিক্ষা ও সামাজিক প্রগতির পক্ষে এঁদের আন্দোলনের জন্য; তৃতীয় পুরুষেও এঁদের এই পারিবারিক প্রচেষ্টা আদৌ হ্রাস পায় নি। প্রাচীন হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ জাতি প্রধানত নিযুক্ত থাকতেন পূজা পাঠ প্রভৃতি পৌরোহিত্যের কাজে, আর বৈদ্য বা চিকিৎসক জাতিটি সাহিত্য ও শিক্ষায় মগ্ন থাকতেন; কাজেই কলুটোলার এই বৈদ্য সেন পরিবারটি যে সাহিত্যকেই প্রধান পেশা হিসাবে গ্রহণ করবেন এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। রামবাগানের দত্তদের

মতই বলুটোলার এই সেন পরিবারটিও প্রধানত সাহিত্যিক পরিবাররূপে পরিচিত; আর ঐ দত্ত পরিবারের ব্যক্তিদের মতই, এই সেন পরিবারের ব্যক্তিদেরও সব সময় সরকারের অতি উচ্চ পদে নিয়োগ করা হয়েছে। এই পরিবার দুটির শিক্ষা ও সাহিত্যগত বৈশিষ্ট্যের জন্য সরকারও এঁদের বরাবর সম্মানের চক্ষে দেখেছেন।

রামকমল সেন

এই পরিবারের যে-ব্যক্তি প্রথম খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করেন, তাঁর নাম রামকমল সেন। সাধারণ্যে তিনি দেওয়ান রামকমল সেন নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁর পিতার নাম গোকুলচন্দ্র সেন; বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি আন্তরিক নিষ্ঠা ও কঠোরভাবে তার আচার অনুষ্ঠান পালন করার জন্য তাঁর কিছু খ্যাতি ছিল। স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তা ও অনুসন্ধিৎসা ঠিকপথে পরিচালিত ও নিয়োজিত হলে মানুষ যে কতখানি উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারেন, রামকমল ছিলেন তার অন্যতম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রামকমল যে-যুগে জন্মেছিলেন, তখন আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থার কল্পনাও কেউ করেন নি। রামকমল ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার সে সীমাবদ্ধ সুযোগ-সুবিধার সদ্ব্যবহার করেন; সে যুগে যাঁরা প্রাথমিক ইংরাজী শিক্ষা দিতে পারতেন, সেই ধরনের শিক্ষকদের কাছে শিক্ষা নিয়ে ও কঠোর শ্রম সাপেক্ষ অধ্যয়নের মাধ্যমে তিনি ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য বলা ও লেখায় এমন অধিকার অর্জন করেন যে, সে যুগের পক্ষে তা ছিল একান্তই দুর্লভ। একমাত্র নিজ চেষ্টাতেই তিনি খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করেছিলেন। প্রাচীন এই পরিবারটি ভাগ্য বিপর্যয়ে দারিদ্র্যের স্তরে নেমে গিয়েছিল; রামকমল তাঁর প্রতিভা, চারিত্রিক সততা, দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার দ্বারা ছাপাখানার সামান্য কম্পোজি-টারের পদ থেকে ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলের দেওয়ানের পদে উন্নীত হতে পেরেছিলেন; উল্লেখযোগ্য যে, তখন সরকারই ছিলেন এই ব্যাঙ্কের মুখ্য অংশীদার ও পরি-চালক। তাঁর পিতা গোকুলচন্দ্র ছিলেন হুগলী আদালতের সেরেস্তাদার; মাসিক মাইনে ছিল ৫০ টাকা; বৈষ্ণব ধর্ম ও সম্প্রদায়ের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। ধর্মপ্রাণ পিতার সন্তান রামকমলও ছিলেন একান্তভাবেই

ধর্মপ্রাণ ; জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দুরূপেই জীবন অতিবাহিত করেছেন ; পিতৃপিতামহের ধর্মের প্রতি তাঁর আস্থা ছিল আজীবন অম্লান। ধর্মের প্রতি এমন নিষ্ঠা সত্ত্বেও, এবং নিজ ধর্মবিশ্বাস থেকে কখনও একচুল বিচ্যুত না হয়েও তিনি খোলামেলাভাবে ইওরোপীয় সমাজে মিশতেন ; সেখানে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। এত গোঁড়া হওয়া সত্ত্বেও ইওরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞান ও রীতিনীতি যে হিন্দু সমাজকে আমূল পরিবর্তিত ও পুনর্গঠিত করে উন্নত নব জীবনের পথে পরিচালনা করতে পারবে, তিনি তাদের গুরুত্ব ও মূল্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। বাংলায় গভীর জ্ঞান এবং ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের অধিকারী রামকমল তাঁর বাস্তব বুদ্ধি নিয়ে সানন্দে বাংলায় প্রগতির পথ-প্রদর্শক হলেন। যে উদ্দীপনা থাকলে মহৎ হৃদয়ের চিন্তাশীল মানুষ প্রচণ্ড জীবনীশক্তি লাভ করে, রামকমল সেই উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে জনগণের প্রগতির জন্য সরকার যে-সব সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করেছিলেন, তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন। বাংলার জনগণের প্রগতিমূলক প্রতিটি প্রকল্পে তিনি প্রধান ও সক্রিয় অংশ নিতেন। তিনি তাঁর সময়ের প্রতিটি সোসাইটি ও কমিটির সক্রিয় সদস্য ছিলেন। এদেশীয়দের শিক্ষার জন্য গঠিত হয়েছিল হিন্দু ও সংস্কৃত কলেজ ; এই উভয় কলেজেরই পরিচালন সমিতির তিনি সক্রিয় সদস্য ছিলেন। কালক্রমে তিনি বাংলার নেটিভ এডুকেশন প্রকল্পের সঙ্গে একীভূত হয়ে গেলেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনায় তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার গভীরতা এবং শিক্ষা আন্দোলনের প্রতি তাঁর উদার সহানুভূতি থাকায়, এদেশীয় (নেটিভ) হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে পেরেণ্টাল অ্যাকাডেমিক ইন্‌স্টিটিউশনের পরিচালন সংক্রান্ত কমিটির সদস্য করে নেওয়া হয়েছিল ; পরে এই প্রতিষ্ঠানটিকে মধ্যবিত্ত ইওরোপীয় ও ইওরেশীয় তরুণদের শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত ডাভ্‌টন কলেজের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়।

এদেশীয়দের মধ্যে শিক্ষার প্রসারে তিনি শুধু উপদেশ বা পরামর্শ দিয়ে ক্ষান্ত থাকতেন না, স্বয়ং এ-বিষয়ে এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল ও এগ্রিকালচারাল অ্যাণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটির জার্নাল দুটিতে লিখতেন, বিশেষত তাঁর বিখ্যাত বাংলা-ইংরাজী অভিধানখানি শিক্ষাবিস্তারে তাঁর শ্রমের প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধাবলী, বিশেষত তাঁর অভিধানের তিনি যে ভূমিকা লিখেছিলেন সেটি পড়লে বোঝা যায়, কারও কাছে থেকে বিশেষ কোন সাহায্য না পেয়েও, একমাত্র স্বীয় পরিশ্রম ও চেষ্টার দ্বারা তিনি ইংরাজী ভাষায় কিরূপ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর মননশক্তি ও হৃদয়বত্তার জন্য এদেশবাসী বহুকাল অবধি তাঁকে স্মরণে রাখবেন ; তাঁর কর্মময়-জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষা ও

সাহিত্যের বোডেন অধ্যাপক হোরেস হেম্যান উইলসনের কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন—জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ও উইলসন ছিলেন ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত বন্ধু। পাশ্চাত্য প্রথায় শিক্ষার মূল্য রামকমল সেন অভ্রান্তভাবেই উপলব্ধি করে এর বিস্তারে তাঁর সমগ্র শক্তি, বিশেষ করে তাঁর মানসিক শক্তি প্রয়োগ করেন। পেশার দিক থেকে তিনি যে-সব পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সে-সব পদের প্রকৃতি অনুযায়ী অর্থার্জন ও ব্যবসায় বাণিজ্যের দিকেই তাঁর ঝোঁক থাকা ছিল স্বাভাবিক, কিন্তু তাঁর প্রচারবিমুখ নীরব স্বদেশ-প্রীতির জন্য তিনি কর্ম-ব্যস্তজীবনে যতখানি সম্ভব সময় ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব দিয়ে শিক্ষাপ্রসারে ব্রতী হয়েছিলেন।

রামকমলের জন্ম হয় ১৭৮৩-র ১৫ মার্চ; স্বগ্রাম গরিফা ত্যাগ করে ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের ১৯ নভেম্বর থেকে তিনি জীবিকার্জন শুরু করেন। ১৮০২-এর ডিসেম্বর তিনি কলকাতার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ব্ল্যাকোয়ারের কেরাণী পদে নিযুক্ত হন। এর এক বছর পর, অর্থাৎ ১৮০৩এর ডিসেম্বরে তিনি বিবাহ করেন। প্রথম চাকরী ছেড়ে দিয়ে তিনি এবার সরকারী স্থপতি মিঃ ব্লেচিনডিনের অধীনে চাকরী নেন। সে চাকরী ছেড়ে দিয়ে ১৮০৪-এর জুলাই-এ ডাঃ হাণ্টারের অধীনে চাকরীতে বহাল হন; তার সঙ্গে হিন্দুস্তানী প্রেসের ভারও গ্রহণ করেন। ১৮০৬-এ তিনি প্রথম এসিয়াটিক সোসাইটির সংস্রবে আসেন। চাঁদনীর নেটিভ হাসপাতালের তিনি ভার নেন ১৮০৮-এর নভেম্বর মাসে। ১৮১১-র মার্চ মাস থেকে তিনি ডাঃ হোরেস হেম্যান উইলসনের জন্য কাজ করতে থাকেন। ১৮১২-তে তিনি লেফটেন্যান্ট র‍্যামজের অধীনে ফোর্ট উইলিয়ামে চাকরী নেন।

তখন হিন্দু কলেজের (তদানীন্তন নাম 'বিদ্যালয়') ডিরেক্টর ছিলেন রাজা গোপীমোহন দেব, বাবু (পরে, রাজা স্যার) রাধাকান্ত দেব, বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, শ্রীকিষেণ সিং, বাবু গুরুপ্রসাদ বসু, বাবু শিবচন্দ্র সরকার, বাবু 'রসোময়' দত্ত, মিঃ ডেভিড হেয়ার ও মিঃ জে সি জি সাদার্ল্যাণ্ড—এঁদের সঙ্গে রাম-কমলও ছিলেন অন্যতম ডিরেক্টর। তিনি উক্ত কলেজের ম্যানেজিং কমিটিরও সভ্য ছিলেন; তাছাড়া, তিনি ছিলেন অনারেবল (পরে লর্ড) টি বি মেকলে'র সঙ্গে পাবলিক ইন্‌স্ট্রাকশন কমিটির অবৈতনিক সদস্য। উল্লেখযোগ্য যে, এদেশীয়দের মধ্যে (পাশ্চাত্য প্রথায়) শিক্ষাবিস্তার সম্পর্কে মিঃ মেকলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রামকমলের মতামতের সঙ্গে সহমত হতেন। কমিটি অব পাবলিক ইন্‌স্ট্রাকশন পরে কাউন্সিল অব এডুকেশনের সঙ্গে যুক্ত হলে, তাঁকে কাউন্সিলেরও সভ্য করা হয়—মনে হয়, তিনি কিছুকাল এর সম্পাদকরূপেও কাজ করেছিলেন। তাঁকে সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক ও সুপারিনটেন্ডেন্ট করা হয়; উল্লেখযোগ্য যে,

এই পদে ইতিপূর্বে পর্যায়ক্রমে অধিষ্ঠিত ছিলেন অধ্যাপক এইচ এইচ উইলসন ক্যাপটেন প্রাইস, ক্যাপটেন মার্শাল ও ক্যাপটেন ট্রয়ার। এদেশীয়দের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে উৎসাহী বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের ন্যায় অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে তিনিও ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির সভ্য ছিলেন। রাজা নরসিংচন্দ্র রায়, বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, মিঃ রুস্তমজী-কাউয়াসজী ও অন্যান্য কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে তিনিও নেটিভ্ হস্‌পিট্যালের গভর্নর ছিলেন। তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির কমিটি অব পেপার্সের 'নেটিভ মেম্বার' ছিলেন। এগ্রিকালচারাল ও হর্টিকাল-চারাল সোসাইটি অব ইণ্ডিয়ার তিনি ছিলেন 'নেটিভ সেক্রেটারী'; তাছাড়া বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও রাজা রাধাকান্ত দেবের সঙ্গে তিনিও এই প্রতিষ্ঠানের কয়েকটি স্ট্যাণ্ডিং কমিটির 'নেটিভ মেম্বার' ছিলেন; পরবর্তীকালে তিনি রাজা রাধাকান্ত দেবের সঙ্গে উক্ত প্রতিষ্ঠানের যুগ্ম সহ-সভাপতি হন। উল্লেখযোগ্য যে, সে-সময় সাহিত্য সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান বলতে ছিল এসিয়াটিক সোসাইটি আর বিজ্ঞান বিষয়ের প্রতিষ্ঠান ছিল এগ্রিকালচারাল অ্যাণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি। ডাঃ কেরির সঙ্গে তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য সমভাবে পরিশ্রম করতে থাকেন; এর মুখপত্র 'ট্রান্‌জ্যাক্‌শনে' তিনি 'ভারতে কাগজ উৎপাদন' শীর্ষক একটি মূল্যবান প্রবন্ধ লেখেন: বাবু হেমচন্দ্র কের্ (কর) তাঁর পাট সম্পর্কিত প্রতিবেদনে এই প্রবন্ধ থেকে বহু উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

জনগণের মঙ্গলের জন্য রামকমলের আগ্রহ এত প্রবল ছিল যে, স্বদেশীয়দের মঙ্গল ও উন্নতিবিধানের জন্য তিনি তাঁর সময়ের কত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন তাদের নাম উল্লেখ করাও প্রায় অসম্ভব। ক্যালকাটা ডিস্‌ট্রিক্‌ট চ্যারিটেবল্ সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি এই জনহিতৈষী ও প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানটির সাহায্যে এগিয়ে আসবার জন্য এদেশীয় ধনীদের উদ্দেশে একটি আবেদনপত্র প্রচার করেন। এজন্য এবং তাঁর অন্যান্য সেবামূলক কাজের জন্য, তাঁকে উক্ত সমিতির সহ-সভাপতি নিয়োগ করা হয়। দরিদ্রতর শ্রেণীর মানুষদের প্রতি তাঁর আন্তরিক সহানুভূতির নিদর্শনস্বরূপ তিনি 'আম্‌স্‌হাউস' কে তার নিজস্ব গৃহনির্মাণের জন্য এক খণ্ড জমি দান করেন। বহু ইওরোপীয় ও দেশীয় কর্তৃক সমর্থিত এবং (সম্ভবত) বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও কয়েকজন বে-সরকারী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তখনকার একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান 'ল্যাণ্ড-হোল্ডার্স' সোসাইটিরও তিনি সভ্য ছিলেন। বর্তমান 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' কেবলমাত্র দেশীয় সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকগণ দ্বারা গঠিত—এদিক থেকে উক্ত সোসাইটির প্রকৃতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। ডাঃ রোণাল্ড মার্টিনের সুপারিশ ক্রমে লর্ড উইলিয়াম বেন্‌টিংক তাঁকে মিউনিসিপ্যাল কমিটিরও সদস্য নিযুক্ত করেন। তাঁরই গভীর জ্ঞান ও দূরদৃষ্টি আর ডাঃ আইজ্যাক্ জ্যাকসনের বাস্তব বুদ্ধির জন্য

কলকাতা শহরের স্বাস্থ্যবিষয়ক বহু উন্নতি সাধিত হয়েছে। এদেশীয়দের মঙ্গলের জন্য এই কমিটি যে-সকল স্থপারিশ করেন, তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল 'ফিভার হসপিট্যাল' স্থাপন ; এটি পরে ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজ নামে জনগণের কাছে পরিচিত হয়েছে। বলা বাহুল্য সরকার কমিটির স্থপারিশটি গ্রহণ করেছিলেন। এটি এখন ভারতের সমশ্রেণীর হাসপাতালগুলির মধ্যে সর্ববৃহৎ।

তিনি শুধু যে এদেশীয়দের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের উৎসাহী প্রবক্তা ছিলেন তাই নয়, সে সময় খুব কম লোকই যে-দিকে নজর দিতেন, সেই কৃষির উন্নতির জন্যও তিনি সোচ্চার হন ; তাছাড়া তখনকার রাজনৈতিক সংগঠনকে তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি দিয়ে তিনি যে-ভাবে সমর্থন করেছিলেন এবং বিশেষজ্ঞ না হয়েও তিনি যে-ভাবে কলকাতার স্বাস্থ্য-বিষয়ক কার্যপ্রণালী সম্পর্কে স্থপারিশ করেছিলেন, তা সত্যই বিস্ময়কর।

তাঁর মৃত্যুতে এগ্রিকালচারাল অ্যাণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া তাঁদের শোকপ্রস্তাবে বলেন, 'আমাদের যে-সকল সভ্যকে মৃত্যু ছিনিয়ে নিয়েছে, তাঁদের অভাবে সোসাইটি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কিন্তু সব থেকে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হল রামকমল সেনের মৃত্যুতে। সোসাইটি গঠিত হবার অল্প দিনের মধ্যেই তিনি এর সঙ্গে যুক্ত হন ; সর্বপ্রথম যাঁরা এর সদস্য হন, তাঁদের মধ্যে জীবিত সামান্য কয়েকজনের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। বেশ কয়েক বৎসর তিনি এর দেশীয় সেক্রেটারী ও কালেক্টর ছিলেন ; কিছুকাল পূর্বে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সহসভাপতির পদেও বৃত হন। যে যুগে এদেশবাসী দেশের উন্নতি বিধানের দিকে আদৌ নজর দিতেন না, সেই সময় তিনি কাজের দ্বারা স্বদেশবাসীর সামনে সৎদৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। প্রতিটি মাসিক সভায় তিনি নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন ; এর কার্যাবলীতে সক্রিয় অংশ নিতেন। সোসাইটি দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছে যে এ-বিষয়ে এদেশীয়দের মধ্যে তিনিই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি।'

তাঁর মৃত্যুর পাঁচ দিন পর, অর্থাৎ ১৮৪৪-এর ৭ আগস্ট অনারেবল স্যার এড্‌ওয়ার্ড রায়ানের সভাপতিত্বে এসিয়াটিক সোসাইটিতে একটি শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে গৃহীত শোকপ্রস্তাবের সারাংশ আমরা নিচে উদ্ধৃত করছি :

'সম্পাদক গভীর দুঃখের সঙ্গে একজন পুরাতন, বিশেষ প্রতিভাবান সহযোগীর মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করেন। সোসাইটির প্রাক্তন একনিষ্ঠ কর্মচারী, দেওয়ান রামকমল সেন, তাঁর শিষ্টাচার ও উল্লেখযোগ্য বিদ্যাবত্তার জন্য যেমন খ্যাত ছিলেন, ততোধিক খ্যাতি ছিল শিক্ষা বিস্তারে তাঁর অবিরাম চেষ্টার জন্য, সৎ ও প্রয়োজনীয় কাজে তাঁর অক্লান্ত উৎসাহ ও পরিশ্রম যার দ্বারা ইওরোপীয় ও দেশীয় জনগণের সকলেই উপকৃত হতেন, সেই উৎসাহ ও পরিশ্রমের জন্য ; ততোধিক খ্যাতি

ছিল তাঁর অমায়িক ব্যবহার, আত্মপ্রচার-বিমুখতা এবং সীমাহীন দানশীলতার

'মিঃ কোলব্রুক, অধ্যাপক উইলসন, মিঃ ডব্‌ল্যু বি বেইলে এবং অন্যান্য বহু বিশিষ্ট ইওরোপীয় ভদ্রলোক যাঁরা কর্মব্যপদেশে এককালে ভারতে ছিলেন, তিনি (রামকমল) ছিলেন তাঁদের বন্ধু ; পত্র মারফতও তাঁদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল ; ফলে এদেশের মতো ইওরোপেও তিনি স্বদেশীয় সাহিত্যে তাঁর পাণ্ডিত্য এবং তাঁর স্বদেশীয়গণ যাতে জগৎসভায় তাঁদের হৃতস্থান পুনরুদ্ধার করতে পারেন, সে জন্য তাঁর তীব্র আগ্রহের জন্যও তিনি বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। এবং (আমরা বলতে পারি যে) এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টাতেই তাঁর সমগ্র জীবন ব্যয়িত হয়েছে। তাঁর এই উৎসাহ অতি উৎসাহে পরিণত হওয়ায় অত্যধিক অধ্যয়ন এবং ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলের দেওয়ানের মতো দায়িত্বপূর্ণ পদের অত্যধিক পরিশ্রম সম্ভবত তাঁর অকালমৃত্যুর কারণ।'

মাননীয় সভাপতি কর্তৃক উত্থাপিত এবং উপস্থিত সকলের দ্বারা সমর্থিত একটি প্রস্তাবে বলা হয়, সোসাইটি এই (দেওয়ান রামকমল সেনের) মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাভিভূত, একথা একখানি পত্রদ্বারা তাঁর পরিবারবর্গকে জানান হোক।

'বাবু হরিচরণ সেন সমীপেষু—

আপনার পিতার মৃত্যু-সংবাদে সোসাইটি গভীর ও অকৃত্রিম শোক পেয়েছে—এই সংবাদ আপনাকে জানাতে ও পরিবারের অন্যান্যদের জানাবার জন্য আপনাকে অনুরোধ করতে, আমি সোসাইটির মাননীয় সভাপতি ও সদস্যগণ কর্তৃক নির্দেশিত হয়েছি। মহাশয়, সোসাইটির মাননীয় সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ একথা আপনাকে, আপনাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্য ও বন্ধুবান্ধবকে না জানিয়ে পারেন না যে, তাঁর পাণ্ডিত্য ও সাহিত্যকৃতি, এদেশীয়দের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারে তাঁর নিরন্তর প্রয়াস, তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রচারিত বহু গুণাবলী, এবং সোসাইটির জন্য তাঁর মূল্যবান সেবামূলক কার্যাবলীর জন্য সোসাইটি এবং এদেশের ও ইওরোপের বহু জ্ঞানীগুণী তাঁকে অসীম শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছিলেন। সোসাইটি তাঁর মৃত্যুতে যেমন গভীর শোক প্রকাশ করছে, তেমনি তাঁর স্মৃতিও এই প্রতিষ্ঠান চিরকাল বহন করবে। ইতি—

মিউজিয়াম,
৯ আগস্ট, ১৮৪৪

(স্বাঃ) এইচ্‌ টরেন্স,
সহ-সভাপতি ও সম্পাদক
এশিয়াটিক সোসাইটি

দেওয়ান রামকমল সেনের মৃত্যুতে মিঃ জন ক্লার্ক মার্শম্যান কর্তৃক সম্পাদিত

'দি ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র ১৮৪৪-এর ১৫ আগস্ট তারিখের সংখ্যায় নিম্নোক্ত শোকজ্ঞাপক লেখাটি প্রকাশিত হয় :

'গত কয়েকদিন যাবৎ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলের দেওয়ান বা ট্রেজারার রামকমল সেনের মৃত্যু সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। এদেশীয়দের মধ্যে তিনি যে উচ্চস্থানের অধিকারী হয়েছিলেন এবং তাঁর স্বদেশবাসীদের ওপর তাঁর যে প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল, সে কথা বিবেচনা করলে, তাঁর মৃত্যু সংবাদটুকুমাত্র প্রকাশ করা যথেষ্ট বলে মনে হয় না। বর্তমান শতাব্দীতে যে-সব দেশীয় ভদ্রলোক ধনার্জন ও দানের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছেন, রামকমল সেন ছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। আরও এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁরা অজ্ঞাত অপরিচিত অবস্থা থেকে মহাধনী হয়ে উঠেছেন, কিন্তু তাঁদের কেউই শিক্ষা সংস্কৃতিতে তাঁর মতো প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারেন নি। 'বিশোনাথ' মতিলাল মাসিক আট টাকা মাইনের চাকরী নিয়ে জীবন শুরু করেন; পরে তিনি লবণগোলার দেওয়ান হয়েছিলেন; ঐ পদ ত্যাগ করতে বাধ্য হওয়ার আগে তিনি, শোনা যায়, বারো থেকে পনের লাখ টাকার মালিক হয়েছিলেন। বাবু আশুতোষ দেবের পিতা এবং ঐ দেব পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা রামদুলাল দে'র জীবন আরম্ভ হয় দেশীয় একজন মনিবের অধীনে মাসিক পাঁচ টাকা মাইনের চাকরী নিয়ে, পরে তিনি প্রাক্তন ফেয়ার্লি, ফার্গুসন অ্যাণ্ড কোম্পানির কেরাণী হন—এরপর চাকরী পান মার্কিন বণিকদের অধীনে—তাঁরা তো তাঁদের একটি জাহাজের নামকরণ করেন তাঁরই নামে—'রামদুলাল দে।' ভারতের রথ্‌স্‌চাইল্ড, মুদ্রা বাজারের বর্তমান একচ্ছত্রাধিপতি মতিবাবু জীবন শুরু করেন দশ টাকা মাইনের চাকরী নিয়ে। রামকমল সেনও নিজে হাতে তাঁর ভাগ্য গড়েছিলেন। মাসিক আট টাকা মাইনেয় তিনি ডাঃ হান্‌টারের হিন্দুস্তানী প্রেসে কম্পোজিটারের চাকরী নিয়ে জীবন শুরু করেন। জীবনশেষে তাঁর বংশধরদের জন্য তিনি যা রেখে গেছেন—উপরিউক্ত ব্যক্তিদের সঞ্চিত অর্থ অপেক্ষা তার পরিমাণ অনেক কম—কেউই এর পরিমাণ দশ লক্ষ টাকার বেশী বলেন নি—তবুও তিনি অনেক বেশী ও স্থায়ী যশের অধিকারী হয়েছেন; এর কারণ, জ্ঞান ও সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আর স্বদেশবাসীর উন্নতির জন্য একনিষ্ঠ বিরতিহীন প্রচেষ্টা।

'ছাপাখানার ঐ নীচু পদে তিনি বেশী দিন থাকেন নি। বর্তমানে অকসফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক ডাঃ উইলসনের দৃষ্টি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়; রাম-কমলের স্বাভাবিক দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা এবং জ্ঞানপিপাসা লক্ষ্য করে ডাঃ উইলসন তাঁকে সামনের সারিতে- এগিয়ে আনবার সকল সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। রামকমলের প্রথম পদোন্নতি, আমাদের ধারণা,' এশিয়াটিক সোসাইটিতে নিয়োগ—

পদটি অবশ্য নীচের দিকেরই ছিল। এখানে এসে তিনি তখনকার ইওরোপীয়দের মধ্যে বিশেষ বিশিষ্ট কয়েকজনের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হন। এদিকে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার জন্য তিনি কঠোর পরিশ্রম করতে থাকেন। ফলে অল্পকালের মধ্যে তিনি অবাধে দ্রুত ইংরাজী বলবার ক্ষমতা অর্জন করেন। আমরা যে সময়ের কথা বলছি, তখন দ্রুত নির্ভুল ইংরাজী বলবার ক্ষমতা এদেশীয়দের মধ্যে ছিল দুর্লভ; কাজেই এই ক্ষমতা তখন বিশিষ্টতা অর্জনে বিশেষ সহায়ক ছিল। শীঘ্রই রামকমল সুশিক্ষিত এদেশীয়দের নেতৃস্থানীয়রূপে পরিগণিত হতে থাকেন। ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হলে তাঁকে এর (কার্যনির্বাহক) সমিতির সভ্য করা হয়। তিনিও কয়েকখানি বই রচনা ও অনুবাদ করে সমিতির পক্ষে প্রয়োজনীয় কাজ করেন। পরবর্তী বৎসর হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে, তাঁর চির-উপকারী পৃষ্ঠপোষক ডাঃ উইলসনের সুপারিশক্রমে নবগঠিত প্রতিষ্ঠানটিকে সংগঠিত করবার ভার পড়ে রামকমলের উপর। এখানে রামকমল স্বদেশবাসীর মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে তাঁর আগ্রহ ও উৎসাহকে রূপ দেবার পরম সুযোগ লাভ করলেন; তাছাড়া জটিল পরিস্থিতিতে সুব্যবস্থা প্রবর্তনের দক্ষতা প্রমাণেরও অবকাশ পেলেন। এই প্রতিষ্ঠানে এসে দেশীয়দের মধ্যে তাঁর মর্যাদা উন্নত স্থানে প্রতিষ্ঠিত হল, এবং ভবিষ্যৎ জীবনে তিনি যে প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন তার ভিত্তিও এখানেই স্থাপিত হল। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার তিন বৎসর পর তিনি ও মিঃ ফেলিক্স্ কেরী (ডাঃ কেরীর জ্যেষ্ঠপুত্র) একখানি ইংরাজী-বাংলা অভিধান প্রণয়নের পরিকল্পনা করেন। অভিধানখানির একশত পৃষ্ঠা মুদ্রিত হবার পূর্বেই মিঃ কেরীর জীবনাবসান হওয়ায়, কাজটি তখনকার মতো বন্ধ হয়ে গেল। টাঁকশালের অ্যাসে-মাস্টার ডাঃ উইলসন, মনে হয়, এর কিছুদিন পরেই তাঁকে টাঁকশালের এদেশীয়দের প্রধান পদে নিয়োগ করেন। অত্যন্ত লাভদায়ক ও দায়িত্বপূর্ণ এই পদে নিযুক্ত হবার ফলে, তাঁর মর্যাদা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। তাঁর কলুটোলার হর্ম্যটি হয়ে ওঠে ধনী ও জ্ঞানীদের নিত্য যাতায়াতের স্থান। তাঁর মহত্ত্বের খ্যাতিও বাংলার দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৩০এ তিনি অভিধান প্রকল্পটির কাজ পুনরায় আরম্ভ করেন এবং ব্যক্তিগত বিপুল শ্রমে সাত শত পৃষ্ঠার এই মহাগ্রন্থ রচনা ও মুদ্রণের কাজ সম্পন্ন করেন। আমাদের এই শ্রেণীর যতগুলি গ্রন্থ আছে, তাদের মধ্যে এখানিই সম্পূর্ণ ও সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বলা যায়; তাছাড়া, গ্রন্থখানি তাঁর শ্রম, উদ্যম ও পাণ্ডিত্যের দীর্ঘকালস্থায়ী স্মারক কীর্তি হয়ে থাকবে; অন্য কিছুর জন্য না হলেও শুধুমাত্র এই একখানি গ্রন্থের জন্যই ভবিষ্যৎ তাঁকে স্মরণে রাখবে।

ডাঃ উইলসন ইংল্যাণ্ড চলে গেলে, রামকমল সরকারী চাকরী ছেড়ে দিয়ে

ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলের এদেশীয় ট্রেজারার বা দেওয়ানের পদ গ্রহণ করেন। তিনি অমানুষিক পরিশ্রম করতেন (অবশ্য এই পরিশ্রমই তাঁর উত্থানের অন্যতম কারণ), এবং নতুন পদ গ্রহণের কয়েক মাস আগে থেকেই তাঁর স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছিল না। এখন স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়ল। মাত্র একপক্ষ কাল পরে হুগলীর বিপরীত তীরে অবস্থিত স্বগ্রামে তাঁর জীবনাবসান হয়।

জনগণের এমন কোন প্রতিষ্ঠান কমই ছিল, যার তিনি সভ্য ছিলেন না বা যেটির উন্নয়নের জন্য তিনি চেষ্টা করেন নি। এশিয়াটিক সোসাইটির কমিটি অব পেপার্সের তিনি সভ্য ছিলেন, উপ-সভাপতি ছিলেন এগ্রিকালচারাল সোসাইটির। ছিলেন ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির পরিচালক সমিতির একজন, হিন্দু কলেজের ম্যানেজার। কি ইওরোপীয়, কি এদেশীয় উভয় সমাজেই তিনি সমভাবে সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। আর কলকাতার সমাজে দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ভারতীয় হিসাবে গণ্য হয়ে আসছিলেন। সারা জীবন তিনি কঠোর নিষ্ঠা, ক্ষেত্রবিশেষে গোঁড়ামির সঙ্গে আপন ধর্মীয় বিশ্বাস অবলম্বন করে থাকলেও, লর্ড হেস্টিংসের শাসনকালে যখন সর্বপ্রথম এই বিশ্বাসের —যে, জনগণের অজ্ঞতাই সাম্রাজ্য রক্ষার সর্বোত্তম রক্ষা-কবচ—বিরোধিতা করা হয়, সেই সময় তিনি স্বদেশবাসীর মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারের জন্য এগিয়ে এসেছিলেন, এটা অবশ্যই তাঁর কৃতিত্ব হিসাবে গণ্য হবে। যে-সব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এদেশবাসীর মধ্যে ইওরোপীয় বিজ্ঞানের প্রসার হয়েছে, সেগুলির প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তিনিই ছিলেন প্রধান উদ্যোগী। এর ফলে এদেশীয় সমাজের চিন্তাধারাও উন্নত হয়েছে।'

রামকমলের মৃত্যুতে অধ্যাপক হোরেস হেম্যান উইলসন নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি তাঁর পুত্র হরিমোহন সেনকে লিখেছিলেন—

> তোমার পত্রে যে শোকাবহ সংবাদ পেলাম, তার জন্য আমি আন্তরিকভাবেই শোকাচ্ছন্ন; অবশ্য তোমার পিতার স্বাস্থ্য সম্পর্কে ডাঃ গ্র্যাণ্ট আর মিঃ পিডিংটনের কাছ থেকে কিছুকাল যাবৎ যে সংবাদ পাচ্ছিলাম, তাতে আমি এই শোক-সংবাদের জন্য যেন অনেকখানি প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। বহু বৎসর ব্যাপী তাঁর সঙ্গে আমার মেলামেশা ও একান্ত ব্যক্তিগত পত্রালাপের মধ্যে দিয়ে তাঁর বৌদ্ধিক উৎকর্ষের সঙ্গে আমি ভালভাবে পরিচিত হতে পেরেছিলাম। বহু পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে তাঁর গুরুত্ব আমি উপলব্ধি করেছিলাম; আর সেই জন্যই তিনি ছিলেন আমার শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র। কলকাতার সমাজে—কি ইওরোপীয় আর কি ভারতীয়—এরূপ উজ্জ্বল চরিত্র ছিল একান্তই বিরল। তাঁর জীবনের মহান লক্ষ্য ছিল দেশের মঙ্গলসাধন ও দেশবাসীর উন্নয়ন। কিন্তু এজন্য তাঁর কোন

আত্মপ্রচার ছিল না ; তিনি কাজ করতেন নিজেকে আড়ালে রেখে। সততা ও একাগ্রতা নিয়ে তিনি তরুণ সম্প্রদায়কে উন্নত করতে চেষ্টা করতেন, কিন্তু এজন্য তাঁর কোন তাড়া ছিল না। তাড়াহুড়ো করে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা কিন্তু তাঁর ছিল না, বাইরে থেকে চাপান উন্নতি তাঁর কাম্য ছিল না, তিনি চাইতেন তরুণরা উন্নত হোক নিজের থেকে, অন্তরের তাগিদে, নিরুপদ্রবে ; এই কারণেই তাঁর অন্যান্য কয়েকজন সহযোগীর মতো তিনি জনপ্রিয় হতে পারেন নি। শুধু তাঁর কাছের মানুষরাই তাঁর গুণমুগ্ধ ছিলেন—বলতে গর্ববোধ হচ্ছে যে, আমিও সেই সামান্য কয়েকজন গুণমুগ্ধের একজন ছিলাম। তাঁর অন্য যে-কোন বন্ধু অপেক্ষা আমি তাঁকে সর্বসময় অত্যন্ত কাছে থেকে লক্ষ্য করবার সুযোগ পেয়েছিলাম ; তার ফলে, আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, স্বদেশবাসীর উন্নতিবিধানের এত বড় দক্ষতাসম্পন্ন মিত্র আর কেউ ছিলেন না ; অবশ্য তিনি নিজের মতও কারও ওপর কখনও চাপিয়ে দিতে চাইতেন না।

রামকমলের সঙ্গে আমার পরিচয়ের সূত্রপাত ১৮১০-র শেষ দিকে। তখন তিনি ডাঃ হাণ্টারের হিন্দুস্তানী প্রেসে চাকরী করেন ; তাঁর অন্যান্য কাজের মধ্যে প্রেসটির কাজকর্ম দেখাশোনা করাও ছিল অন্যতম। উক্ত সময়ে ডাঃ লেইডেন আর আমি প্রেসটির অংশীদার হই। ১৮১১তে ডাঃ হাণ্টার ও ডাঃ লেইডেন জাভা চলে গেলেন ; প্রেসটির দায়িত্ব নামেমাত্র হলেও, পড়ল আমার ওপর ; আমার বয়স তখন অল্প ; প্রেসের কাজকর্ম কিছুই বুঝি না ; ফলে প্রেসটি পরিচালনা করতে থাকলেন রামকমল। ডাঃ হাণ্টার ও ডাঃ লেইডেনের জাভাতে মৃত্যু হয় ; তখন প্রেসটি প্রায় সম্পূর্ণরূপে আমার মালিকানাধীন হয়ে যায় ; এই সময় ক্যাপটেন রোবাক প্রেসের অংশীদাররূপে আমার সঙ্গে যোগ দেন ; প্রেসের পুঙ্খানুপুঙ্খ কাজসহ প্রেসের সামগ্রিক পরিচালনার ভার থাকে রামকমলের ওপর ; তাঁর কাজে আমরা উভয়েই সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট ছিলাম। ১৮২৮এ প্রেসের মালিকানা হস্তান্তরিত হয়। আমি ছিলাম এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক আর রামকমল ছিলেন ঐ প্রতিষ্ঠানের 'সরকার'। প্রেসের কাজের সঙ্গেই তিনি এ-কাজটিও করতেন। এই সব কাজকর্মের ব্যাপারেই প্রতিদিন প্রায় ঘণ্টায় ঘণ্টায় আমাদের দুজনের দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হত ; এইভাবে আমি তাঁর কর্মদক্ষতা, সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় পেয়েছিলাম। তাঁকে আমি যেমন ভালবাসতাম, তাঁর প্রতি তেমনি আমার শ্রদ্ধাও ছিল ; এই জন্য আমার ব্যক্তিগত বৈষয়িক ব্যাপার তাঁর হাতেই আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। আমার থেকে তিনি আমার ব্যক্তিগত বৈষয়িক ব্যাপারগুলি অনেক সুষ্ঠুভাবে

পরিচালনা করতেন। আমাদের উভয়ের মধ্যে বহু বিষয়েই সহমত ছিল। সংস্কৃত শিক্ষায় তিনি বিশেষ অগ্রগতি লাভ করবার সময় পান নি; কিন্তু এই ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর তীব্র আগ্রহ ছিল। এই ভাষার অধ্যাপকদের ওপরেও তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। তোমরা তো জান, বাংলা ভাষায় তাঁর জ্ঞান ছিল গভীর, তাঁর এইসব অর্জিত গুণ ও এশিয়াটিক সোসাইটির সংস্রবে আসার ফলে তাঁর জ্ঞান-পিপাসার উদ্ভব হয়। উল্লেখ্য, তিনি এককালে এই এশিয়াটিক সোসাইটির নেটিভ সেক্রেটারী হয়েছিলেন; যাই হোক, জ্ঞান পিপাসা ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কালক্রমে তিনি টাঁকশালের দেওয়ান হয়েছিলেন। এরপর আমার কলকাতা ত্যাগের সময় তিনি হন ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলের ক্যাশিয়ার। ভারতবর্ষ থেকে আমি ১৮৩৩এ চলে আসি। কাজেই তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের পর তেইশ বছর ধরে তাঁকে জানবার সুযোগ আমার হয়েছিল। এই সমগ্র সময়ে তাঁকে আমি একইভাবে ধীরস্থির, উচিতমনা, স্বাধীনচেতা, অপরাজেয় ও বুদ্ধিদৃপ্ত দেখেছি। কখনও দেখিনি কোন কিছু বুঝতে বা উপলব্ধি করতে তাঁর বিলম্ব হয়েছে, পরিশ্রম করতে ক্লান্তি বোধ করেছেন, মেজাজ তিক্ত হয়েছে বা কারও ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন। প্রভূত পরিমাণ টাকাকড়ি তাঁর দায়িত্বে থাকত কিন্তু আমার তো নয়ই, তাঁর সংস্রবে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের কারোরই তাঁর সততায় সন্দেহ করবার অবকাশ হয়নি। টাঁকশালে তাঁর কাজ ছিল কঠোর পরিশ্রমসাধ্য; একটানা দশ থেকে বারো ঘণ্টা তাঁকে পরিশ্রম করতে হত; কিন্তু সব সময়ই তিনি প্রফুল্ল, কর্তব্য-সচেতন থাকতেন; সততার সঙ্গে কর্তব্যকর্ম সম্পাদনেই তিনি প্রকৃত আনন্দ পেতেন। তাঁর স্বদেশবাসীর সঙ্গে আমার মত বিনিময়ের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অশেষ মূল্যবান পরামর্শদাতা। সহকর্মী হিসাবে তাঁর বিচারবুদ্ধি ও বিবেচনার ওপর আমি নির্দ্বিধায় নির্ভর করতে পারতাম। আমার আদর্শ ও উদ্দেশ্য তিনি খুব ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারতেন; আমার আদর্শের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাও ছিল; এইজন্য তাঁর সহযোগিতা ও সমর্থনের ওপর আমি নির্ভর করতে পারতাম। এই মন্তব্যগুলি হিন্দু কলেজ পরিচালনার ব্যাপারে ছিল বিশেষভাবে প্রযোজ্য—উল্লেখ্য যে, উক্ত কলেজের পরিচালন সমিতির তিনি ছিলেন, আমারই মতো, সক্রিয় সদস্য। সংক্ষেপে বললে বলতে হয়, প্রেসে, এশিয়াটিক সোসাইটিতে, সাহিত্য-সংক্রান্ত কাজকর্মে, জনগণের ও ব্যক্তিগত কার্যকলাপে, টাঁকশালে এবং কলেজে আমরা দুজনে সব সময় মিলিতভাবে কাজ করেছি; আজ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি যে, অতগুলি বৎসরব্যাপী আমাদের মিত্রতার মধ্যে কোন ছেদ পড়েনি, বরাবর উভয়ের আন্তরিকতা বজায় ছিল আর

দুজনের উদ্দেশ্যও বরাবর এক ছিল। কলকাতা থেকে চলে আসবার সময়, রামকমলকে ছেড়ে আসতে হয়েছিল বলে যে দুঃখ পেয়েছিলাম, সে-রকম দুঃখবোধ কলকাতার আর অতি সামান্য কয়েকজনকে ছেড়ে আসার জন্য হয়েছিল। তারপর একই স্বার্থে একই উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার পত্রালাপ চলেছে নিয়মিতভাবে; কিন্তু ব্যক্তিগত যোগাযোগের অভাব তাতে পূরণ হয়নি। তাঁর পত্রের জন্য আমি আকুল আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতাম, তার কারণ সেগুলিতে থাকত আমারই মতো একই প্রকার কার্যকলাপের চিত্র, এইসব কার্যকলাপের মাধ্যমেই তিনি প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন, আর আমাদের পারস্পরিক শ্রদ্ধা যে এত দিন ধরে অক্ষত ছিল, তারও প্রমাণ থাকত ঐ সব পত্রে। তাঁর মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্তও যে শ্রদ্ধা অটুট ছিল এ আমার কাছে বড় সান্ত্বনার সংবাদ। তাঁর প্রতি আমার প্রীতি ও শ্রদ্ধার অবসান হবে সেইদিন যখন আমিও আর এই পৃথিবীতে থাকব না।

উপরের পর্যালোচনায় রামকমলের সঙ্গে আমার দীর্ঘ ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের স্মৃতিচারণ করে ফেললাম। তবে, আগামী মাসে (আমি যত দূর জানি) তাঁর (সমাজের কাছে) প্রয়োজনীয় এবং সম্মানিত জীবনের একটি সুসংবদ্ধ বিবরণ পাঠাবার চেষ্টা করব। ইতি—

আন্তরিকভাবে তোমার শুভার্থী
(স্বা) এইচ এইচ উইলসন

দুর্ভাগ্যবশত প্রতিশ্রুত ঐ সুসংবদ্ধ বিবরণটি পাওয়া যায়নি।

লংম্যান, ব্রাউন, গ্রীন অ্যাণ্ড লংম্যান্‌স্‌ কর্তৃক ১৮৪৫এ প্রকাশিত 'মণ্ডার্স বায়োগ্রাফিক্যাল ট্রেজারী : এ ডিকসনারী অব ইউনিভার্সাল বায়োগ্রাফি'তে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য যে রাজা রামমোহন রায় ব্যতীত অন্য কোন ভারতীয়ের জীবনী উক্ত গ্রন্থে প্রকাশিত হয়নি। বিবরণটি নীচে তুলে দেওয়া হল :

বহু উচ্চগুণ, অপরাজেয় শ্রমশীলতা ও বিপুল প্রভাবের অধিকারী হিন্দু (ভারতীয়) রামকমল সেন ছিলেন ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলের দেওয়ান বা ট্রেজারার। তাঁর কর্মজীবন আরম্ভ হয় ডাঃ হাণ্টারের হিন্দুস্তানী প্রেসের কম্পোজিটার-রূপে; এজন্য বলা যায় যে, তিনি প্রকৃতই স্বীয় ভাগ্য নির্মাতা ছিলেন। প্রয়োজনীয় জ্ঞান বিস্তারে তাঁর প্রচেষ্টাসমূহ ছিল উৎসাহপূর্ণ ও সুপরিচালিত। তাঁর স্বদেশবাসীর শিক্ষাগত অগ্রগতি ও ইওরোপীয় বিজ্ঞান প্রচারের জন্য প্রতিষ্ঠিত তাঁর সময়ের কলকাতার প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের সুপরিচালনার জন্য তিনি সক্রিয়ভাবে সারাজীবন অতিবাহিত করে গেছেন। মৃত্যু, আগস্ট, ১৮৪৪।

নৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়ে এই মহৎ মানুষটি শুধু জীবিত থাকার সময়ই উল্লেখযোগ্য ছিলেন তাই নয়, ভবিষ্যৎকালের পটেও তিনি তাঁর কীর্তিচিহ্ন এঁকে গেছেন ; এই সংক্ষিপ্ত জীবনীও একান্তই অপূর্ণ থেকে যাবে, যদি না তাঁর জীবনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করা যায়। প্রথমটি হল তাঁর ধর্মনিষ্ঠা, আর দ্বিতীয়টি হল তাঁর সরল স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। রামকমল ছিলেন বৈষ্ণব ; প্রতিদিন প্রত্যূষে তিনি বিষ্ণুর প্রিয় তুলসীকুঞ্জে বসে পূজা প্রার্থনা করতেন ; যত জরুরী কাজই থাক, তাঁর দীর্ঘসময়ব্যাপী পূজা থেকে তিনি কখনও বিরত হন নি। তাঁর পারিবারিক নথিপত্রে তাঁর স্বরচিত কতকগুলি প্রার্থনাও পাওয়া গেছে, সেগুলিতে তাঁর প্রগাঢ় আত্মনিবেদনের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর চালচলনও ছিল একান্তই সাদাসিধা। নিরামিষাশী, পূর্ণ আহার গ্রহণ করতেন দিনে একবার, মধ্যাহ্নকালে। মদ্যপানও করতেন না। সন্ধ্যায় কাজ থেকে ফিরে সামান্য কয়েকটি সন্দেশ আর দু'কাপ চা খেতেন। চা কখনও কখনও এক সঙ্গে তিন কাপও খেতেন ; চা ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয় পানীয় ; নৈশ আহার্য রান্না করতেন মানিকতলা বাগান বাড়িতে হয় নিজে, কিংবা নিজের তত্ত্বাবধানে রান্না করাতেন। এর দ্বারা বৈষ্ণবোচিত দীনতা যেমন প্রকাশ পেত, তেমনি রান্না যে কঠোরভাবে হিন্দু আচার ও রীতি অনুযায়ী হয়েছে সে সম্বন্ধেও তিনি নিশ্চিত হতে পারতেন।

রামকমলরা তিন ভাই ; মদনমোহন ছিলেন জ্যেষ্ঠ আর কনিষ্ঠের নাম ছিল রামধন। মদনমোহন ছিলেন আর্মি ক্লোদিং এজেন্সীর দেওয়ান। মদনমোহনের জ্যেষ্ঠপুত্র গোবিন্দচন্দ্র সেন ছিলেন কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের সহকারী সচিব। পরে এই কমিটির স্থলাভিষিক্ত হয় কাউন্সিল অব এডুকেশন। কাউন্সিলেও তিনি ঐ একই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, পিতার মৃত্যুর পর তিনি আর্মি ক্লোদিং এজেন্সীতে পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি ছিলেন বড় জমিদার, এককালে সমগ্র হালিশহর পরগণা ছিল তাঁর মালিকানাধীন। তিনি ছিলেন কলকাতার জাস্টিস অব দি পীস, কিছুকালের জন্য এগ্রিকালচারাল অ্যাণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটির ভাইস-প্রেসিডেণ্ট এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের কমিটির সদস্য, বর্তমানে অবলুপ্ত ব্যাঙ্ক অব হিন্দুস্তান, চায়না অ্যাণ্ড জাপানের কলকাতা শাখার পরিচালকদের অন্যতম। তাঁর ভাই মধুসূদন সেন আগ্রা ব্যাঙ্কের খাজাঞ্চী।

রামকমলের কনিষ্ঠ ভাই রামধন ছিলেন ডেপুটি কালেক্টর। ফার্সী ভাষায় তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। অতি চমৎকার একখানি ইংরাজী-ফার্সী অভিধান তিনি রচনা করেছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মাধবচন্দ্র প্রথমে ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলের সহকারী খাজাঞ্চী, পরে হরিমোহন সেন বিদায় নেবার পর, তিনি ঐ ব্যাঙ্কের খাজাঞ্চী হন। বিয়াল্লিশ বৎসর তিনি এই পদে চাকুরী করেন। মাসিক ১২০০ টাকা বেতন পেতেন। এই দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর ও সেক্রেটারীদের শ্রদ্ধা পেয়ে

এসেছেন। ১৮৭৯তে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি মাসিক ২৫০ টাকা পেন্সন পাচ্ছেন; অত্যন্ত ভালভাবে ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে দীর্ঘকাল ব্যাঙ্কের চাকুরী করার স্বীকৃতিস্বরূপ ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরবর্গ তাঁকে এই পেন্সন মঞ্জুর করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রামকিষেণ ব্যারিস্টারী পাস করে এসে এখন মুনসেফের চাকুরী করছেন। কনিষ্ঠ ঠাকুরচরণ হাইকোর্টের উকীল ছিলেন, এখন তিনি এই শহরেরই মেসার্স এ এজ্ লাস্টো কোম্পানীর বেনিয়ান।

রামকমল চার পুত্র রেখে যান: হরিমোহন, পিয়ারীমোহন, বংশীধর ও মুরলীধর। তৃতীয় পুত্র বংশীধর টাঁকশালের 'বুলিয়ান কীপার' ছিলেন, অল্প বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়; মৃত্যুকালে তিনি দুই কন্যা রেখে গেছেন। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তিনি পারদর্শী ছিলেন।

হরিমোহন সেন

রামকমলের জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিমোহন পিতার দক্ষতা ও গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। অধিকন্তু প্রতিভা বিকাশের জন্য যে-সব সুযোগ-সুবিধা রামকমল ছোট বেলায় আদৌ পাননি, হরিমোহন সে-সব পুরোমাত্রায় পেয়েছিলেন। হিন্দু কলেজ এদেশের বেশ কিছু প্রতিভাধরকে পূর্ণতালাভে সাহায্য করেছিল; হরিমোহন এখানকার পাঠ্যক্রম সসম্মানে উত্তীর্ণ হন; তাঁর সহপাঠী ছিলেন রসিককৃষ্ণ মল্লিক, (ডাঃ) কৃষ্ণ-মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং (রাজা) দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। কিন্তু পিতার নির্দেশ অনুযায়ী দিনলিপি লেখার ফলে তাঁর লেখার বিশেষ একটি শৈলী গড়ে ওঠে। এই কাজটির ফলে তাঁর জীবনে শুধু যে নিয়মানুবর্তিতা ও পরিমিতিজ্ঞান গড়ে উঠেছিল তাই নয়, তাঁর হাতের লেখা—কি বাংলা কি ইংরাজী—হয়ে উঠেছিল অতি সুন্দর; এছাড়া নিয়মিত ইংরাজী লেখার ফলে তাঁর প্রবন্ধাদি বিশিষ্টতা অর্জন করতে পেরেছিল। তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও অধ্যবসায়ের ফলে তিনি ইংরাজী, বাংলা ও ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর হরিমোহন ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলের দেওয়ানের পদটি লাভ করেন। এই পদে তিনি ১৮৪৪ থেকে ১৮৪৯ পর্যন্ত চাকুরী করেছিলেন। কিছুকাল তিনি সরকারী ট্রেজারীরও দেওয়ান ছিলেন; এই চাকুরী সূত্রে তিনি উক্ত ট্রেজারীর সাবট্রেজারার মিঃ ওক্সের একটি চমৎকার প্রসংশাপত্র অর্জন করেন। পিতার মতই তিনি ধর্মভীরু ও নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন; অবশ্য, পিতার মতো অত কঠোরভাবে

আচার অনুষ্ঠান তিনি পালন করতে পারতেন না। পিতার মতই তিনি তাঁর সময়ের উল্লেখযোগ্য মানুষ ছিলেন।

ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলের সেক্রেটারী মিঃ হগ্ দেশীয় কেরাণীদের ওপর অযথা পীড়ন চালাতেন; তাঁর এই আচরণের সমালোচনা করে এদেশীয়দের একমাত্র ইংরাজী পত্রিকা হিন্দু ইন্‌টেলিজেন্সারে একটি প্রবন্ধ বের হয়; পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন কালীপ্রসাদ ঘোষ; কিন্তু মিঃ হগ্ অন্যায়ভাবে সন্দেহ করেন যে সমালোচনাটি লিখেছেন হরিমোহন সেন; তাঁর সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় হরিমোহন পদত্যাগ করেন। ইংরাজী ভাষায় দক্ষ হরিমোহনের ভাষার সঙ্গে উক্ত প্রবন্ধের একটু-আধটু মিল থাকায় সন্দেহ আরও দৃঢ় হয়েছিল। এই সন্দেহের বিরুদ্ধে হরিমোহন একজন ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে হলফ করেন। মিঃ হগের ব্যবহারে হরিমোহনের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। আদালতে ভিত্তিহীন অভিযোগের বিরুদ্ধে অস্বীকৃতি জানিয়েও তিনি স্বস্তি পেলেন না; বিভাগীয় তদন্তের বিরুদ্ধে তাঁর বিবেক ও অন্তর বিদ্রোহী হওয়ায়, তিনি মাসিক ১৫০০ টাকা মাইনের চাকুরীটিতে ইস্তফা দিলেন। কল্পনাপ্রবণ মানুষ, এবার ব্যবসায়ে মন দিলেন; কিন্তু তিনি ভুল পেশা বেছে নিয়েছিলেন, ব্যবসায়ে তিনি সফল হতে পারলেন না। তাঁর অন্যান্য পরিকল্পনার মধ্যে একটি হল, ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে কলকাতা থেকে দিল্লী পর্যন্ত ঘোড়ার ডাকের প্রবর্তন। রেলগাড়ী চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ব্যবসায়ও উঠে গেল। এর পর তিনি জাহাজ নির্মাণ শিল্পে মনোনিবেশ করে সম্বলপুরে একখানা জাহাজ নির্মাণও করান। উদ্দেশ্য ছিল, সম্বলপুর থেকে কলকাতায় ঐ জাহাজে করে সেগুন কাঠ আমদানী।

তাঁর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল জয়পুরের মহারাজা রামসিংহের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক। সুশিক্ষিত মহৎ হৃদয় এই মহারাজার সঙ্গে কয়েক বৎসর পূর্বেই তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছিল। সিপাহী বিদ্রোহ দমনের পর লর্ড ক্যানিং কর্তৃক আগ্রায় অনুষ্ঠিত দরবারে দু'জনের বন্ধুত্ব আরও ঘনিষ্ঠ হয়। অনেকেই মহারাজাকে ভয় দেখিয়েছিলেন যে, দরবারে তিনি যোগদান করলে, ফল খুব খারাপ হবে।

কিন্তু হরিমোহন দরবারে যোগদানের জন্য মহারাজাকে শুধু পরামর্শ নয়, অনেক অনুরোধ-উপরোধও করলেন। দরবারে মহারাজার আশঙ্কিত বিপদ তো হলই না, বরং তিনি আরও খেতাবও পেলেন; তার থেকেও যা গুরুত্বপূর্ণ, এই দরবারে তাঁর রাজ্যের আয়তনও বাড়িয়ে দেওয়া'হল। হরিমোহনের পরামর্শে দরবারে যোগদানের ফল এত ভাল হওয়ায়, মহারাজা, তাঁর পরিবারবর্গ ও দরবারের ওপর তাঁর প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। একজন বাঙালীর পক্ষে জয়পুর গিয়ে রাজা প্রজা সকলের আস্থা অর্জন করা কম কথা নয়, চারিত্রিক

সততা, দৃঢ়তা ও স্বাভাবিক দক্ষতার জন্য হরিমোহন এই কৃতিত্ব অর্জন করতে পেরেছিলেন; তাঁর পরবর্ত্তীকালের কার্যাবলী দ্বারা তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে, এই আস্থা অপাত্রে স্থাপিত হয় নি। রামসিংহও ছিলেন উচ্চমনা, উদারচেতা মানুষ; তাঁর রাজ্যের প্রয়োজনসমূহ তিনি ভালভাবেই উপলব্ধি করতেন। তাঁর সমর্থন পেয়েই হরিমোহন সুদূরপ্রসারী জনহিতকর সংস্কার সাধন করেছিলেন। তাঁর পরামর্শে ও পরিকল্পনা অনুযায়ী জয়পুর রাজকীয় কাউনসিল এবং জয়পুর স্কুল অব আর্টস প্রতিষ্ঠিত হয়। আর্টস স্কুলটি প্রতিষ্ঠায় মাদ্রাজ আর্টস কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ডাঃ হাণ্টারের অভিজ্ঞতার সহায়তা পাওয়া গিয়েছিল। হরিমোহনেরই চেষ্টায় তদানীন্তন জয়পুর স্কুল, বর্তমানের মহারাজার কলেজ, এখনকার উন্নত অবস্থায় পৌঁছতে পেরেছিল। কান্তিচন্দ্র মুখার্জীকে হরিমোহন মহারাজার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার ফলে, তিনি সেখানে এখন চাকরী করছেন; হরিমোহন আরও কিছু বাঙালীকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁরা সেখানেই এখন বসবাস করছেন। তাঁর পরামর্শমত চলার ফলে স্বয়ং মহারাজার এবং তাঁর রাজ্যের অনেক মঙ্গল হয়, কিন্তু তাঁর মৃত্যুতে মঙ্গলজনক বহু পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। নিজেকে তিনি এঁদেরই মঙ্গলের জন্য সম্পূর্ণরূপে নিয়োগ করেছিলেন। তাঁর ওপর মহারাজার আস্থা এত প্রগাঢ় ছিল এবং তাঁর কাজের ফলে রাজ্যের এত মঙ্গল হয়েছিল যে, জীবনের শেষ কয়েক বছর কার্যত তিনিই ছিলেন রাজ্যের প্রধান-মন্ত্রী। তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল সব সময় অবিরাম নিজের অর্থ ও সামর্থ্য দিয়ে জনগণের মঙ্গল করে যাওয়া; প্রত্যাশী হয়ে গেলেই তাঁর সাহায্য পাওয়া যেত। একদিকে তিনি ছিলেন কোমলমনা, অন্যের দুঃখে তাঁর মন বিগলিত হত, অন্যদিকে, নিজের যত বড় বিপদই আসুক তিনি থাকতেন অবিচল। তাঁর উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সৌজন্যবোধ, পরিশীলিত আচরণ ও সক্রিয় পরোপ-কারিতার জন্য যাঁরাই তাঁর সংস্রবে আসতেন, তাঁরাই তাঁকে ভালবাসতেন। যে তিনটি ভাষায় ভারতে সাধারণত ভাবের আদানপ্রদান হয়, সেই তিনটি ভাষাতেই তিনি পণ্ডিত ও সুবক্তা ছিলেন; কাজেই কোন সমাজেই তিনি মেলামেশা করতে অসুবিধা বোধ করতেন না। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব, বাবু (পরে, মহারাজা) রমানাথ ঠাকুর এবং আশুতোষ দেব। এঁরা সকলেই তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন, ভালও বাসতেন। এই প্রসঙ্গে আর একটা বিষয়ের উল্লেখ না করলে বিবরণ অপূর্ণ থেকে যাবে। সেটা হল, সঙ্গীতে তাঁর পারদর্শিতা; সঙ্গীতের তিনি ছিলেন উচ্চশ্রেণীর সমঝদার; সে সময় তাঁর মতো আর কোন ভারতীয় পিয়ানো বাজানোয় দক্ষ ছিলেন না। কলকাতার মেসার্স হার্বাডেন অ্যাণ্ড কোম্পানির সহযোগিতায় তিনিই প্রথম এদেশীয় গানে

ইওরোপীয় সুর বসিয়েছিলেন।

জনসেবামূলক কাজে তিনিও তাঁর পিতার মতই বিশিষ্টতা অর্জন করেছিলেন, অবশ্য পিতার মতো তাঁর ক্ষেত্র এত ব্যাপক ছিল না। লেক্স লোসি, ১৮৫০এর একবিংশ আইন (উত্তরাধিকার আইন) দ্বারা হিন্দু ধর্মের ওপর প্রথম খোলাখুলি আঘাত হানা হয়; হিন্দুগণ স্বভাবতই বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। কার্যত ইংরেজ শাসনের আর কোন সময়ে বাংলা-বিহার-ওড়িশার হিন্দু জনগণ এমনভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেনি, যেমন এই প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে তাঁরা আইনসম্মত পন্থায় বিরোধিতার আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের কাছে এই উপলক্ষে যে ভাষায় স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছিল, সে রকম ভাষা আর কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়নি। কলকাতায় এক মহতী সভায় লেক্স লোসির বিরুদ্ধে একটি স্মারকলিপি ইংল্যাণ্ডে কোর্ট অব ডিরেকটর্সের কাছে প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে কমিটি গঠিত হয়, হরিমোহন সেনকে করা হয়েছিল তার সম্পাদক। আমাদের ধারণা তাঁর কর্মদক্ষতা ও উদ্যমের এর থেকে বড় স্বীকৃতি আর কিছু হতে পারে না। তিন বৎসরকাল তিনি এই অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকবার সময় কঠোর পরিশ্রম দ্বারা সর্বজনের সন্তোষ বিধানে সক্ষম হয়েছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটি ও এগ্রি-কালচারাল অ্যাণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটিরও তিনি সভ্য ছিলেন। ১৮৫৩তে বাবু রামগোপাল ঘোষের সঙ্গে যুগ্মভাবে দ্বিতীয়োক্ত সোসাইটিরও তিনি সহসভাপতি ছিলেন। এই সোসাইটির ট্রানস্লেশন কমিটিরও তিনি সভ্য ছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাচ্য বিভাগেরও তিনি সদস্য ছিলেন; সদস্য ছিলেন ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটি এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটির; এই দুটি সংগঠন মিলিত হয়ে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন সৃষ্ট হলে, তিনি তারও সক্রিয় সদস্য হন। কার্যত তাঁর প্রাত্যহিক কার্যালয় ছিল ঐ অ্যাসোসিয়েশনের একটি কক্ষ। অ্যাসোসিয়েশনের অপরাপর সক্রিয় সদস্য ছিলেন বাবু (পরে মহারাজা) রমানাথ ঠাকুর, বাবু জয়কিষেণ মুখার্জী প্রভৃতি; রাজা রাধাকান্ত দেব ছিলেন সভাপতি। ১৮৫৪তে স্যার জন পিটার গ্র্যাণ্টের সভাপতিত্বে স্থাপিত ক্যালকাটা লাইসিয়ামের তিনি সক্রিয় সদস্য ছিলেন। প্রধানত ইওরোপীয়গণই লাইসিয়ামের কাউনসিলের সদস্য ছিলেন; দেশীয় সদস্যদের মধ্যে ছিলেন রুস্তমজী কাওয়াস্‌জী, রমানাথ ঠাকুর, হরিমোহন সেন ও পিয়ারীচাঁদ মিত্র। শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করা ছিল লাইসিয়ামের উদ্দেশ্য। সোসাইটি ফর দি প্রোমোশন অব ইনডাসট্রিয়াল আর্টসেরও তিনি সক্রিয় সদস্য ছিলেন। এই সংগঠনের প্রচেষ্টাতে ক্যালকাটা স্কুল অব আর্টস প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে এটি সরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়; এইচ্‌ গুড্‌ওয়াইন্‌ ছিলেন এর সভাপতি।

এছাড়া, তিনি সদস্য ছিলেন ক্যালকাটা মেকানিকস ইনসটিট্যুটের। ১৮৫৬তে লেফ্‌টেন্যান্ট (বর্তমানে কর্নেল) উইলিয়াম ন্যাস লীজের সঙ্গে যুগ্মভাবে তিনি বেথুন সোসাইটির সহ-সভাপতি ছিলেন। বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তিনি হিন্দু চ্যারিটেবল সোসাইটির যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন। খ্রীস্টিয়ান মিশনারীদের শিক্ষার প্রভাব প্রতিরোধ করবার উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

মুরলীধর সেন

রামকমল সেনের সর্বকনিষ্ঠ এবং একমাত্র জীবিত পুত্র মুরলীধর সেন। সুপ্রীম কোর্টে প্রথম যে ভারতীয় দলটিকে অ্যাটর্নিরূপে প্র্যাকটিস করবার অনুমতি দেওয়া হয় মুরলীধর ছিলেন তাঁদের অন্যতম। গিরিশচন্দ্র ব্যানার্জী ও রমানাথ লাহার তিনি ছিলেন সমসাময়িক। ইওরোপীয় অ্যাটর্নি ফার্মের তিনিই প্রথম ভারতীয় অংশীদার। তিনি মেসার্স ঈহ্‌মে অ্যাণ্ড ব্যারো কোম্পানির অংশীদার ছিলেন। হাইকোর্টের প্রবীণতম অ্যাটর্নিদের অন্যতম মুরলীধর ছিলেন কলকাতার অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট এবং কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচিত কমিশনার।

হরিমোহন সেনের পুত্রগণ

হরিমোহন পাঁচ পুত্র: যদুনাথ, মহেন্দ্রনাথ, যোগেন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথকে রেখে পরলোকগমন করেন। এই পাঁচজনের মধ্যে চার জনই জয়পুরের মহারাজার অধীনে চাকরী করেছেন। জ্যেষ্ঠ যদুনাথ ছিলেন কলকাতা টাঁকশালের বুলিয়ানকীপার এবং পেপার কারেন্সি বিভাগের প্রধান খাজাঞ্চী। এখন তিনি মহারাজার কাউন্সিল অব স্টেটের সদস্য। মধ্যম মহেন্দ্রনাথ ছিলেন কলকাতায় আয়কর বিভাগের হেড অ্যাসিস্ট্যান্ট; এখন তিনি জয়পুর রাজ্যের ইংরাজি বিভাগের বিশেষ দায়িত্বে এবং তথাকার রাজকীয় মুদ্রণ বিভাগের সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত; তিনি জয়পুর গেজেটের সম্পাদক, স্থানীয় কয়েকটি কমিটির সদস্য

এবং জনগণের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তৃতীয় যোগেন্দ্রনাথ জয়পুর মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার ও সম্পাদক। কনিষ্ঠ উপেন্দ্রনাথ জয়পুর আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ।

নরেন্দ্রনাথ সেন

চতুর্থ নরেন্দ্রনাথের জন্ম হয় ১৮৪৩-এর ২৩ ফেব্রুয়ারী। চার ভাই যখন জয়পুরের মহারাজার অধীনে চাকরী নিয়ে চলে গেলেন, তখন সম্ভবত বিধাতার ইচ্ছাতেই, চতুর্থজন পিতামহের জনহিতৈষণার বহুবিস্তৃত কর্মক্ষেত্র কলকাতায় থেকে গেলেন, হয়তো পিতামহের আরব্ধ কিন্তু অসম্পূর্ণ কার্য সম্পূর্ণ করবার জন্যই।

সে সময়ের বড় ঘরের ছেলেদের শিক্ষার জন্য পাঠান হত হিন্দু কলেজে। নরেন্দ্রনাথকেও ঐ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়েছিল। বিশেষ মেধাবী ছাত্ররূপে পরিচিত নরেন্দ্রনাথ সহপাঠীরূপে পেয়েছিলেন (রাজা) শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মতো পরবর্তীকালের বিখ্যাত ব্যক্তিদের। কিন্তু স্বাস্থ্যহীনতার জন্য ষোল বছর বয়সেই তাঁর বিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটে। এদিকে ছেলের উচ্চশিক্ষার জন্য অর্থব্যয়ে পিতার কোন কার্পণ্য ছিল না; তাই, নরেন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ না হলেও কিছুটা সুস্থ হতেই তাঁর জন্য গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হলেন সে সময়ের অভিজ্ঞ সাংবাদিক ও শিক্ষাবিদ ক্যাপটেন ফ্র্যাঙ্ক পামার; এঁকে কলকাতার মানুষ আজও স্মরণ করেন। অধ্যয়নশীলতাই ছিল নরেন্দ্রনাথের নেশা; পড়তে এত ভালবাসতেন যে, সেটা তাঁর একরকম পাগলামীতে পরিণত হয়েছিল। এতে আবার পিতার কাছে উৎসাহও পেতেন। এইরূপ বুদ্ধিমান অধ্যয়নপ্রিয় ছাত্র পেয়ে ক্যাপটেন পামারও তাঁকে শিক্ষাক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যেতে বিশেষ উৎসাহী হয়ে ওঠেন। সুপণ্ডিত এই শিক্ষকের সাংবাদিক হিসাবে সাফল্যের প্রভাব এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে তিনি সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের সম্বন্ধে যে গল্প বলতেন, তার প্রভাবে, ঐ অল্প বয়সেই নরেন্দ্রনাথ সাংবাদিক হবার বাসনা পোষণ করতে থাকেন। কলেজ ছাড়ার পর বেশ কয়েক বছর তিনি ক্যাপটেন পামারের নির্দেশমত অধ্যয়ন চালিয়ে যেতে থাকেন; এই হিসাবে তখনও তিনি ছাত্র; কিন্তু ঐ বয়স ও অবস্থাতেই তিনি সমসাময়িক রাজনৈতিক পত্রপত্রিকায় ছোট ছোট প্রবন্ধাদি পাঠিয়ে ভবিষ্যতে সীমাহীন আকাশে ওড়বার আগে যেন নিজের ডানার শক্তি পরীক্ষা করতে

লাগলেন। এই সময় তিনি সকাল দশটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত ক্যালকাটা পাব্লিক লাইব্রেরীতে নিয়মিত অধ্যয়ন করতে থাকেন। অপ্রতিরোধ্য কোন শক্তি তাঁকে যে লক্ষ্যে পৌছে দিতে উৎসুক ; তিনি যেন তারই জন্য তাঁর জ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ণ করে চলেছিলেন। এদিক থেকে হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখার্জীর মতো তিনি স্বয়ং-অধ্যয়ন দ্বারা শিক্ষিত হয়েছিলেন, কেন না হরিশচন্দ্রের মতই তিনি বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বিশেষ পান নি; সাংবাদিকতা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে অন্যান্যের উর্ধ্বে ওঠবার এ ছাড়া, বোধ হয়, অন্য কোন পথ নেই। সাহিত্যক্ষেত্রে অগ্রগতির তীব্র আকাঙ্ক্ষা জ্ঞানার্জনে যে-কোনপ্রকার আলস্য তাঁকে যেন অস্থির ধৈর্যহারা করে ফেলেছিল। সেই বাল্যকাল থেকে আজ পর্যন্ত জীবনের অন্যান্য সকল ক্ষেত্র থেকে যতখানি সম্ভব সময় ছিনিয়ে নিয়ে সাধারণ এবং প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জনের জন্য অধ্যয়নে নিয়োগ করেছেন। উনিশ-কুড়ি বছর বয়সে কলকাতার তখনকার বিখ্যাত অ্যাটর্নি মিঃ উইলিয়াম অ্যাসলির অধীনে শিক্ষানবিশী শুরু করেন। মিঃ জেমস হিউম ও অন্যান্য কয়েকজন উচ্চপদস্থ ও মহাজ্ঞানী ব্যক্তি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র কর্তৃক সে সময় সম্পাদিত ইণ্ডিয়ান ফীল্ড পত্রিকায় তাঁকে ঐ সময়ই (সম্পাদকীয় বিভাগের) নিয়মিত কর্মী করে নেওয়া হয়।

কিন্তু, ইণ্ডিয়ান ফীল্ড পত্রিকায় ঐ সময় তিনি যেসব প্রবন্ধাদি লিখেছিলেন সেগুলিকে তাঁর সাংবাদিক হবার স্বপ্নের প্রথম প্রচেষ্টা বলে গণ্য করা যায়। কলকাতার বিখ্যাত আইনজীবী মিঃ মনোমোহন ঘোষ, বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অর্থানুকূল্য ও বাবু কেশবচন্দ্র সেনের সর্বপ্রকার সহায়তা নিয়ে, ইণ্ডিয়ান মিরর প্রতিষ্ঠা করলে, নরেন্দ্রনাথ যেন জীবনের অভীষ্টে পৌছেছিলেন। সকলেই জানেন, ১৮৬১তে মিঃ মনোমোহন ঘোষের সম্পাদনায় ইণ্ডিয়ান মিরর পাক্ষিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হয়েছিল। নরেন্দ্রনাথকে তিনি সাদর অভ্যর্থনায় ডেকে নিয়েছিলেন মূল্যবান সহায়করূপে। নরেন্দ্রনাথ পত্রিকাটিতে মূল্যবান প্রবন্ধাদি লিখতে থাকেন; মিরর প্রতিষ্ঠার কয়েকমাস পরেই মিঃ ঘোষ ইংল্যাণ্ড চলে গেলে, নরেন্দ্রনাথ পত্রিকাটির সম্পাদক হন; মিরর পাক্ষিক থেকে সাপ্তাহিকে রূপান্তরিত হলে এবং নরেন্দ্রনাথ হাইকোর্টের অ্যাটর্নিরূপে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তিনি পত্রিকার সম্পাদনাভার অনিচ্ছাসত্ত্বেও ত্যাগ করেন যাতে আরব্ধ পেশায় প্রতিষ্ঠিত হবার ভিত্তি-স্থাপন করতে পারেন।

কেশবচন্দ্রও ইংল্যাণ্ডে কিছুকাল থেকে দেশে ফিরলেন এই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যে, ইণ্ডিয়ান মিররকে দৈনিক পত্রিকায় পরিবর্তিত করে অধিকতর কার্যকর মাধ্যমে পরিণত করতে হবে। নরেন্দ্রনাথ ও ইণ্ডিয়ান মিরর এতদিন যেন একই সত্তায় পরিণত হয়েছিল। দৈনিকে রূপান্তরে তাঁর পূর্ণ সমর্থন ছিল। বাবু প্রতাপচন্দ্র

মজুমদারকে সম্পাদক করে নরেন্দ্রনাথ অ্যাটর্নির কাজে বেশী সময় দিতে থাকলেন ; কিন্তু প্রতাপবাবু অল্পকালমাত্র এর সম্পাদক ছিলেন।

সংবাদপত্র পরিচালনা সাধারণত খুব সুখকর বা লাভদায়ক হয় না। এর সঙ্গে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নন, তাঁরা কখনই বুঝবেন না যে, সংবাদপত্র পরিচালনার সঙ্গে কত দুঃশ্চিন্তা ও অসুবিধা বিজড়িত থাকে। যাঁদের জন্য সাংবাদিক পরিশ্রম করেন, তাঁরাও তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকেন না—এই হল সাংবাদিকের কাজের প্রকৃতি। কাকেও ভয় না করে, কারও অনুগ্রহের প্রত্যাশী না হয়ে সত্য ও ন্যায়ের জন্য তাঁকে লিখতে হবে, কিন্তু খেয়াল রেখে প্রতিটি শব্দ ওজন করে লিখতে হবে যাতে একটি কথাতেও অতিশয়োক্তি বা অল্পোক্তি না হয়ে যায় ; কোথাও সে রকম হলে সাংবাদিকের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। ইংরেজের স্বার্থে ইংরেজ পরিচালিত ইংরেজী পত্রিকার সাংবাদিককে যদি এই সব অসুবিধার ও বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়, তাহলে নেটিভদের স্বার্থে নেটিভ-পরিচালিত ইংরাজী ভাষায় পত্রিকার সাংবাদিকদের অনেক বেশী অসুবিধা ও বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। দেশীয়দের অন্য যে-কোন কর্মোদ্যোগের মতো দেশীয় ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত সংবাদপত্রকে এদেশীয়গণও সাধারণত হীন ও নিম্নস্তরের বস্তুরূপে গণ্য করেন, তাই কোন নেটিভ কর্তৃক ইংরাজী ভাষায় পত্রিকা পরিচালনা করতে হলে অপরিমেয় বিপত্তির মধ্য দিয়ে চলতে হয়। এর আগে অপরাপর অর্থবান ও প্রতিভাধর ব্যক্তিরা একখানি ইংরেজী দৈনিক পত্রিকা পরিচালনার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু ইণ্ডিয়ান মিরর ছাড়া অন্য সবগুলিই ব্যর্থ হয়েছে। ইণ্ডিয়ান মিরর-এর ভাগ্যে ঐ ব্যর্থতা না জুটে, জনমতের মুখপত্ররূপে বর্তমান উন্নতির শিখরে ওঠবার একমাত্র কারণ, এর শুরু থেকে আজ পর্যন্ত নরেন্দ্রনাথের অদম্য অধ্যবসায় ও সংকল্পের দৃঢ়তা। এটি সাপ্তাহিক থাকার সময় ছাড়া, এর শুরু থেকে আজ পর্যন্ত নরেন্দ্রনাথ স্বেচ্ছায় বিনা পারিশ্রমিকে এর জন্য সম্পাদকীয় দায়িত্ব পালনের স্বার্থে নিজের সমগ্র সময় ও শ্রম দিয়ে এসেছেন। নেটিভগণও যে সফলভাবে ইংরেজী দৈনিক পত্রিকা পরিচালনে সক্ষম, তাঁর এই আন্তরিক বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তাঁকে অনেক বিঘ্ন অতিক্রম এবং বহু স্বার্থত্যাগ করতে হয়েছে। যে নির্ভীক উদ্যম নিয়ে তিনি এই পত্রিকাখানি পরিচালনা করেছেন, তার সঙ্গে তুলনীয় তাঁরই শ্রমশীলতা, কুশলতা ও কর্মদক্ষতা। তাঁর অ্যাটর্নি পেশাটি ছিল অত্যন্ত লাভদায়ক, সেখানেও কর্তব্যসাধনে তাঁর ত্রুটি ছিল না ; তৎসত্বেও ঐ পেশা থেকে বহু ঘণ্টা সময় বাঁচিয়ে, স্বাস্থ্য, আরাম ও বিরাম—সব কিছু উপেক্ষা করে তিনি সম্পাদকের কর্ম সম্পাদন করেছেন। তাঁর শ্রমশীলতা ছিল অপরাজেয়। ইণ্ডিয়ান মিরর এতই সাফল্য লাভ করে যে, ১৮৭৮-এ এটিকে একপৃষ্ঠার দৈনিকে পরিণত করা হয়—এটিই হয় ভারতীয় পরিচালিত অনন্য সংবাদপত্র। পত্রিকাটি

এতদিন যৌথ মালিকানাধীন ছিল, ১৮৭৯ থেকে এটির একমাত্র স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক হলেন নরেন্দ্রনাথ সেন। এখন পর্যন্ত পত্রিকাটির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কুড়ি বছরের। ইংরেজীতে ভারতীয় সাংবাদিকতায় তাঁর দান যে কত বড় তা সঠিকভাবে বর্ণনা করা অসম্ভব। তিনিই সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণ করেছেন যে ইংরেজ পরিচালিত ইংরেজী পত্রিকার মতো ভারতীয় পরিচালিত ইংরাজী পত্রিকা সমান জনপ্রিয় হতে পারে। তাঁর দান এর থেকেও বেশী। তিনি দেখিয়েছেন যে, যে কর্মশক্তি, অধ্যবসায় ও সংকল্পের দৃঢ়তাকে একমাত্র ইংরেজ জাতিরই বিশেষ গুণ বলে বিবেচনা করা হয়েছে, ঐসব গুণ একজন ভারতীয়ের মধ্যেও সমভাবে থাকতে পারে। নরেন্দ্রনাথের জীবন ও জীবনী থেকে এই শিক্ষাই আমরা লাভ করেছি ; তিনি দেখিয়েছেন যে, কথা নয় কাজই মূল্যবান। ইণ্ডিয়ান মিরর আরও প্রমাণ করেছে যে, যে সাহিত্য- প্রীতি আমরা রামকমল সেনের চরিত্রে লক্ষ্য করেছিলাম, সেই গুণ তাঁর বংশধরের মধ্যেও এখনও সমভাবে বর্তমান।

বিহারীলাল গুপ্ত

হরিমোহন সেনের জ্যেষ্ঠ কন্যার জ্যেষ্ঠপুত্র বিহারীলাল বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের সদস্য। আশৈশব তিনি মাতামহের কাছেই পালিত। যে-সব গুণের জন্য আজ তাঁর চাকরী জীবনে উন্নতি ও সম্মানের সীমাহীন সুযোগ তিনি লাভ করেছেন, বাল্যে তার কোন লক্ষণই দেখা যায়নি। কিছুকাল তিনি অস্থায়ী প্রেসিডেন্সি ম্যাজিসট্রেট ও কলকাতার করোনার ছিলেন।

পিয়ারীমোহন সেন

রামকমল সেনের মধ্যম পুত্র পিয়ারীমোহন হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করেন। তিনি পিয়ারীচাঁদ মিত্রদের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি ধর্মপ্রাণ ও দয়াবান মানুষ

ছিলেন। তাঁর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই হয়তো তাঁর পুত্র কেশবচন্দ্র সেনের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল। শান্ত প্রকৃতির পিয়ারীমোহন ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীতপ্রিয়। সেতারবাদনে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। প্রশস্ত-হৃদয় দয়াবান এই মানুষটিকে সকলেই শ্রদ্ধা করতেন। পরম বৈষ্ণব পিয়ারীমোহনের কপালে সবসময় তিলক আঁকা থাকত। জীবিকার জন্য প্রথমে তাঁকে সমৃদ্ধ মেসার্স ব্যাগ্শ অ্যাণ্ড কোম্পানির বেনিয়ান করা হয়, পরবর্তীকালে তিনি কলকাতা টাঁকশালের বুলিয়ানকীপারের পদ লাভ করেন।

নবীনচন্দ্র সেন

পিয়ারীমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র নবীনচন্দ্র ছিলেন ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলের আমানতকারী বিভাগের হেড অ্যাসিস্ট্যান্ট। অনেকেই জানেন না যে, প্রধানত এঁরই উদ্যোগে বর্তমানে সমৃদ্ধ হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুইটি ফাণ্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। এঁরই অনুরোধে-উপরোধে পড়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় অছি হতে স্বীকৃত হন, অছি হওয়ার পর তিনি প্রতিষ্ঠানটির সংগঠনে সক্রিয় অংশ নেন। তিনি ছিলেন এই ফাণ্ডের প্রথম সচীব

কৃষ্ণবিহারী সেন

পিয়ারীমোহনের কনিষ্ঠপুত্র কৃষ্ণবিহারী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট স্নাতক। তিনি এম এ পাস। ইণ্ডিয়ান মিরর দৈনিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হলে, কৃষ্ণবিহারীকে তার অন্যতম সাব-এডিটররূপে নিয়োগ করা হয়। কিছুকাল পর তিনি নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে মিররের সহযোগী সম্পাদক হন; ঐ পদে বেশ কয়েক বৎসর তিনি কাজ করেন। ইংরেজী লেখায় তিনি বিশেষ দক্ষ। এখন তিনি সানডে মিররের সম্পাদক এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো। এ ছাড়া তিনি অ্যালবার্ট স্কুলের রেক্টর।

কেশবচন্দ্র সেন

কলুটোলার প্রখ্যাত এই সেন পরিবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে জগদ্‌বিখ্যাত হয়েছেন কেশবচন্দ্র সেন। ১৮৩৮-এর ১৯ নভেম্বর তিনি কলুটোলাতে জন্মগ্রহণ করেন। পিয়ারীমোহনের তিনি মধ্যমপুত্র। বাল্যকাল থেকেই তিনি শান্ত ও দয়ালু, কিন্তু তাঁর স্বাধীনচিত্ততা ও অন্যান্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখে সহজেই ভবিষ্যদ্‌বাণী করা যেত যে, এ ছেলে ভবিষ্যতে বহু মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করবে। বস্তুত মানবচরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ তাঁর পিতামহ রামকমল সেন বালক কেশবচন্দ্রকে দেখে নাকি বলেছিলেন, কালে এ ছেলে বিরাট ব্যক্তিরূপে পরিচিত হবে।

স্বগৃহে বাংলা শেখার পর তাঁকে হিন্দু কলেজে ভর্তি করা হয়; এখানে শিক্ষালাভ করে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েন। এখানে তিনি সর্বাপেক্ষা মেধাবী ও বিশিষ্ট ছাত্রদের অন্যতম ছিলেন। স্বভাবতই গম্ভীর প্রকৃতির হলেও, মাঝে মাঝে ছাত্রজীবনে তাঁর বাগ্মিতা প্রকাশ পেত। তাঁর উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গীতে সকলে চমৎকৃত হতেন। কোন সামাজিক বা নৈতিক প্রশ্নে কোনরূপ প্রস্তুতি না নিয়েও তিনি যেরূপ উচ্চস্তরের বক্তৃতা দিতেন, তাতে বিশেষজ্ঞগণ পর্যন্ত বলতেন যে, ব্রাহ্ম ধর্মের প্রচার ও প্রসারে (বাগ্মিতাপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা) তিনি যে খ্যাতিলাভ করেছেন, ব্যবহারজীবী হলে জীবনে ততোধিক সার্থকতা লাভ করতে পারতেন। প্রায় শৈশবকাল থেকেই তিনি সব খেলায়, সকল কাজে সঙ্গী সাথীদের নেতা হতেন। যাত্রার দল গড়তেন আর তিনিই হতেন তার অধিকারী। শৈশবে তিনি যে-সব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতেন, এখানে তার একটির উল্লেখ করা যেতে পারে। সে-সময় গিলবার্ট নামক একজন ফরাসী যাদুকর খাস কলকাতাবাসীদের হাত সাফাইয়ের নানারকম ক্রিয়াকৌশল দেখিয়ে চমৎকৃত করেছিলেন; বালক কেশবচন্দ্র একবারমাত্র সেই সব দেখেই, তাঁর কৌশল ধরে ফেলে সকলকে সেইসব খেলা দেখাতে থাকেন। তার উদ্ভাবনী শক্তি এখানেই থেমে যায় নি। সমাজসংস্কারমূলক আন্দোলনকে, বিশেষত হিন্দু বিধবা বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হবার পর, এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য, তিনি পরিবারের অন্যান্য তরুণ সদস্যদের সহযোগিতায়

হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ হল্-এ পর পর বেশ কয়েক রাত্রি 'হিন্দু বিধবা বিবাহ নাটক' মঞ্চস্থ করেন। এই বাবদ তাঁর অভিভাবকগণকে কমপক্ষে ১০,০০০; টাকা ব্যয় করতে হয়েছিল। সে যাই হক, অভিনয় হয়েছিল সফল ও সার্থক। শহরের সে-যুগের প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রসমূহে এই প্রচেষ্টা ও অভিনয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা প্রকাশিত হয়েছিল।

ইংরেজী শিক্ষার জন্য, এবং তাঁর নিজের স্বীকৃতি অনুযায়ী, ইংরেজী সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রভাবে তিনি গভীরভাবে বাইবেল অধ্যয়নে ও ঈশ্বরের একত্বে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই, আবাল্য অভ্যস্ত মূর্তিপূজা ও তার আচার আচরণ তিনি ঘৃণাভরে ত্যাগ করলেন, কিন্তু 'মনের যে স্থান এতদিন হিন্দু কুসংস্কার অধিকার করেছিল, তার স্থান নেবার মতো কিছুই ছিল না; দু'তিন বৎসর যাবৎ তিনি ধর্মীয় ব্যাপারে উদাসীন ও সংস্রবশূন্য হয়ে রইলেন; ধর্মবিষয়ক আলাপ আলোচনা করবেন এমন একটি বন্ধুও তাঁর ছিল না। মূর্তি-উপাসনা থেকে তিনি দেহসর্বস্ব আরাম-আয়েস বিলাসের জীবনে চলে যাচ্ছিলেন।' তিনি নিজেই বলেছেন 'অবশেষে ঈশ্বরের ইচ্ছায় এক রহস্যময় পন্থায় আমার কাছে সত্যের আলোক উদ্ভাসিত হল, এবং সেই থেকে শুরু হল সংগ্রাম, আশা আর চেষ্টা যার ফলে, বলতে আনন্দ হচ্ছে, আমি শান্তি পেয়েছি, হৃদয় আমার রূপান্তরিত হয়েছে।' নিয়মিত প্রার্থনার অভ্যাস দ্বারা তাঁর ধর্মের প্রতি আগ্রহ প্রোৎসাহিত হতে থাকে। তাঁর এই অভ্যাস দেখে অনেকেই সন্দেহ করতে থাকেন যে, তিনি খ্রীস্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে চলেছেন, পরিণামে তাঁকে অনেক উপহাস সইতে হয় ও নানা বিরক্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। এসব সত্বেও তিনি অভ্যাসমত প্রার্থনা করতে থাকেন; এজন্য তাঁর আত্মা আশা, সাহস ও দৃঢ়তা লাভ করে। অধ্যাত্মজ্ঞানের আশীর্বাদ যাতে তাঁর বন্ধুগণও লাভ করতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে তিনি 'সান্ধ্য ধর্মীয় বিদ্যালয়' স্থাপন করে স্বয়ং তার সম্পাদক বা পরিচালক হন। প্রখ্যাত জর্জ টম্সন্ দু'বার এই বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পরীক্ষায় সভাপতিত্ব করেন। তিন বৎসরের মাথায় অর্থাভাবে বিদ্যালয়টি বিলুপ্ত হল। এর অল্প কিছুদিন পরে, ১৮৫৮ তে কেশব স্বগৃহে নিকট বন্ধু ও সহপাঠীদের নিয়ে 'গুডউইল ফ্র্যাটার্নিটি' নাম দিয়ে ছোট একটি ক্লাব স্থাপন করেন। এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল ধর্মীয় আলোচনার বিকাশ ও প্রার্থনা। এখানে এবং ইতিপূর্বে স্বগৃহে প্রতিষ্ঠিত বিতর্ক সভায় কেশবচন্দ্র প্রস্তুতিহীন বক্তৃতা অভ্যাস ও আয়ত্ত করতে থাকেন এবং ধর্মীয় শক্তিতে অপরের উপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা অর্জন করতে থাকেন; এই ক্ষমতা পরবর্তী জীবনে তাঁর পক্ষে বিশেষ কার্যকর হয়েছিল। তাঁর যা কিছু অধ্যয়ন সবেরই লক্ষ্য ছিল ভবিষ্যতের পথনির্দেশের জন্য সত্যের সন্ধান। দর্শন ও তর্কশাস্ত্র ছিল তাঁর

বিশেষ প্রিয়।

১৮৫৮তে একখানি ব্রাহ্ম পুস্তিকা তাঁর হাতে আসে; সেখানি পড়ে তিনি দেখেন যে, যে-একেশ্বরবাদের তিনি সন্ধান করছিলেন, তারই উপাসনার জন্যও সেই মতবাদের প্রতিষ্ঠান আগে থেকেই আছে। কুড়ি বছর বয়সে তিনি ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করেন; তাঁর এই সাহসিক পদক্ষেপের সঙ্গী হন তাঁর গুড্ উইল ফ্র্যাটার্নিটির বন্ধুগণ। ব্রাহ্মসমাজের আচার্য বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরামর্শে এবং হিন্দু বিশ্বাস তিনি বর্জন করেছেন এটা প্রমাণ করবার জন্য তিনি কুলগুরুর কাছে 'মন্ত্র' (দীক্ষা) নিতে অস্বীকার করলেন। পরিবারের গুরুজনেরা বহুপ্রকারে তাঁকে বোঝালেন যে, ধর্ম ধর্ম করে জীবন কাটালে জীবিকার সংস্থান হবে না, তখন তিনি কেরানীর চাকরী গ্রহণ করলেন; ধর্মচিন্তা আর সত্যানুসন্ধানে তাঁর অন্তর আপ্লুত; কাজেই অল্পদিনের মধ্যে ঐ চাকরী ছেড়ে দিয়ে তিনি ঈশ্বরের সেবায় নিজেকে নিয়োগ করলেন। পিতৃপিতামহের ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করায় এবং সাংসারিক জীবনে অনীহা দেখা দেওয়ায় তাঁকে তিরস্কার, ভীতিপ্রদর্শন ও বহু অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হল। কিন্তু তাঁর সাহস আর বিশ্বাসের দৃঢ়তা নিয়ে এ সব কিছুর বিরুদ্ধে শক্তভাবে তিনি দাঁড়াতে সক্ষম হলেন। ১৮৫৯এ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য সমুদ্রপথে সিংহল যাত্রা করলেন; কেশব তাঁর সঙ্গী হলেন। প্রত্যাবর্তনের পর কেশব ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলে মাসিক ২৫ টাকা বেতনে কেরানীর পদে বহাল হলেন; সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরের জন্য শীঘ্রই তাঁর বেতন বাড়িয়ে ৫০ টাকা করা হল। এই ব্যাঙ্কে চাকরী করবার সময় তিনি 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন।

১৮৬০এ 'সঙ্গত সভা' প্রতিষ্ঠায় কেশব গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন। 'সভার' উদ্দেশ্য ছিল বাস্তব, অর্থাৎ যা-কিছু চরিত্র গঠনে ও সাধনে সাহায্য করে, তা-ই এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। তাঁকে সমাজের 'আচার্য' পদে বরণ করা হয়; ঐ বৎসরই তাঁকে সমাজের সম্পাদক করা হয়। এই সময় তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে জাতপাত কুলীন অকুলীন প্রভৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সস্ত্রীক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন—দেবেন্দ্রনাথরা ব্রাহ্মণ হলেও, ছিলেন পিরালী ব্রাহ্মণ, পতিত। ফলে, আচারবিচারহীন দম্পতি বাড়ী হতে বহিষ্কৃত হলেন। ছ'মাস পর কেশব অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ায়, আত্মীয়স্বজনের মন নরম হল; তাঁর আইনসঙ্গত অধিকার স্বীকার করে নিয়ে বাড়ীতে তাঁর স্বস্থানে তাঁকে ফিরিয়ে আনলেন; কেশব কিন্তু তাঁর বিশ্বাস ও আচরণের স্বাধীনতা ত্যাগ করলেন না; কয়েকমাস পরে তাঁর প্রথম সন্তানের জাতকর্ম করলেন সরল ব্রাহ্ম প্রথায়, পারিবারিক চাপ সত্ত্বেও পারিবারিক প্রথা মানলেন না। সমাজের মঙ্গল ও উন্নতির জন্য কেশবচন্দ্র এই সময় পর্যন্ত প্রায় পাঁচ

বৎসরকাল দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। এই সময় দুজনের মধ্যে মতভেদ এবং শেষ পর্যন্ত বিচ্ছেদ হয়; কেশবের নেতৃত্বে 'ভারতের ব্রাহ্ম সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। মতান্তরের কারণ আচার্যরূপে কেশব উপবীত ধারণের বিরোধিতা করেন, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ উপবীত বর্জনের নাকি বিরোধী ছিলেন। ১৮৬৩তে কেশব ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের বর-কনের বিবাহ দিলে, সংস্কৃত ধর্মের এই দুই নেতার মতান্তর চরম পর্যায়ে পৌঁছয়।

আদি (ব্রাহ্ম) সমাজের সম্পাদকের পদ থেকে তাঁকে সরান হল এবং কেশব আদি (বাহ্ম) সমাজ ত্যাগ করলেন ১৮৬৫তে। এই ঘটনার এক বছর আগে ১৮৬৪তে, কেশব মাদ্রাজ ও বোম্বাই ঘুরে এসেছেন ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করে; ১৮৬৮তে দ্বিতীয়বার বোম্বাই গেলেন; ১৮৬৯এ গেলেন পাঞ্জাব। ১৮৬৬র মে মাসে মেডিক্যাল কলেজের থিয়েটারে তিনি 'যীশুখ্রীস্ট, ইওরোপ ও এশিয়া' শীর্ষক তাঁর বিখ্যাত ভাষণ দিলেন; এর ফলে, লোক সন্দেহ করতে লাগল যে, তিনি খ্রীস্ট ধর্মের দিকে ঝুঁকেছেন। ১৮৬৬র নভেম্বরে সমাজ আনুষ্ঠানিকভাবে দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। আদি (ব্রাহ্ম) সমাজের নেতা রইলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর; আর ভারতের ব্রাহ্মসমাজের নেতা হলেন কেশবচন্দ্র সেন। ১৮৬৮তে ভাইসরয় স্যার জন লরেন্সের আমন্ত্রণক্রমে কেশব সিমলা গেলেন; সেখানে, যে প্রাসাদটি ভারতীয় নৃপতিদের অবস্থানের জন্য সংরক্ষিত ছিল তাতেই তাঁকে থাকতে দেওয়া হল। তাঁরই কথামত সিমলাতে স্যার হেনরী মেইন্ 'ব্রাহ্ম বিবাহ আইনের' বিল আনেন। ১৮৭২এ লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে এটি আইনরূপে গৃহীত হয়। ক্রমে সমাজ দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হল। দেবেন্দ্র-নাথ ও কেশবচন্দ্রের সম্পর্কের অবশ্য বিশেষ উন্নতি হল না; এদিকে, কেশবের শিষ্যবৃন্দ দূরদূরান্তরে ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচার করতে লাগলেন। ১৮৭০-এ কেশব ইংল্যাণ্ড গেলেন; যাবার আংশিক উদ্দেশ্য ছিল 'ইওরোপীয় সভ্যতা ও প্রগতি সম্পর্কে ভালভাবে জ্ঞানার্জন' আর বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল ইংল্যাণ্ডের জনগণকে ভারতের পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় মঙ্গলে উদ্বুদ্ধ করা। ১৮৭০-এর প্রথম দিকে তিনি ইংল্যাণ্ডে পৌঁছন; সেখানে তিনি সোৎসাহ সংবর্ধনা পেয়েছিলেন। তাঁর ইংল্যাণ্ড গমন যে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই ভ্রমণে তাঁর বাগ্মিতার খ্যাতি আরও ব্যাপ্তি লাভ করে।

১৮৭০-এর ১২ এপ্রিল হ্যানোভার স্কোয়ার কক্ষে সমাজের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়। এই সমাবেশে ইংল্যাণ্ডের বহু অভিজাত ও বিশিষ্ট ভদ্রলোক সমবেত হয়েছিলেন। এখানে তাঁকে সহর্ষ ও আন্তরিক অভ্যর্থনা জানানো হয়। লর্ড লরেন্স তাঁর ভাষণে বলেন যে:

'তিনিই কেশবচন্দ্র সেনকে সমুদ্র পার হয়ে ইংল্যাণ্ডে আসতে উৎসাহ

দিয়েছিলেন—হিন্দু ভদ্রলোকদের পক্ষে সমুদ্রযাত্রা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, অত্যন্ত ভীষণ ব্যাপার হওয়া সত্বেও তিনি কেশবকে প্রোৎসাহিত করেছিলেন। তাঁদের অতিথি বিখ্যাত বংশের সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক। তাঁর (কেশবের) পিতামহ ছিলেন সংস্কৃত ভাষার গভীর জ্ঞানসম্পন্ন এদেশীয় পণ্ডিত পরলোকগত মিঃ উইলসনের সহযোগী ও সহকর্মী। হিন্দুদের চিকিৎসক জাতি থেকে ইনি উদ্ভূত। অল্প বয়সে ইনি পিতৃমাতৃহীন হন; এর খুল্লতাত এঁকে একটি ইংরেজী স্কুলে ভর্তি করে দেন; সেখানকার পাঠ শেষ হলে তিনি কলকাতার কলেজে পড়ে স্নাতক হন, এখানেই তিনি ইংরেজী ভাষা, সাহিত্য ও ইতিহাসে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন; এই গভীর জ্ঞান নিয়ে তিনি পৌত্তলিক থাকবেন, এ অসম্ভব। প্রথম জীবনেই তিনি মূর্তি পূজাকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করেন; ক্রমে ধ্যান ও প্রার্থনার মাধ্যমে তিনি একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। এর পর তিনি একটি (ধর্ম) সম্প্রদায়ে যোগদান করেন, নিম্ন বঙ্গে এই সম্প্রদায়টিকে ব্রাহ্ম সমাজ নামে অভিহিত করা হয়। এঁরা ব্রহ্ম বা স্রষ্টার উপাসক। এই সংস্কারকদের মধ্যে থেকে অল্পকালের মধ্যে তিনি অধিকতর সংস্কারক একটি দলের নেতা হন। মহান সংস্কারক যে দলটি বঙ্গদেশে গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরূপে গণ্য হন কেশবচন্দ্র সেন। এই আন্দোলন আজও তার শৈশব অতিক্রম করেনি; এমনকি কেশবচন্দ্র পর্যন্ত এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব সবিশেষ ব্যাখ্যা করে উঠতে পারেন নি। তিনি বিশ্বাস করেন যে, এই সংস্কারমূলক আন্দোলন ভারতীয় জনগণের ওপর ব্যাপক ও বিস্তৃত প্রভাব ফেলবে।'

ইংল্যাণ্ডে তিনি যে সব কাজ করেছিলেন, নীচে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল:

১৮৭০-এর ১০ এপ্রিল তিনি ডাঃ মার্টিনের চ্যাপেলে প্রথম 'উপদেশ' দেন। 'ইউনাইটেড কিংডম অ্যালায়েন্স ফর দি সাপ্রেশন অব লিকার ট্র্যাফিক' (যুক্তরাজ্যের মদ্যপান নিবারণী সংযুক্ত সমিতির) এক সমাবেশে তিনি মদ্যপান বিরোধী একটি বক্তৃতা দেন; এই সমাবেশে চার হাজার মানুষ সমবেত হয়েছিলেন। তিনি বলবার জন্য উঠে দাঁড়াতেই সমবেত সকলে দাঁড়িয়ে উঠে তাঁকে সহর্ষ অভিনন্দন জানান। এই বক্তৃতাটি তিনি দিয়েছিলেন ১৮৭০-এর ১৯ মে। ১৮৭০-এর ২৪ মে তিনি 'স্পার্জিয়ন্'স্ টেবার্নেকলে 'ভারতের প্রতি ইংল্যাণ্ডের কর্তব্য' বিষয়ে বক্তৃতা দেন, সেটি শোনবার জন্যও চার হাজার ব্যক্তি সমবেত হয়েছিলেন। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন লর্ড লরেন্স। ব্রিস্টলে তিনি রামমোহন রায়ের সমাধি দর্শন ও সমাধিপার্শ্বে প্রার্থনা করেন। ম্যাঞ্চেষ্টারে তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লে, এক ইংরেজ পরিবার অতি যত্নসহকারে তাঁর সেবা শুশ্রূষা করেন। মহারাণীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার হয়; মহামান্যা মহারাণীর ব্যক্তিগত

সচিব জেনারেল পনসনবি বিশেষ আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। প্রাসাদে তিনি প্রাতরাশ গ্রহণ করেন; সম্পূর্ণ নিরামিষ ভোজ্য পরিবেশিত হওয়ায় কেশব বিস্মিত হন। মহামান্যা মহারাণী রাজকুমারী লুইসি (বর্তমানে মার্সিওনেস অব লোর্ন)-কে সঙ্গে নিয়ে তাঁকে সাক্ষাৎদান করেন; তাঁদের মধ্যে আকর্ষণীয় বিষয়ে আলাপ আলোচনা হয়। বাবু কেশবচন্দ্র সেনের স্ত্রীর একখানি আলোক-চিত্র দেখে মহামান্যা মহারাণী বিশেষ খুশী হন এবং সেখানি গ্রহণে সম্মতি জানান। এই ঘটনার কয়েকদিন পর কেশবচন্দ্র মহামান্যা মহারাণীর ব্যক্তিগত সচিবের নিকট হতে একখানি পত্র পান; সচিব জানান যে, কেশবের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় মহারাণী খুব খুশী হয়েছেন, পত্রের সঙ্গে কিছু উপহার আসে; উপহারের মধ্যে ছিল: ১. মহারাণীর একখানি আলোকচিত্র, ২. আর্লি ইয়ার্স অব প্রিন্স কন্‌সর্ট এবং ৩. তাঁর 'হাইল্যাণ্ড জার্ণালস্' নামক দুখানি পুস্তকেই মহারাণীর স্বাক্ষর ছিল, আর ছিল রাজকুমারী লুইসি ও রাজকুমার লিওপোল্ডের একখানি করে আলোকচিত্র। বাবু কেশবচন্দ্র সেন ইংল্যাণ্ডের লণ্ডন, ব্রিস্টল, নর্টিংহাম, বার্মিংহাম, লীড্‌স্, ম্যাঞ্চেষ্টার, লিভারপুল, এডিনবার্গ, গ্ল্যাসগো প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতা করেন।

'সমাজ' ভারতীয়দের আগের ব্যবহার ও ধর্মে যে পরিবর্তন সাধন করেছিল, তাতে ইংল্যাণ্ডের সকল পক্ষই বিস্মিত হয়েছিল। প্রতিভাধর ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের সংস্পর্শে এসে যে-সব সুযোগ-সুবিধার উৎপত্তি হয়, দেশে ফিরে কেশবচন্দ্র তার সুফল উপলব্ধি করেন। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি হিন্দু-মুসলমান-পার্শী ও ইংরেজদের নিয়ে 'ইণ্ডিয়ান রিফর্ম অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন। অ্যাসোসিয়ে-শনটি পাঁচ ভাগে বিভক্ত, ১. স্ত্রীলোকদের উন্নয়ন, ২. শিক্ষা, ৩. স্বল্পমূল্যে সাহিত্য, ৪. মদ্যপান নিবারণ ও ৫. দান; প্রতিটি বিভাগই গত কয়েক বৎসর যাবৎ ভাল কাজ করে আসছে। কেশবচন্দ্রের জীবনের পরবর্তী বৎসরগুলি ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস।

উল্লেখ করা বাহুল্য হবে যে, কুচবিহারের তরুণ মহারাজা কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেছেন।

কলকাতার শেঠ ও বসাকগণ

শেঠরা ছিলেন গৌড়ের অধিবাসী, পরবর্তীকালে তাঁরা সুবর্ণ গ্রাম, ঢাকা কাসিমবাজার, মুর্শিদাবাদ এবং হুগলী জেলার হলুদপুরে বসবাস করতে চলে

আসেন। পূর্বে তাঁরা পেশায় তন্তুবায়[১] ছিলেন। ক্রমে তাঁরা সুতি কাপড়ের ব্যবসায় করতে আরম্ভ করেন। ব্যবসায়ের জন্য তাঁরা বাংলার প্রধান প্রধান শহরে বাস করতেন; পর্তুগীজ ও ওলন্দাজরা যখন উপনিবেশ গড়ে তুলছেন, সেই সময় তাঁরা কলকাতায় বসতি স্থাপন করেন। জনশ্রুতি, পলাশী যুদ্ধের পঞ্চাশ বছর আগে, বর্তমান কেল্লা যে জমিটির ওপর অবস্থিত, সে জায়গায় ধনী শেঠরা বসবাস করতে আরম্ভ করেন, তাঁদের আরাধ্য দেবতা গোবিন্দ জীউ-এর একটি মন্দিরও নির্মিত হয়। ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনকালে বা তৎকালে প্রভাবশালী সরকারী ব্যক্তি মহারাজা নন্দকুমার রায়ের[২] সময়, শেঠরা বসাকদের কলকাতায় এনে বসবাস করান। উদ্দেশ্য, বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনে সুবিধা। বসাকরাও ধনী ছিলেন। প্রথমে তাঁরা মুর্শিদাবাদে সুতি (কোরা) কাপড় ও রেশমী বস্ত্রের ব্যবসায় করতেন, তখন আলিবর্দি খানের শাসনকাল; ক্রমে তাঁরা কাসিমবাজার, ঢাকা এবং অন্যান্য স্থানে শাখা স্থাপন করেন। বর্তমানের কলকাতার শেঠ ও বসাকগণ কাসিমবাজার, ঢাকা প্রভৃতি স্থানের শেঠ ও বসাকদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন না।

অনারেবল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বর্তমান কেল্লা[৩] নির্মাণের সময় গোবিন্দপুরের জমির বদলে শেঠ ও বসাকদের জমি দান করেন। সেই সময় শেঠগণ গোবিন্দ জীউর মূর্তিটি বড়বাজারে নিয়ে যান; বৈষ্ণব দাস শেঠের বাড়ীর উত্তর কোণে নির্মিত মন্দিরে এখনও এই মূর্তি অধিষ্ঠিত আছেন। এই সময় শেঠ ও বসাকদের মধ্যে পাঁচ ব্যক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন। এঁরা হলেন যদুবিন্দু শেঠ, বৈষ্ণবদাস শেঠ, শোভারাম বসাক, বৃন্দাবন বসাক ও কৃষ্ণচন্দ্র বসাক। যদুবিন্দু ও বৈষ্ণবদাস অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। বিষ্ণুপুরের রাজাদের ইষ্টদেবতা রাধাকান্ত জীউ-এর বিগ্রহ এনে যদুবিন্দু শেঠ ৫নং বাঁশতলা লেনে প্রতিষ্ঠা করেন।

---

১. তন্তুবায়দের মধ্যে শেঠ, বসাক, দত্ত, মল্লিক ও হালদার এই পাঁচটি পদবী প্রচলিত।

২. কামাল-উদ্-দীন মহারাজা নন্দকুমারের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে মামলা দায়ের করেন। মহারাজাকে দোষী সাব্যস্ত করে '১৭৭৫-এর জুলাই মাসে ফাঁসি দেওয়া হয়। ভারতীয়গণ স্তম্ভিত হয়ে পড়েন যে, একজন অতি উচ্চস্থানাধিকারী ভারতীয়, তদুপরি তিনি ব্রাহ্মণ, এইভাবে ফাঁসিতে প্রাণ হারালেন। এই প্রথম ইংরেজরা একজন পদস্থ ভারতীয়কে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলেন।' তাঁর পুত্র মহারাজা গুরুদাস রায়, রায় রায়ান, সুতানুটির চড়কডাঙ্গায় বাস করতেন। ভাগিনেয় রাজা মহানন্দ ব্যতীত মহারাজা গুরুদাসের অন্য কোন উত্তরাধিকারী ছিলেন না। রাজা মহানন্দ ছিলেন মুর্শিদাবাদ নিজামতের দেওয়ান। এঁর তিন পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ কুমার জয়কৃষ্ণ মুর্শিদাবাদে বাস করতেন।

৩. (কলকাতার) বর্তমান কেল্লা যে জমির ওপর অবস্থিত, কেল্লা স্থাপিত হবার পূর্বে ঐ স্থানটি ছিল গোবিন্দপুর। অনারেব্‌ল্ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পুরাতন কেল্লা ছিল ড্যালহৌসি স্কোয়ারের উত্তর-পশ্চিমে।

পরবর্তীকালে রাধাকান্ত জীউর একটি সুন্দর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ; সেখানে আজও ৪০ থেকে ৫০ জনকে প্রত্যহ খাওয়ান হয়। আর ধার্মিকপ্রবর বৈষ্ণবদাস কলকাতা থেকে মুখ-ঢাকা পাত্রে করে পবিত্র গঙ্গাজল সোমনাথ ও দ্বারকনাথের মন্দিরে পাঠাতেন ; খাঁটি ও নির্ভেজাল গঙ্গাজলের প্রমাণস্বরূপ পাত্রগুলির উপর তাঁর নামের মোহর অঙ্কিত থাকত। তাঁর প্রপৌত্রের সময় পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চালু ছিল।

যদুবিন্দু শেঠের দুই বংশধর চৈতন্যচরণ ও আনন্দচন্দ্র ও অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। মহারাজ নবকৃষ্ণ দেববাহাদুর ও কলকাতার নাগরিকবৃন্দ চৈতন্যচরণের দানশীলতা ও অন্যান্য বহু গুণের জন্য তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। আনন্দচন্দ্র ছিলেন অত্যন্ত মিতব্যয়ী ; মৃত্যুকালে তিনি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা রেখে গিয়েছিলেন ; উত্তরাধিকারসূত্রে এই অর্থ পেয়েছেন চৈতন্যচরণ শেঠের বংশধর রাধাকৃষ্ণ শেঠের পুত্র বাবু মাধবকৃষ্ণ শেঠ। তিনি (মাধবকৃষ্ণ) চৈতন্যচরণ ও আনন্দচন্দ্র উভয়ের সম্পত্তিরই মালিক। তিনি কলকাতা শহরের জাস্টিস অব দি পীস্।

যদুবিন্দু শেঠের অন্যতম বংশধর নন্দলাল শেঠের পৌত্র রাধাকান্ত শেঠ হিন্দু কলেজের উজ্জ্বল ছাত্র ছিলেন। তিনি রাজা রাধাকান্ত দেববাহাদুরের প্রীতি ও শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন; তিনি উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীতজ্ঞ ও ফার্সী ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর পুত্র প্রিয়নাথ শেঠ যদুবিন্দু শেঠের বাসভবনে বাস করছেন ; সচ্চরিত্র, বুদ্ধিমান ও অত্যন্ত ভদ্র।

রাধাকান্ত বসাকের পুত্র বাবু তারিণীচরণ বসাক বর্তমানে শোভারাম বসাকের বংশের কর্তা। বৃন্দাবনচন্দ্র বসাকের বংশধরদের অনেকে এখনও জীবিত। এখনও কৃষ্ণচন্দ্র বসাকের বাসগৃহ কলকাতায় বর্তমান। বিডন স্কোয়ারের নিকট চিৎপুর রোডের ওপর গৃহটি অবস্থিত। শহরের কিছু শিক্ষিত উৎসাহী যুবক এখানে একটি পাঠকক্ষ স্থাপন করেছেন।

রাজা সুসময়ের পরিবারবর্গ (পাথুরিয়াঘাটা)

এই পুরাতন ধনী বংশের প্রতিষ্ঠাতা কোটিপতি লক্ষ্মীকান্ত ওরফে নকুড় ধর কবে কোথা থেকে এসে কলকাতায় বসবাস করতে শুরু করেন, জানা মুশকিল। কলকাতার পাথুরিয়াঘাটায় যে অঞ্চলটিতে তিনি বাস করতেন তার বর্তমান নাম সুখ বাজার।

অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি লক্ষ্মীকান্ত ধনৈশ্বর্যের জন্য বিখ্যাত তো ছিলেনই, তিনি সকলের কাছে বিশেষভাবে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রতি তাঁর ভক্তির জন্য। কর্নেল ক্লাইভ ও তাঁর পূর্ববর্তীগণ নকুড় ধরের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য পেয়েছিলেন। মারাঠা যুদ্ধের সময়ও অনারেবল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এঁর আর্থিক সহায়তা পেয়েছিল। নকুড় ধরের বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন তাঁর কন্যার একমাত্র জীবিত পুত্র রাজা সুখময় রায় বাহাদুর। ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ভক্তিতে দৌহিত্র মাতামহ অপেক্ষা কম ছিলেন না; অবশ্য জনহিতকর কার্যেও তিনি অনেক অর্থ ব্যয় করতেন। জগন্নাথধাম পুরীগামী তীর্থযাত্রীদের যাতায়াতের জন্য রাস্তা ও আশ্রয়ের জন্য যাত্রীনিবাস নির্মাণকল্পে তিনি লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করেন। তাঁর এই দানের জন্য মার্কুইস অব হেস্টিংসের শাসনকালে ব্রিটিশ সরকারের কাছে থেকে তিনি রাজা বাহাদুর খেতাব ও একটি স্বর্ণপদক লাভ করেন। এর কিছুদিন পর দিল্লীর বাদশাহ্ শাহ্ আমলও তাঁকে রাজাবাহাদুর খেতাব ও পাঁচ হাজার সওয়ার রাখবার অধিকার দান করেন। তাঁর দু'বার রাজা বাহাদুর খেতাব পাবার সংবাদের প্রতি পারস্যের মহামান্য সম্রাটের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়; তখন তিনিও কাউন্সিলের মারফত তাঁকে রাজা বাহাদুর খেতাব দ্বারা সম্মানিত করেন। মৃত্যুকালে তিনি পাঁচ পুত্র রেখে যান; তাঁরা হলেন ১. রাজা রামচন্দ্র রায়, বাহাদুর, ২. রাজা কৃষ্টচন্দ্র রায়, বাহাদুর, ৩. রাজা বৈদ্যনাথ রায়, বাহাদুর, ৪. রাজা শিবচন্দ্র রায়, বাহাদুর এবং ৫. রাজা নৃসিংহচন্দ্র রায়, বাহাদুর।

১. রাজা সুখময়ের জ্যেষ্ঠপুত্র রাজা রামচন্দ্র একমাত্র পুত্র রাজা রাজনারায়ণকে রেখে মারা যান। রাজনারায়ণ অপুত্রক ছিলেন; তাঁর পোষ্যপুত্র কুমার ব্রজেন্দ্রনারায়ণও অপুত্রক ছিলেন; তিনি কুমার দীনেন্দ্রনারায়ণকে পোষ্য নেন। এই দীনেন্দ্রনারায়ণ এখন জোড়াসাঁকোয় বাস করছেন।

২. রাজা সুখময়ের মধ্যমপুত্র রাজা কৃষ্টচন্দ্র ছিলেন অপুত্রক।

৩. রাজা সুখময়ের তৃতীয় পুত্র রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর রাজভক্তি ও দানে তাঁর পূর্বপুরুষের সমতুল ছিলেন। লর্ড আমহার্স্ট তাঁকে রাজা বাহাদুর খেতাব, একটি স্বর্ণপদক এবং অপূর্ব কারুকার্য খচিত একখানি তরবারি দান করেন। তরবারিখানি তিনি সকল সমাবেশে পরিধান করতেন।

উপযুক্ত পিতার যোগ্য পুত্র ছিলেন রাজা বৈদ্যনাথ রায়; রাজভক্তি ও দানের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর আদর্শস্থানীয় পূর্বপুরুষদেরও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। ফলে তিনি তাঁর সমসাময়িক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের অগ্রগণ্য হয়ে উঠেছিলেন। এখানে জনহিতকর কাজে তাঁর কয়েকটি দানের কথা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। হিন্দু কলেজকে তিনি দান করেছিলেন ৫০,০০০ টাকা; কাশীপুর গান ফাউণ্ড্রি ঘাট

ও দমদম থেকে ঐ ঘাট পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণকল্পে দিয়েছিলেন ৪০,০০০ টাকা। নেটিভ্ হাসপাতালের জন্য ৩০,০০০ টাকা; মিস উইলসন প্রকল্পিত নেটিভ স্ত্রীলোকেদের শিক্ষার জন্য ২০,০০০ টাকা; কর্মনাশা পুল নির্মাণ প্রকল্পে ৮,০০০ টাকা; ইংলণ্ডের জুয়োলজিক্যাল সোসাইটিকে দান করেছিলেন ৬,০০০ টাকা—এ দানের জন্য মহদাশয় মার্কুইস অব ল্যান্সডাউন তাঁকে অতি উচ্চ প্রশংসাপত্র দেন এবং লণ্ডন জুয়োলজিক্যাল সোসাইটি ১৮২৬-এর ২২ জানুয়ারী তাঁকে একখানি ডিপ্লোমা দান করেন।

রাজা বৈদ্যনাথের দুই পুত্র কুমার রাজকিষেণ রায় বাহাদুর এবং কুমার কালীকিষেণ রায়, বাহাদুর। কুমার রাজকিষেণ দুই পুত্র কুমার জয়গোবিন্দ ও কুমার শ্যামদাসকে রেখে পরলোক গমন করেন। কুমার জয়গোবিন্দের একমাত্র পুত্র কুমার মনোহরচন্দ্র সচ্চরিত্র যুবক। রাজা বৈদ্যনাথের কনিষ্ঠ পুত্র কুমার কালীকিষেণ জনহিতৈষণা সহ পিতার অনেক গুণ পেয়েছিলেন। তিনি পাইকপাড়ায় প্রথম সরকারী সাহায্যযুক্ত অ্যাংলো ভার্নাকুলার স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন; স্কুলটিকে তিনি বহু বৎসর যাবৎ সাহায্য করেছিলেন। চিৎপুরে নর্দার্ন দাবার্বান হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার সময় তিনি ২,৫০০ টাকা এককালীন দান করেন, এবং মাসিক ১০০ টাকা হিসাবে চাঁদা দিতে থাকেন। মহিমান্বিত রাইট অনারেবল লর্ড নেপিয়ারের কলকাতায় আগমন উপলক্ষে কুমার কালীকিষেণ তাঁকে বিরাট অভ্যর্থনা ভোজে আপ্যায়িত করেন, ঠিক যেমনটি তাঁর পিতা অভ্যর্থনা ভোজ দিয়েছিলেন ভরতপুর যুদ্ধে জয়লাভের জন্য লর্ড কম্‌বার মিয়ারকে। এই উপলক্ষে ভোজ ছাড়াও বলনাচ ও আতসবাজির বিপুল আয়োজন ছিল। একদিকে মহামান্যা মহারাণীর ৬২তম রেজিমেণ্ট স্বাগত সুর বাজাচ্ছিল, অন্যদিকে কুমার কালীকিষেণ তখন মহামান্য অতিথিকে পান ও আতর উপহার দিচ্ছিলেন। অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হয়। এ মন্তব্য করতে বড় আনন্দ হচ্ছে যে, এই অভিজাত পরিবারটির যোগ্য বংশধর পূর্বপুরুষদের অনুসৃত নীতি অনুযায়ী ঐ উপলক্ষে রাজভক্তির পরকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন; মহামান্য সেনানায়ক লর্ড নেপিয়ার অব ম্যাগডালাও যথাযোগ্যভাবে তার স্বীকৃতি জানান। লর্ড অকল্যাণ্ডের শাসনকালে কালীকিষেণকে 'কুমার' খেতাব, অভিজাত উপযোগী পরিচ্ছদ এবং হীরক সমন্বিত একটি 'সরপচ্' (পাগড়িতে আঁটবার রত্ন) দান করা হয়। লর্ড হার্ডিঞ্জ তাঁকে পারিবারিক তরবারি ব্যবহার করবার অনুমতি দেন। ১৮৭৮-এ কুমার কালীকিষেণের মৃত্যু হয়; মৃত্যুকালে তাঁর দুই সুশিক্ষিত পুত্র কুমার দৌলতচন্দ্র ও কুমার নগরনাথ জীবিত ছিলেন। পিতার জীবিতকালে দৌলতচন্দ্র ১৮৭৫ থেকে ১৮৭৮ পর্যন্ত সরকারী চাকরী করতে থাকেন; তিনি ছিলেন কালীপুরের সাবরেজিস্ট্রার অব ডীডস অ্যাণ্ড অ্যাস্যুরেন্সেস। পিতার

মৃত্যুর পর পারিবারিক সম্পত্তি পরিচালনার জন্য তিনি চাকরী ছাড়তে বাধ্য হন। চাকরী করবার সময় ঐ দায়িত্বপূর্ণ পদে তিনি তাঁর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট করে কাজ করেছিলেন। এঁর দুই শিশুপুত্র বর্তমান, কুমার তেজসচন্দ্র ও কুমার সতীশচন্দ্র। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগরনাথ ছিলেন নিঃসন্তান।

৪. রাজা সুখময় রায়ের চতুর্থ পুত্র রাজা শিবচন্দ্র রায়, বাহাদুর জনহিতৈষণা-মূলক বহু কাজ করায় ব্রিটিশ সরকার তাঁকে রাজা খেতাবে ভূষিত করেছিলেন। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান।

৫. রাজা সুখময় রায়ের পঞ্চম ও কনিষ্ঠ পুত্র রাজা নৃসিংহচন্দ্র রায়, বাহাদুর তাঁর দানশীল স্বভাবের জন্য সকলের শ্রদ্ধেয় ছিলেন। তাঁকেও ব্রিটিশ সরকার রাজা বাহাদুর খেতাবে ভূষিত করেন। তিনি একমাত্র পুত্র কুমার রাজকুমার রায়কে রেখে মারা যান। রাজকুমারের দুই পুত্র রাধাপ্রসাদ রায় ও কুমার দেবীপ্রসাদ রায়। কুমার রাজকুমার খুব সাদাসিধা জীবন যাপন করেন। সকল প্রকার বিলাসিতা বর্জন করে তিনি তাঁর সম্পত্তি প্রভূত পরিমাণ বাড়িয়েছেন। তাঁর পুত্র দুটিও ভাল শিক্ষা লাভ করেছেন। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে তাঁরাও দেশের মঙ্গল সাধন করবেন।

রাজা সুখময় রায়ের বর্তমান বংশধরদের কলকাতা ও তার উপকণ্ঠে প্রচুর ভূসম্পত্তি আছে।

ঠাকুর পরিবার

কি ইওরোপীয়, কি দেশীয়, বাঙলার সকল সমাজের ঘরে ঘরে এই পরিবারটির নাম সুপরিচিত। পরিবারটির রাজনৈতিক, সামাজিক গুণাবলী, অতুল ঐশ্বর্য এবং সর্বোপরি সুপ্রসিদ্ধ দ্বারকানাথ ঠাকুরের উদার দানশীলতার জন্য পরিবারটি উচ্চস্থান অধিকার ও রক্ষা করে চলেছেন। দ্বারকনাথ তো তাঁর দানশীলতার জন্য ইওরোপে 'ভারতীয় প্রিন্স' নামে পরিচিত ছিলেন। বহু মানবিক গুণের সমাবেশ হয়েছিল এই মানুষটির মধ্যে ; সে সব গুণাবলীই বহুধা বিভক্ত হয়ে যেন তাঁর বংশধরদের মধ্যে রক্ষিত হয়েছে। সম্পদে, সামাজিকতায়, জনহিতৈষণায় ও দানশীলতায় বাংলার আর কোন পরিবার সম্ভবত এই পরিবারটির সঙ্গে তুলনীয় নয়। এই প্রদেশে এমন জেলা খুব কম আছে ; যেখানে ঠাকুর পরিবারের কোন

না কোন শরিকের জমিদারী না আছে।

ঠাকুর পরিবার দাবী করেন যে, আদিশূর যে-পঞ্চব্রাহ্মণকে কনৌজ থেকে আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন, তাঁদের অন্যতম ভট্টনারায়ণ এঁদের আদিপুরুষ। ১০৭২ খ্রীস্টাব্দে তিনি এদেশে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। ভট্টনারায়ণ কয়েকখানি সংস্কৃত পুস্তকের প্রণেতা। এগুলির মধ্যে আছে 'কাশীরমণ মুক্তিবিচার', 'প্রয়োগরত্ন', 'বেণীসংহার নাটক' এবং 'গোভিল সূত্র ভাষ্য'।

ধরণীধর: ভট্ট নারায়ণের নবম পুরুষ ধরণীধর মনুসংহিতার ওপর একখানি ভাষ্য লেখেন। ভাই বনমালী 'ভক্তি রত্নাকর' ও 'দ্রব্য শুদ্ধিপ্রকরণ রহস্য' নামক ধর্মগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। একাদশ পুরুষ ধনঞ্জয় (ওরফে পোবো) বৈদিক শব্দের একখানি নির্ঘণ্ট প্রকাশ করেন। বল্লাল সেন বা লক্ষ্মণ সেনের শাসনকালে তিনি বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর পুত্র হলায়ুধ ছিলেন লক্ষ্মণ সেনের প্রধান মন্ত্রী এবং 'ব্রাহ্মণ সর্বস্ব', 'ন্যায়, পণ্ডিত, শিব, মৎস্যসূক্ত তন্ত্র,' 'অভিধান রত্নমালা' ও 'রবি রহস্য' গ্রন্থের প্রণেতা। তাঁর পুত্র বিভূ'র দুই পুত্র, ১. মহেন্দ্র এবং ২. গণেন্দ্র ; এঁদের দুজন থেকেই দুটি বংশধারার উৎপত্তি হয়েছে। যে বংশের কথা আমরা এখানে লিখছি তার প্রতিষ্ঠাতা মহেন্দ্র। মহেন্দ্রের পঞ্চম পুরুষ এবং ভট্টনারায়ণের অষ্টাদশ পুরুষ রাজারাম ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ওপর 'শ্রৌত সিদ্ধান্ত' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর পৌত্র জগন্নাথ (ওরফে পণ্ডিত রাজা) তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেন, ১. অলঙ্কার শাস্ত্রের ওপর 'রস গঙ্গাধর', ২. মিশ্র বিষয়ে কাব্যগ্রন্থ 'ভামিনী বিলাস', এবং ৩. জ্যামিতি বিষয়ক 'রেখা গণিত'। তাঁর পুত্র পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ 'প্রয়োগ রত্নমালা', সংস্কৃত অভিধান 'ত্রিকাণ্ড শেষ', 'একস্বর কোষ' (বর্ণমালাসমূহের অভিধান), 'হরজোট' 'হর বোলি' 'গোত্রপ্রবর দর্পণ', 'মুক্তি চিন্তামণি', 'বিষ্ণুভক্তি', 'কল্পলতা', এবং 'ভাষা বৃত্তি' রচনা করেন। এই পুরুষোত্তমই পীর আলি খাঁ নামক একজন আমিনের ভোজসভায় নিষিদ্ধ ভোজ্যের ঘ্রাণ নেওয়ায়, অন্য মতে পীর আলির সঙ্গে ভোজ্য গ্রহণ করেছিলেন এমন একজনের কন্যাকে বিবাহ করায়, তাঁকে 'পীর আলি' (পিরালী) দোষ লাগে। এই বিবাহের পর তিনি বসবাসের জন্য যশোহরে চলে যান। তাঁর পুত্র বলরাম 'প্রবোধ প্রকাশ' নামক একখানি ব্যাকরণ রচনা করেন।

পঞ্চানন: ইনি বলরামের পঞ্চম পুরুষ এবং ভট্টনারায়ণের একবিংশ পুরুষ। পঞ্চানন যশোহর ছেড়ে গোবিন্দপুর চলে আসেন ; সে যুগের ইংরেজ ভদ্রলোকগণের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়, তাঁদের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। তখন ইংরেজের অধীনে চাকরী করেন এমন সকল ব্রাহ্মণকেই ঠাকুর বলে সম্বোধন করা হত, পঞ্চাননও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। এই উপাধি থেকেই

পরিবারটির পদবী হয়ে যায় 'ঠাকুর'। ইংরেজীতে বিকৃত হয়ে ঠাকুর হয়ে দাঁড়ায় 'টেগোর'।

জয়রাম : পঞ্চাননের পুত্র জয়রাম আমিনের চাকরী করতেন। আমিন হিসাবে তিনি সমগ্র ২৪ পরগণা জরিপ করেন। কেল্লা নির্মাণের জন্য তাঁর বাস্তু অধিগৃহীত হওয়ায়, তিনি পাথুরিয়াঘাটায় বাসস্থান স্থাপন করেন। তিনি চার পুত্র, ১. আনন্দী রাম, ২. দর্পনারায়ণ, ৩. নীলমণি এবং ৪. গোবিন্দরামকে রেখে ১৭৬২তে পরলোকগমন করেন। জ্যেষ্ঠ এবং কনিষ্ঠের বংশধর নেই। মধ্যম দর্পনারায়ণের বংশধরগণ বর্তমানে ঠাকুর পরিবারের বড় তরফ এবং নীলমণির বংশ ছোট তরফ নামে পরিচিত।

বড় তরফ

দর্পনারায়ণ : জয়রামের মধ্যম পুত্র। ইনি ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। চন্দননগরে ফরাসী সরকারের অধীনে চাকরী করে এবং ব্যবসায় বাণিজ্য দ্বারা তিনি প্রভূত ধন-সম্পদের মালিক হন। নাটোর এস্টেটের বিভিন্ন অংশ বিক্রি হতে থাকলে, তিনি রংপুরে বিরাট এক জমিদারী খরিদ করেন। তাঁর দুই বিবাহ ; প্রথমা পত্নীর গর্ভে তার পাঁচ পুত্রের জন্ম হয় : রাধামোহন, গোপীমোহন, কৃষ্ণমোহন, হরিমোহন এবং পিয়ারীমোহন ; দ্বিতীয়ার গর্ভে জন্ম হয় লাডলি মোহন এবং মোহিনীমোহন, তাঁর এই দুই পুত্রের। পারিবারিক গুরুকে বর্জন এবং অন্যান্য অসদাচরণের জন্য তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধামোহন ও তৃতীয় পুত্র কৃষ্ণমোহনকে ত্যাজ্য পুত্র করেন। তাঁর পঞ্চম পুত্র মূকবধির পিয়ারীমোহনের জীবনধারণের ব্যবস্থা করে, এবং পারিবারিক ইষ্ট দেবতার সেবার জন্য ৩০,০০০ টাকা গচ্ছিত রেখে, তিনি তাঁর বাকী সম্পদ ও সম্পত্তি অপর চার পুত্রের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেন।

গোপীমোহন : দর্পনারায়ণের মধ্যম পুত্র গোপীমোহন জানতেন কীভাবে অভিজাত একটি পরিবারের গৌরব বৃদ্ধি করতে হয় ; তিনি শিক্ষা-সংস্কৃতিমূলক কাজ, দান এবং বিবেচনাপূর্ণ জনহিতৈষণা দ্বারা বংশের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করেন।

তাঁর জীবন ও কাজ ছিল সুখ ও সন্তোষপূর্ণ। সুখী হয়েছিলেন তিনি তাঁর গৌরবান্বিত পুত্র পৌত্রদের জন্যও। তাঁর খ্যাতিমান ছয় পুত্রের মধ্যে হরকুমার ও প্রসন্নকুমার এবং হরকুমারের পুত্রগণ রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও সাহিত্যিক উদ্যমের জন্য দেশীয় সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের গৌরবস্বরূপ। মাননীয় মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং সঙ্গীতের ডক্টরেট শৌরীন্দ্রমোহন বিখ্যাত পিতামহ ও

পিতা অপেক্ষা কম খ্যাতিমান নন। বর্তমান প্রেসিডেন্সি (প্রাক্তন হিন্দু) কলেজে দাতাদের নামের একটি মর্মর ফলক বসান হয়েছে—সেখানে গোপীমোহনের নাম আছে দ্বিতীয় স্থানে—প্রথম স্থানের অধিকারী হলেন বর্ধমানের মহারাজা।

গোপীমোহনের দুর্গাপূজা উৎসবে কলকাতার প্রধান ও বিশিষ্ট ইওরোপীয় অধিবাসিগণ যোগদান করতেন। অন্যান্যের মধ্যে জেনারেল ওয়েলেস্‌লি (পরবর্তীকালে ডিউক অব ওয়েলিংটন) একটি পূজা উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। এই সময় একটি মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে—টানাপাখার দড়ি ছিঁড়ে পাখাটি জেনারেলের কাছেই সশব্দে পড়ে যায়—সৌভাগ্যবশত জেনারেলের কোন আঘাত লাগেনি।

সাধারণের মধ্যে প্রচলিত কুসংস্কারের যে তিনি কত উর্ধ্বে ছিলেন—একটি দৃষ্টান্তে সেটি স্পষ্ট হবে। বিখ্যাত প্রতিকৃতিশিল্পী চিনেরী কলকাতা এলে অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত বাঙালী কুসংস্কারবশত নিজ নিজ বা পরিবার-পরিজনের প্রতিকৃতি আঁকাতে ভয় পেলেন, ঠিক যেমন ইওরোপীয়গণ উইল করতে ভয় পান, এই সংস্কারবশত যে, উইল করালে আয়ু কমে যাবে। কিন্তু গোপী-মোহন এই বহু ব্যাপক কুসংস্কারের বিরোধী ছিলেন—মিঃ চিনেরীকে দিয়ে তিনি তাঁর প্রতিকৃতি আঁকিয়ে নিলেন। ঐ বংশের মাননীয় প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বৈঠক-খানায় প্রতিকৃতিখানি এখনও টাঙান আছে।

সংস্কৃতভাষা শিক্ষা, সঙ্গীত ও শরীরচর্চার তিনি ছিলেন পৃষ্ঠপোষক। প্রচলিত বহু কুসংস্কারের উর্ধ্বে হলেও, পিতৃপিতামহের ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী পূজাপার্বণ আচার-আচরণ তিনি কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন—ব্রাহ্মণ, ঘটক প্রভৃতিদের উদারভাবে অর্থবস্ত্র দান করতেন। একবার রাইটার্স বিল্ডিংসে কিছু নবাগত অসামরিক (ইংরেজ) কর্মচারী একটি ব্রাহ্মণী ষাঁড়ের ওপর অযথা অকথ্য অত্যাচার চালাচ্ছিল। তাদের কবল থেকে তিনি ষাঁড়টিকে রক্ষা করেন। সে যুগে তাঁর এই সাহসিকতা, ধর্মনিষ্ঠা ও স্বাদেশিকতা বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছিল।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চল, এমন কি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ থেকে আগত সঙ্গীতজ্ঞগণ তাঁর বাড়িতে সমাদৃত হতেন। তাঁর সামনে গান-বাজনার অনুষ্ঠান হত, গুণীজন পুরস্কৃত হতেন। আর দেশের সঙ্গীতশিল্পিগণ তাঁর কাছে থেকে নিয়মিত মাসোহারা পেতেন।

বিখ্যাত কুস্তীগীর রাধা গোয়ালা তাঁর বেতনভুক ছিলেন। তাঁর সুরাহ্‌র (ত্তরার) বাড়ীর সংলগ্ন বাগানে কুস্তীর নিয়মিত প্রতিযোগিতা হত। কলকাতায় বাণিজ্য-সংস্থা মেসার্স ব্যারেটো অ্যাণ্ড কোম্পানীর মিঃ জোসেফ ব্যারেটো ছিলেন গোপীমোহনের বন্ধু। মিঃ জোসেফও ছিলেন কুস্তীপ্রেমিক। তিনিও কয়েকজন

কুস্তীগীর রেখেছিলেন। দুই বন্ধুতে সুরাহ্‌র (শুরার) বাগানে কুস্তী প্রতিযোগিতা দেখতেন। দীর্ঘজীবী রাধা গোয়ালা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত গোপীমোহন এবং তাঁর পুত্রদের কাছ থেকে পেন্সন পেয়েছিলেন।

হাসির কবিতা রচয়িতা 'লখীকান্ত' এবং সমগ্র বাঙলায় গান ও কবিতা রচনার জন্য বিখ্যাত কালী মীর্জাও তাঁর কাছ থেকে নিয়মিত মাসোহারা পেতেন। দীনদুঃখী এবং গুণীদের জন্য তাঁর দানের ভাণ্ডার সব সময়ই উন্মুক্ত থাকত। এক-কালের বিশিষ্ট ভূস্বামী পরিবারের বিশ্বনাথ চৌধুরীও দুর্দশাগ্রস্ত হওয়ায় তাঁর কাছ থেকে ভাল মাসোহারা পেতেন।

দয়ালু দানশীল গোপীমোহন নির্ভরশীল আত্মীয়পরিজনদেরও উপেক্ষা করেন নি; তাঁদের মঙ্গলের প্রতি তাঁর সবসময় দৃষ্টি থাকত। তাঁর বহুদিনের বিশ্বস্ত বৃদ্ধ দেওয়ান রামমোহন মুখোপাধ্যায়ের নামে তিনি রাজশাহীর একটি জমিদারী খুব সস্তায় কিনে প্রভুসেবার পুরস্কারস্বরূপ তাঁকেই দান করে দেন। চন্দননগরের গোঁদলপাড়ার অধিবাসী এই রামমোহন এই জমিদারী ভোগ করে গেছেন; তাঁর পৌত্র গোপালচন্দ্র এখন ঐ জমিদারীর জমিদার।

সরকারও তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। তাঁকে হিন্দু কলেজের 'পুরুষানুক্রমিক গভর্নর' নিয়োগ করা হয়; কলেজের একজন ছাত্রকে বিনা বেতনে পড়বার অনুমতিদানের অধিকার তিনি আজীবন ভোগ করেছেন।

যশোহরের রাজা বরদাকান্ত রায়ের পিতা তাঁর জমিদারীর বিরাট একটি অংশ রক্ষা করার জন্য গোপীমোহনের কাছে কার্যকরী আর্থিক সাহায্য লাভ করেছিলেন। মামলায় জেতার পর রাজা গোপীমোহনকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছিলেন। সেই সময় হতে দুটি পরিবারের মধ্যে একপ্রকারের আত্মীয়তা গড়ে ওঠে। এবং এঁদের বংশধরগণ আজও পরস্পরকে জ্ঞাতি ভ্রাতারূপে গণ্য করেন।

শোভাবাজারের রাজা রাজকৃষ্ণ দেবের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। প্রগাঢ় বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ তাঁরা পরস্পরের মধ্যে উষ্ণীষ বিনিময় করেন—সেকালে এটাই ছিল প্রকৃত বন্ধুত্বের প্রতীক। কিন্তু রাজা রাজকৃষ্ণ ও তাঁর সৎভাই রাজা গোপীমোহনের মধ্যে শরীকানা মামলায়, গোপীমোহন ঠাকুর গোপীমোহনকে সাহায্য করতে থাকেন; ফলে, দুজনের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়।

যৌবনে রাজা রাজকৃষ্ণ ধর্মীয় নিয়মনিষ্ঠা বিশেষ মানতেন না। একদিন কোন ধর্মীয় শোভাযাত্রায় তিনি খালি পায়ে শোভাযাত্রাটিকে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। ঠাকুর পরিবারের সামনে দিয়ে শোভাযাত্রাটি চলবার সময় রাজা গোপীমোহন ঠাকুর রসিকতা করে বললেন, 'কত ভূমিকায়ই অভিনয় করলে, রাজা!' ঠাকুর পরিবারের পিরালী দোষের প্রতি ইঙ্গিত করে রাজকৃষ্ণ রাজা গোপীমোহনের

মনে ঘা' দিয়ে বললেন, 'তা আমি করি, কিন্তু কোন ভূমিকাতেই তোমার অভিনয় তো দেখা যায় না।' গোপীমোহন আত্মস্থ ও গম্ভীর হয়ে নিজের উপবীতখানি ইঙ্গিতবহরূপে ঠিকভাবে টেনে দিয়ে বললেন, 'না রাজা, কিন্তু আমি যেস্থানে আছি, তার নাগালও তুমি কখনও পাবে না।'

কিন্তু একথা ভাবলে ভুল হবে যে, তিনি বিষণ্ণ গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। আত্মপ্রতিষ্ঠ মর্যাদাসচেতন হলেও, প্রয়োজনে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে তিনি রঙ্গরসিকতাও উপভোগ করতেন।

তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রদ্বয়ের বিবাহের সময় দু'তিন দিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছিল; বৃষ্টির আর বিরাম নেই। প্রথামত বিয়ের শোভাযাত্রা আর বের হতে পারে না। এই সময় একজন পশ্চিমা পণ্ডিত বললেন, মন্ত্রের শক্তিতে তিনি বৃষ্টি থামিয়ে দিতে পারেন। রাজা জানালেন, পারলে, তিনি মোটা পুরস্কার পাবেন।

পণ্ডিত তাঁর যত মন্ত্র ছিল সবই বলে গেলেন; বৃষ্টি কিন্তু থামল না। হেসে রাজা বললেন, কই পণ্ডিত বৃষ্টি তো থামল না। পণ্ডিত বললেন, মেঘ থেকে বৃষ্টি ঝরে পড়া আমি বন্ধ করতে চেয়েছিলাম, সেটা করেছি; কিন্তু আমি মন্ত্র বলবার আগেই যে বিন্দুগুলো মেঘ থেকে ঝরে পড়েছিল, আকাশে থাকা সে বিন্দুগুলোকে তো আমি মেঘে ফেরৎ পাঠাতে পারি না। সেগুলোর পড়া শেষ হলেই, বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাবে।

রাজা খুব হেসে বললেন, বৃষ্টি রুখতে না পারলেও, আপনার উপস্থিত বুদ্ধির জন্য আমার প্রতিশ্রুত পুরস্কার আপনি পাবেন। (দ্রষ্টব্য: ওরিয়েণ্টাল মিসেলেনি, ১৭শ সংখ্যা, আগস্ট, ১৮৮০)।

রাজা গোপীমোহন ঠাকুর সংস্কৃত, ফরাসী, পর্তুগীজ, ইংরেজী, ফার্সী ও উর্দু জানতেন। তাঁর ঐশ্বর্য, দানশীলতা, প্রভাব প্রতিপত্তি, ক্ষমাশীলতা এবং ধর্মীয় বিষয়ে কঠোর নিষ্ঠা তাঁকে এবং এই পরিবারটিকে ভারতীয় অভিজাত সমাজে অতি উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছে। মূলাজোড়ে ভাগীরথী তীরে তিনি দ্বাদশ শিবমন্দির ও একটি কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মৃত্যুকালে তিনি ছয় পুত্র রেখে যান: সূর্যিকুমার, চন্দ্রকুমার, নন্দকুমার, কালীকুমার, হরকুমার এবং প্রসন্নকুমার। প্রথম চারজন ছিলেন নিঃসন্তান।

হরকুমার: গোপীমোহনের পঞ্চম পুত্র হরকুমার অত্যন্ত নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। উচিত অনুচিত কার্যকলাপ সম্পর্কে সচেতন হরকুমার সরল সাদাসিধা জীবনযাপন করতেন। তিনি ছিলেন সংস্কৃতে প্রগাঢ় পণ্ডিত। সংস্কৃতে তিনি এমনভাবে কথা বলতেন যেন একটি প্রচলিত ভাষায় কথা বলছেন।......

কয়েক বছর আগেও, হরকুমারকে শিক্ষিত বললে, শাসকদের অনেকেই হয়তো উপহাস করতেন, কিন্তু 'এখন' মানবিক বিদ্যায় সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই

তাঁকে পণ্ডিত বলে স্বীকার করেন…। (আধুনিক) শিক্ষাকে এড়িয়ে যাবার জন্মে তিনি সংস্কৃত শেখেননি; এই ভাষা ও সাহিত্যে গভীরভাবে প্রবেশ করবার জন্যই তিনি সংস্কৃত শিক্ষা করেন।

দুই ভাই হরকুমার ও প্রসন্নকুমার স্থির করেন যে, মূলাজোড় মন্দিরে পিতার সম্মানে উপযুক্ত সংস্কৃত প্রশস্তিযুক্ত একটি মর্মর ফলক স্থাপন করবেন। উপযুক্ত সংস্কৃত শ্লোকের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হল। মৃতের প্রতি সম্মান জ্ঞাপনের জন্য যে সব কারণে ডাঃ স্যামুয়েল জনসন ল্যাটিন বাক্য উৎকীর্ণ করাবার পক্ষপাতী ছিলেন, উচ্চ শিক্ষিত হিন্দুগণ হয়তো তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আরও যুক্তিযুক্ত কারণে সংস্কৃত ভাষায় স্মৃতিফলক উৎকীর্ণ করাবার জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে উঠলেন। সুশিক্ষিত দু'তিনজন সংস্কৃতজ্ঞকে বিচারক নিযুক্ত করা হল। বিখ্যাত পণ্ডিতগণ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করলেন। অন্যান্যদের সঙ্গে হরকুমারও ছদ্মনামে শ্লোক পাঠালেন। কাউকে ঘুণাক্ষরে জানতেও দিলেন না যে, তিনিই ঐ শ্লোকের রচয়িতা। তাঁরই শ্লোক শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হওয়ায়, সেটি উৎকীর্ণ করা হল এবং আজও মূলাজোড়ে সেটি অবস্থিত। ভাই প্রসন্নকুমার তাঁর এই সাফল্যের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

তাঁর সংস্কৃতের গুরুমহাশয়ের নাম ছিল ঝড়ুমামা; পূর্ববঙ্গের মানুষ। এই ঝড়ুমামা হিন্দুস্থানে ব্যাপকভাবে প্রচলিত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ না পড়ে, পড়েছিলেন কল্প ব্যাকরণ। অল্প বয়সেই হরকুমার সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্য গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। পরিণত বয়সে তিনি সংস্কৃত কলেজের প্রখ্যাত পণ্ডিত নিমচাঁদ শিরোমণির নিকট বেদান্ত দর্শন অধ্যয়ন করেন। সে সময় হিন্দুদের মধ্যে সংকীর্ণতা এত বেশী ছিল যে, কোন দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যয়নকে সকলে সন্দেহের চোখে দেখতেন, তাঁদের আশঙ্কা ছিল দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করলে মানুষ প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাসে আস্থাহীন হয়ে পড়বে। এই কারণে, এক বিবাহ উৎসবে জ্ঞাতিভ্রাতা উমানন্দনের সঙ্গে তার দেখা হলে, উমানন্দন বললেন, তুমি বেদান্ত পড়ছ শুনে বড় দুঃখ পেলাম, হরকুমার। কারণ জানতে চাইলে, উমানন্দন বললেন, ওসব পড়লে মানুষ ম্লেচ্ছ হয়ে যায়; আমার আশঙ্কা, এত লেখাপড়া শেখার পর, এখন বেদান্ত পড়ে তুমিও ধর্মকর্মে বিশ্বাস হারাবে, এ:তা আমরা সকলেই জানি। একটু হেসে হরকুমার বললেন, মনে রেখো বেদান্তদর্শনের স্রষ্টা ব্যাসদেবই সব পুরাণের রচয়িতা। তোমার মত অনুযায়ী, ব্যাসদেবের তো ঘোর নাস্তিক হবার কথা। খ্রীস্টীয় অব্দের পনেরশো বছর আগে প্রচলিত বৈদিক ভাষা থেকেই আমাদের আধুনিক সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি; ব্যাসদেব সেই সংস্কৃত ভাষার মহত্তম রত্ন। সলোমনেরও বহু শতাব্দী পূর্বে সংস্কৃত ছিল কথ্য ভাষা এও তো সত্য কথা। বহু আধুনিক

লেখকের অর্বাচীন লেখা সকলে সানন্দে পড়ছেন, আর সংস্কৃত সাহিত্যের মহৎ অংশ পড়লে কেউ অধঃপাতে যাবে এ কুসংস্কার বড় দুঃখের।

দুই ভাই হরকুমার ও প্রসন্নকুমারের ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ হয় স্বগৃহে। তারপর তাঁদের ভর্তি করা হয় মিঃ শেরবোর্নের স্কুলে এবং শেষ পর্যন্ত হিন্দু কলেজে। তখন হিন্দু কলেজের প্রধান শিক্ষক ছিলেন মিঃ ডি অ্যানসেলিন, তিনিই হলেন দুই ভাইয়ের গৃহশিক্ষক। ফার্সী ভাষাও হরকুমার ভালভাবে শিখেছিলেন, অবাধে এবং দ্রুত তিনি এই ভাষাটিতে কথা বলতে পারতেন। তিনি সঙ্গীত শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, সাধাগলায় সুর তাল রাগ সমন্বিত গান যেমন তিনি গাইতেন তেমনি সেতার বাজনায় ছিলেন ওস্তাদ।

হরকুমার সভাসমিতি করে বেড়াবার মানুষ ছিলেন না, বিষয়সম্পত্তির দিকেও তাঁর বিশেষ নজর ছিল না। ফলে, অব্যবস্থা ও দুর্নীতির জন্য তাঁদের পৈতৃক যৌথ সম্পত্তি বিপন্ন হয়ে পড়ল; এ সংবাদ তিনি পেলেন তাঁদের এক পুরাতন বিশ্বস্ত কর্মচারীর কাছে। হরকুমার ও প্রসন্নকুমার তখন সেরেস্তার নথিপত্র পরীক্ষা করে দেখলেন কর্মচারীটির গোপন সংবাদ একান্তই সত্য। হরকুমার এখন বিষয়কর্মে মনোনিবেশ করে প্রমাণ করলেন যে, এ বিষয়েও তিনি সমান পারদর্শী। তাঁর প্রথম কাজ হল শরীকদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করা; কাজটি সহজ না হলেও, তিনি সুচারুরূপে সম্পাদন করেছিলেন। তাঁর নিজের অংশটিও ঋণে জর্জরিত। অধ্যবসায়, অক্লান্ত পরিশ্রম ও কঠোর মিতব্যয়িতা দ্বারা সেটিকে তিনি শুধু রক্ষা করলেন না, ক্রমে সেটিকে যথেষ্ট বাড়িয়েও তুললেন।

১৮৫৮তে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁর মৃত্যুতে সুপণ্ডিত, গুণী, অনুসন্ধিৎসু, পরিশীলিত চরিত্রের এই অভিজাত মানুষটির জন্য পরিচিত সকলেই শোকমগ্ন হন।

পারিবারিক গ্রন্থাগারে তিনি অমূল্য দুর্লভ সংস্কৃত পুথির সংগ্রহ রেখে গেছেন। তিনি কয়েকখানি প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থের রচয়িতা। মণিরত্নও তিনি ভাল চিনতেন—তাঁর সংগ্রহে বেশ কিছু উচ্চশ্রেণীর মণিরত্ন ছিল। [দ্রষ্টব্য : ওরিয়েন্টাল মিসেলেনি, ১৮শ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর, ১৮৮০]

এই বিশিষ্ট পরিবারের বর্তমান প্রতিনিধি হরকুমারের দুই পুত্র অনারেব্‌ল মহারাজা **যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, সি এস আই** এবং রাজা **শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, সি আই ই** রাজনীতি ও সাহিত্যজগতে এখন উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। এঁরা সব দিক দিয়েই গোপীমোহন ঠাকুরের যোগ্য উত্তরাধিকারী। এই দুই ভাই পদমর্যাদা, প্রভাব প্রতিপত্তি ও খ্যাতির দিক থেকে বিশিষ্ট পিতামহের বিশিষ্টতাকেও ছাড়িয়ে গেছেন। এই দুই ভাইয়ের উচ্চ আধুনিক শিক্ষা বা উচ্চতম পদাধিকারী ইওরোপীয়দের সঙ্গে মেলামেশা সত্ত্বেও এঁদের জাতীয় ধর্মবিশ্বাস বা জাতীয়

আচারবিচার একটুও শিথিল হয়নি। সুসংস্কৃত ইওরোপীয় আদবকায়দায় অভ্যস্ত হয়েও তাঁরা পিতৃপিতামহের সহৃদয় দানশীলতা ও সরলতা অটুটভাবে বজায় রেখেছেন। এতদিন পর্যন্ত হিন্দু অভিজাতদের দুর্নাম প্রচলিত আছে যে, তাঁরা অলস, বিলাসী এবং কামুক—এই দুই ভাই তাঁর মূর্তিমান প্রতিবাদ। একজন রাজনীতিক্ষেত্রে এবং অপর জন সাহিত্যক্ষেত্রে আপন আপন কীর্তিদ্বারা ঐ কলঙ্ক মোচনে সাহায্য করেছেন।

দি অনারেব্‌ল মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর সি এস আই

হরকুমারের জ্যেষ্ঠ পুত্র যতীন্দ্রমোহনের জন্ম হয় কলকাতায়, ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে। তাঁর আট বৎসর বয়সে তাঁকে হিন্দু কলেজে ভর্তি করা হয়; এখানে তিনি ন'বৎসর শিক্ষালাভ করেন; মেধাবী যতীন্দ্রমোহনের কলেজীয় ছাত্রজীবন ছিল উজ্জ্বল। এরপর ক্যাপটেন ডি এল রিচার্ডসন, রেভারেণ্ড জন ক্লাশ প্রভৃতি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং কয়েকজন (এঁদের তুলনায় দ্বিতীয় শ্রেণীর) শিক্ষাবিদের গৃহশিক্ষকতায় ইংরেজী সাহিত্য ও বিজ্ঞানে তাঁর শিক্ষা পরিচালিত হয়। পিতার আদর্শ ও উৎসাহ তাঁকে সংস্কৃত শিক্ষায় প্রেরণা দেয়—এই ভাষাতেও তিনি পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। অপরদিকে কাব্যের প্রতি স্বাভাবিক ঝোঁক থাকায় তিনি ইংরেজী ও বাংলায় অল্প বয়স থেকেই কবিতা রচনা করতেন; এগুলি 'লিটারারী গেজেট' ও 'প্রভাকরে' সাদরে প্রকাশিত হত। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় নাট্যকলার পুনরুজ্জীবনের জন্য তাঁর উদ্যম ও প্রচেষ্টার মূল্য অসীম। তাঁর পদমর্যাদা ও সম্পদের জোরে কিছু পুরাতন নাটকের অভিনয় করানো তাঁর পক্ষে আদৌ কঠিন ছিল না; এজন্য বিশেষ প্রশংসার কোন কারণ থাকত না; কিন্তু সেটুকুতেই তিনি ক্ষান্ত থাকেন নি; নিজেই তিনি কয়েকখানি উচ্চশ্রেণীর নাটক লেখেন; এগুলির মধ্যে তাঁর 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য; কারণ প্রচলিত অশ্লীলতা সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়ে নৈতিকতা ও সুরুচি বজায় রেখে তিনি নাটকীয় ঘটনা গড়ে তোলেন। বাল্যকাল থেকেই সাহিত্য রচনার দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল; এই সময় তিনি বেশ কয়েকটি নাটক বা গীতিনাট্য হয় রচনা করেন নয়তো সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করেন। কিন্তু এগুলি তিনি প্রকাশ করেন অপরের নামে। সে যুগে বেলগাছিয়া ভিলায় জনপ্রিয় নাটকগুলির অভিনয় তাঁরই অনুপ্রেরণায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বর্তমানকালে

নাট্যানুষ্ঠানে যেরূপ ঐকতান বাদন হয়ে থাকে, তিনিই তার স্রষ্টা; হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের রাগ-রাগিণীকে তিনি এজন্য কাজে লাগিয়েছিলেন। যৌবনে যতীন্দ্রমোহনের ধারণা ছিল ছন্দ, শব্দের ঝঙ্কার ও লালিত্যের দিক থেকে বাংলা ভাষা এত দুর্বল যে, এতে অমিত্রাক্ষর ছন্দে উচ্চস্তরের কবিতা বা কাব্য রচনা করা সম্ভব নয়। তাঁর এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করবার জন্য মাইকেল মধুসূদন দত্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য রচনা করলেন; এখানি পড়ে মহারাজার ভুল ভাঙল; তিনি কাব্যখানি প্রকাশনার সমগ্র ব্যয় বহন করতে স্বীকৃত হলেন। সাহিত্য কীর্তিকে তাঁর সাহায্যদান এই একটিমাত্র ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না; বহু সাহিত্যিকের বহু গ্রন্থ সময়মত তাঁর সহায়তা না পেলে কখনও প্রকাশিত হতে পারত না। শহর কলকাতা ও তার আশপাশের যে-সকল জ্ঞানী গুণী মানী ব্যক্তি তাঁর বৈঠকখানায় পরিচালিত বার্ষিক নাট্যানুষ্ঠানসমূহ দেখবার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরা একবাক্যে ঐ সকল অনুষ্ঠানের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এইভাবে তাঁর প্রচেষ্টাতে ভারতের প্রাচীন নাট্যসাহিত্যের প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধা পুনরায় জাগ্রত হয়। লর্ড নর্থব্রুক দুবার এই নাট্যানুষ্ঠান দেখেছিলেন, ভারতের প্রাক্তন আণ্ডার সেক্রেটারী অব স্টেট (উপমন্ত্রী) মিঃ গ্র্যাণ্ট ডাফ, কয়েকজন ছোট লাট বাহাদুর, কয়েকজন প্রধান সেনাপতি, অন্যান্য উচ্চপদাধিকারী এবং যেসব সম্ভ্রান্ত বিদেশী কৃতবিদ্য ব্যক্তি এই সকল অনুষ্ঠান দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁরা সকলেই ভারতীয় প্রাচীন নাট্যকলার অতি উচ্চ প্রশংসা করেন। এক সময় তিনি ইওরোপীয় এবং ভারতীয় সঙ্গীতের যথেষ্ট চর্চা করতেন; গান বাজনায় কিছু পারদর্শিতাও লাভ করেছিলেন। তিনিই প্রথম ইংল্যাণ্ড থেকে মিউজিক্যাল বক্‌স্ ও অরগ্যান আনিয়ে দেশীয় গানের স্বর বসিয়েছিলেন।

বাইরের কর্মজীবনে তাঁকে দীক্ষা দেন তাঁর কাকা অনারেবল প্রসন্নকুমার ঠাকুর, সি এস আই। তাঁর সমাজে যে মর্যাদা, ধনসম্পদ, স্বাভাবিক ও অর্জিত গুণরাশি আছে, স্বাভাবিকভাবেই আশা করা যায় যে বাইরের কর্মজীবনে তিনি উপযুক্ত স্থান সহজেই অধিকার করবেন। পাইকপাড়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের পরলোকগমনে তাঁর সামনে একটা সুযোগ এসে যায়। তাঁকে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের অবৈতনিক সম্পাদক নির্বাচন করা হয়—এই প্রতিষ্ঠানের তিনি এখন সভাপতি। সরকার থেকেও সম্মান এল। স্যার উইলিয়াম গ্রে তাঁকে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য নিয়োগ করেন।

স্যার উইলিয়াম গ্রে-র ধারণা হল, তাঁর মতো মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্যপদ লাভ যথেষ্ট নয়, তাই তিনি তাঁকে এমন সম্মান দানের জন্য সুপারিশ করেন যা, এদেশীয় সমাজে তাঁর স্থানের উপযুক্ত হয়।

'বাবু যতীন্দ্রমোহন অতি উচ্চ শিক্ষিত, তিনি উত্তম ইংরেজী শিক্ষা লাভ

করেছেন। দেশীয় সমাজে তিনি নেতাস্বরূপ, তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র অসাধারণ; তাঁর দেশবাসিগণ তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন। তিনি লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্নরের লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সক্রিয় সদস্য; দেশের মঙ্গলের জন্য তিনি সুচিন্তিতভাবে অংশগ্রহণ করেন। মেদিনীপুর, ফরিদপুর, মুর্শিদাবাদ, 'রাজশাহ্‌য়ে', 'নদ্দীয়া' এবং ২৪ পরগণায় তাঁর জমিদারী আছে। এছাড়া তিনি জীবদ্দশায় পরলোকগত রায় প্রসন্নকুমার ঠাকুরের রংপুর প্রভৃতি স্থানের জমিদারীসমূহের উপস্বত্বেরও অধিকারী। কলকাতা এবং তাঁর জমিদারীর এলাকা সমূহে রাস্তা স্কুল প্রভৃতি জনহিতৈষণামূলক কাজে দান করতে তিনি সব সময়ই আগ্রহী; স্বদেশবাসিগণের মধ্যে সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্পর্কিত জ্ঞানের প্রসারের জন্য তিনি অকাতরে দান করে আসছেন। কলকাতায় তিনি আঠার জন ছাত্রের ভরণপোষণ করে চলেছেন। তা ছাড়া সম্ভ্রান্ত জমিদার হিসাবে তিনি ১৮৬৬র দুর্ভিক্ষের সময় তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন; ঐ সময় তিনি প্রজাদের খাজনা মকুব করেন। তিন মাস যাবৎ তিনি ২৫০ জন নিরন্ন মানুষকে প্রত্যহ অন্নদান করেন।'

তদানীন্তন ভাইসরয় অ্যাণ্ড গভর্নর জেনারেল আর্ল অব মেয়ো ১৮৭১-এর ১৭ মার্চ একখানি সনদ দ্বারা 'ব্যক্তিগত' সম্মান হিসাবে 'রাজা বাহাদুর' খেতাবে তাঁকে ভূষিত করেন। ঐ সম্মান অর্পণ করবার সময় লেফটেনাণ্ট গভর্নর স্যার জর্জ ক্যাম্বেল তাঁর অভিভাষণে বলেন :

> 'মহামান্যা মহারাণীর প্রতিনিধিরূপে মাননীয় ভাইসরয় আপনাকে যে খেতাব দান করেছেন, আনুষ্ঠানিকভাবে সেটি আপনাকে অর্পণ করার সৌভাগ্য হওয়ায় আমি বিশেষ আনন্দবোধ করছি।
>
> কলকাতার ইতিহাসে মহান স্থানের অধিকারী, এমন কি ব্রিটিশশাসিত ভারতেও মহান স্থানের অধিকারী একটি পরিবারে আপনি জন্মগ্রহণ করেছেন। পরিবারটি রাজভক্তি এবং জনহিতৈষণার জন্য সুপরিচিত।
>
> শুধুমাত্র আপনার বংশগৌরব স্মরণ করেই মাননীয় ভাইসরয় আপনাকে এই সম্মানে ভূষিত করেন নি; আপনার ব্যক্তিগত যোগ্যতার জন্যও আপনাকে এই সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে। আপনার বুদ্ধিমত্তা, দক্ষতা, উল্লেখযোগ্য জনহিতৈষণা, মহান চরিত্র এবং রাজ্যের প্রতি আপনি যে সেবা প্রসারিত করেছেন তার জন্য এই সম্মান অত্যন্ত যুক্তিযুক্তভাবেই আপনার প্রাপ্য।
>
> বেঙ্গল কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে আপনি আমাকে যেরূপ সাহায্য করেছেন, তাতে আমি আনন্দিত এবং উক্ত পরিষদে বিভিন্ন বিষয় আলোচনা কালে আপনি যে জ্ঞান ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, তার দ্বারা আমি প্রভূত উপকৃত হয়েছি। আপনার মতো ব্যক্তির পরামর্শ আমার পক্ষে

অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অনেক সময় আপনার সঙ্গে আমার মতের পার্থক্য হয়েছে একথা সত্য; কিন্তু মানুষে মানুষে মতের ভিন্নতা তো স্বাভাবিক: আজ অকপটে জানাচ্ছি যে, আপনার সহমত আমার পক্ষে সব সময় মূল্যবান হয়েছে। আর ঘটনাক্রমে আপনি যখন আমার বিরোধিতা করেছেন, আপনার বিরোধিতা সব সময়ই বুদ্ধিদীপ্ত, সরকারের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত এবং শিষ্টতাপূর্ণ হয়েছে।'

একমাত্র স্যার উইলিয়াম গ্রে-ই যে তাঁর গুণ, চরিত্র ও বুদ্ধিমত্তায় মুগ্ধ হয়েছিলেন তাই নয়; পরিষদে তাঁর প্রথমবারের 'কাল' শেষ হলে, স্যার জর্জ ক্যাম্‌বেল তাঁকে দ্বিতীয়বার সদস্যপদ গ্রহণের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান। তাঁর পত্র:

বেলভেডিয়ার, আলিপুর
৫ অক্টোবর, ১৮৭১

প্রিয় রাজা,

পরিষদে আর একটি 'টার্মে'র জন্য আপনাকে সদস্য মনোনীত করবার সম্মতি চাইছি। আপনার চরিত্রবত্তা এবং নিরপেক্ষভাবে সকল প্রশ্ন পর্যালোচনা করবার ক্ষমতার জন্য আপনার সাহায্যকে মূল্যবান মনে করি; শ্রেণীস্বার্থে আপনার চিন্তা আবদ্ধ নয়, বরং আপনার দেশের উচ্চনীচ সকলের প্রতি আপনার সমদৃষ্টি আছে, এই আমার বিশ্বাস।

ইতি ভবদীয়,
স্বাঃ জি ক্যামবেল

রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ইত্যাদি।

তাঁর নির্মলচরিত্রবত্তা, পরিশীলিত দক্ষতা এবং সশ্রদ্ধ সরকার-প্রীতির জন্য অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত কারণে ছোটলাট বাহাদুরগণ, এমন কি বড়লাট বাহাদুরগণ পর্যন্ত এই মানুষটির ওপর বিশেষ আস্থা রাখতেন, জনগণের মঙ্গল সম্পর্কিত বিভিন্ন কাজে তাঁর পরামর্শ চাইতেন। ১৮৭৩-৭৪-এর বিহার দুর্ভিক্ষের সময় মাননীয় লর্ড নর্থব্রুক শুধু যে তাঁর পরামর্শ চেয়েছিলেন তাই নয়, পরন্তু তাঁকে এ-কথাও বলেছিলেন, 'হয় ইংল্যাণ্ড গিয়ে হাউস অব কমন্সের সিলেক্ট কমিটির কাজে ভারতীয় বিষয়াবলীর ওপর সাক্ষ্য দিতে, বা এই কাজের জন্য এমন একজন ভারতীয় ভদ্রলোকের নাম সরকারকে জানাতে, যাঁর ভারতীয় বিষয়াবলীর ওপর পর্যাপ্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আছে এবং যিনি যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার অধিকারী।' এতখানি আস্থা আর কোন ভারতীয় ভদ্রলোকের ওপর এর আগে কোন শাসক স্থাপন করেন নি। লর্ড নর্থব্রুক তাঁকে যে কি পরিমাণ শ্রদ্ধা করতেন, মহারাজ রমানাথ ঠাকুরকে লিখিত ১৮৭৭এর ১৬ মার্চ তারিখের তাঁর পত্রে সেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পত্রখানির সংশ্লিষ্ট অংশ এখানে আমরা উদ্ধৃত করছি: 'রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে নেওয়া হয়েছে জেনে খুশী হলাম। সব সময়ই আশা করতাম যে, তিনি পরিষদের সদস্য হবেন। আমার কথা দয়া করে তাঁকে জানাবেন।'

উত্তরাধিকার সূত্রে রাজা যতীন্দ্রমোহন সুবিস্তৃত জমিদারীর মালিক ছিলেন, তার ওপর তাঁর কাকা অনারেবল প্রসন্নকুমার ঠাকুর সি এস আই ইষ্টিপত্রদ্বারা তাঁর জমিদারীও আজীবন ভোগ করবার অধিকার দেওয়ায়, তিনি দেশের প্রথম শ্রেণীর জমিদারদের অন্যতম হতে পেরেছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁর অগণিত প্রজা-সাধারণের মঙ্গলের প্রতি তাঁর সদয় ও বিবেচনাপূর্ণ দৃষ্টি ছিল। প্রজাদের দুঃখ দুর্দশার দিনে তাঁর দান ও সাহায্য হত অবারিত।

১৮৬৬র আকালের সময়, প্রজাদের দুর্দশা নিবারণের জন্য তিনি সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন; আর মেদিনীপুরের রায়তদের দুর্দশা চরমে ওঠায়, অন্যান্য ত্রাণ ব্যবস্থার সঙ্গে ৪০,০০০ টাকা খাজনাও তিনি মকুব করে দেন। জনহিতৈষণার এই মহান কাজের জন্য জেলা কর্তৃপক্ষের মারফত সরকার থেকে তাঁকে ধন্যবাদ জানানো হয়। তাঁর উদারতা ও দানশীলতার এইটিই একমাত্র দৃষ্টান্ত নয়। নেটিভ হাসপাতালটি চাঁদনীচক থেকে পাথুরিয়াঘাটার স্ট্র্যাণ্ড রোডে স্থানান্তরের প্রস্তাব হলে, হাসপাতালের বর্তমান বাড়ীগুলি যে বিস্তৃত মূল্যবান জমির উপর অবস্থিত, তার সবটাই তিনি নিঃশর্ত ও নিঃস্বার্থভাবে সরকারকে দান করেছিলেন। ১৮৭৬এর ৩ ফেব্রুয়ারী মেয়ো নেটিভ হাসপাতালটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকালে উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতি বাংলার প্রধান বিচারপতি স্যার রিচার্ড কৌচ্ বলেন, 'এই স্থানে হাসপাতাল স্থানান্তরিত করার প্রস্তাব হয়েছে শোনামাত্র রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এই জমির ওপর তাঁর সকল স্বত্বস্বামিত্ব অসুস্থ স্বদেশ-বাসীর চিকিৎসার জন্য নিঃস্বার্থভাবে দান করে দিয়েছেন।'

দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও জনগণের মঙ্গলের জন্য স্থাপিত নিধিতে দান করতে বা চাঁদা দিতে মহারাজা কখনও দ্বিধা করেন না। তাছাড়া তাঁর বিপুল প্রভাব, প্রতিপত্তিকেও তিনি জনহিতৈষণার কাজে লাগান। তরুণদের শিক্ষায় উৎসাহ দেবার উদ্দেশ্যে তিনি সরকারের পরিচালনায় ১২,০০০ টাকা গচ্ছিত রেখেছেন। এর সুদ থেকে তাঁর পিতার নামে মাসিক ২০ টাকা হারে একটি বৃত্তি সংস্কৃতের শ্রেষ্ঠ ছাত্রকে দেবার এবং আর একটি সমপরিমাণ মাসিক বৃত্তি তাঁর কাকার নামে আইনের সর্বাপেক্ষা সফল ছাত্রকে দেবার ব্যবস্থা হয়।

সংস্কৃত শিক্ষারও তিনি উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক। একটি নিধি স্থাপন করে তিনি মেধাবী দরিদ্র টোল ছাত্রকে মাসিক ৮ টাকা হারে 'প্রসন্নকুমার ঠাকুর বৃত্তি' এবং বাংলায় টোলসমূহের মধ্যে থেকে সর্বাপেক্ষা মেধাবী দুজন ছাত্রকে 'হরকুমার ঠাকুর'

কেয়ুর দেবার ব্যবস্থা করেন।

তিনি 'মহারাজা' খেতাব পান দিল্লীতে ১৮৭৭এর ১ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত 'সামাজিক সমাবেশে' এবং ১৮৭৭এর ১৪ আগস্ট কলকাতার বেলভেডিয়ারে অনুষ্ঠিত দরবারে সনদ দান উপলক্ষে ছোট লাটবাহাদুর নিম্নোক্ত ভাষণ দান করেন :

'এমন একটি বংশের প্রতিনিধিরূপে আপনি এসেছেন, যে বংশে বহু সদ্‌গুণ-ভূষিত জনহিতৈষী ও দেশের হিতে উৎসর্গিত-প্রাণ প্রথম শ্রেণীর মানুষের উদ্ভব হয়েছে, এই জন্য 'মহারাজা' খেতাবের সনদটি আপনাকে উপহার দেবার সময় আমি বিশেষ আনন্দ বোধ করছি, সরকার এই পরিবারটিকে সব সময় বিশ্বাস করেছেন এবং প্রয়োজনে এর পরামর্শ নিয়েছেন। জনগণের মঙ্গলের জন্য আপনি সব সময়ই সুচিন্তিত উদার মনোভাব অবলম্বন করেছেন; লেফটেনান্ট গভর্নর ও গভর্নর জেনারেলের পরিষদের সদস্যরূপেও আপনি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদন করেছেন।'

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই দরবারে মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণকেও মহারাজা খেতাবের সনদ ও খেলাৎ দেওয়া হয়, কিন্তু প্রথম স্থানটি নির্দিষ্ট করা হয়েছিল মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, সি এস আই-এর জন্য।

সেই বৎসরই মহারাজাকে গভর্নর জেনারেলের লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত করা হয়। যে উৎসাহ ও দক্ষতার সঙ্গে তিনি এই পদের কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করেন, তার জন্য তাঁকে ১৮৭৯তে দ্বিতীয়বারের জন্য সদস্য মনোনীত করা হয়। এ সম্মান আজ পর্যন্ত কোন বাঙালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বা ভদ্রলোককে দেখান হয়নি। সুপ্রীম লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে তিনি যেরূপ মূল্যবান কাজ করেছিলেন, সে সম্পর্কে ঐ পরিষদের সর্বাপেক্ষা যোগ্যতা-সম্পন্ন আইন সদস্য স্যার আর্থার হব্‌হাউস সিভিল প্রোসিডিওর বিলের ওপর বিতর্কের সময় যে মন্তব্য করেন, সেইটি উদ্ধৃত করলেই বোধ হয় যথেষ্ট হবে। তিনি বলেন :

এ বিষয়ে যা কিছু বলা যেতে পারে, সে সবই আমার বন্ধু, মহারাজা যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুর অবশ্যই বলবেন : কারণ কমিটির অধিবেশনে তিনি বিশেষ দক্ষতা ও যুক্তিসহ বিলের বিরোধীদের মত প্রকাশ করেছেন। বন্ধুত্ব ও বিনয়ের সঙ্গেই স্বীকার করছি যে, ৪র্থ সংখ্যক বিলে ধারাটি যেভাবে আছে, অপরিবর্তিতরূপে তেমনি থাকলে, আমি মাননীয় মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের যুক্তিসমূহের বিরুদ্ধে নিজ মত সমর্থন করতে পারব না। ৪র্থ সংখ্যক বিলের ওপর ভোট দেবার সময় কমিটিতে তাঁর যুক্তি মেনে নিয়ে তাঁর সঙ্গেই ভোট দিয়েছি—এই হল আমার বক্তব্যের বাস্তব প্রমাণ।

ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট পাস করবার সময় মহারাজা কি ভূমিকা নিয়েছিলেন সে সম্পর্কে অনেক ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হয়েছে। দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রসমূহকে নিন্দা করা দূরে থাক, সংবাদপত্রের ওপর যে-কোন প্রকার বাধা নিষেধের তিনি সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। দেশীয় ভাষায় নীচুস্তরের কিছু সংবাদপত্রের দায়িত্বজ্ঞানহীন ঘৃণ্য প্রচারের জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন এবং বলেন, 'এদের প্রচারগুলি শূন্যগর্ভ বাগাড়ম্বর ছাড়া কিছু নয়।' তাঁর এই সমালোচনাকে স্যার এর্স্কিন পেরী বলেন, 'অত্যন্ত সঠিক সমালোচনা।' (দ্রষ্টব্য : **Copy of Opinions and Reasons entered in the Minutes of Proceedings of the Council of India relating to the Vernacular Press Act, 1882, presented to both Houses of Parliament, p. 3).** সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অপব্যবহার দমনের জন্য পিনাল কোডই পর্যাপ্ত—এই ছিল ব্যাপকভাবে জনগণের অভিমত। কিন্তু সরকারের আগ্রহাতিশয্যের প্রতি সম্মান জ্ঞাপনের জন্য এবং আফগান সংকটের কথা বিবেচনা করে, তিনি (মহারাজা যতীন্দ্রমোহন) স্থির করেন যে, রাজভক্ত প্রজারূপে বিরোধিতা করা উচিত নয়। এই অবকাশে তাঁর উক্তরূপ আচরণের এই ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী রাইট অনারেবল মিঃ ডবল্যু ই গ্ল্যাডস্টোন। তিনি বলেন, 'কাউন্সিলের একমাত্র নেটিভ সদস্য ইচ্ছাকৃতভাবে এবং চেষ্টা সহকারেই কোনরূপ মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকেন। কাউন্সিলের একমাত্র নেটিভ সদস্যের এই হল অভিমত ; তিনি বিলটি সমর্থন করেছেন, কিন্তু বিলের বিষয়বস্তুকে সমর্থন করেন নি।' (দ্রষ্টব্য ; **Hansard's Parliamentary Debates, Vol. 242, Pt. I. P 57).**

১৮৭৯তে তিনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নির্বাচিত হন। ঐ বৎসর মহামান্যা ভারতসম্রাজ্ঞীর আদেশে তাঁকে মোস্ট এগজলটেড অর্ডার অব দি স্টার অব ইণ্ডিয়া পদবী দেওয়া হয়—এই উপলক্ষে লর্ড লিটন তাঁকে পত্র ও টেলিগ্রাম দ্বারা অভিনন্দন জানান।

ওই সময় বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স দুর্গাপূজার ছুটি ১২ দিন থেকে কমিয়ে ৪ দিন করবার জন্য সরকারের ওপর ক্রমাগত চাপ দিচ্ছিল ; মহারাজা যতীন্দ্রমোহন হস্তক্ষেপ না করলে দেশবাসী বার দিন ছুটি উপভোগের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হত : বোম্বাই থেকে প্রকাশিত থিওজফিস্ট পত্রিকা তাঁদের ১৮৮০র আগস্ট সংখ্যায় লিখলেন :

মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য। ইনিই অন্যতম ভারতীয় অভিজাত ব্যক্তি যাঁকে ইওরোপীয় সমাজ সর্বাপেক্ষা বেশী সম্মান ও শ্রদ্ধা করে থাকে। তাঁর কাকার মতো তাঁকেও মহামান্যা মহারাণী 'কমপ্যানিয়নশিপ অব দি স্টার অব ইণ্ডিয়া' পদবী দ্বারা সম্মানিত করেছেন ; আর

দুর্গাপূজার ছুটি রক্ষার জন্য দেশবাসী এঁর নিকট ঋণী।

লর্ড লিটনকে এ বিষয়ে ভুল বোঝান হয়েছিল, মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের ব্যক্তিগত প্রভাবে লর্ড লিটন প্রকৃত তথ্য জেনে ছুটি সংরক্ষণ না করলে, বাংলার অধিবাসীরা যে কি পর্যন্ত হতাশ হত, সে আর বলবার নয়। এ ছুটি শুধুমাত্র বাঙালীরা ভোগ করেন না। সর্বধর্ম ও জাতির মানুষ বাৎসরিক এই দীর্ঘ ছুটিতে রেল ও নদীপথে স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য বাইরে যান। এই ছুটির অবসরে সরকারী বা বেসবকারী অফিসে কর্মবত বাঙালী আত্মীয়স্বজনের কাছে বৎসবান্তে যেতে পারেন, ব্যক্তিগত বৈষয়িক কাজের তদারক কবতে পারেন, সর্বোপরি তাঁদের সাধ্যের মধ্যে যতটুকু উৎসব আনন্দ করা যায়, তা তাঁরা এই অবকাশেই করে নেন। হিন্দুবা যতদিন এই ছুটি উপভোগ করতে পারবেন, ততদিন অন্তত তাঁরা মহারাজা যতীন্দ্রমোহনকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মনে রাখবেন।

লর্ড লিটন তার প্রতি বিশেষ বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল, লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্যপদ মহারাজার প্রতি যেমন সম্মানজনক, তেমনই, রাজভক্ত একজন অভিজাতের সেবাও সরকারের পক্ষে মূল্যবান, কারণ মহারাজার মতামত ছিল স্বাধীন, কিন্তু কখনই সবকারের কাজের পক্ষে বাধাস্বরূপ হত না, বিবেকের দ্বাবাই তিনি পরিচালিত হতেন, কিন্তু তাঁর মতামত পূর্বাপর কখনও সামঞ্জস্যহীন হত না। দু'জনের মধ্যে ববাবব পাবস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির সম্পর্ক ছিল। লর্ড লিটন বিশ্বাস করতেন যে, তিনি যেমন মহারাজার বিবেচনা-পূর্ণ আপসপন্থী মনোভাব দ্বারা উপকৃত হযেছেন, ভবিষ্যৎ ভাইসরয়গণও তাঁর এই সেবা ও মনোভাব দ্বারা সমভাবে উপকৃত হবেন। পরবর্তীকালে এখান থেকে অবসব গ্রহণের পর, লর্ড লিটন তাঁকে যত চিঠি লিখতেন, সবগুলিতেই তাঁকে 'ইয়োব হাইনেস' পাঠ থাকত।

বাজা মহাবাজা খেতাব দ্বাবা সম্মানিত অন্যান্য অভিজাত ব্যক্তিগণ তাদের মোট পাঁচ জন, বেশী হলে ছ'জন, সশস্ত্র প্রহবী বাখবার অধিকাবী, একমাত্র মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, সি এস আই সরকারের বিশেষ আদেশ বলে, দেশীয় রাজন্যবর্গের ন্যায় অনেক বেশী সংখ্যক সশস্ত্র প্রহরী রাখবার অধিকারী।

অপরপক্ষে মহারাজা অত্যন্ত নিষ্ঠাবান হিন্দু, পূজা পাঠে তিনি অনেক সময় ব্যয় করেন। মর্যাদাসম্পন্ন হয়েও তিনি অমায়িক, চালচলন সাদা-সিধা লোক দেখানো কোন ভাব নেই, যাঁরাই তাঁব সংস্পর্শে আসেন সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করেন, ভালবাসেন। তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র নির্মল, নিষ্কলঙ্ক, ইংরেজ সমাজ, ইংরেজী শিক্ষা দেশের অভিজাত হিন্দুদের মধ্যে বিলাস-ব্যসনের যে প্রলোভন সৃষ্টি করেছে, তিনি অপরিমেয় অর্থ ও পদমর্যাদা সত্বেও সে সব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

তাঁর মহৎ চরিত্রের সবচেয়ে বড় পরিচয়, তাঁর বৃদ্ধা মা-র প্রতি ভালবাসা ও ভক্তি আর ভাইয়ের প্রতি অসাধারণ স্নেহ ও প্রীতি।

তাঁর কোন পুত্রসন্তান নেই; তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রগণই তাঁর বিশাল সম্পত্তির অধিকারী হবেন; আমরা আশা করব যে, তাঁরা তাঁর সম্পত্তির মতো তাঁর গুণাবলীরও উত্তরাধিকারী হবেন।

তিনি মেয়ো হাসপাতালের গভর্নর, ভারতীয় যাদুঘরের অছি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি। কলকাতা শহরের জাস্টিস অব দি পীস, ইত্যাদি ইত্যাদি।

জ্যেষ্ঠ যতীন্দ্রমোহন ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে থাকলে, তাঁর অনুজ শৌরীন্দ্রমোহন বিশেষ প্রতিভার জোরে সারা জগৎকেই তাঁর খ্যাতির মঞ্চে পরিণত করেছেন।

রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর সি আই ই

হরকুমার ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র শৌরীন্দ্রমোহনের জন্ম হয় ১৮৪০এ। ন'বছর বয়সে তাঁকে হিন্দু কলেজে ভর্তি করা হয়। ন'বছর তিনি ঐ কলেজে পড়তে পেয়েছিলেন; মাথার অসুখের জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ঐ সময় তাঁকে কলেজ ছাড়তে হয়। বাল্যকাল থেকেই তাঁর লেখার দিকে ঝোঁক ছিল, লেখার জন্য পরিশ্রমও করতেন অক্লান্তভাবে। 'ভূগোল ও ইতিহাস ঘটিত বৃত্তান্ত' বইখানি তিনি লেখেন চৌদ্দ বছর বয়সে—এটি প্রকাশিত হয় ১৮৫৭তে। পরের বছর তাঁর মৌলিক নাটক 'মুক্তাবলী' প্রকাশিত হয়—তখন তাঁর বয়স পনের।

অল্প বয়স থেকেই তিনি পশু ও পাখী খুব ভালবাসতেন; এই সম্পর্কিত তাঁর সংগ্রহও মন্দ ছিল না। এইগুলি পালন করতে করতে প্রকৃতি-বিজ্ঞানে তিনি এমন বাস্তব জ্ঞান অর্জন করেন যে, শুধু ডাক শুনেই পাখীটি কোন প্রজাতির অন্তর্গত তা তিনি বলে দিতে পারতেন।

ষোল বছর বয়সে তিনি সঙ্গীত-শিক্ষা আরম্ভ করেন। সঙ্গীতে ছিল তাঁর স্বাভাবিক প্রতিভা; কিন্তু সঙ্গীতে তিনি প্রথম উৎসাহ ও শিক্ষা পান কাছারীর একজন কর্মচারীর কাছে। পরবর্তীকালে মার্গ-সঙ্গীতে তিনি শিক্ষালাভ করেন বিখ্যাত বীণকর ওস্তাদ লছমীপ্রসাদ মিশির এবং অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর

কাছে। প্রায় ঐ সময় তিনি কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকখানি বাংলায় অনুবাদ করেন।

তিনি পিয়ানোতে ইংরাজী সঙ্গীতের শিক্ষালাভ করেন একজন জার্মান অধ্যাপকের কাছে। পরে, সময় সময় ইওরোপ থেকে কৃতবিদ্য সঙ্গীত বিশারদ এসে পিয়ানোতে তাঁকে উচ্চতর তালিম দেন। সঙ্গীত তাঁর কাছে শখের জিনিস নয়, এ এখন তাঁর নেশা। এ বিদ্যা তিনি আয়ত্ত করতে চান সুশৃঙ্খলভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে; তার জন্য যে যা দাম চেয়েছে সেই দামেই তিনি বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরাজী পুঁথি ও পুস্তক ক্রয় করতে থাকেন। এই সকল সূত্র থেকে তিনি তাঁর (অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর সাহচর্যে) বিখ্যাত 'সঙ্গীত সার' গ্রন্থ রচনা করেন। তখন প্রকৃত হিন্দু সঙ্গীত সংকীর্ণ গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে, জনসাধারণ এর থেকে অনেক দূরে সরে গেছে দেখে তিনি এই সময় স্থির করেন যে হিন্দু সঙ্গীতকে তিনি জনপ্রিয় করে তুলবেন এবং এদিকে জনগণের রুচি গড়ে তুলবেন। অর্থ, গুণ ও সামগ্রীর অভাব না থাকায় তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য ১৮৭০-এর ৩ আগস্ট কলকাতার চিৎপুর রোডে স্থাপন করলেন 'বেঙ্গল মিউজিক স্কুল'; কিঞ্চিত বেতনের বিনিময়ে এখানে হিন্দু সঙ্গীত শেখাবার ব্যবস্থা হল। বিদ্যালয়টির প্রশংসনীয় অগ্রগতি হয়েছে; এর সাফল্যে ইওরোপীয় ও ভারতীয় সমাজ মুগ্ধ। এই বিদ্যালয়ের একটি শাখা কলুটোলায় খোলা হয়েছে, দুটিই শৌরীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বে ও ব্যয়ে সাফল্যের সঙ্গে পরিচালিত হচ্ছে। দেশবাসীর মধ্যে হিন্দু সঙ্গীত প্রচার ও প্রসারে সন্তুষ্ট না হয়ে, সরকারী বেসরকারী বিদ্যালয়ে তিনি নিজ ব্যয়ে সঙ্গীত শিক্ষক ও সঙ্গীত শিক্ষা বিষয়ক পুস্তক সরবরাহ করছেন; এবং যে-সকল সঙ্গীতশিল্পী হিন্দু সঙ্গীতের ওপর পুস্তক লিখছেন ও প্রকাশ করছেন, তাঁদের তিনি উৎসাহ তো দেনই, উদারভাবে সাহায্যও করেন।

১৮৭৫-এ শৌরীন্দ্রমোহন ফিলাডেলফিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর অব মিউজিক উপাধি লাভ করেন; পরে, বাংলা সরকার এই উপাধি লাভ সমর্থন করেন। একথা ভুললে চলবে না যে, দেশীয় ঐকতান বাদনে তিনি শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য প্রবর্তন করেন; এই উদ্দেশ্যে নিজস্ব কিছু রচনা / স্বরলিপিও তিনি দেশীয় সঙ্গীতের উপযোগী করে তৈরী করেন। তিনিই প্রথম দেশীয় প্রমোদ জীবন্ত ট্যাবলো ও শারেড্ প্রবর্তন করেন। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তাঁর এই শ্রম এবং বিস্তৃত হিন্দু সঙ্গীতশাস্ত্রের পুনরুজ্জীবনে তাঁর প্রচেষ্টার জন্য তিনি সারা বিশ্বের প্রশংসা অর্জন করেছেন। তিনি যে-সকল খেতাব, উপাধি, পদবী, সম্মান, প্রশংসাপত্র, পদক ও স্বীকৃতি পেয়েছেন তার একটি তালিকা এখানে দেওয়া হল:

ভারতবর্ষ: কমপ্যানিয়ন অব দি অর্ডার অব ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার;

রাজা খেতাব আর তার সঙ্গে একটি সরপেচ্, একখানি তলোয়ার, সোনার একটি ঘড়ি; বাংলা সঙ্গীত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে সরকারের প্রদত্ত প্রশংসাপত্র, লর্ড লিটন তিনবার তাঁর লিখিত পুস্তক স্বাক্ষরসহ উপহার দেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট ও কলকাতার পুলিস ম্যাজিস্ট্রেট, জাস্টিস অব দি পীস, নেপালের গোর্খা স্টার (স্বর্ণপদক); উচ্চ প্রশংসা জানিয়ে লর্ড লিটনের একখানি পত্র; লাহোর মিউজিয়ামের বেনিফ্যাকটর; বাংলা ও বোম্বাই এশিয়াটিক সোসাইটির স্বীকৃতিপত্র।

আমেরিকা: ডিগ্রী অব ডক্টর অব মিউজিক (এপ্রিল, ১৮৭৫); এটিই প্রথম বিদেশী ডিগ্রী—বাংলা ও ভারত সরকারদ্বয় কর্তৃক সমর্থিত। মেক্সিকোর রাষ্ট্রপতির স্বাকৃতিপত্র; রিপাবলিক অব ইউনাইটেড স্টেটস-এর প্রেসিডেণ্ট মিঃ আর বি হেয়েসের লিখিত ও স্বাক্ষরিত উচ্চ প্রশংসাপত্রসূচক স্বীকৃতিপত্র। ব্রেজিলের মহামান্য সম্রাট কর্তৃক পুস্তক প্রাপ্তির স্বীকৃতিপত্র।

ইংল্যাণ্ড: তাঁর প্রেরিত পুস্তকের প্রাপ্তিপত্র পাঠিয়েছিলেন ইংল্যাণ্ডের মহামান্যা মহারাণী, প্রিন্স অব ওয়েলস লিওপোল্ড এবং কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরী। রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য, রয়্যাল সোসাইটি অব লিটারেচারের ফেলো এবং লণ্ডনস্থ সোসাইটি অব সায়েন্স, লেটার্‌স অ্যাণ্ড আর্টের সাম্মানিক পৃষ্ঠপোষক।

ফ্রান্স: অফিসার অ্যাকাডেমি, প্যারিস; লরেল লীভ্‌সের সিলভার ডেকোরেশন; অফিসার, দ্য লিন্‌স্টাক্‌শঁ্যা পাব্লিক ফ্রান্স (এতৎসহ পামলীভ্‌সের গোলডেন ডেকোরেশন); অ্যাকাডেমিক মন্ট্রিলের প্রথম শ্রেণীর সদস্য; জনশিক্ষা বিভাগের মন্ত্রী এবং এম গার্সা দ্য তাসির নিকট হতে পুস্তকের প্রাপ্তি স্বীকার; সদস্য, অ্যাকাডেমি দ্য এয়ারোস্টশেঁা মেটেওরোলজিক্, প্যারি।

পর্তুগাল: রয়্যাল পর্তুগীজ মিলিটারী অর্ডার অব ক্রাইস্টের সেভালিয়ে; লিসবন জাতীয় গ্রন্থাগার হতে পুস্তকের প্রাপ্তিস্বীকার।

সার্ডিনিয়া: সাসারিস্থ রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাথেনিয়ামের পৃষ্ঠপোষক।

স্পেন: মহামান্য রাজার নিকট হতে প্রাপ্তিস্বীকার।

সিসিলি: পালের্মো রয়্যাল অ্যাকাডেমির সোসিও অনোরেরিও, ক্যাটানিয়ার সিরকোলা ভিত্তোরিও এমানুয়েল ফিলানত্রোপিকে লেত্তেরারিও সেডে (স্বর্ণপদক সহ); ক্যাটানিয়া সিরকোলো লেওরারিও অ্যারিস্‌ডিকো মিউজিকেল্ বেলিনি'র সোসিও প্রোতেত্তোরো (স্বর্ণপদক সহ)।

ইতালি: পরলোকগত মহামান্য রাজা ভিক্টর এমানুয়েলের স্বাক্ষরিত একখানি বড় আকারের আলোকচিত্র। পোপ ৯ম পিয়াস কর্তৃক উপহৃত একটি পদক। মহামান্য রাজা হামবার্ট কর্তৃক উপহৃত চমৎকার একটি মোজাইক টেবল।

পূজ্যপাদ পোপ ত্রয়োদশ লেও কর্তৃক উপহৃত মোজাইকে নির্মিত সেণ্ট পিটার্সের একটি ব্যাসিলিকা, রোমস্থ সেণ্ট সিসিলিয়ার রয়্যাল অ্যাকাডেমির সোসিও ওনোরারিও। সোসাইটা দিদাসক্যালিকা ইতালিয়ানা'র সোসিও ওনোরারিও। ফ্লোরেন্স-এর রয়্যাল মিউজিক্যাল ইনস্টিটিউটের অ্যাকাডেমিকো করিসপন্‌দেন্তে। নেপলসের অ্যাকাডেমি অব পিথাগোরিকার সোসিও কো-অপারেতর (রৌপ্য-পদকসহ)। আরবিনোস্থ রাফায়েলো রয়্যাল অ্যাকাডেমির সোসিও করিসপন্দেন্তে (স্বর্ণপদকসহ)। বোলানোর ফিলহারমনিক অ্যাকাডেমির সোসিও ওনোরারিও। পার্মার রয়্যাল ইউনিভার্সিটির বেনিমেরিতো; অধ্যাপক জি বি ভেচ্চিওত্তি কর্তৃক শৌরীন্দ্রমোহনের পুস্তকসমূহের বিস্তৃত পর্যালোচনা। ফ্লোরেন্সের ওরিয়েণ্ট্যাল অ্যাকাদেমির সাধারণ সদস্য। তুরিন রয়্যাল অ্যাকাডেমির করেসপনডিং সদস্য। অ্যাকাডেমিয়া পিত্তাগোরিকা ওভ্‌ভেরো স্কুলা ইতালিকা থেকে ডত্তোরে দি মিউজিকা এ দিলেত্তারে পদবী ও প্রেসিদেন্তে ওনোরোরিও (স্বর্ণপদকসহ)। বিবলিওতেকা পপুলারি সার্কোল্যাণ্ডি ভিন্‌সেনসো মন্টি ডি আলফনসিনে'র সোসিও ওনোরারিও (স্বর্ণপদকসহ)। লেগহর্নের ইনস্টিটিউটো আমবার্তো প্রাইমো'র প্রেসিদেন্তে দ্য'অনোরে উ্যফসিয়ালে দেলিগেটো (স্বর্ণ ক্রস সহ)। ফের্মো'র আতেনসো আলেস-সান্দ্রো মনজিনি ইনস্টিটিউটে'র সোসিও ওনোরারিও। নেপলসের বেনিমারি'তো সারকোলো একাডেমিকো লা ফ্লোরা ইতালিকা'র সোসিও ওনোরারিও। সালের-নো'র অ্যাসোসিয়েজিওনে গিওভ্যানিলে সালারনিতানা'র সোসিও দ্য ওনোরে। নেপলসের আতেনসো গিওভান বাতিস্তা আলেওত্তি'র সোসিও ফনডাতোরে। ভিসেঞ্জা'র ভিত্তোরিও এমানুয়েলে সারকোলে এডুকেটিভে'র সোসিও ওনোরারিও (স্বর্ণপদকসহ)। অ্যাকাদিমেয়া লেত্তারারিয়া লাজজে'রো পাপি দ্য লুচ্চ'র সাম্মানিক সদস্য। উক্ত স্থানের অপেরা সোসাইটির সাম্মানিক সদস্য। রোমের রিয়ালে সোসাইটা ডিডাসক্যালিকা ইতালিনা থেকে স্বর্ণপদক।

সুইজারল্যাণ্ড: জেনেভা ইন্‌স্টিটিউটের করেসপনডিং সদস্য। বার্নের অ্যাকাডেমি থেকে প্রাপ্তিস্বীকার। জেনেভার লুনিয়ন ভ্যালডোটেইনে'র সাম্মানিক সভাপতি।

অস্ট্রিয়া: কমানডার অব দি মোস্ট এগ্‌জলটেড অর্ডার অব ফ্রান্সিস জোসেফ। অস্ট্রিয়ার আর্চডিউক চার্লস্ লুই কর্তৃক প্রাপ্তিস্বীকার। ভিয়েনা ওরিয়েণ্টাল মিউজিয়ামের করেস্‌পন্‌ডিং সদস্য।

হাঙ্গারি: অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের প্রাপ্তিস্বীকার।

স্যাক্সনি: নাইট কম্যাণ্ডার অব দি ফার্স্ট ক্লাস অব দি অর্ডার অব আলবার্ট। লিপজিগ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাপ্তিস্বীকার।

জার্মানী: লণ্ডনস্থ জার্মানীর রাজকীয় রাষ্ট্রদূত কাউণ্ট মুনাস্টারের মারফত

মহামান্য (জার্মান) সম্রাটের স্বাক্ষরযুক্ত একখানি আলোকচিত্র। স্ট্রাসবুর্গের ইম্পিরিয়্যাল ইউনিভার্সিটি, ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী এবং বার্লিনের রয়্যাল লাইব্রেরী কর্তৃক প্রাপ্তিস্বীকার। ডাঃ ওয়েবরের কাছ থেকে পত্র, আলোকচিত্র এবং শৌরীন্দ্রমোহনের পুস্তকের বিস্তৃত সমালোচনা।

বেলজিয়াম: নাইট কমাণ্ডার অব দি অর্ডার অব লিওপোল্ড। ব্রাসেল্‌সের রয়্যাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স, লেটার্স অ্যাণ্ড ফাইন আর্টসের অ্যাসোসিয়েট মেম্বার, তৎসহ অ্যাকাডেমির সভাপতি এম গেভর্ট ও প্রাক্তন মন্ত্রী পি ডি ডেকারের অভিনন্দনপত্র।

হল্যাণ্ড: মহামান্য রাজার স্বাক্ষরিত একখানি আলোকচিত্র ও একটি পদক। রয়্যাল ফিলোলজিক্যাল অ্যাণ্ড এথনোগ্রাফিক্যাল ইনস্টিটিউশন অব নেদারল্যাণ্ডস, হেগ্‌-এর বৈদেশিক সদস্য। সোসাইটি অব আমসটারডামের করেস্‌পন্ডিং মেম্বার। ইউট্রেক্ট বিশ্ববিদ্যালয় ও হারলেম সোসাইটি অব সায়েন্সের তরফ থেকে প্রাপ্তিস্বীকার পত্র। যবদ্বীপের 'বোরো বুদুর' মন্দিরের বর্ণনা ও অঙ্কিত চিত্রের একখানি পুস্তক ওলন্দাজ সরকারের তরফ থেকে উপহার।

ডেনমার্ক: রাজা এবং রয়্যাল সোসাইটি অব অ্যান্টিকোয়ারিয়ান্‌স্‌-এর পক্ষ থেকে প্রাপ্তিস্বীকার পত্র।

নরওয়ে: ক্রিস্টিয়ানাস্থিত রয়্যাল ইউনিভার্সিটির প্রাপ্তিস্বীকার পত্র।

সুইডেন: স্টকহোম রয়্যাল মিউজিক্যাল আকাদেমির সাম্মানিক সদস্য (স্বর্ণপদক সহ)।

রাশিয়া: সেণ্ট পিটার্সবার্গ ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরী ও দোরপাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাপ্তিস্বীকার পত্র।

গ্রীস: মাননীয় রাজার স্বাক্ষরিত আলোকচিত্র। এথেন্সের আর্কিওলজিক্যাল সোসাইটির সাম্মানিক সদস্য।

তুরস্ক: তুরস্কের মহামান্য সুলতানের তরফ থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর ইম্পিরিয়াল অর্ডার অব দি মেজিদী।

মিশর: সেভেলিয়ে অব দি ইম্পিরিয়াল অর্ডার অব মেজেদী।

আফ্রিকা: কেপ অব গুড হোপ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাপ্তিস্বীকারপত্র।

সিংহল: সিংহল রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সাম্মানিক সদস্য।

ব্রহ্মদেশ: মাননীয় রাজা কর্তৃক বাদ্যযন্ত্র উপহার।

শ্যামদেশ (সিয়াম): মাননীয় রাজা কর্তৃক ডেকোরেশন অব দি অর্ডার অব বাসবমালা।

চীনদেশ: রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির উত্তর চীন শাখা কর্তৃক প্রাপ্তিস্বীকারপত্র।

যবদ্বীপ : বাটাভিয়ার সোসাইটি অব আর্টস অ্যাণ্ড সায়েন্স-এর করেসপণ্ডিং সদস্য (উক্ত সমিতির শতবার্ষিকী উপলক্ষে নির্মিত পদক সহ)।

অস্ট্রেলিয়া : মেলবোর্ন ফিলহারমোনিক সোসাইটির সাম্মানিক সদস্য।

জাপান : মহামান্য সম্রাট কর্তৃক বাদ্যযন্ত্র উপহার। টোকিও ডিয়া-গাকুস্থিত ডিপার্টমেণ্ট অব ল', সায়েন্স অ্যাণ্ড লিটারেচার কর্তৃক প্রাপ্তি-স্বীকার পত্র।

মন্টি্রল, জেরুজালেম, রোড্স, মাণ্টা প্রভৃতি স্থান থেকে প্রেরিত বহু সম্মান।

তাছাড়া—

লিভোর্নো থেকে ক্যাভালিয়ে দোনোরে। স্পেনের নাইট অব অনার অব দি অর্ডার ক্যাবাললেরোস অসপিতালারোস।

প্রথম শ্রেণীর সেলেশ্চিয়্যাল ইম্পিরিয়াল অর্ডার অব দি প্রেশাস স্টার অব চায়না (তৎসহ উপহার হিসেবে এনামেল করা পাত্র)।

সাইপ্রাসের—জেরুজালেমের—আর্মেনিয়ার মহামান্যা প্রিন্সেস রয়্যাল মেয়ারী অব লুসিগানের পক্ষে উপহৃত নাইট অব অনার।

সেভিয়ার্স অব ম্যারিটাইম আল্পসের নাইট অব অনার।

লেগহর্ন থেকে হাই প্রোটেক্টর অব দি অর্ডার অব দি হিউম্যানিটারিয়ান আকাডেমি অব দি হোয়াইট ক্রস।

লেগহর্নের হামবার্ট (প্রথম) ইনস্টিটিউটের—হাই প্রোটেক্টর গ্র্যাণ্ড অফি-সিয়্যাল ডেলিগেট—সাম্মানিক ক্রস সহ।

বুয়েনস আয়ার্সের ক্যাভেলিয়ার অব অনার অব দি অ্যাকাডেমিক অর্ডার।

ন্যাপোলি থেকে অনারারী প্রেসিডেন্ট অব দি প্রোপ্যাগাণ্ডা ঘ্য সায়েঞ্জা পোপোলেয়ার—স্বর্ণপদক সহ।

পারস্যের মহামান্য শাহ্-এন-শাহ্ দান করেন ইম্পিরিয়্যাল হাই অর্ডার অব দি লায়ন অ্যাণ্ড সান।

লণ্ডনের ট্রিনিটি কলেজের ফেলো। পারস্যের মহামান্য শাহ্-এন-শাহ্ তাঁকে 'নবাব' খেতাবে ভূষিত করেন।

বোম্বাইয়ের থিওজফিস্ট আগস্ট, ১৮৮০র সংখ্যায় অত্যন্ত যুক্তিযুক্তভাবে লেখেন :

> "রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর এখন সর্বাধিক সম্মানে ভূষিত মানুষ। অবশ্য, এবিষয়ে প্রিন্স বিসমার্কের সমকক্ষ হতে হলে তাঁকে আরও অনেক অনেক পদক ও আভূষণ পেতে হবে; কারণ প্রিন্স যত খেতাব পদক ও আভূষণ পেয়েছিলেন সে সব বুকে ঝোলাতে হলে তাঁর বুকের বিস্তার একুশ

ফিট হওয়ার দরকার ছিল। তাঁর এই সব পদকের সংখ্যা ছিল ৪৮২।"

১৮৮০র ১ জানুয়ারী শৌরীন্দ্রমোহনকে অর্ডার অব দি ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার উপাধিতে এবং ঐ বৎসর ৩ ফেব্রুয়ারী 'রাজা' খেতাবে ভূষিত করা হয়। এই দুই উপলক্ষেই লর্ড লিটন তাঁকে টেলিগ্রাম ও চিঠি মারফত অভিনন্দন জানান; তাঁকে সরপেচ, তরবারী ও একটি সোনার ঘড়ি সমন্বিত খেলাৎ এবং প্রথাসিদ্ধ সনদ দেওয়া হয় ১৮৮০, ৩১ মার্চ তারিখে বেলভেডিয়ারে অনুষ্ঠিত দরবারে। ঐ অনুষ্ঠানে স্যার অ্যাশলি ইডেন তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন :

"আপনার যে সকল গবেষণা ও গুণাবলীর জন্য আপনি ইংল্যাণ্ড এবং ইওরোপে, তথা স্বদেশে সুপরিচিত সেগুলি গভর্নর জেনারেলের স্বীকৃতি পাওয়ায় আমি আনন্দিত হয়েছি। আপনি এমন একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন, যার রাজভক্তি সুপরিচিত ও পরীক্ষিত; এইজন্য ব্যক্তিগত সম্মান-রূপে রাজা খেতাবে আপনাকে ভূষিত করবার সুযোগ পেয়ে আমি খুশী।"

ভারত সরকার

সনদ

শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, সি আই ই সমীপে—

"এতদ্দ্বারা আমি আপনাকে ব্যক্তিগত সম্মান হিসেবে রাজা খেতাবে ভূষিত করছি।"

ফোর্ট উইলিয়াম
২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৮৮০

ইণ্ডিয়ান মিররের সম্পাদক ১৮৮০র ১ এপ্রিল লেখেন, ১৮৮০র ৩১ মার্চ বেলভেডিয়ারে অনুষ্ঠিত দরবারে রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর অত্যন্ত শোভনভাবে প্রাপ্ত সম্মান গ্রহণকালে নিজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাননীয় মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করেন—দাদার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা সীমাহীন। উপস্থিত ইওরোপীয় ও ভারতীয় দর্শকবৃন্দ পুলকিত বোধ করেন এবং তাঁকে সকলে অভিনন্দন জানান। ভারতে থাকবার সময় শৌরীন্দ্রমোহনের গুণ ও প্রীতি-মুগ্ধ লর্ড লিটন তাঁকে অনেকগুলি স্বাক্ষরিত পত্র লেখেন। শৌরীন্দ্রমোহন লর্ড লিটনকে নিজ ও স্বীয় পূর্বপুরুষদের কয়েকখানি পুস্তক উপহার দিলে, বড়লাটবাহাদুর তাঁকে আন্তরিক ও হৃদয়স্পর্শী কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। এই পত্রে তিনি লেখেন ভারতীয় একজন ভদ্রলোকের বিস্ময়কর সাহিত্যিক প্রতিভার প্রতি তিনি আজীবন শ্রদ্ধা পোষণ করবেন—এই ভদ্রলোকের প্রতি তাঁর মর্যাদাবোধ সীমাহীন।

বিদেশ থেকে তিনি যত পদক ও নাইট প্রভৃতি খেতাবের প্রতীক আভূষণ

পেয়েছিলেন, সে সব বুকে এঁটে বেলভেডিয়ারে অনুষ্ঠিত 'রাজা' খেতাব দানের দরবারে উপস্থিত হবার সরকারী অনুমতি তাঁকে দেওয়া হয়েছিল—ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম এই অনুমতি পেয়েছিলেন।

ফ্লোরেন্সের ওরিয়েণ্টাল অ্যাকাডেমির সম্পাদক অধ্যাপক অ্যাঞ্জেলো ডি গুবারনেটিভের সম্পাদনায় প্রকাশিত সচিত্র জীবনী-কোষ গ্রন্থে জগতের তিনশত বিখ্যাত ব্যক্তির মধ্যে শৌরীন্দ্রমোহনকেও স্থান দেওয়া হয়েছে। প্যারিস থেকে এমিল আর্টাও কর্তৃক প্রকাশিত পেল্‌ফেজ ইউনিভার্সাল ডিকশনারী-তে জগতের শ্রেষ্ঠ পঞ্চাশ জন জীবিত সুরকারের অন্যতমরূপে তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তাছাড়া সঙ্গীত বিজ্ঞানে তাঁর সহযোগিতাও প্রার্থনা করা হয়েছে। তাঁর 'স্বরসপ্তশর্তী' নামক অপূর্ব গ্রন্থখানি জগতের শ্রেষ্ঠ সুরকারদের রচনার সঙ্গে সংরক্ষিত হয়েছে।

ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন এ ডব্‌লু ক্রফটের অনুরোধে ১৮৮০র অক্টোবরে মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত মেলবোর্ন স্কুল সায়েন্সে প্রেরণের জন্য রাজা শৌরীন্দ্রমোহন অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং অভূতপূর্ব এক 'ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্গীতের স্থান' নামক একটি প্রবন্ধ প্রেরণ করেন। আশা করা যায়, এতদিনে তিনি এজন্য উপযুক্ত স্বীকৃতি ও প্রশস্তি-পত্র পেয়েছেন।

ইওরোপের বহু জ্ঞানীগুণী তাঁর সম্পর্কে পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন ও প্রখ্যাত অ্যাকাডেমিসমূহের মুখপত্রে (জার্নালে) তাঁর মহান বংশ ও কীর্তি সম্পর্কে প্রবন্ধাদি লেখা হয়েছে। কিন্তু বেলজিয়ামের মহামান্য রাজা লিওপোল্ড তাঁকে যে পত্রখানি লিখেছেন সেটাই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা তৃপ্তিদায়ক। পত্রখানি নীচে উদ্ধৃত করা হল :

মহান রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর,

কম্যাণ্ডার অব দি রয়্যাল অর্ডার অব লিওপোল্ড,

কলিকাতা, সমীপেষু,

মাননীয় মহাশয়,

আপনি যে সহৃদয়তার সঙ্গে অতি চমৎকার উপহার আমাকে পাঠিয়েছেন তার জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করবেন; এই উপহার প্রেরণের মধ্যে দিয়ে আমার প্রতি আপনার যে সদিচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে, তাকে আমি অত্যন্ত মূল্যবান মনে করি বলে আমি এগুলি সযত্নে সংরক্ষণ করব; তাছাড়া কলকাতায় আপনার মহান পিতৃব্যের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার হয়, তাঁর স্মৃতিতেও আমি এগুলি সযত্নে সংরক্ষণ করব। আমি পুনরায় আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে মঙ্গলময় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি, তিনি যেন

আপনাকে এবং আপনার পরিবারবর্গকে সর্বদা সুস্বাস্থ্য ও সম্পদে রাখেন। সশ্রদ্ধ প্রীতিসহ।

ভবদীয়
স্বাঃ লিওপোল্ড

ব্রাসেল্‌সের রাজপ্রসাদ
১৮ ডিসেম্বর, ১৮৭৯

বিনা শ্রমে রাজা এই সব গুণের অধিকারী হন নি। নীচে তাঁর আজ পর্যন্ত লিখিত ও প্রকাশিত পুস্তকাদির একটি তালিকা দেওয়া হলো। তালিকাটি ভালভাবে দেখলে বোঝা যাবে, জ্ঞানরাজ্যে কত বিচিত্র দিকে এবং কত গভীর-ভাবে তিনি প্রবেশ করেছেন।

বাংলা—১. ভূগোল ও ইতিহাস ঘটিত বৃত্তান্ত ২. মুক্তাবলী নাটিকা (মৌলিক রচনা) ৩. মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক (অনুবাদ) ৪. জাতীয় সঙ্গীত বিষয়ক প্রস্তাব ৫. যন্ত্রক্ষেত্র দীপিকা (সেতার বিষয়ক রচনা) ৬. মৃগঙ্গ মঞ্জরী ৭. হার্মোনিয়াম সূত্র ৮. যন্ত্র কোষ (বাদ্যযন্ত্র বিষয়ক রচনা) ৯ ভিক্‌টোরিয়া গীতিমালা (ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস, ভারতীয় সুরে) ১০. ভারতীয় গীতিমালা (ভারতের ইতিহাস, ভারতীয় সুরে গেয়) ১১. ভারতীয় নাট্যরহস্য (সংস্কৃত গ্রন্থ হতে সংকলিত)।

ইংরাজী—১. হিন্দু মিউজিক ফ্রম ভেরিয়াস অথর্স (সংকলন) ২. সিক্স প্রিন্সিপাল রাগজ অব দি হিন্দুজ (লিথোগ্রাফ চিত্র সম্বলিত) ৩. এইট্‌ প্রিন্সিপাল রসজ অব দি হিন্দুজ (ঐ) ৪. টেন্‌ প্রিন্সিপাল অবতারজ অব দি হিন্দুজ (ঐ) ৫. দি বাইণ্ডিং অব দি ব্রেইড (বেণীসংহার নাটকের অনুবাদ) ৬. হিন্দু মিউজিক (হিন্দু পেট্রিয়টে তাঁর ও মিঃ সি বি ক্লার্কের মধ্যে আলোচনার পুনর্মুদ্রণ) ৭. ইংলিশ ভার্সেস সেট্‌ টু হিন্দু মিউজিক ৮. শর্ট নোটিসেস্‌ অব হিন্দু মিউজিক্যাল ইন্সট্রুমেণ্টস (বর্ণানুক্রমিক) ৯. ফিফ্‌টি টিউন্স (গ্রন্থকারের স্বরলিপি সংগ্রহ) ১০. স্পেসিমেন্স অব ইণ্ডিয়ান সঙস্‌ (সুরসহ সঙ্গীত সংগ্রহ) ১১. একতান অব ইণ্ডিয়ান কন্‌সার্ট (ভারতীয় ঐকতান স্বর সংগ্রহ) ১২. এ ফিউ লিরিক্স অব আওয়েন্‌ মেরেডিথ সেট টু ইণ্ডিয়ান মিউজিক ১৩. এইট টিউন্‌স্‌ (গ্রন্থকারের স্বরলিপি সংগ্রহ)।

সংস্কৃত—১. সঙ্গীত-সার-সংগ্রহ ২. মানস পূজনম্‌ (সুরসহ শঙ্করাচার্যের স্তোত্র) ৩. কবি রহসান (হলায়ুধের রচনা, শৌরীন্দ্রমোহন কর্তৃক সম্পাদিত)।

ইংরাজী অনুবাদসহ সংস্কৃত—১. ভিক্টোরিয়া গীতিকা (ভারতীয় সুরসহ ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস) ২. প্রিন্স পঞ্চাশৎ (ভারতীয় সুরসহ প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের সম্মানে রচিত পঞ্চাশটি শ্লোক)।

৩. **রোমকাব্য সংস্কৃত শ্লোকে সংক্ষিপ্তাকারে রোমের সমগ্র ইতিহাস**—মহামান্য সম্রাট হামবার্ট এই গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণটি তাঁকে উৎসর্গ করবার অনুমতি দিয়েছেন। প্রস্তাবিত পুনর্মুদ্রণে মূল সংস্কৃতের সঙ্গে ইতালীয় ভাষায় অনুবাদও থাকবে। ইতিমধ্যে কাব্যটির প্রশংসাসূচক আলোচনা রোমের 'ওপিনিওন' (২৪ জুলাই, ১৮৮০), 'পোপোলো রোমানো' ২৪ জুলাই, ১৮৮০) প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

হিন্দি—১. গীতাবলী—(কণ্ঠ সঙ্গীতের প্রাথমিক পুস্তক)।

হিন্দী, বাংলা ও ইংরাজী অনুবাদসহ সংস্কৃত সঙ্গীত—১. মণিমালা (দুখণ্ডে প্রকাশিত, সংস্কৃত সাহিত্য থেকে সংগৃহীত সঙ্গীত)।

রাজা শৌরীন্দ্রমোহনের মূল্যবান ও মনোজ্ঞ পুস্তকসমূহের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই জানেন যে, তাঁর জ্ঞান কেবলমাত্র সঙ্গীতশাস্ত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। কাব্য, কবিতা, সঙ্গীত, নাটক, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর সমান অধিকার ছিল। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর গভীর জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তাঁর বিস্তৃত ও ব্যাপক জ্ঞান ; এই জন্য কি স্বরচিত আর কি আহরিত সংস্কৃত গীতে তিনি সুললিত সুর সংযোজনে সক্ষম হয়েছেন। চিত্রশিল্পকেও তিনি অবহেলা করেন নি। তাঁর সচিত্র 'সিক্স্ প্রিনসিপাল রাগজ', 'এইট প্রিনসিপাল রসজ' এবং 'টেন প্রিনসিপাল অবতারস অব দি হিন্দুজ' এর চিত্রগুলি দেখলেই বোঝা যায় এই চারুশিল্পটির প্রতি তাঁর আগ্রহ কত গভীর এবং রুচি কত উন্নত। নিজে অবশ্য তিনি কখনও এই শিল্পটির চর্চা করেন নি। মণিরত্ন চেনার দিক থেকে তিনি প্রকৃত জহুরী। এ বিষয়ে তাঁর 'মণিমালা' গ্রন্থখানি অমূল্য।

তাঁর উৎসাহ, উদ্যম ও কর্মশক্তি সাহিত্য ও সঙ্গীতেই শেষ হয়ে যায় না। বহু বিষয়ে সাহিত্য রচনায় ব্যাপৃত থাকলেও, তিনি দাদা ও নিজের বিস্তৃত জমিদারী ও বৈষয়িক ব্যবস্থা পর্যালোচনা ও তদারকিতে আদৌ শৈথিল্য দেখাননি। সমস্ত হিসাবপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিচালনা ও পরীক্ষা করেন। শিল্পী সাহিত্যিকদের পক্ষে বৈষয়িক বিষয়ে এভাবে মনোনিবেশ করা সাধারণত দেখা যায় না ; কিন্তু এ ক্ষেত্রেও তিনি অসাধারণ।

তাঁর দুই পুত্র—কুমার প্রমোদকুমার ঠাকুর ও কুমার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর। প্রমোদকুমার বুদ্ধিমান ; তাঁর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

প্রমোদকুমারের বিবাহ উৎসব

প্রমোদকুমারের বিবাহ উপলক্ষে তাঁর জ্যেঠামশাই মাননীয় মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর সি এস আই ১৮৮০র ২৮ জানুয়ারী খুব জাঁকজমকপূর্ণ নাচের আয়োজন করেন। সমগ্র প্রাসাদ আলোক-উদ্ভাসিত করা হয়েছিল ; নিমন্ত্রিত

হয়েছিলেন দেশীয় সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত সকল ব্যক্তি। কনে ছিলেন সিমলার সাময়িকভাবে নেওয়া একটা বাড়ীতে—পাথুরিয়াঘাটা থেকে সিমলা পর্যন্ত সমগ্র রাজপথ বিজলী বাতি দিয়ে আলোকোজ্জ্বল করা হয়—এজন্য অবশ্য ব্যয়ও হয়েছিল বিপুল। বিবাহ অনুষ্ঠিত হল ১৮৮০র ৩১ জানুয়ারী। বিবাহের শোভাযাত্রার জন্য সরকারের বিশেষ অনুমতিতে পঞ্চাশ জন খোলা তলোয়ারধারী সৈনিক ছিল মহারাজার অস্ত্রধারী নিজস্ব সিপাহীদের ঠিক পিছনেই। এই সৈনিক সিপাহীদের প্রত্যেককে সেদিন নূতন পোষাকে সাজানো হয়েছিল। সুদৃশ্য জাঁকজমকপূর্ণ পোষাক পরিহিত সৈনিক-সিপাহীদের কুচকাওয়াজটি হয়ে উঠেছিল যেমন মনোরম তেমনি অসাধারণ। দেশীয় বাদ্যভাণ্ডের সঙ্গে ছিল দুটি ব্যাণ্ড; দৃশ্যটি আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল গোরাদের আর একটি ব্যাণ্ড পার্টির জন্য। কলকাতা, শহরতলী এবং অন্যান্য স্থানের সম্ভ্রান্ত পরিবারের কর্তাগণ মাননীয় দুই ভাইয়ের প্রতি সম্মান জানাবার জন্য হেঁটে পাথুরিয়াঘাটা থেকে সিমলায় কনের (অস্থায়ী) বাড়ী অবধি গিয়েছিলেন।

বিয়ের প্রায় ঠিক পরেই মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর সি এস আই স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহায়তায় বিপুলসংখ্যক দুঃস্থ মানুষকে ভোজন করান, জেলা দাতব্য-নিধিতে ৮,০০০ টাকা দান করেন এবং দুঃস্থদের মধ্যে বিতরণের জন্য জেলা কর্তৃপক্ষকে প্রচুর পরিমাণে নতুন জামাকাপড় পাঠিয়ে দেন।[১]

এই বিবাহ উপলক্ষে রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, সি আই ই ইত্যাদি স্বদেশ এবং ইওরোপের বহু রাজা-সম্রাট ও জ্ঞানীগুণীদের কাছে থেকে তাঁর পুত্রের বিবাহের জন্য অভিনন্দন বার্তা পেয়েছেন। সবগুলি ছাপাতে গেলে এই সংক্ষিপ্ত জীবনীর কলেবর অনেক বৃদ্ধি পাবে আশঙ্কায় আমরা নীচে সামান্য কয়েকটির উল্লেখমাত্র করছি (মূল পুস্তকে পত্রগুলি মুদ্রিত হয়েছে—অনুবাদক)

১. জার্মানীর মহামান্য সম্রাট ও রাজা
২. লণ্ডনস্থ জার্মান রাষ্ট্রদূত
৩. রোম থেকে কার্ডিন্যাল নিনা
৪. স্যাক্সনির মহামান্য রাজা (তাঁর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কর্তৃক প্রেরিত)
৫. নেপালের প্রধান মন্ত্রী মারফত নেপালের মহামান্য রাজা
৬. নেপালের প্রধান সেনাপতি
৭. নেদারল্যাণ্ডের মহামান্য রাজা
৮. উট্রেক্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব কিউরেটর্স-এর সম্পাদক পৃথক পৃথক পত্রে পিতা ও পুত্রকে অভিনন্দন জানান।

ভারত ও ইওরোপের এত সম্রাট, রাজা, জ্ঞানীগুণীদের পত্রে রাজা শৌরীন্দ্র-মোহনের প্রতি যে ঘনিষ্ঠ প্রীতির পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে, খুব কম দেশীয় রাজাই

এমন পত্র প্রাপ্তির গৌরব করতে পারেন।

শেষ করবার আগে একথা না বললে ভুল হবে যে, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ও রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর পরিবারের সর্বাপেক্ষা সুপরিচিত ব্যক্তি। সভ্য জগতের সকল শ্রেষ্ঠ মানুষই এই দুই ভাইকে সর্বাপেক্ষা সুশিক্ষিত, সম্মানিত এবং উল্লেখযোগ্য ভারতীয় হিসাবে গণ্য করেন।

জগতের অন্যান্য দেশে ভারতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে যে সব কুসংস্কার প্রচলিত ছিল রাজা শৌরীন্দ্রমোহনের একক প্রচেষ্টায় সে বদ্ধমূল ধারণা দূর হয়েছে—ভারতীয় সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য সম্পর্কে জগৎ অবহিত হয়েছে—এ দিক থেকে দেশ তাঁর কাছে যে কতখানি ঋণী তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ভারতীয় সঙ্গীত মানেই ঢাক ঢোল পেটান বা মাঝিমাল্লার গান, তাঁর সাধনার ফলে এ ধারণা দূর হয়েছে।

এই কারণে রাজা শৌরীন্দ্রমোহন জগতের বিভিন্ন দেশ থেকে যে সম্মান ও স্বীকৃতি পেয়েছেন, অন্য কোন ব্যক্তি তা পান নি। তাঁর এই সম্মানে দেশ ও দেশবাসীও গৌরবান্বিত হয়েছেন।

হিতোপদেশের নিম্নোদ্ধৃত বিখ্যাত শ্লোক এই দুই আদর্শস্থানীয় ভাইয়ের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য :

গুণিগণগণনারম্ভে ন পততি কঠিনী সম্ভ্রমাৎ যস্য।
তেনাম্বা যদি সুতিনী বদ বন্ধ্যা কীদৃশী ভবতি ॥

(অপর গুণিসমূহের গণনারম্ভে সম্ভ্রমেতে যার নামে খড়ি না পড়ে, সেইরূপ পুত্রে মাতা যদি পুত্রবতী হন, তবে বল্ বন্ধ্যা কেমন হয় ?)

ধনবান ও গুণবান এই দুই পুত্রের জন্য তাঁদের বৃদ্ধা মাতাও গৌরবান্বিতা হয়েছেন, গৌরবান্বিতা দেশমাতাও। উল্লেখযোগ্য যে, এঁদের শ্রদ্ধেয়া মাতৃদেবীও কয়েকখানি গ্রন্থের রচয়িত্রী—এগুলি তিনি রচনা ও প্রকাশ করেছিলেন আত্মীয়া, বান্ধবীদের মধ্যে বিতরণের জন্য, যাতে তাঁদের মধ্যে লেখাপড়া করার স্পৃহা জাগে। তাঁর লেখা 'তারাবতী' (বাংলায়) এবং 'স্তবমাল্য' (সংস্কৃতে) বিশেষ সুপরিচিত। এ ছাড়া মণিরত্ন বিষয়ে তিনি বিশেষ জ্ঞানের অধিকারিণী—রাজা শৌরীন্দ্রমোহন মায়ের কাছে এই বিদ্যায় শিক্ষা লাভ করে তাঁর 'মণি-মালা' পুস্তকখানি রচনা করেন।

এযুগে হিন্দু সমাজে যেখানে ভাইয়ে ভাইয়ে চলছে ঝগড়া-বিবাদ, মামলা-মোকদ্দমা, সেই যুগে সেই সমাজে আদর্শ এই দুই ভাই মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ও রাজা শৌরীন্দ্রমোহনের প্রীতির বন্ধন, ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অপেক্ষা অনেকবেশী আদর্শ-স্থানীয়। ১৮৫৮তে পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ যতীন্দ্রমোহন কনিষ্ঠ শৌরীন্দ্রমোহনের দায়িত্ব নেন—সেই সময় থেকে এখনও দুই ভাইয়ের বিস্তৃত জমিদারী, ভূসম্পত্তি,

গভর্নমেণ্ট সিকিউরিটিতে জমানো বিপুল বিত্ত ও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সোনাদানা এবং অত্যন্ত মূল্যবান হীরাজহরাৎ একত্রেই উভয়ের পরিচালনাধীনে ও ভোগ-দখলে আছে। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত তাঁদের উল্লেখযোগ্য জমিদারীগুলির মধ্যে আছে ফরিদপুর জেলার পরগণা হাবিলী, হাকিমপুর, বসন্তপুর, কুতুবপুর প্রভৃতি; কলকাতার সম্পত্তির মধ্যে আছে ডিহি পঞ্চান্ন গ্রামের তালতলা বাজার; আছে চন্দননগর ও অন্যান্যস্থান।

বাস্তব বুদ্ধি ও দক্ষ পরিচালনার গুণে মাননীয় মহারাজা তাঁদের পৈতৃক সম্পত্তি বহু গুণ বৃদ্ধি করেছেন। নবার্জিত সম্পত্তিগুলির মধ্যে আছে রামপুর সহ লস্করপুর, বেউলিয়া সহ গড়ের হাট, তিনবেড়িয়া, হাতিশালা, কাগজপুকুর, জঙ্গীপুরসহ রোকনপুর এবং এইরূপ অন্যান্য মহাল। অতি সম্প্রতি মাননীয় মহারাজা প্রায় চৌদ্দ লক্ষ টাকা মূল্যে বালুচরের রায় লছমীপৎ বাহাদুরের কাছে থেকে বিখ্যাত মহাল পলাদসি, শ্যামবাটী, সাদুল্লাপুর, ফতেপুর, সুখসেনা এবং মহম্মদ আমিনপুর (সাধারণ্যে 'শেওড়াফুলি নামে পরিচিত) ক্রয় করেন। সমগ্র এই যৌথ সম্পত্তি আছে শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর সি আই ই-র পরিচালনাধীনে।

এ ছাড়া, তাঁদের কাকা অনারেবল প্রসন্নকুমার ঠাকুর সি এস আই-র ইষ্টিপত্র অনুযায়ী মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর সি এস আই কাকার পাতিলাদহ, ঘোড়ারহাট, উথৈ, লাট, মাণ্ডা, বাসুদেবপুর প্রভৃতি মূল্যবান মহালের আয় আগের মতো এখনও ভোগ করছেন। নীচের সারণি থেকে মহালের নাম, কোন জেলায় অবস্থিত এবং সরকারকে দেয় রাজস্বের পরিমাণের একটি সঠিক চিত্র পাওয়া যাবে।

সারণি—ক

মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর সি এস আই এবং রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর সি আই ই-র যৌথ জমিদারী :—

মহালের নাম	যে জেলায় অবস্থিত	রাস্তা ও পূর্ত সেস বাদে সরকারকে দেয় পরিমাণ (ভগ্নাংশ বর্জিত)
পরগণা হাবিলী	ফরিদপুর	৩৫,০৯২ ০ ০
„ হাকিমপুর	ঐ	৭,১৬৪ ০ ০
„ বসন্তপুর ও কুতুবপুর	মেদিনীপুর	৫৩,৮১৬ ০ ০
শিখরবাটী	২৪ পরগণা	২১০ ০ ০
দেবোত্তর সম্পত্তি		
শান্তিপুর, সোনাটিকরী ও মূলাজোড়	নদীয়া, হুগলী ও ২৪ পরগণা	২২,১৭৭ ০ ০

পরগণা লস্করপুর ও গড়েরহাট	রাজসাহী	৪৩,১০৩ ০ ০
পরগণা তিলবেড়িয়া, হাতিশালা ও কাগজপুকুর	নদীয়া	৯,৭০২ ০ ০
পরগণা রোকনপুর	মুর্শিদাবাদ	৩৫,১৬৯ ০ ০
„ ফতেপুর	পূর্ণিয়া	১০,৬৫৫ ০ ০
„ পলাদসি, শ্যামবাটী এবং সাতুল্লাপুর	রংপুর, দিনাজপুর ও বগুড়া	১৩,৩৩৮ ০ ০
পরগণা সুখসেনা (বা জুমুনি)	নয়া ডুমকা	৭,৬২৮ ০ ০
„ মহম্মদ আমিনপুর (বা শেওড়াফুলি)	হুগলী ও বর্ধমান	৪০,১৫৬ ০ ০
	মোট টাকা	২,৭৮,২১০ ০ ০

(আনুমানিক জনসংখ্যা—২,৮০,০০০ জন

সারণি—খ

অনারেবল মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর সি এস আই-র ভোগদখলে অবস্থিত অনারেবল প্রসন্নকুমার ঠাকুর সি এস আই-র সম্পত্তি :—

মহাল	জেলা	সরকারে দেয় রাজস্ব
পরগণা পাতিলদহ	রংপুর	৬৪,৩৪৯ ০ ০
„ ঘোড়ারহাট ইত্যাদি	দিনাজপুর	৮,৮৭৪ ০ ০
„ উথৈ, লাটমাণ্ডা	বগুড়া	৫৯৮ ০ ০
„ বাসুদেবপুর	মুঙ্গের	৪,৪৬৮ ০ ০
ঢাকুরিয়া এবং অন্যান্য	২৪ পরগণা	১,১২৫ ০ ০
	মোট	৭৯,৪১৪ ০ ০

(আনুমানিক জনসংখ্যা—৩,০০,০০০ জন)

অনারেব্‌ল প্রসন্নকুমার ঠাকুর সি এস আই

গোপীমোহন ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র প্রসন্নকুমারের জন্ম হয় ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দে। ইংরেজির প্রাথমিক শিক্ষা তিনি লাভ করেন মিঃ শেরবোর্নের বিদ্যালয়ে। ঠাকুর পরিবারের যশ ও প্রভাব-প্রতিপত্তিতে তাঁর দানও কম নয়। "তিনি ও তাঁর মতো ব্যক্তিদের জন্যই আজ বাংলাদেশ ভারতে উচ্চ স্থানের অধিকারী হয়েছে। যুক্তিযুক্ত কারণেই বাঙালীদের ভারতের অ্যাথেনীয় বলা হয়। ভারতের মতো গ্রীসবাসীরাও ছিল বহু জাতি উপজাতিতে বিভক্ত এবং ঈর্ষা দ্বেষে জর্জরিত। আধুনিক ভারতকে সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সুরুচির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য নেতার গৌরবজনক ভূমিকা বাংলার। এই বাংলা থেকে ভারতবর্ষ পেয়েছে রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কেশবচন্দ্র সেনের মতো সংস্কারক। সতী প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, বিধবা বিবাহের প্রচলন ও প্রসার এবং উন্নত আধুনিক ব্যাপক শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য আন্দোলন, সে-ও শুরু হয়েছিল এই বঙ্গদেশে। প্রাচীন কালের ডোরীয়দের মতো শিখ ও মারাঠাগণ যুদ্ধাভিযান ও যুদ্ধ জয়ের জন্য বিখ্যাত ছিলেন, কিন্তু বাঙালীরা, এথেনীয়দের মতো সংস্কৃতি, সাহিত্য, চারুশিল্প, সমাজ সংস্কার এবং প্রগতির জন্য ওঁদের অপেক্ষা অনেক উন্নত ছিলেন।"

আগেই বলেছি, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের মতো মানুষদের জন্য বাংলা এই অগ্রগণ্য স্থানের অধিকারী হতে পেরেছে। যে জাতি জাতিগৌরব নিয়ে অন্য সকলকে দূরে সরিয়ে রাখে বা সরে থাকে, অহংকারী, জগতে অন্যের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলে, বরং নিজেকে সংকুচিত বিচ্ছিন্ন করে রাখে, সেইরূপ একটি জাতির সর্বপ্রকার কুসংস্কারের মধ্যে ব্রাহ্মণ হিসাবে, হিন্দু হিসাবে প্রসন্নকুমার তাঁর বাল্যকালে পালিত হয়েছিলেন। এই সব কুসংস্কারের উর্ধ্বে উঠতে হলে অনেক শক্তিশালী মনের অধিকারী হওয়া দরকার। অতি অল্প সংখ্যক মানুষই বাল্যের অভ্যস্ত কুসংস্কারের উর্ধ্বে উঠতে পারেন। অভ্যস্ত আচার আচরণ ও সামাজিক ব্যবস্থার বাঁধন ভেঙে নূতন সমাজব্যবস্থা ও আচার-আচরণের জন্য যে সঠিক বিচারবুদ্ধি, সংস্কারমুক্তি ও নিগড় ভাঙার সংকল্পের প্রয়োজন, তা দশ হাজার মানুষের মধ্যে এক জনেরও থাকে কিনা সন্দেহ;

পারিপার্শ্বিকের সঠিক মূল্যায়ন এবং তার থেকে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছনোর জন্য প্রয়োজন প্রশান্ত মনন, যা সব কিছুর মধ্যে থেকেও সত্যকে সঠিকভাবে চিনে নিতে সক্ষম। যে সমাজ ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আমরা পালিত হই, তার সঠিক ও পক্ষপাতশূন্য মূল্যায়ন আমাদের অনেকের মধ্যেই কঠিন। শৈশবের অভ্যস্ত চিন্তাধারার রেশ সারা জীবনই টিকে থাকে; সেই মজ্জাগত অভ্যাস ও গার্হস্থ্য জীবনের আহ্বান উপেক্ষা করা বড় কঠিন। প্রসন্নকুমার সত্যের সন্ধান পেলে, অন্তত সত্য বলে তাঁর কাছে যা প্রতীয়মান হত, তাকে গ্রহণ এবং সর্বজনের কাছে তার সত্য ঘোষণা করতে দ্বিধা করবার মতো মানুষ ছিলেন না; আদর্শ স্থাপন দ্বারা অপরকে শিক্ষা দেবার, মিথ্যাকে টেনে নামাবার এবং সত্যকে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য যে নৈতিক সাহসের প্রয়োজন প্রসন্নকুমারের তা ছিল।

রামমোহন রায়ের সঙ্গে মেলামেশার ও বন্ধুত্বের ফলে, তিনি যে গোঁড়া হিন্দু সমাজব্যবস্থার মধ্যে পালিত হয়েছিলেন তার সব কিছুই যাচাই করে দেখতে লাগলেন; পরিণামে তিনি 'দেশবাসীর নিকট আবেদন' (**An Appeal to his Countrymen**) নাম দিয়ে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ ও প্রচার করলেন। এর মাধ্যমে তিনি সর্ব সত্তার স্রষ্টা সব কিছুর নিয়ামক একেশ্বরের আরাধনার জন্য আহ্বান জানালেন। তাই বলে তিনি 'প্রতিমা ভঙ্গকারী' হয়ে ওঠেন নি—ধর্মান্ধের মতো তিনি তাঁর নববিশ্বাসের বিরোধী সব কিছু এবং সকলকে আঘাত করে বেড়াতে লাগলেন না। তর্ক, যুক্তি ও রুচিশীল উপদেশ—এতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকতেন; মূলাজোড়ের পারিবারিক মন্দির ও তার ব্যবস্থাদি অক্ষুণ্ণ রইল; মাতৃভক্তি ছিল তাঁর শৈশবের শিশুসুলভ ধর্ম, বাল্যের বিশ্বাস, যৌবন ও পরিণত বয়সের পবিত্র পালনীয় কর্তব্য—তাই তাঁর মায়ের রূপোর পালঙ্কখানিকে তিনি মূলাজোড় মন্দিরে নিয়ে গিয়ে দেবতার চৌকিতে পরিণত করেন, যাতে সাধারণে ব্যবহার করে সেটিকে অপবিত্র করতে না পারে। মাতৃদেবী এই পালঙ্কে শুয়ে ঘুমোতেন; প্রসন্নকুমারের কাছে তাই সেটি অতি পবিত্র বস্তু। সেটিকে সাধারণ ব্যবহার দ্বারা তিনি অপবিত্র হতে দিতে পারেন না। মূলাজোড়ের বিগ্রহকে তাঁর মা সর্বান্তঃকরণে ভক্তি করতেন, তাই পালঙ্কখানি তিনি সেই দেবমন্দিরেই উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন।

শুধুমাত্র ধর্মীয় বা পারিবারিক স্নেহ প্রীতি শ্রদ্ধার ব্যাপার নয়, প্রসন্নকুমার তাঁর চিন্তার স্বাধীনতা, সচেতন ও সৎ ভাবে সত্যানুসন্ধান, কৈশোর-বাল্যের প্রীতিভক্তির প্রতি শ্রদ্ধা ও মৃতের প্রতি ভক্তি রক্ষা করে এসেছেন। শ্রেণী সচেতনতা দিয়ে তিনি কখনও তাঁর চিন্তাকে আচ্ছন্ন হতে দেন নি। এই শ্রেণী সচেতনতাই সামাজিক কুসংস্কার, অবিচার এবং সামাজিক স্বেচ্ছাচারের মূল।

শ্রেণী সচেতনতার মতো কিছু চিন্তাধারাই আমাদের বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে, আদর্শ থেকে আমাদের বিচ্যুত করে, প্রভাবিত করে আমাদের কর্মধারাকে— অনেক সময় এর সপক্ষে কোন যুক্তি থাকে না, আবার অনেক সময় যুক্তির বিরুদ্ধে গিয়েও আমরা কাজ করি। এই বিচার বিমূঢ়তা সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে খুব বেশী দেখা যায়; দেখা যায় জাতীয়তার নামে জাতীয় অহমিকা প্রকাশে; দেখা যায় সমাজের স্বেচ্ছাচারে। এই ভ্রান্ত বুদ্ধিই যা-কিছু নূতন তাকেই ভ্রান্ত বা ঘৃণ্য ভাবে। অভ্যস্ত পথ থেকে সামান্যতম বিচ্যুতি হলেই ধরে নেওয়া হয় যে, প্রভাব প্রতিপত্তি ধ্বংস হবে, মানমর্যাদা লোপ পাবে, শ্রেণী-শক্তির অবসান হবে।

প্রসন্নকুমার সদর আদালতের উকিল হতে চাইলে চারিদিক থেকে গেল গেল রব উঠল। প্রচুর পরিশ্রম সহকারে কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাঁর আইন পড়ার কথা শুনে জনৈক ঘনিষ্ঠ বন্ধু তিরস্কার করে বললেন, অনর্থক অপমানজনক এই আইন পড়ে তুমি কী করবে? তোমার এত সম্পত্তি, এত ধনদৌলত, আইন ব্যবসায়ে তোমার কী দরকার? উত্তরে প্রসন্নকুমার বললেন, মন হল সুগৃহিণীর মতো। ভাঁড়ারে তাঁর যা-কিছু থাকে, তাকেই তিনি কোন-না-কোন সময় কোন-না-কোন কাজে লাগাতে পারেন। আইন শাস্ত্রে তাঁর গভীর জ্ঞানকে কাজে লাগাতে বিলম্বও খুব একটা হল না। তিনি নীল চাষের ব্যবস্থা করেছিলেন, একটি তেলকলও খুলেছিলেন; মামলায় দুটি ক্ষেত্রেই তাঁর প্রচুর লোকসান হয়ে গেল; তাঁর ধারণা হল মকদ্দমা ঠিকমত পরিচালিত হলে তাঁর লোকসান হত না; তাই ঠিক করলেন ভবিষ্যতে তিনি নিজের মামলা-মোকদ্দমা নিজেই লড়বেন। উকিল হিসাবে নিজের নাম নথিভুক্ত করলেন; অল্পদিনের মধ্যে সদর আদালতে তাঁর পসার সব আশা ছাড়িয়ে গেল। তখন সরকারী উকিল ছিলেন মিঃ বেইলি। তাঁর অবসর গ্রহণের পর অধিকাংশ জজ প্রসন্নকুমারের নাম সরকারী উকিল পদের জন্য সুপারিশ করলেন। অবশ্য কয়েকজন জজ এবং বোর্ড অব রেভেনিউ'র একজন সদস্য তাঁর নিয়োগের বিরুদ্ধে এই কারণে আপত্তি জানালেন যে, তিনি বাংলার অন্যতম মুখ্য জমিদার। উকিল হিসাবে তিনি যে কতখানি সাফল্য লাভ করবেন, তা তাঁর অতীব শুভানুধ্যায়ী বন্ধুরাও আশা করতে পারেন নি। জমিদারী তিনি শুধু রক্ষা করলেন না, বাড়ালেনও; ওকালতিতে তাঁর বার্ষিক আয় দাঁড়াল গড়ে দেড় লাখ টাকা।

তিনিই প্রথম সম্ভ্রান্ত পরিবারের যুবকদের মধ্যে নিজের জন্য একটি পেশা বেছে নিয়ে উকিল হলেন, ফলে এসব পরিবারের শিক্ষিত যুবকদের সামনে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপিত হল।

প্রসন্নকুমার যেসব কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন, এবং জয়ীও হয়েছিলেন,

সেসবের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো বড় কঠিন। এই সংস্কার বা কুসংস্কারগুলি আমাদের বয়োবৃদ্ধি ও শিক্ষার সঙ্গে বেড়ে উঠেছে। ছোট থেকেই কোন কোন বস্তু ও বিষয়কে শ্রদ্ধা করতে বা ঘৃণা করতে আমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়; কিন্তু উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে পৌঁছলে আমাদের সেই বাল্যের ও কৈশোরের সংস্কার বা কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠতে বলা হয়, এটাই হয় তখন আমাদের শিক্ষার অঙ্গ। এ একটা সংগ্রাম—এ সংগ্রামে কেউ জেতে, আবার অনেকেই হেরে যায়। কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষরা যতক্ষণ নিজের মতো চলতে চালাতে পারেন ততক্ষণ তাঁরা বড় অমায়িক এমনকি পরোপকারী; কিন্তু তাঁদের খেয়ালের ঘোড়ার একটা বালামচিও যদি কেউ স্পর্শ করে, অমনি তাঁরা বাঘের মতো রুখে ওঠেন। যা কিছু তাঁদের মতের বিরুদ্ধে যায়, তাই হয়ে দাঁড়ায় মিথ্যাচার, ক্ষতিকারক, কুসংস্কার। আর যা কিছু তাঁদের মতের সঙ্গে মেলে তাই হয় পরম সত্য। এই ধরনের মানুষরা কখনও নিজেদেরও ভালভাবে বুঝতে পারেন না। আর নিজেকে না বুঝলে মানুষ কখনও জ্ঞান অর্জন বা কুসংস্কারমুক্ত হতে পারে না। অপরের মতামত শোনবার সময় আমাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটলে, বুঝতে হবে আমরা নিজেরাই কুসংস্কারে ডুবে আছি।

প্রসন্নকুমার এ শিক্ষা লাভ করেছিলেন নিরবচ্ছিন্ন অধ্যয়ন ও পরিপার্শ্ব লক্ষ্য করে। তাঁর বহু বন্ধু বোঝালেন: দেখ, যে কুসংস্কার নিজেদের পরিবার জাতি দেশ বা বাল্যের অভ্যাসের সঙ্গে যুক্ত তা কোন-না-কোনভাবে আমাদের উপকারই করে। প্রসন্নকুমারের উত্তর, 'কক্ষনো না, নিজের গুণেই যদি সত্য মঙ্গলজনক হয় এবং মিথ্যা হয় ক্ষতিকর তা হলে প্রতিটি মানুষকে মন খোলা রেখে সব বিষয়ের সম্মুখীন হতে হবে; পূর্বগঠিত স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে সত্যের সম্মুখীন হতে যাওয়া ক্ষতিকর।' প্রসন্নকুমারের মতই ছিল ঠিক। সত্যের প্রকাশে যে মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়—সে মন অবশ্যই কুসংস্কারাচ্ছন্ন—এই হল দর্শনশাস্ত্রের সর্বোচ্চ শিক্ষা।

এই কাহিনীর নায়ক প্রসন্নকুমার হিন্দু কলেজের গভর্নর হিসাবে সক্রিয় এবং মঙ্গলজনক ভূমিকা নেন। বাংলা শিক্ষা বিভাগের নথিপত্রের মধ্যে আজও অ্যাংলো-বেঙ্গলি স্কুল কলেজের জন্য তাঁর প্রদত্ত পরিকল্পনা ও পাঠ্যপুস্তকের তালিকা পাওয়া যাবে। হিন্দু কলেজের ওপরও সম্পৃক্ত ব্যাপারে একমাত্র বর্ধমানের মহারাজা এবং এই দুই ভাই হরকুমার ও প্রসন্নকুমারের কায়েমী বা স্থায়ী অধিকার ও সুযোগ সুবিধা প্রাপ্য ছিল। এই অধিকার ও সুযোগ সুবিধা ত্যাগ না করলে এবং শিক্ষা বিভাগের হাতে তুলে না দিলে কলেজটির পুনর্গঠন সম্ভব হচ্ছিল না; প্রসন্নকুমার নিঃস্বার্থ দেশাত্মবোধ দ্বারা পরিচালিত হয়ে হরকুমারের কাছে ঐ অধিকার ও সুযোগ সুবিধা ত্যাগ করবার জন্য প্রস্তাব করলে, সেই অনুযায়ী দুই ভাই ঐ কলেজের ওপর তাঁদের সকল অধিকার ত্যাগ করলেন। তখন লর্ড

ডালহৌসির শাসনকাল। তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত নির্দেশে আদেশ দেন যে, কলেজের প্রতিষ্ঠাতাদের জনহিতৈষণার এই মনোভাব যেন স্থায়ী স্মারকরূপে কলেজেই প্রদর্শিত হয়। প্রেসিডেন্সি কলেজে একটি মর্মর-ফলক স্থাপন করে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এই কাজ সম্পন্ন করেন। ফলকটিতে লেখা আছে।

Erected
To commemorate
The liberality and public spirit of the donors
Whose names are recorded below
Who mainly contributed to
the founding of the
Hindu College.
Now represented by the
Hindu School
and
Presidency College
His Highness the Maharaja of Burdwan.
Babu Gopi Mohon Tagore.
Babu Joy Kissan Singh,
Raja Gopi Mohan Dev,
Babu Ganga Narayan Das.

[বর্তমান হিন্দু স্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় প্রধান দাতাদের জনহিতৈষণা স্মরণীয় করবার জন্য এই স্মৃতিফলক স্থাপিত হল। নীচে প্রধান দাতাদের নাম দেওয়া হল :
(হিজ হাইনেস) বর্ধমানের মহারাজা। বাবু গোপীমোহন ঠাকুর। বাবু জয়কৃষ্ণ সিংহ। রাজা গোপীমোহন দেব। বাবু গঙ্গানারায়ণ দাস।]

সরকার বা সরকারের শিক্ষা বিভাগেরই এই স্মৃতিফলক স্থাপন করা উচিত ছিল। তাঁরা কেউ এ কর্তব্য সম্পাদনা না করায়, এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন গোপীমোহন ঠাকুরের এক পৌত্র।

প্রসন্নকুমার মেয়েদের স্কুল কলেজে গিয়ে শিক্ষা লাভের পক্ষপাতী ছিলেন না। নিজের মেয়ে ও নাতনীদের তিনি অতি উত্তম ও উচ্চশিক্ষা দিয়েছিলেন, কিন্তু সে হয়েছিল বাড়ীতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে। তাঁর মতে, মেয়েদের স্কুল কলেজে শিক্ষা লাভ করতে যাওয়া চিরাচরিত বিশ্বাসের বিরোধী, সামাজিক মনোভাবের

প্রতি তা আঘাতস্বরূপ এবং ধর্মীয় সংস্কারের পরিপন্থী। মাননীয় মিঃ বেথুনকে লিখিত একখানি স্বরচিত পত্রে তিনি তাঁর এই সব মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, এদেশের সমাজের ওপর প্রকাশ্য (অর্থাৎ স্কুল-কলেজে) স্ত্রীশিক্ষা চাপিয়ে দেবার চেষ্টা চলছে, তাঁর আশঙ্কা ছিল এর পরিণাম হবে ভয়াবহ। এ আশঙ্কা ঠিকই ছিল।

প্রবীণ বয়সে তিনি দুখানি পত্রিকা—বাংলায় 'অনুবাদক' এবং ইংরেজীতে 'রিফর্মার' সম্পাদনা করেন। দুখানিতেই তিনি দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, আইনকানুন সংক্রান্ত এবং ধর্ম বিষয়ক প্রশাসনে অত্যন্ত ধীরস্থির ভাবে বিচার বিবেচনা করে অগ্রসর হবার প্রবক্তা ছিলেন। প্রতিটি সরকারী বা বেসরকারী তরফ থেকে আসা সংস্কারমূলক প্রস্তাবকে তিনি যুক্তি তর্ক দিয়ে অনেক বিচার বিবেচনার পর তাঁর পত্রিকায় লিখতেন।

সরকারের দাবীমত খাজনা দিয়ে কোন ব্যক্তি ভূসম্পত্তি ভোগ করলে বা প্রজাদের নিকট হতে ভূমি রাজস্ব আদায় করলে রাজস্ব কর্তৃপক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে যে রায় দিতেন, সে রায়ের বিরুদ্ধে আপীলের দ্রুত বিচার নিষ্পত্তির জন্য ১৮২৮-এর রেগুলেশন ৩ গৃহীত হলে প্রসন্নকুমার দেখলেন যে দ্রুত নিষ্পত্তির নামে আপীল কেসগুলি দেওয়ানী আদালতের এক্তিয়ার হতে সরিয়ে নিয়ে বিশেষ আয়োগের হাতে দেওয়ার আইনটিতে এমন কতকগুলি ধারা সন্নিবিষ্ট হয়েছে যার দ্বারা লাখেরাজ-দারদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। (রাজা) রামমোহনের সহযোগিতায় তিনি এই নূতন আইনের বিরুদ্ধে কোর্ট অব ডিরেকটরের কাছে একখানি কড়া প্রতিবাদ-পত্র পাঠালে, কোর্ট ভারত সরকারের কাছে নূতন আইন প্রবর্তনের কারণ জানতে চাইলেন; কোর্টের আশঙ্কা নিরশনের জন্য আইনটির সপক্ষে ভারত সরকার যে ব্যাখ্যা পাঠালেন তাতে এ-ও বলা হল যে, জনগণ এই আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ নন, প্রতিবাদটি মাত্র তিন ব্যক্তি : দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর এবং রামমোহন রায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত। ক্ষতিকর আইনটি প্রত্যাহৃত না হলেও, কোর্ট অব ডিরেকটর্স উপলব্ধি করলেন যে, রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনায় ভারত-বাসীরাও আর পিছিয়ে নেই।

সতীদাহ প্রথা বিলোপের বিরুদ্ধে কিছু ভারতীয় (হিন্দু নেতা) আপত্তি জানিয়ে প্রিভি কাউন্সিলে যে আবেদন করেছিলেন, ইংল্যাণ্ডের রাজা সেটি খারিজ করে দেওয়ায় তাঁকে ধন্যবাদ জানাবার জন্য ১৮৩২-এর নভেম্বরে জোড়া-সাঁকোর ব্রাহ্মসমাজ মন্দির প্রাঙ্গণে যে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর।

১৮৩৭ ও ১৮৩৮-এ বোর্ড অব রেভেনিউ-র তদানীন্তন সচিব মিঃ রস্ ম্যাঙ্গলস সকল জেলায় একই সঙ্গে লাখেরাজ সম্পত্তি সংক্রান্ত আপীলের শুনানীর

জন্য সরকারকে উদ্বুদ্ধ করে জেলায় জেলায় বিশেষ আয়ুক্ত ও বিশেষ উপ-সমাহর্তা নিয়োগ করলেন, যাতে আপীলের শুনানী একই সময়ে হতে পারে। এই সকল কাজকে আক্রমণ করে প্রসন্নকুমার বেঙ্গল্‌ হরকরায় লিখলেন; মিঃ ম্যাঙ্গল্‌স্‌ও অবশ্য সেগুলির উপযুক্ত জবাব উক্ত পত্রিকায় প্রকাশ করলেন। দুজনেই যোগ্যতার সঙ্গে স্ব স্ব যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াস পেলেন। জনসাধারণ অবশ্য স্বীকার করলেন যে, প্রসন্নকুমারই এই বিতর্কে জয়ী হয়েছেন।

রাজস্ব কর্তৃপক্ষের অন্যায়, বে-আইনী সিদ্ধান্ত এবং যে পদ্ধতিতে ডিক্রি জারী করে লাখেরাজদারদের ও জোতদারদের কাছে থেকে খাজনা আদায় করা হতে থাকল, তাতে সারা বাংলায় অসন্তোষ ও বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ল। তহ্‌সিলদাররা সরকারী রাজস্ব আদায়ের নাম করে মহিলাদের নোলক মাকড়ি ও অন্যান্য গহনা আইনী ও বে-আইনীভাবে ছিনিয়ে নিতে লাগল। ১৮৩৯-এর কোন এক সময় বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও অন্যান্য কয়েকজন বন্ধু মিলিত হয়ে (এই অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য) একটি সভা আহ্বান করলেন—এই সভার কথা এখনও লোকের মনে আছে—তাঁরা এর নাম দিয়েছিলেন লাখেরাজদারদের মহাসম্মেলন। দেশের সকল অংশ থেকে লোকে উদ্যোক্তাদের আহ্বানে সাড়া দিলেন। টাউন হলের একতলায় সভা অনুষ্ঠিত হল—শ্রোতাদের ভিড়ে 'হল' উপচে পড়ল—জনতার ভিড়ে চাঁদপাল ঘাট থেকে গভর্নমেণ্ট হাউস পর্যন্ত রাজপথ পূর্ণ হয়ে গেল। সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্বাচিত হলেন রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর। সেকালে কলকাতা বার-এর মিঃ লেইথের মতো যে-সকল (বিদেশী) ব্যবহারজীবী জনস্বার্থ বিষয়ক আলোচনায় সক্রিয় অংশ নিতেন, তাঁদের কয়েকজন, বিশেষত মিঃ লেইথ এই আন্দোলনের সমর্থনে চমৎকার একটি বক্তৃতা করেন। সভায় দ্বারকানাথ ঠাকুর বললেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, যে মুসলমান শাসনকে আমরা বর্বর বলতে অভ্যস্ত, সেই বর্বর শাসকগণ বিভিন্ন সময়ে শিক্ষা ও ধর্ম বিষয়ে উৎসাহ দেবার জন্য যে-সব ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন, ভদ্রমহোদরগণ, সে-সব ব্যবস্থা এই খ্রীস্টিয়ান সরকার, যে-সরকার নিজেকে জগতের সর্বাপেক্ষা সভ্য সরকার বলে দাবী করেন, আজ ছিনিয়ে নিতে চলেছেন।' তাঁর বক্তৃতা উচ্ছ্বসিত করতালি ধ্বনি দ্বারা অভিনন্দিত হয়। প্রসন্নকুমার এই সভায় বিশেষ কিছু বলেননি; কিন্তু এই আন্দোলন ও সভার প্রধান উদ্যোক্তা ও ব্যবস্থাপক ছিলেন তিনি; তাঁরই সুপরিচালনায় সভাটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পেরেছিল। লর্ড অকল্যাণ্ড বিরাট এক গণ্ডগোলের আশঙ্কা করে, সকল ম্যাজিসট্রেটকে এই সভায় উপস্থিত থাকতে আদেশ দিয়েছিলেন, ইওরোপীয় ও দেশীয় পুলিস

গভর্নমেণ্ট হাউস পর্যন্ত, রাস্তার উভয় পার্শ্বে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আর স্বয়ং লর্ড অকল্যাণ্ড সরকারের সকল বিভাগের সচিবদের সঙ্গে নিয়ে উদ্‌গ্রীব আগ্রহে সভার সংবাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন—প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর তাঁকে সভার সংবাদ পৌঁছে দেওয়া হচ্ছিল।

এই মহতী সভার তাৎক্ষণিক ফল হল এই যে, গ্রামের পঞ্চাশ বিঘা অপেক্ষা অল্প পরিমাণ নিষ্কর ভূমির রাজস্ব মকুব করা হল।

জনগণের সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নের বিষয়েও তিনি উদাসীন ছিলেন না। তাঁর সুরাহ্‌র (শুরার) বাগানে তিনিই প্রথম বাংলায় দেশীয়দের থিয়েটার মঞ্চ স্থাপন করলেন; তাঁর সঙ্গে এতে যোগদান করলেন তাঁরই মতো হিন্দু কলেজের বহু প্রাক্তন ছাত্র। এখানেই প্রথম সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হল উত্তররাম চরিতের উইলসন কৃত অনুবাদের এবং শেক্‌সপীয়ারের জুলিয়াস সীজারের। তাঁর দেশীয় ও বিদেশী বন্ধুগণ বিপুল সংখ্যায় এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে ১৮৩১-এর ৩০ ডিসেম্বর তারিখের এন্‌কোয়ারার লেখেন: যে দেশীয় থিয়েটার বিষয়ে কথাবার্তা চলছিল গত বুধবার সেটির উদ্বোধন হয়। প্রথম অভিনয় হয় উত্তররাম চরিতের ডাঃ উইলসন কৃত অনুবাদ নাটকের প্রথম অঙ্কটির, পরে শেক্‌সপীয়ারের জুলিয়াস সীজার নাটকের পঞ্চম অঙ্কের। প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হয় বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাগান বাটীতে। অভিনেতারা সকলেই ছিলেন অপেশাদার—এঁদের অনেকেই হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করেছিলেন। সুঅভিনয়ে চরিত্রগুলি মূর্ত হয়ে উঠেছিল।······অনারেবল স্যার এডওয়ার্ড রায়ন, কর্নেল ইয়ং, মেজর বীটসন, মিঃ হেয়ার, মিঃ মেলভিল এবং আরও কয়েকজন পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত ইওরোপীয় ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। অভিনয় দর্শনে তাঁরা বিশেষ প্রীতি লাভ করেন। তাঁর দৃষ্টান্ত কলকাতার অধিকতর ধনী নাগরিকগণ অনুসরণ করেন, এবং জাতীয় উন্নয়ন ও মুক্তি এবং সুরুচিপূর্ণ আমোদ-প্রমোদের এই মাধ্যমটি বাংলা থেকে মাদ্রাজ, বোম্বাই, পাঞ্জাব এমন কি সিন্ধুদেশেও অনুসৃত হয়।

তাঁর দানও ছিল ব্যাপক কিন্তু সুবিবেচিত। তাঁর স্বগৃহে দৈনিক শতাধিক দরিদ্র মানুষকে খাওয়ানো হত। অন্নের সংস্থান নেই এমন অনেক দরিদ্র ছাত্রও তাঁর বাড়ীতে প্রতিদিন খেতে পেত। দরিদ্র হয়ে পড়েছেন এমন কিছু ব্যক্তি ও পরিবারকে তিনি নিয়মিত মাসিক বৃত্তি দিতেন, অনেকের জন্য আবার বার্ষিক বরাদ্দও থাকত।

তাঁর পরিজন, পরিচারক-পরিচারিকাদের এবং পোষ্যবর্গের জন্য তিনি বিনাব্যয়ে চিকিৎসারও ব্যবস্থা করেছিলেন; বাইরের লোকও ওষুধ কিনতে পারছেন না জানতে পারলে তার দামও তিনি দিয়ে দিতেন। নেটিভ হাসপাতাল

(বর্তমানে মেয়ো হাসপাতাল নামে পরিচিত)-এর তিনি ছিলেন সক্রিয় গভর্নর। তাঁর উদার ও নিঃস্বার্থ দান না পেলে গরাণহাটা শাখা ডিসপেন্সারীটি বহু পূর্বেই লুপ্ত হয়ে যেত, তাহলে স্থানীয় অভাবী অসুস্থ মানুষদের দুর্দশার সীমা পরিসীমা থাকত না। (সংস্কৃত) পণ্ডিতবর্গ ও দুঃস্থ শিক্ষিতজনের দুঃখের কাহিনী তিনি ধৈর্যের সঙ্গে শুনতেন এবং প্রয়োজনবোধে যথোচিত আর্থিক সাহায্য দিতেন। দুর্গাপূজায় কলকাতার ধনীরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের দান-দক্ষিণা ও পার্বণী দিতেন ; এটা ছিল রেওয়াজ—এ বিষয়ে তিনি ছিলেন সবার অগ্রণী।

তাঁর স্বগৃহে স্থাপিত নিজস্ব গ্রন্থাগারটি সাহিত্য ও আইন-বিষয়ক গ্রন্থে ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ। সদর আদালতে ও হাইকোর্টের জজগণ প্রয়োজন হলেই এই গ্রন্থাগারের সাহায্য নিতেন। তাছাড়া উপযুক্ত সুপারিশপ্রাপ্ত যোগ্য ছাত্রগণের জন্যও এই গ্রন্থাগারের দ্বার ছিল অবারিত।

নিজের প্রজাদের মঙ্গলের প্রতি এত দৃষ্টি বোধ হয় আর কেউ দেন নি। পত্তনি প্রথার তিনি অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন—তাঁর ধারণা ছিল ঐ প্রথায় প্রজারা সাধারণত অত্যাচারিত হয়। প্রায়ই তিনি তাঁর জমিদারী পরিদর্শনে বের হতেন—সেখানে তিনি অতি দরিদ্র দিনমজুরদের সঙ্গে দেখা করে তাদের কথা শুনতেন। জমিদারীর বিভিন্ন স্থানে প্রজাদের মঙ্গলের জন্য তিনি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেছিলেন ; প্রয়োজনে প্রজাদের তিনি ঋণ দিতেন ; আর প্রকৃত চাষীদের কারও ওপর খাজনার বোঝা বেশী হচ্ছে বুঝতে পারলে তিনি তার খাজনা, হয় কমিয়ে দিতেন, না-হয় মকুব করে দিতেন। তাঁর দেওয়া ঋণ উপযুক্ত ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত দানে পর্যবসিত হত ; কিন্তু তিনি যদি বুঝতে পারতেন যে, খাতক মিথ্যা অজুহাত দিচ্ছে বা পরিশোধে সক্ষম হয়েও এড়িয়ে যাচ্ছে, তা হলে টাকা আদায়ের ব্যাপারে তিনি যে উদ্যমের পরিচয় দিতেন তারও তুলনা মেলা ভার। সত্য-সত্যই যারা অভাবী, সৎভাবে পরিশ্রম করে, তাঁদের তিনি ছিলেন পরম উপকারী বন্ধু, কিন্তু অলস অপদার্থগণ তাঁকে শত্রু বলে ভাবত।

একবার তিনি রংপুরে জমিদারী পরিদর্শনে গেছেন ; সেখানকার বিশিষ্ট প্রজারা তাঁর সঙ্গে দেখা করে বললেন, হুজুরের মতো এত বড় মান্যগণ্য মানুষের আর কাঠের পাল্কীতে জমিদারীতে ঘোরা শোভা পায় না। প্রসন্নকুমার হেসে উত্তর দিলেন, কী করি বলুন, গরীব ব্রাহ্মণ আমি, চাঁদির পাল্কী পাব কোথায়। অমনি প্রজারা চাঁদা তুলতে লাগলেন ; রূপোর পাল্কী গড়াবার মতো টাকা তুলে তাঁকে দিতে এলে, তাঁদের অনেক অনুরোধ উপরোধ করে বোঝালেন, গ্রামাঞ্চলে চাঁদির পাল্কী উপযোগী নয় ; তাছাড়া তিনি চাঁদির পাল্কী ব্যবহার করতেও চান না, কাজেই তাঁরা যেন যাঁর যাঁর টাকা ফেরৎ দিয়ে দেন।

দিনাজপুর, রংপুর ও বগুড়া জেলায় তাঁর জমিদারী ছিল। এইসব জেলায়

আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের উন্নতির জন্য করতোয়া নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করেন; তাঁরই উদ্যোগে ১৮৫৬-র ১২নং আইন গৃহীত হয় উক্ত নদীর নাব্যতা বাড়াবার জন্য। তাঁর কাজ পরীক্ষা করে দেখবার উদ্দেশ্যে কলিকাতা ও ইস্টার্ন ক্যানাল্‌সের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার বগুড়ায় প্রেরিত হয়েছিলেন; ১৮৬৩-র ১৩ মে তিনি রিপোর্ট দিলেন, নদীটিকে সারা বৎসর নাব্য রাখবার জন্য বাবু যে চেষ্টা করেছেন, সত্যই তা প্রশংসার্হ। তাঁর কৃতিত্ব এইখানে যে বহুবার ব্যর্থ হয়েও তিনি অধ্যবসায়ের সঙ্গে আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করেছেন। নদীর দু'পাশের বালুময় মৃত্তিকার জন্য অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাঁর এই প্রকল্প ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

লর্ড ডালহৌসির নেতৃত্বে লেজিসলেটিভ কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়া গঠিত হলে তিনি প্রসন্নকুমারকে উক্ত সংস্থার ক্লার্ক অ্যাসিস্‌টেণ্টের পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। প্রসন্নকুমার সানন্দে বড়লাট বাহাদুরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা, দেশের আইনকানুন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান, বিশেষত দেশবাসীর চরিত্রগঠনে ও উন্নতিবিধানে কিরূপ আইন কিভাবে প্রয়োগ হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা দিয়ে উক্ত সংস্থাকে সাহায্য করতে অগ্রসর হলেন। ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলগুলিতে একই ধরনের আইনকানুন প্রচলিত করবার জন্য লণ্ডনস্থ রয়্যাল কমিশন এ-বিষয়ে যে-সকল পরিকল্পনা ও সুপারিশ পেশ করেন, সেগুলি পর্যালোচনা করে কার্যে পরিণত করবার জন্য ভারতীয় লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের একটি কমিটি গঠন করা হয়; এই কমিটির প্রতি-বেদনে অন্যান্য কথার মধ্যে মন্তব্য করা হয়: ক্লার্ক অ্যাসিস্টেণ্টের বিস্তৃত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এবং অদম্য কর্মোদ্যমের জন্য কমিটি অসাধারণভাবে উপকৃত হয়েছেন, এবং কমিটি তাঁর ঋণ স্বীকার করছেন। পেনাল কোড সুবিন্যস্ত করার কাজে তিনি এককভাবে এবং কোডের দেশীয় ভাষায় অনুবাদের কাজে অন্যান্য কয়েকজন প্রাচ্য পণ্ডিতের সঙ্গে স্যার বার্নেস পীকক ও তাঁর সহকর্মীদের সাহায্য করেন। তিনিই প্রথম বাঙালী (তথা ভারতবাসী) যাঁকে ভাইসরয়ের লেজিস-লেটিভ কাউন্সিলের সদস্য হবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল; দুর্ভাগ্যবশত তিনি তখন অত্যন্ত অসুস্থ, এজন্য এই আমন্ত্রণ তাঁর বা ভারতের কোন উপকারে আসে নি। তবে, বাংলার লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর প্রচুর; কাউন্সিলের তদানীন্তন কার্যবিবরণীতে তাঁর যুক্তিপূর্ণ বিতর্ক, পরিষ্কার চিন্তাশক্তি ও দেশাত্মবোধের বহু বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। আইন বিষয়ক তাঁর কার্যাবলী তো অমূল্য।

ইওরোপীয় বা ভারতীয় যিনিই হন আইন বিষয়ে তাঁর পরামর্শ চাইলে তিনি আগ্রহের সঙ্গে এবং বিনা পারিশ্রমিকেই পরামর্শ দিতেন। তাঁর স্মরণশক্তি

ছিল বিস্ময়কর। কারও কোন পূর্ব নজিরের বা ঐতিহাসিক কোন ঘটনার বিবরণ প্রয়োজন হলে, তিনি শুধু সংশ্লিষ্ট বই নয়, তার কোন পৃষ্ঠায় সেটি আছে তাও বলে দিতেন।

মহারাজা গোলাব (গুলাব) সিংহের কাশ্মীর শাসনকালে তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ভ্রমণ করেন। মহারাজা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলে, প্রসন্নকুমার এই শর্তে রাজী হলেন যে, তিনি মহারাজাকে কোন নজরানা দেবেন না এবং মহারাজাও তাঁকে কোন খেলাৎ দেবেন না। (মহারাজা তাঁর শর্তে রাজী হয়ে যাওয়ায়) তিনি কাশ্মীরে পঁচিশ দিন অতিবাহিত করেন। এই সময় প্রায়ই তাঁর মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হত; প্রয়োজনে মহারাজাকে তিনি মূল্যবান পরামর্শও দিতেন। বিদায় নেবার সময় তিনি মহারাজাকে বললেন, 'মহারাজার কাজে লাগতে পারে, দেবার মতো এমন কোন উপহার আমার নেই, বা আমার কোন কাজে লাগতে পারে এমন কোন উপহারও মহারাজা আমাকে দিতে পারবেন না। কিন্তু দূরবীণ যন্ত্র দূরবর্তী বস্তুকে নিকটবর্তী করে দেখায় আমিও সেইভাবে মহারাজাকে কিছু স্মারক দ্রব্য দিতে চাই, যাতে কখনও কখনও আমার 'কথা মহারাজের মনে পড়তে পারে। তাঁর এই মন্তব্য ও উপহার দুয়েতেই মহারাজা খুব খুশী হয়েছিলেন।

ইষ্টি পত্র দ্বারা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর আইন অধ্যাপক পদ, তাঁর গুরুত্বপূর্ণ কীর্তিগুলির অন্যতম। এই কাজটির জন্য লোকে তাঁকে যুগ যুগ ধরে স্মরণ করবে। এ পর্যন্ত প্রকাশিত এই পদের অধিকারিগণের বক্তৃতা-সমূহের বিশেষ মূল্য আছে। তবু বলতে হয় যে, তাঁর সমগ্র জীবনটিই ছিল এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ কাজের সমষ্টি। সরকার কর্তৃক ব্যাঙ্ক স্ট্রাণ্ড রোড এলাকা অধিগ্রহণ এবং শ্মশানঘাট তুলে দেবার সরকারী উদ্যোগের বিরোধী আন্দোলনে তিনি সফল নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত কলকাতার উন্নতির জন্য তিনি সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। রাজা রাধাকান্ত দেবের পর তিনিই হন সংগঠনটির সভাপতি। মূলাজোড়ে তাঁর পিতার ধর্মীয় দানের সঙ্গে তিনি স্থায়ী নিধি স্থাপন করে সেখানে একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করেন; আজও এই বিদ্যালয়ে অধ্যাপকগণ ব্যাকরণ, ছন্দঃ, ন্যায় ও স্মৃতি শিক্ষা দিচ্ছেন। এই প্রসঙ্গে এখানে তাঁর কয়েকটি দানের দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়:

	টাকা
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ঠাকুর আইন অধ্যাপক পদের জন্য	৩,০০,০০০
জেলা দাতব্য সমিতিকে	১০,০০০

'নেটিভ' হাসপাতালকে	১০,০০০
মূলাজোড় সংস্কৃত বিদ্যালয়ের গৃহনির্মাণ কল্পে	৩৫,০০০
মূলাজোড় দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতির জন্য	১,০০,০০০
নির্ভরশীল আত্মীয়পরিজন ও পোষ্যদের জন্য	১,০৯,০০০
জমিদারীর ও অন্যান্য বিভাগের কর্মচারী ও গৃহভৃত্যদিগকে	১,০৬,০০০
মোট	৬,৭০,০০০

ভিতরে বাহিরে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যখন বিপন্ন হয়ে পড়েছিল, সেই সিপাহী বিদ্রোহের সময় ব্রিটিশ রাজের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য যে প্রদর্শনী করা হয়েছিল, তার উদ্যোক্তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অগ্রণী। ১৮৬১ ও ১৮৬৬-র দুর্ভিক্ষের সময় আর্ত মানুষের ত্রাণের জন্য উদার দান নিয়ে তিনিই সর্বাগ্রে এগিয়ে এসেছিলেন; বার বার যাতে এমন দুর্বিপাক না হয় তার জন্য প্রয়োজন মতো সৎপরামর্শও তিনি দিয়েছিলেন।

তাঁর সম্পর্কে আর একটি ঘটনার বিবরণ দিয়ে আমরা এই প্রসঙ্গ শেষ করব। ১৮৬৫-তে রেওয়ার মহারাজা প্রাসাদপুরী কলকাতা এলে আমাদের নায়ক নিজ প্রাসাদে তাঁকে তাঁর পদমর্যাদায় এবং প্রসন্নকুমারের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক যোগ্যতার উপযোগী বিপুল এক সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। মহারাজার জন্য নির্মিত জরি বসান মসনদের পাশে মণিমুক্তা খচিত হাতলযুক্ত একখানি তলোয়ার রাখা হয়েছিল। সেখানি দেখে, রেওয়ার মহারাজা হেসে জিগ্‌গেস করলেন, 'বাঙালীরা কি এখনও তলোয়ার ব্যবহার করেন?' তাৎক্ষণিক উত্তরে প্রসন্নকুমার বললেন, "না মহারাজা, অনেকদিন হল বাঙালীরা তলোয়ারের বদলে কলম ব্যবহার করছেন; ইংরেজ রাজের সুশাসনের জন্য তলোয়ার ব্যবহারের প্রয়োজনও আর আমাদের নেই। তলোয়ারটি এখানে রাখা হয়েছে আমাদের আদর্শ স্থানীয় পূর্বপুরুষদের বিশেষত হলায়ুধের, স্মারক হিসাবে। মহারাজতো জানেন, হলায়ুধ ছিলেন বাঙলার শেষ রাজা লক্ষ্মণ সেনের প্রধান মন্ত্রী," এর থেকে প্রসন্নকুমারের স্বভাবসিদ্ধ সৌজন্যবোধ এবং সপ্রতিভতার একটি ভাল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

প্রসন্নকুমার তাঁর মনন, যৌক্তিকতাপূর্ণ বাগ্মিতা এবং নেতৃত্বের যোগ্য মনীষার জন্য বাঙলার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের অন্যতম হিসাবে অবশ্যই গণ্য হবেন। মহামান্যা মহারাণীর সরকার তাঁর সম্পর্কে যে শ্রদ্ধা পোষণ করতেন, তার প্রতীক হিসাবে ১৮৬৬-র ৩০ এপ্রিল তাঁকে 'দি কমপ্যানিয়নশিপ অব দি মোস্ট এগ্‌জল্টেড্‌ অর্ডার অব দি স্টার অব ইণ্ডিয়া' খেতাব দ্বারা সম্মানিত করা হয়। (দ্রষ্টব্য: ওরিয়েন্টাল মিসেলিনি সংখ্যা ১৯, অক্টোবর ১৮৮০—প্রসন্নকুমার ঠাকুর সম্পর্কিত

বিবরণ)। প্রসন্নকুমার ছিলেন সেই সামান্য সংখ্যক হিন্দুদের অন্যতম যাঁরা ছিলেন ইওরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে সামাজিক মেলামেশার পক্ষপাতী। কোন না কোন উচ্চপদস্থ ইওরোপীয় বা অন্য মাননীয় ইওরোপীয়কে তাঁর সঙ্গে আহারের জন্য তিনি নিমন্ত্রণ না করতেন, এমন দিন ছিল না। বেলজিয়ামের বর্তমান রাজা লিওপোল্ড ২য়, তখন ডিউক অব ব্র্যাব্যাণ্ট, কলকাতা দর্শনে এসে প্রসন্নকুমারের অতিথি হয়েছিলেন। ১৮৬৮-র ৩০ আগস্ট প্রসন্নকুমারের মৃত্যু হয়; তাঁর মৃত্যুতে তাঁর বন্ধুবর্গ এবং গুণমুগ্ধ ব্যক্তিগণ শোকসাগরে নিমগ্ন হন।

গণেন্দ্রমোহন: প্রসন্নকুমারের একমাত্র পুত্র গণেন্দ্র খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি বাঙালীদের মধ্যে প্রথম ব্যারিস্টার। সাধারণত ইংল্যাণ্ডেই তিনি বসবাস করেন।

হরিমোহন: দর্পনারায়ণের চতুর্থ পুত্র হরিমোহন ইংরেজীতে কৃতবিদ্য ছিলেন। ধর্মীয় নিষ্ঠার জন্য তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর একমাত্র পুত্র উমানন্দন (ওরফে, নন্দলাল) ছিলেন এক্সপোর্ট ওয়েরহাউসের দেওয়ান। উমানন্দনের পুত্র উপেন্দ্রমোহন এখন এই পরিবারের কর্তা।

পিয়ারীমোহন: দর্পনারায়ণের পঞ্চম পুত্র। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন।

লাড্‌লিমোহন: দর্পনারায়ণের ষষ্ঠ পুত্র। তাঁর দুই পুত্র, হরলাল ও শ্যামলাল। হরলালের পুত্র ত্রৈলোক্যমোহনের পুত্রসন্তান ছিল না।

মোহিনীমোহন: দর্পনারায়ণের সপ্তম পুত্র। বিষয়কর্মে পারদর্শী মোহিনীমোহন পৈতৃক সম্পত্তি বহুলাংশে বৃদ্ধি করেন। নূতন সম্পত্তির মধ্যে বাখরগঞ্জ জেলার এদিলপুর পরগণার জমিদারীটিও ছিল। নিলামে তিনি জমিদারীটির জন্য সকল ভাইয়ের যৌথ নামে ডাক দেন; কিন্তু তাঁরা এই জমিদারী কিনতে রাজী না হওয়ায়, জমিদারীটি শেষ পর্যন্ত তাঁর নামে বর্তায়। এই জমিদারীর জন্য তিনি বহু মামলায় জড়িয়ে পড়েন। যা হক, এই সব মামলায় শেষ পর্যন্ত তিনিই জয়ী হন। কিন্তু বেশী দিন তিনি এই সম্পত্তি ভোগ করতে পারেন নি। প্রায় ত্রিশ বৎসর বয়সের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর দুই নাবালক পুত্র, নয় বৎসরের কানাইলাল এবং পাঁচ বৎসরের গোপাললালেরও বিপুল সম্পত্তির দায়িত্ব অর্পণ করেন তাঁর সহোদর ভাই লাড্‌লিমোহনের হাতে। লাড্‌লিমোহন তাঁর ওপর অর্পিত এই পবিত্র দায়িত্ব বিশেষ সততা ও যোগ্যতার সঙ্গে সম্পাদন করেন। সাবালক হয়ে কানাইলাল বর্ধিত খাজনা সহ অটুট পৈতৃক সম্পত্তি এবং জমানো বিপুল অর্থ লাভ করেন।

কানাইলাল ছিলেন অমিতব্যয়ী। অল্পকালের মধ্যেই তিনি সমগ্র পৈতৃক সম্পত্তি বিপন্ন করে ফেললে দুই ভাইয়ের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ল। এই সময় গোপাললাল যে ভ্রাতৃপ্রেমের আদর্শ স্থাপন করেন, আজকের

অধঃপাতের দিনে লোকে হয়তো তাকে ভাব-বিলাস বলে গণ্য করবেন। সম্পত্তি ভাগ করবার সময়, তিনি জ্যেষ্ঠের ঋণের অর্ধেকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিশেষ সততার সঙ্গে এবং নিয়মিত ভাবে তিনি এই ঋণ পরিশোধ করেন। তাঁর দয়া ও সহানুভূতি ভ্রাতৃপ্রেমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বিপদে পড়ে কেউ তাঁর সাহায্য চাইলে—সে অর্থ বা পরামর্শ যাই হোক, তিনি উদারভাবে সারাজীবন অর্থী প্রত্যর্থীদের সাহায্য করেছেন।

বাবু কালীকিষেণ : গোপাললালের পুত্র কালীকিষেণের জন্ম হয় আনুমানিক ১৮৪১ খ্রীস্টাব্দে। বাংলার অভিজাত ও ভদ্রপরিবার সমূহের ছ্যারো হিন্দু কলেজেই তাঁর শিক্ষা আরম্ভ হয়। কিন্তু উক্ত প্রতিষ্ঠানে কোন মুসলমান বাঈজীর পুত্র ভর্তি হওয়ায়, তাঁকে হিন্দু কলেজ থেকে ছাড়িয়ে এনে, ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে ভর্তি করা হয় ; এখানে তিনি অতি অল্প সময় শিক্ষালাভ করেন। এরপর তাঁকে ভর্তি করা হয় ডাভ্‌টন কলেজে। কিন্তু খারাপ স্বাস্থ্যের জন্য এই প্রতিষ্ঠানও তাঁকে ছাড়তে হয়। তখন সেযুগের শ্রেষ্ঠ ইওরোপীয় পণ্ডিতদের গৃহশিক্ষকতায় তাঁর শিক্ষা পরিচালিত হতে থাকে। অধ্যয়নশীল কালীকিষেণ লেখাপড়ায় কঠোর পরিশ্রম করতে থাকেন। এতে তাঁর স্বাস্থ্য আরও ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকায়, তিনি কম পরিশ্রমসাধ্য জমিদারী সেরেস্তার কাজ দেখতে আরম্ভ করেন। জমিদারী বিস্তৃত, কিন্তু এ বিষয়ে তিনি বিশেষ শিক্ষা ও সহায়তা লাভ করেন তাঁদের আত্মীয় মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। বাখরগঞ্জ জেলার এদিলপুর ও অন্যান্য পরগণার হিসাব নিকাশ পরিচালনা করেই, তাঁর অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হয়। ফল আশানুরূপই হয়েছে। তাঁর জমিদারীর প্রজাসাধারণ তাঁর কাছে যে সহানুভূতিপূর্ণ ও সহৃদয় ব্যবহার পেয়ে থাকেন, বাংলার অতি সুপরিচালিত জমিদারীগুলিতেও তা প্রায় দুর্লভ।

তাঁর পুত্রের বিবাহের সময়, বাবু কালীকিষেণ প্রচুর দান করেন। তাছাড়া অভাবী মানুষদের দারিদ্র্যমোচনে তিনি উদারহস্তে দান করে থাকেন। তাঁরই দয়া লাভ করে বহুসংখ্যক দরিদ্র ছাত্র শিক্ষা লাভ করছেন, যাতে ভবিষ্যতে তাঁরা নিজেদের ও পরিবার পরিজনের ভরণপোষণ করতে পারেন। এখন, যত দিন যাচ্ছে, গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করাই কঠিন হয়ে পড়ছে ; এই সময় ছাত্রদের শিক্ষালাভে সহায়তা করে তিনি তাদের এবং সাধারণভাবে বহু পরিবারের অশেষ উপকার করছেন।

ছোট তরফ

ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, জয়রামের কনিষ্ঠ পুত্র নীলমণির বংশকেই বলা হয় ছোট তরফ। নীলমণি ঠাকুরের পাঁচ পুত্র : রামতনু, রামরত্ন, রামলোচন,

রামমণি এবং রামবল্লভ। রামমণির তিন পুত্রের মধ্যে মধ্যমপুত্র দ্বারকানাথ ঠাকুরকে তাঁর অপুত্রক জ্যেঠামশায় রামলোচন ঠাকুর দত্তক নেন। কনিষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল রমানাথ ঠাকুর।

দ্বারকানাথ ঠাকুর

দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৭৯৪এ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ইংরেজী শিক্ষার সূত্রপাত হয় শের্বোর্নের স্কুলে, ফার্সী ভাষাও কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি আয়ত্ত করেন। পালক পিতার মৃত্যুর পর তাঁকেই বিস্তৃত জমিদারী পরিচালনার ভার নিতে হয়। ফলে অল্প বয়সেই তিনি প্রজাস্বত্ব এবং জমিদারী সংক্রান্ত আইনকানুনে বিশেষ দক্ষতা লাভ করেন। এর পর আইন অধ্যয়ন করে তিনি বহু রাজা মহারাজা ও জমিদারের আইন বিষয়ক প্রতিনিধি হন। এর সঙ্গে (কিছু প্রতিষ্ঠানের) ব্যবসায়িক প্রতিনিধিত্বও করতে থাকেন। ২৪-পরগণার সল্ট এজেন্ট ও কালেক্টরের সেরেস্তাদারের চাকরীও করেন। পরে তিনি ঐ দফ্‌তরের দেওয়ান পদ লাভ করেন। আবগারী, আফিম ও লবণ পর্ষদের দেওয়ানীও করতে থাকেন। কিন্তু স্বাধীন জীবনযাপনে আগ্রহী দ্বারকানাথ ১৮৩৪-এর আগস্ট মাসে চাকরী ত্যাগ করে 'মেসার্স কার টেগোর অ্যাণ্ড কোম্পানি' প্রতিষ্ঠা করেন। এই কোম্পানির পরিচালনায় বিভিন্ন স্থানে তিনি কয়েকটি কারখানা স্থাপন করেন। আবার, তাঁর দয়া, দান ও জনকল্যাণ চিন্তাও ছিল অতুলনীয়। তখন এমন কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বা সামাজিক, রাজনৈতিক কিংবা দাতব্য প্রতিষ্ঠান ছিল না যা তাঁর সহযোগিতা বা পর্যাপ্ত আর্থিক সাহায্য লাভ করেনি। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা ও সংগঠিত করার ব্যাপারে তিনি সক্রিয় অংশ নেন। মেডিক্যাল কলেজের মঙ্গলের জন্যও তাঁর আগ্রহের অবধি ছিল না। ১৮৩৬-এর এপ্রিলে তিনি ল্যাণ্ড হোল্ডার্স সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রধানত তাঁরই প্রেরণায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদটি সৃষ্ট হয়। তিনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতার একজন উৎসাহী প্রবক্তা ছিলেন।

১৮৪২-এর ৯ এপ্রিল তিনি ইওরোপ অভিমুখে যাত্রা করেন। রোমে তিনি পোপের সহিত পরিচিত হন। ১০ জুন তিনি পৌছলেন লণ্ডন—এখানে তাঁকে সোৎসাহ অভ্যর্থনা জানান হল। ব্যক্তিগত ও প্রতিষ্ঠানগতভাবে তাঁকে কয়েকটি ভোজসভায় আপ্যায়ন জানান হয়। ১৬ জুন তিনি মহামান্যা মহারাণীর সাক্ষাতের

সম্মান লাভ করেন—তাঁর পূর্বে আর কোন ভারতীয়ের এ সম্মানলাভের সৌভাগ্য হয় নি। বাকিংহাম প্রাসাদে মহামান্যা মহারাণী তাঁকে এক ভোজে আপ্যায়িত করেন। মহামান্যা মহারাণীর আমন্ত্রণে তিনি সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজ ও রয়্যাল নার্সারী পরিদর্শন করেন। তিনি মহারাণীর ও তাঁর স্বামীর একখানি করে পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি কলকাতাকে তাঁর মারফৎ উপহার দিবার অনুরোধ জানান, মহারাণী তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। প্রতিকৃতি দুখানি কলকাতার টাউন হলের তিন তলায় এখনও টাঙানো আছে। দ্বারকানাথ স্কটল্যাণ্ডও গিয়েছিলেন, সেখানেও তিনি সমভাবে সম্মানিত হন। ১৮৪২-এর শেষে দিকে তিনি ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন, ফেরার পথে ফ্রান্সের রাজা লুই ফিলিপ তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে সম্মানিত করেন।

(প্রত্যাবর্তনের পর) দ্বারকানাথই ছিলেন কলকাতার সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ব্যক্তি। তাঁর বেলগাছিয়া ভিলা (এখন পাইকপাড়া রাজাদের সম্পত্তি) সেসময় প্রতি সন্ধ্যায় আমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে প্রদত্ত ভোজসভা এবং অন্যান্য সামাজিক আমোদপ্রমোদে মুখরিত হয়ে থাকত।

১৮৪৫এ তিনি পুনরায় ইংল্যাণ্ড অভিমুখে যাত্রা করলেন। পথে তিনি কায়রোতে মিশরের ভাইসরয়ের এবং নেপ্‌ল্‌সে ইটালির রাজার কাছ থেকে সংবর্ধনা লাভ করলেন। (ইংলণ্ডে) মহামান্যা মহারাণী বিশেষ আন্তরিকতার সঙ্গে স্বীয় বসবার ঘরে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। মহারাণীর ইচ্ছা অনুযায়ী তিনি সিংহাসনের পিছনে দাঁড়াবার অধিকার পেলেন—খুব অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই এ মর্যাদার অধিকারী হতে পারেন। ভারতবর্ষ থেকে দ্বারকানাথ মহারাণীর জন্য কিছু উপহার নিয়ে গিয়েছিলেন। মহারাণী সাদরে সেগুলি গ্রহণ করেন। বিশেষ আমন্ত্রণে দ্বারকানাথ বাকিংহাম প্রাসাদে গেলে মহারাণীর নির্দেশ অনুযায়ী তাঁকে মহারাণী ও প্রিন্স আলবার্টের ক্ষুদ্রাকৃতি প্রতিকৃতি উপহার দেওয়া হয়; তাতে লেখা রইল : 'ভিক্টোরিয়া আর আলবার্টের পক্ষ থেকে দ্বারকানাথ ঠাকুরকে সাদর উপহার—বাকিংহাম প্রাসাদ, জুলাই ৮, ১৮৪৫।'

এ বৎসরই তিনি আয়ারল্যাণ্ড পরিদর্শনে গেলে সেখানকার ভাইসরয় তাঁকে সাদর সংবর্ধনা জানান। ঐ বৎসর 'ইণ্ডিয়ান প্রিন্স' নামে খ্যাত দ্বারকানাথকে ডাচেস অব ইনভারনেস এক ভোজসভায় অ্যাপ্যায়িত করেন। ঐ ভোজসভাতেই দ্বারকানাথের কম্পজ্বর দেখা দেয়। চিকিৎসার জন্য তাঁকে লণ্ডন আনা হয়। কম্পজ্বর ক্রমে পালাজ্বরে পরিণত হয়। এই জ্বরে ভুগেই ১৮৪৬এর ১ আগস্ট তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন; তখন তাঁর বয়স ৫২ বৎসর মাত্র। বেশ কয়েক-জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করেন। তাঁর শবাধারে দুটি রৌপ্যফলক বসিয়ে তাতে ইংরাজী ও বাংলায় লেখা হয়—'বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর,

জমিদার, ৫২ বৎসর বয়সে ১৮৪৬এর ১ আগস্ট শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।' (দ্বারকানাথের জীবনের বিস্তৃত বিবরণীর জন্য কিশোরীচাদ মিত্র লিখিত ও মেসার্স থ্যাকার স্পিঙ্ক অ্যাণ্ড কোম্পানি কর্তৃক ১৮৭০এ প্রকাশিত 'মেময়র্স অব দ্বারকানাথ টেগোর' দ্রষ্টব্য)।

দ্বারকানাথ মৃত্যুকালে তিন সুশিক্ষিত পুত্র রেখে যান: দেবেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ এবং নগেন্দ্রনাথ। এঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথ 'ভারতীয় ঋষি' নামে বিখ্যাত।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেবেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে। তাঁর শিক্ষা আরম্ভ হয় রাজা রামমোহন রায়ের বিদ্যালয়ে; এর পর তাঁকে হিন্দু কলেজে ভর্তি করা হয়। দ্বারকানাথ তাঁকে নিজ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান 'কার টেগোর অ্যাণ্ড কোম্পানি' ও 'ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে' কাজ শেখানোর উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করে নেন। বিশেষ যত্ন সহকারে তিনি সংস্কৃত শিক্ষা করেন; বাল্যকাল থেকেই তিনি ধর্মভাবাপন্ন ছিলেন। বাইশ বৎসর বয়সেই তিনি তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠা করেন—এখানে সত্য, ধর্ম ও ভক্তি সম্বন্ধে আলোচনা হত। এই সভাকে পরবর্তীকালে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে একীভূত করা হয়—রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মসমাজের তখন পতনোন্মুখ অবস্থা। এই সময় হতে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন; তাঁর আন্তরিকতা ও ভক্তির জন্য ব্রাহ্মসমাজে আবার প্রাণসঞ্চার হয়। বেদের বহু শিক্ষা সমাজের আদর্শসম্মত নয় দেখে তিনি বেদের বহু অংশ ত্যাগ করে, গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি মন্ত্র গ্রহণ করেন। হিমালয়ে তিনি কয়েক বৎসর ধ্যান করে কাটান। তত্ত্ববোধিনী সভা বিলুপ্ত হবার পর, তিনি কলকাতায় একটি ব্রাহ্ম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৯২ শকাব্দে দুর্গাপূজার সময় তিনি সমুদ্রপথে কতিপয় বন্ধুবান্ধবসহ সিংহল যাত্রা করেন। 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকাখানি তাঁরই সাহায্য ও উৎসাহে প্রকাশিত হয়—পত্রিকাটির প্রথম সম্পাদক ছিলেন মনোমোহন ঘোষ; তিনি ইংল্যাণ্ড চলে গেলে, এর সম্পাদক হন কেশবচন্দ্র সেন। সমাজে আচার-অনুষ্ঠান বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের মধ্যে মনান্তর হলে, একমাত্র দেবেন্দ্র-নাথের ব্যয়েই 'ন্যাশনাল পেপার' প্রতিষ্ঠিত হয়।

উপবীত ত্যাগ ও ব্রাহ্মমতে কন্যার বিবাহ দেবার ব্যাপারে তিনিই প্রথম ব্রাহ্ম।

কিছুকালের জন্য তিনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। কিন্তু ধর্মবিষয়ে মগ্ন থাকায় তিনি এই পদ ত্যাগ করেন; তিনি অত্যন্ত আড়ম্বরসহকারে তাঁর বাড়ীতে ৭ (১১) মাঘ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক (প্রতিষ্ঠা) দিবস উপলক্ষে উৎসব করতেন। বক্তৃতা ও রচনা দ্বারা তিনি বাংলা সাহিত্যেরও সমৃদ্ধি সাধন করেছেন। তিনি পাঁচ পুত্রের পিতা। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম এবং বাংলা সাহিত্যের খ্যাতিমান লেখক। তাঁর অন্য পুত্রগণও পিতার ন্যায় ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী। তাঁর মধ্যম পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ প্রথম ভারতীয় আই সি এস। দেবেন্দ্রনাথের সকল পুত্রই কাব্যপ্রেমী।

মহারাজা রমানাথ ঠাকুর সি এস আই

রামমণির কনিষ্ঠ পুত্র রমানাথের জন্ম ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে। মিঃ শেরবোর্নের গ্রামার স্কুলে তাঁর ইংরাজী শিক্ষার সূত্রপাত হয়; এই বিদ্যালয়ে তিনি কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করেন। তাছাড়া, বাংলা, সংস্কৃত এবং ফার্সীও তিনি বাড়ীতে শিক্ষা করেন। তিনি বাণিজ্যিক ও ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত কাজ শিক্ষা করেন মেসার্স আলেকজাণ্ডার অ্যাণ্ড কোম্পানির ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে। কর্মজীবন শুরু করেন ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের দেওয়ান রূপে; উল্লেখ্য যে, তাঁর ভাই দ্বারকানাথ ছিলেন এই ব্যাঙ্কের অন্যতম ডিরেক্টর। জ্ঞাতি ভ্রাতা প্রসন্নকুমারের সঙ্গে তিনি 'ইণ্ডিয়ান রিফর্মার' পত্রিকা পরিচালনা করতে থাকেন। 'হিন্দু' ছদ্মনামে তিনি প্রায়ই 'হরকরা' ও 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় লিখতেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠায় তিনিই ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। আমৃত্যু, প্রায় দশ বৎসর, তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন। ১৮৬৬তে তিনি বেঙ্গল কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। এখানে তিনি জনগণের স্বার্থে পরম নিষ্ঠা সহকারে বলতেন; ফলে, সহকর্মিগণ তাঁকে রায়তদের বন্ধু নামে ডাকতেন। কয়েক বৎসর যাবৎ তাঁকে জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য করা হত। রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিটি প্রশ্নে তিনি যা বলতেন, সকলেই তার ওপর গুরুত্ব দিতেন। এমন কোন জনসভা হত না, যেখানে রমানাথের সক্রিয় ভূমিকা না থাকত। খুব একটা বাগ্মিতা না থাকলেও, তাঁর বক্তৃতা হত আন্তরিকতাপূর্ণ, সময়োপযোগী ও যৌক্তিকতাসমৃদ্ধ। ১৮৭৩এ তাঁকে গভর্নর-জেনারেলের কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত করা হয়;

ঐ সময়ই তাঁকে রাজা খেতাবে ভূষিত করা হয়। তাঁর সহকর্মিগণ কাউন্সিলে তাঁর মূল্যবান কাজের প্রশংসা করেন। ভাইসরয় (লর্ড নর্থব্রুক) ও একখানি স্বাক্ষরিত পত্রদ্বারা তাঁর গুরুত্বপূর্ণ কাজের প্রশংসা করেন। ১৮৭৫এ মহামান্যা মহারাণী তাঁকে দি মোস্ট এগজলটেড অর্ডার অব দি স্টার অব ইণ্ডিয়া খেতাবে ভূষিত করেন। মাননীয় প্রিন্স অব ওয়েলসকে বেলগাছিয়া ভিলাতে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য যে জাতীয়-অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়, তাঁকে তার সভাপতি নির্বাচিত করা হয়; সমিতির সুশৃঙ্খল ও মর্যাদাপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি জানিয়ে প্রিন্স অব ওয়েলস তাঁকে একটি অঙ্গুরীয় উপহার দেন। মহামান্যা মহারাণী 'ভারত সম্রাজ্ঞী' পদবী গ্রহণ উপলক্ষে ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেল লর্ড লিটন ১৮৭৭এর ১ জানুয়ারী রমানাথকে মহারাজা খেতাবে ভূষিত করেন। উদার শিক্ষানীতির প্রবক্তা রমানাথকে যুক্তিযুক্তভাবেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো মনোনীত করা হয়। কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের তিনি অছি এবং/বা কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য ছিলেন। কি দানে আর কি ধর্মমতে, তাঁর মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িকতা বা সংকীর্ণতা ছিল না।

বহুমূত্র রোগে দীর্ঘকাল ভোগবার পর ১৮৭৭-এর ১০ জুন তিনি ঐ রোগেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই দুঃখজনক ঘটনা প্রসঙ্গে লর্ড লিটন অনারেবল রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর, সি আই ই-কে লেখেন :

প্রিয় মহাশয়,

কর্নেল বার্নকে লিখিত আপনার পত্রে আমাদের বন্ধু মহারাজা রমানাথ ঠাকুর বাহাদুরের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া মর্মাহত হইলাম। ইহা কেবলমাত্র আমার ব্যক্তিগত দুঃখ নহে, আপনার ও তাঁহার অসংখ্য গুণমুগ্ধেরও শোক—তাঁহাদিগের এই শোকে আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। তাঁহার মৃত্যুতে সরকার ও বাংলার জনগণ জ্ঞানী, সৎ ও বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা হারাইল। তাঁহার পরিচিত আর কেহ (বোধ হয়) তাঁহার মৃত্যুতে আমার মতো দুঃখ পায় নাই।

ইতি

ভবদীয় চির বিশ্বস্ত

(স্বা) লিটন

পুঃ : মহারাজা এমন একজন সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন, যিনি এখন ভাইসরয়ের কাউন্সিলের সদস্য জানিয়া আনন্দিত বোধ করিতেছি। অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাকে আমার কথা বলিবেন।

মহারাজার স্মৃতিরক্ষার পদ্ধতি নির্ধারণকল্পে টাউন হল-এ একটি শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার

অ্যাশলি ইডেন, কে সি এস আই। কলকাতার সম্ভ্রান্ত ইওরোপীয় ও দেশীয় ব্যক্তিবর্গ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

মহারাজার জীবৎকালেই তাঁর পুত্রের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে মহারাজা তিনটি পৌত্র রেখে যান। জ্যেষ্ঠ পৌত্রের মৃত্যু হয় ১৮৭৮-এর সেপ্টেম্বরে।

নীচের তালিকায় ঠাকুর পরিবারের যে-সকল ব্যক্তি গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাঁদের নাম এবং তাঁদের রচিত গ্রন্থের নাম দেওয়া হল :

ভট্টনারায়ণ

১. কাশীমরণ মুক্তি বিচার
২. প্রয়োগরত্ন (কয়েকটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান বিষয়ক)
৩. বেণীসংহার নাটক
৪. গোভিলসূত্র রহস্য

ধরণীধর

৫. মনুস্মৃতির ভাষ্য

বনমালী

৬. দ্রব্যশুদ্ধিপ্রকরণ রহস্য (ধর্মগ্রন্থ)
৭. ভক্তিরত্নাকর

ধনঞ্জয়

৮. নিঘণ্টু (বৈদিক শব্দের নির্ঘণ্ট)

হলায়ুধ

৯. ব্রাহ্মণ সর্বস্ব
১০. ন্যায় সর্বস্ব
১১. পণ্ডিত সর্বস্ব
১২. শিব সর্বস্ব
১৩. মৎস্য সূক্ততন্ত্র
১৪. অভিধান রত্নমালা (সংস্কৃত অভিধান)
১৫. কবি রহস্য

রাজারাম

১৬. শ্রৌত সিদ্ধান্ত (ধর্মীয় অনুষ্ঠান বিষয়ক)

জগন্নাথ

১৭. রসগঙ্গাধর (অলঙ্কার শাস্ত্র)
১৮. ভামিনী বিলাস (বিভিন্ন বিষয়ে কবিতাসমূহ)
১৯. রেখা গণিত (জ্যামিতি)

পুরুষোত্তম

২০. প্রয়োগ রত্নমালা (ব্যাকরণ)
২১. মুক্তিচিন্তামণি (বেদ বিষয়ক)
২২. বিষ্ণুভক্তি কল্পলতা
২৩. ভাষাবৃত্তি (পাণিনি ব্যাকরণের টীকা)
২৪. ত্রিকাণ্ডকোষ (সংস্কৃত অভিধান)
২৫. একাক্ষর কোষ (বর্ণ বিষয়ক অভিধান)
২৬. হরলতা
২৭. হরবোলী (সংস্কৃত অভিধান)
২৮. গোত্রপ্রবর দর্পণ

বলরাম

২৯. প্রবোধ প্রকাশ (ব্যাকরণ)

হরকুমার

৩০. দক্ষিণার্চ পারিজাত (তন্ত্র বিষয়ক)
৩১. হরতত্ত্ব-দিধিতি (তন্ত্র বিষয়ক)
৩২. পুরশ্চরণ-পদ্ধতি (তন্ত্র বিষয়ক)

প্রসন্নকুমার

৩৩. Table of Succession According to the Hindu law of Bengal.
৩৪. Heritable Right of Bundhus According to the Western Sc'1ool.
৩৫. বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লিখিত প্রবন্ধাদি
৩৬. বিভিধ চিন্তামণি (বৃহস্পতি বাচস্পতির মূল সংস্কৃতে রচিত মিথিলায প্রচলিত হিন্দু আইনের সংক্ষিপ্ত টীকা)

যতীন্দ্রমোহন

৩৭. Prose and Verse (English)
৩৮. বিদ্যাসুন্দর নাটক ও কয়েকখানি বাংলা প্রহসন

শৌরীন্দ্রমোহন

৩৯. ৩২ খানি গ্রন্থের রচয়িতা (শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের জীবনী দ্রষ্টব্য)

দেবেন্দ্রনাথ

৭১. ব্রাহ্মধর্ম (২ খণ্ডে)
৭২. সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম
৭৩ বাংলা ব্রাহ্মধর্ম

১৪. Brahma Dharma : Its Views and Princ ples
১৫. The Principles of Brahma Dharma Explained
১৬. অনুষ্ঠান পদ্ধতি
১৭. ব্রহ্মোপাসনা

(এ ছাড়া কয়েকটি প্রবন্ধ)

কুমারটুলি বনমালী সরকারের পরিবারবর্গ

সদ্‌গোপ জাতীয় আত্তারাম (আত্মারাম) সরকার হুগলী জেলাব ভদ্রেশ্বব থেকে এসে কলকাতার কুমারটুলিতে বসবাস করতে থাকেন। বনমালী, বাধাকৃষ্ণ এবং হরেকৃষ্ণ এই তিন পুত্র রেখে তিনি মারা যান।

বনমালী পাটনায় (কোম্পানির) কমার্শিয়াল রেসিডেন্টের দেওয়ান এবং কিছুকাল অনারেবল ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কলকাতাস্থ ডেপুটি ট্রেডাব ছিলেন। তিনি বিপুল বিত্তের অধিকারী হন, দাতা হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। কলকাতা, হুগলী ও ২৪ পরগণায় তাঁর সম্পত্তি ছিল। কুমারটুলিতে নির্মিত তাঁর বাসভবনটি ছিল কলকাতার বৃহত্তম অট্টালিকা—কথিত আছে, ১৭৫৬তে কলকাতা অবরোধের বহু পূর্বেই এটি নির্মিত হয়েছিল, বর্তমানে (১৮৮১) এটি জরাজীর্ণ। নিষ্ঠাবান হিন্দু বনমালী শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দব ও শিব ঠাকুবেব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন, মন্দিরসহ বিগ্রহ দুটি এখনও বর্তমান। বনমালী ও হবেকৃষ্ণ নিঃসন্তান ছিলেন। রাধাকৃষ্ণ একমাত্র পুত্র কৃষ্ণমোহনকে রেখে মাবা যান। কৃষ্ণ-মোহন এত অমিতব্যয়ী ছিলেন যে কলকাতায় তাঁর নাম হযে গিযেছিল বডবাবু। যৌবনেই কৃষ্ণমোহনের মৃত্যু হয়, মৃত্যুকালে তিনি তাঁর একমাত্র বিবাহিতা কন্যা আনন্দমযী দাসীকে বেখে মাবা যান। আনন্দময়ীও নিঃসন্তান ছিলেন, তিনি তাঁর সমগ্র পৈতৃক সম্পত্তি বিগ্রহদ্বয়ের নামে উৎসর্গ করেন এবং দেবরপুত্র (বা ভাসুবপুত্র) জনার্দন নিয়োগীকে সেবাইত নিযোগ করেন। জনার্দনও অপুত্রক ছিলেন, তিনিও ইষ্টিপত্রদ্বারা তাঁর পোষ্যপুত্র ও জ্যেষ্ঠ জামাতাকে সেবাইত নিয়োগ করে যান।

পরিবারটিব এখন আর সে ঐশ্বর্য বা জাঁকজমক নেই।

কুমারটুলি বেনীমাধব মিত্রের পরিবারবর্গ

এই মিত্র পরিবারটির আদি বাস ছিল নদীয়া জেলার চাকদহ স্টেশনের নিকটবর্তী গোরেপাড়া গ্রামে। শতাধিক বৎসর পূর্বে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য এঁরা কলকাতা চলে আসেন। বেণীমাধবের প্রপিতামহ নিধিরাম মিত্র কুমারটুলির বসু পরিবারে বিবাহ করার সুবাদে কুমারটুলিতেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। তাঁর পুত্র দুর্গাচরণের দুই বিবাহ; প্রথমা স্ত্রী নিঃসন্তান অবস্থায় অল্প বয়সে মারা যান; দ্বিতীয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন দুর্গাচরণের চার পুত্র: দর্পনারায়ণ, রাজমোহন, ভৈরবচন্দ্র ও বৃন্দাবনচন্দ্র। এঁদের মধ্যে দর্পনারায়ণই অধিক পরিচিত। অল্প বয়সেই রাজনারায়ণের মৃত্যু হয়। মাত্র বার বা তের বছর বয়সেই দর্পনারায়ণ মেসার্স ফেয়ারলি, ফার্গুসন অ্যাণ্ড কোম্পানিতে কেরাণীর চাকরী পান; (উল্লেখযোগ্য যে তখন এই কোম্পানিই ছিল সঙ্গতি ও খ্যাতির দিক থেকে একমাত্র মেসার্স জন পামার কোম্পানির পরবর্তী স্থানের অধিকারী)। দর্পনারায়ণ ছিলেন যেমন বুদ্ধিমান তেমনি চটপটে ও অন্যান্য বহু সদগুণের অধিকারী। শীঘ্রই তাঁকে 'ক্যালকুলেটার ও অ্যাডজাস্টার' পদে উন্নীত করা হয়। দর ও সুদের হার সম্পর্কীয় প্রশ্ন শোনামাত্র তিনি উত্তর বলে দিতে পারতেন, তার জন্য তাঁর চিন্তা করবারও প্রয়োজন হত না। চোখের নিমেষে তিনি বড় বড় যোগ কষে দিতেন। তাঁর এই নির্ভুল ও দ্রুত হিসাব করবার ক্ষমতার জন্য তিনি কর্তৃপক্ষের পর্যাপ্ত অনুগ্রহ লাভ করেন; সাহেবরা তাঁকে 'ড্যাপ' নামে ডাকতেন, হিসাব মেলাবার ব্যাপারে কোথাও কোন গোলযোগ হলেই ড্যাপের ডাক পড়ত, আর মুস্কিলেরও আসান হত। অফিসে যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি হওয়ায় তিনি তাঁর ভাইদের নিজের সহকারী করে ঐ অফিসে ঢুকিয়ে নেন। অর্থবান তিনি হতে পারেন নি; তবে সে সময় জিনিষ-পত্রের দাম কম থাকায়, তাঁর অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল ছিল। ব্যক্তিগত স্বার্থ অপেক্ষা (হিন্দু) ধর্মীয় অনুশাসনের প্রভাববশত তিনি স্বীয় বাসগৃহকে ছয় বা তারও অধিকসংখ্যক ব্রাহ্মণের বাসস্থানে পরিণত করেছিলেন, তাঁদের ব্যয়ের একটা বড় অংশও তিনি দিতেন। তাঁদের স্বগ্রামের পার্শ্ববর্তী গ্রাম কামালপুর থেকে তর্কালঙ্কার ও ন্যায়রত্নগণ, বিশেষত বিখ্যাত পণ্ডিত বলরামের বংশধরগণ,

পূজা, বিবাহ, শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তাঁদের প্রাপ্য দক্ষিণা ও পার্বণী আদায়ের জন্য কলকাতা এলে দর্পনারায়ণের বাড়ীতেই তাঁরা আরামে থাকতে পারতেন। দর্পনারায়ণের ভাইয়েরা বিশেষত ছোট ভাই বৃন্দাবন, এ-বিষয়ে দাদার আদর্শ অনুসরণ করতেন।

দর্পনারায়ণ ও ভৈরবচন্দ্র নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। ফলে, বৃন্দাবনচন্দ্র হন ঐ বংশের প্রতিনিধি। তাঁর চার পুত্র মধুসূদন, নবীনচন্দ্র, বেণীমাধব ও নবকিশোরের মধ্যে দ্বিতীয ও চতুর্থ জন অল্প বয়সেই মারা যান। বাবু মধুসূদন তাঁর জ্যেঠামশায়ের অফিস মেসার্স ফেয়ার্লি, ফার্গুসন অ্যাণ্ড কোম্পানির অফিসে প্রথম চাকরীতে ঢোকেন, ঐ কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে গেলে, পর পর কয়েকটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে চাকরী করার পর সামরিক বিভাগের ফিল্ড হাসপাতালে গোমস্তার চাকরী লাভ করেন। তখন দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ চলছে। চিলিযানওযালা, গুজরাট প্রভৃতি বহু স্থানের রক্তাক্ত যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁকে উপস্থিত থাকতে হয়েছে, এমন পরিস্থিতিতে বহু চাকুরেই দু হাতে টাকাপয়সা জামিয়ে ধনী হয়ে যায়, কিন্তু মধুসূদন হয় খুব সৎ ছিলেন, নয় ছিলেন অত্যন্ত ভীরু, যাব জন্য তিনি তুলনামূলকভাবে অর্থহীন থেকে যান। যুদ্ধের পর তাঁকে ফিবোজপুরে সামবিক ডিপোতে বদলী করা হয়। শেষ পর্যন্ত তাঁকে কাস্টম হাউসে নিযোগ করা হয়, সেখান থেকে অবসর নিযে এখন অবসব ভাতা পাচ্ছেন। পুবাণ, তন্ত্র ও সাহিত্যসমূহ তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন—এই সব হিন্দু শাস্ত্রে তাঁর জ্ঞান গভীর ও ব্যাপক। তাঁর দ্বিত য পক্ষের তিনটি পুত্র আছে, এবা সকলেই অল্পবযস্ক।

বাবু বেণীমাধবের জন্ম হয ১৮২২এ। তাঁর বাল্যকাল আদৌ উল্লেখযোগ্য বা উজ্জ্বল ছিল না; ইংরেজীর প্রাথমিক শিক্ষা তিনি লাভ করেন ডাঃ ডাফের স্কুলে। ১৮৪২-এ তিনি কাস্টম হাউসে একটি চাকরী পান, মিঃ জে জে হার্ভে তখন ঐ বিভাগের কালেক্টর। বেণীমাধবের পদের মাইনে বা মর্যাদা কোনটাই বেশী ছিল না। তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর কাজ খুব ভালভাবে করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। পদ উচ্চ না হক, উচ্চতর আধিকারিকগণ তাঁর সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করতে লাগলেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ডেপুটি কালেক্টরগণ তো বটেই, কালেক্টরগণও তাঁর পরামর্শ চাইতে লজ্জাবোধ করতেন না। এই সব কারণে তাঁর ছোটখাট পদোন্নতি হয়। তাঁর দক্ষতা ও চাকুরীক্ষেত্রে তিনি কত প্রয়োজনীয় সেটা উপলব্ধি করে উচ্চতর আধিকারিকগণ স্বেচ্ছায় অযাচিতভাবে তাঁকে প্রশংসাপত্র দিতে থাকেন। অন্যান্যদের মধ্যে সর্বজনশ্রদ্ধেয় দক্ষতাসম্পন্ন কালেক্টর মিঃ ডব্ল্যু ব্রাকেন বিশিষ্ট পদ্ধতিতে বেণীমাধবের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও স্নেহ প্রকাশ করেন। ১৮৪৫ সালে অবসর গ্রহণকালে মিঃ ব্র্যাকেন অন্যান্য

অফিসার বিশেষত তাঁর স্থলাভিষিক্তের নিকট বেণীমাধবকে 'সবজান্তা' অর্থাৎ কাস্টম বিষয়ক সর্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী, বলে পরিচয় করিয়ে দেন। মিঃ ব্র্যাকেন ব্যবসায়ী ও অধীনস্থ কর্মচারীদের কাছে সমান প্রিয় ছিলেন। তাঁর অবসর গ্রহণকালে ব্যবসায়ীগণ তাঁকে একটি রৌপ্য আধার উপহার দেন, আর অধীনস্থ কর্মচারীবর্গ তাঁর একখানি তৈলচিত্র আঁকাবার জন্য ২,০০০ টাকা চাঁদা তোলেন—যাতে তাঁর সহৃদয় ব্যবহারের স্মৃতি জাগরূক থাকে। মিঃ ব্র্যাকেন জানান 'বেণীর' সাহায্য না পেলে তিনি অতখানি দক্ষতা সহকারে কাজ করতে বা জনপ্রিয় হতে পারতেন না, কাজেই, প্রতিকৃতিতে 'বেণী'ও চিত্রিত হলে তিনি সব চেয়ে বেশী খুশী হবেন। প্রতিকৃতিখানি আঁকেন জার্মান শিল্পী ক্রমহোলৎস; প্রতিকৃতিতে আছে, উপবিষ্ট মিঃ ব্র্যাকেনের পাশে দপ্তরের পোশাকে সজ্জিত বেণীমাধব অফিসের কোন বিষয় ব্যাখ্যা করছেন। এই প্রতিকৃতিখানি এখনও কালেক্টরের ঘরে টাঙানো আছে। যে-কোন ব্যবসায়ী সে খ্রীস্টিয়ান, পার্শী, ইহুদি, পশ্চিমা, বোম্বাইওয়ালা বা বাঙালী যা-ই হন, কাস্টম হাউসে যাঁরই কোন কাজ থাকত, তিনিই বেণীমাধবকে ভালবাসতেন। উনচল্লিশ বছর তিনি চাকরী করছেন, এর মধ্যে তাঁর সততা বা কর্তব্যনিষ্ঠায় কোন কলঙ্কের ছাপ লাগে নি। গত পাঁচ বৎসর কাল তিনি ডেপুটি সুপারভাইজারের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বেণীমাধবের বিবাহ হয় বাগবাজারের বনেদী সোম পরিবারের বিশিষ্ট ব্যক্তি কৃষ্ণচন্দ্র সোমের জ্যেষ্ঠা কন্যার সঙ্গে। বর্তমানে তাঁর এক পুত্র ও চার কন্যা। পুত্রের নাম বরদাচরণ মিত্র, তিনি বি-এ পাস। তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যার বিবাহ হয়েছে স্মলকজ কোর্টের প্রাক্তন জজ হরচন্দ্র ঘোষের পুত্র প্রতাপচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে, তিনি কলকাতার রেজিস্ট্রার।

সিমলার বসু পরিবার

বনেদী এই বসু পরিবারের আদি বাস ছিল হুগলী জেলার পানসিয়ালাতে। এই বংশের রামচন্দ্র বসু পানসিয়ালা ছেড়ে হরিপালে বাস করতে চলে যান। তাঁর ছয় ছেলের মধ্যে সীতারাম ও চুনীলাল ভাগ্যান্বেষণে কলকাতা চলে আসেন, আর বেণীমাধব যান বালেশ্বরে। ভাইদের মধ্যে চুণীরামই ছিলেন বিশিষ্টতম। উন্নত

চরিত্র, সততা ও শ্রমশীলতার জন্য তিনি সহজেই যোগ্য স্থান লাভ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত গোঁড়া বৈষ্ণব। বৃন্দাবন থেকে এসে নিজের ঠাকুরবাড়ীতে বিষ্ণুর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন; জাতিগত দিক থেকে অধিকার না থাকলেও, তিনি নিজে ঠাকুরের ভোগ রান্না করতেন। অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে তিনি প্রণাম পর্যন্ত করতেন না। তিনি চাকরী করতেন প্রখ্যাত রামদুলাল দে'র অধীনে; এই চাকরী ছিল বিশেষ লাভ-দায়ক; রামদুলাল একদিন বিনীতভাবে আহারের জন্য অনুরোধ করায়, তিনি চাকরী ছাড়তে উদ্যত হয়েছিলেন, তাঁর আয়ের তুলনায় দান খয়রাত ছিল প্রচুর। প্রতিদিন তাঁর ঠাকুরবাড়ীতে কয়েকজন বৈষ্ণবকে খাওয়ান হত। দুটি মহোৎসবে হাজার হাজার বৈষ্ণবকে ভোজন করান হত। এছাড়া প্রতিটি বৈষ্ণব উৎসব তাঁর ঠাকুরবাড়ীতে বিশেষ সমারোহের সঙ্গে পালিত হত। ৬০ বৎসরের 'পরিণত বয়সেই' তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র গঙ্গাগোবিন্দ বাণিজ্য করে প্রভূত ধনসম্পদ অর্জন করেন। কিন্তু অসৎ লোকের ওপর ব্যবসায় বাণিজ্য পরিচালনার ভার দিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে যান, শেষ জীবন তাঁর কাটে দুঃখ ও কতকটা দারিদ্র্যের মধ্যে। ব্যবসায় বাণিজ্যে তাঁর দক্ষিণ হস্ত মেজ ভাই রাধাগোবিন্দ এই অবস্থায় একটি ভাল চাকরী জোগাড় করেন। পরবর্তী সময়ে স্বাধীন ব্যবসায় শুরু করে তিনিও ধনী হয়ে ওঠেন; সমৃদ্ধির দিনে তিনি বহু দরিদ্র আত্মীয়স্বজনের ভরণ-পোষণ করতেন। তিনিও ব্যবসায় পরিচালনার দায়িত্ব দেন এক ভ্রাতুষ্পুত্রের ওপর, এই ভাইপোটি ছিলেন অপদার্থ, ফলে রাধাগোবিন্দের ব্যবসায় ধ্বংস হয়ে যায়, ভগ্ন-হৃদয়ে চল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন। তার দুই পুত্র, পিতার মৃত্যুকালে নবীনকৃষ্ণের বয়স ছিল মাত্র পাঁচ বৎসর। নবীনের জন্ম হয় ১৮২৮-এর ১৩ জানুয়ারী; জ্যোতিষে পারদর্শী পিতা রাধাগোবিন্দ ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, এই শিশুর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি তখন ইহলোকে থাকবেন না। অতি শৈশব থেকেই এই শিশুর মধ্যে শিক্ষার প্রতি তীব্র আগ্রহ দেখা যায়, শৈশবে তিনি যা শুনতেন বা দেখতেন, তা কখনও ভুলতেন না। বিশ বৎসর বয়স হবার আগেই তিনি ইংরেজী সাহিত্য ও দর্শনে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। যত দিন যায়, তাঁর জ্ঞান ও জ্ঞান তৃষ্ণাও তেমনি বেড়ে চলে, কিন্তু বিরাট সংসারের বোঝা কাঁধে থাকায় সেই তরুণ বয়সেই তাঁর অসুবিধারও অন্ত ছিল না। তিনি ছিলেন প্রকৃতি প্রেমিক; তাই তাঁর ধারণা হল চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা করলে এবং চিকিৎসা ব্যবসায়ে ব্রতী হতে পারলে, জীবনে স্বাধীনভাবে চলতে পারবেন আর প্রকৃতির পৃষ্ঠাগুলিও তাঁর সামনে খুলে যাবে। কলেজ জীবনে তিনি বই পড়তেন না, গ্রন্থাগার হজম করতেন।* দুঃখের বিষয়, তাঁর উজ্জ্বল কলেজ জীবনের পূর্ণ বিবরণ দেবার মতো স্থান আমাদের নেই। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, শেষ পরীক্ষায় তিনি সবকটি পদক লাভ

করায়, গভর্ণর জেনারেল নিজের পক্ষ থেকে তাঁকে একটি পদক উপহার দেন। শীঘ্রই তিনি চিকিৎসা ব্যবসায় শুরু করলেন; কিন্তু কতকগুলি গভীর প্রশ্নে তাঁর মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠতে লাগল; বিভ্রান্ত বোধ করতে লাগলেন—একই ওষুধের ক্ষেত্রে একই প্রকার প্রতিক্রিয়া কেন হয় না; কিছুটা নিশ্চয়তার সঙ্গে কেন কিছুই বলা যায় না—চিকিৎসাশাস্ত্রের এই যখন অবস্থা, তখন তিনি চিকিৎসা করবেন কি ভাবে! সংশয় আর মানসিক দ্বন্দ্ব! চিকিৎসা ব্যবসায় তিনি একেবারে বর্জন করলেন।

সংবাদপত্রের সঙ্গে তাঁর সংস্রব অনেক আগে থেকেই ছিল। প্রায় এই সময় হিন্দু পেট্রিয়টের মহান সম্পাদকের মৃত্যু হওয়ায়, পত্রিকাটিরও অপমৃত্যু হবার উপক্রম হল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সি আই ই এবং রাজা দিগম্বর মিত্র সি এস আই, নবীনকৃষ্ণের উপর পত্রিকাটি সম্পাদনার ভার অর্পণ করেন। তাঁর দক্ষ ও প্রশংসনীয় পরিচালনায় পত্রিকাখানি পুনরায় স্বপ্রতিষ্ঠ হয় এবং তাঁর অধীনে যাঁরা শিক্ষানবিশী শুরু করেন, তাঁরাও প্রভূত উন্নতি করে কালে নিজেরা সম্পাদক হয়ে ওঠেন। এই সময় ডাঃ ডাফের অনুরোধে তিনি মধ্যপ্রদেশের কমিশনারের অধীনে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ করেন। 'প্রজাপতির ঐক্য' শীর্ষক একটি সুযোগ্য প্রবন্ধে নবীনকৃষ্ণ ডাঃ ডাফকে আক্রমণ করেন; ডাঃ ডাফ লেখককে খুঁজে বের করেন; দুজনের পরিচয় হয়; পরিচয় গভীর বন্ধুত্বে পরিণত হয়। অল্পদিনের মধ্যে তিনি অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারীর পদ ত্যাগ করে, আর্থিক লোকসান স্বীকার করে বিচার বিভাগে একটি পদ গ্রহণ করেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানে জ্ঞান ও স্বাভাবিক প্রতিভা তাঁকে বিশিষ্টতা দান করে। পনের বৎসর ব্যাপী তিনি এক্‌সট্রা অ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনারের পদে চাকরী করেন। চাকরী করার তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, পরিণত বয়সে পেনসন পেয়ে নিশ্চিন্ততার সঙ্গে গ্রন্থাগারে বসে অধ্যয়নে মনোনিবেশ করতে পারবেন। দুর্ভাগ্যবশত তাঁর এ উদ্দেশ্য সফল হয় নি; অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে ব্রেন ফিভারে তাঁর জীবনাবসান হয় মাত্র ৫১ বৎসর বয়সে ১৮৭৯-র ২০ জানুয়ারী। অনেক কিছু করবার মতো দীর্ঘ আয়ু তিনি লাভ করেন নি; কিন্তু বেথুন সোসাইটির সদস্য হিসাবে উক্ত সমিতির বিভিন্ন সভায় তিনি যে সকল বক্তৃতা করেন সেগুলি পড়লে যে-কোন চিন্তাশীল পাঠক বুঝতে পারবেন কত গভীর জ্ঞানের তিনি অধিকারী ছিলেন। এমন কোন বিষয় ছিল না যা তাঁর মনোযোগ আকৃষ্ট করেনি; তাঁর বক্তৃতা ও প্রবন্ধাবলীতে এ কথার সুস্পষ্ট ছাপ আছে। তাঁর মৃত্যুতে গুণমুগ্ধ বন্ধু ও উদীয়মান লেখকগণ গভীর শোকে নিমগ্ন হন। উদীয়মান লেখকদের তিনি ছিলেন পথপ্রদর্শক, বন্ধু। তাঁর দুই পুত্র: অমৃতকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রকৃষ্ণ।

বেণীমাধবের একমাত্র পুত্র হরমোহনের দুই পুত্র গিরীশচন্দ্র ও শিবচন্দ্রের মধ্যে

দ্বিতীয় জন এখন বাঁকীপুর টেম্পল মেডিক্যাল স্কুলের ধাত্রীবিদ্যার শিক্ষক ও সফল চিকিৎসক।

গঙ্গাগোবিন্দ ও রাধাগোবিন্দের জ্ঞাতি ভ্রাতা মদনমোহন থেকে এই বংশের অপর শাখার উদ্ভব হয়; তাঁর চার পুত্র: শিবচন্দ্র, হরিশচন্দ্র, দুর্গাচরণ এবং তারিণীচরণ। এঁরা সকলেই বেনিয়ান এবং বেনিয়ানদের পেশায় সাফল্যও লাভ করেছেন। লক্ষপতি তারিণীচরণ এখন এই বংশের একমাত্র জীবিত ব্যক্তি; তিনি কলকাতার প্রথম শ্রেণীর ধনী বেনিয়ান।

তালতলার ডাঃ দুর্গাচরণ ব্যানার্জি

কুলীন ব্রাহ্মণ গোলকচন্দ্র ব্যানার্জির পুত্র প্রয়াত ডাঃ দুর্গাচরণ ব্যানার্জির জন্ম হয় ১৮১৯এ, ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেণ্টের নিকটবর্তী গ্রাম মনিরামপুরে।

ছ'বছর বয়সে তিনি গুরুমশায়ের পাঠশালে বাংলা শিক্ষা আরম্ভ করেন। এর চার বছর পর তাঁর পিতা তাঁকে কলকাতা এনে হিন্দু কলেজে ভর্তি করে দেন। ১৫/১৬ বছর বয়সে তিনি একটি বৃত্তি পান এবং এই সময় থেকেই তিনি ইতিহাস ও গণিতে সহপাঠীদের ছাড়িয়ে ওঠেন। এরপর এক ব্রাহ্মণ বালিকার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়; তখন তাঁর পিতা তাঁকে সল্ট বোর্ডের অধীনে চাকরী নিতে বাধ্য করেন। কিন্তু তিনি জ্ঞানপিপাসা এমন তীব্রভাবে অনুভব করতে থাকেন যে একদিন বোর্ডের দেওয়ান দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিবেদন রাখেন। তিনি বলেন 'অজ্ঞতার রাজ্য থেকে তিনি সবে জ্ঞানের গিরিচূড়ার পথে অগ্রসর হচ্ছেন, এমন সময় শিক্ষাক্ষেত্র থেকে তাঁর সম্পর্ক চুকে যাওয়া মহাদুর্ভাগ্যের বিষয়।' দ্বারকানাথ তাঁর পিতাকে ডেকে পাঠিয়ে ছেলেকে হিন্দু কলেজে ভর্তি করতে বাধ্য করেন। কিন্তু পিতার আর্থিক দুরবস্থার জন্য শিক্ষা সমাপ্তির দু'এক বৎসর পূর্বেই তাঁকে পুনরায় কলেজ ছাড়তে হয়। অবশ্য কলকাতায় পাওয়া যায় এমন ইংরেজী সাহিত্য ও বিজ্ঞানের বই ছাড়াও তিনি ইওরোপ থেকে আমদানী করা নতুন নতুন বই অধ্যয়নে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। এই অভ্যাসের ফলে তখনকার ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিন্দু কলেজের শ্রেষ্ঠ ছাত্রগণ অপেক্ষা তিনি অনেক বেশী অগ্রসর হতে পেরেছিলেন। ২১ বছর বয়সে তিনি ডেভিড হেয়ারের ইংলিশ স্কুলে দ্বিতীয়

শিক্ষকের চাকরী পান। এবং মহান মানবপ্রেমিক ও এদেশীয়দের বন্ধু ডেভিড হেয়ারের অনুমতি নিয়ে দৈনিক দু'ঘণ্টা করে মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা করতে থাকেন। তাঁর চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের কারণ নিম্নরূপ :

একদিন স্কুলে তিনি পড়াচ্ছেন এমন সময় একজন বেয়ারা মারফত খবর পেলেন, তাঁর স্ত্রী অসুস্থ। দ্রুত বাড়ী ফিরে দেখলেন, তাঁর স্ত্রী খুব বেশী অসুস্থ, অমনি তিনি ডাক্তারের খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু তিনি চিকিৎসক নিয়ে ফেরবার পূর্বেই তাঁর স্ত্রীর প্রাণ বিয়োগ হয়। উপযুক্ত সময়ে যোগ্য ডাক্তার না পাওয়ায়, এবং তাঁর স্ত্রী হাতুড়ে চিকিৎসকের চিকিৎসার শিকার হওয়ায় তিনি চিকিৎসক হবার জন্য স্থির সঙ্কল্প করেন।

কালে তিনি প্রথমা স্ত্রীর বিয়োগব্যথা ভুলে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন সত্য, কিন্তু একথা তিনি ভুলতে পারেন নি, যে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে তাঁর অজ্ঞতায় এবং যোগ্য চিকিৎসকের অভাবেই তাঁর প্রথমা স্ত্রী মারা যান ; তাই পিতার শত আপত্তি ও বিরোধিতা সত্ত্বেও মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করতে থাকেন। ডেভিড হেয়ারের স্কুলে মিঃ জোন্স সুপারইনটেনডেণ্ট হয়ে এসে দুর্গাচরণকে জানিয়ে দিলেন, দৈনিক দুঘণ্টা করে তিনি স্কুল থেকে ছাড়া পাবেন না। দুর্গাচরণ তখন ডাক্তারী শেখবার জন্য শিক্ষকতা ত্যাগ করলেন। এই ভাবে পাঁচ বছর ডাক্তারী শেখার পর বিশেষ এক পরিস্থিতিতে তিনি মেডিক্যাল কলেজ ছাড়লেন। পরিস্থিতিটি এইরকম :

মেসার্স জার্ডিন স্কিনার অ্যাণ্ড কোম্পানির বেনিয়ান বাবু নীলকমল ব্যানার্জি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লে, শহরের প্রতিষ্ঠিত ডাক্তারগণ তাঁকে পরীক্ষা করে সকল আশা ছেড়ে দিলে দুর্গাচরণের ডাক পড়ল। তিনি রোগী দেখে ব্যবস্থাপত্র লিখে দিলেন। সেই সময় ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ রিচার্ডসন কলকাতা এলে তাঁকে রোগী ও দুর্গাচরণের ব্যবস্থাপত্র দেখান হয়। ব্যবস্থাপত্র দেখে রিচার্ডসন খুব খুশী হয়ে জানালেন, ওখানা সম্পূর্ণ ঠিক আছে। দুর্গাচরণের ব্যবস্থামত ওষুধ খাইয়ে দেখা গেল কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রোগী ফল পেতে আরম্ভ করেছেন।

রিচার্ডসন নিজে উদ্যোগী হয়ে দুর্গাচরণের সঙ্গে পরিচয় করলেন। আলাপে সন্তুষ্ট হয়ে তিনি তাঁর নাম দিলেন 'দেশী রিচার্ডসন'।

এদিকে রামকমলবাবু সুস্থ হয়ে উঠলে দুর্গাচরণের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় একপ্রকার জোর জবরদস্তি করে তাঁকে মাসিক ৮০ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়ামের খাজাঞ্চির চাকরী নেওয়ালেন : শর্ত রইল যে, তিনি (দুর্গাচরণ) সকাল, সন্ধ্যা, রবিবার ও ছুটির দিন প্র্যাকটিস করতে পারবেন। এই ভাবে চলার পর দুর্গাচরণ চাকরি ছেড়ে, সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চিকিৎসা

ব্যবসায় আরম্ভ করলেন। তখন তাঁর বয়স ৩৪। কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁর পসার এত বেড়ে গেল যে, সকাল সন্ধ্যায় তাঁর বাড়ীতে রোগীর ভিড় লেগে থাকতে লাগল। লোকের ধারণা হল, তাঁর কাছে চিকিৎসা করবার সুযোগলাভ মানে সাক্ষাৎ ধন্বন্তরির আশীর্বাদলাভ। তাঁর চিকিৎসা পদ্ধতিরও বৈশিষ্ট্য ছিল। রোগের নাম, সর্বোপরি রোগের লক্ষণ শুনেই স্বভাবসিদ্ধভাবে তিনি বুঝে নিতেন, রোগ কতখানি ছড়িয়েছে বা অবস্থা কেমন; সেই অনুযায়ী সঠিক ওষুধ দিতেন। অতি কঠিন রোগের অসংখ্য রোগীর সফল চিকিৎসা করায় তাঁর নাম আরও ছড়িয়ে পড়ল। অসুখ হলে সকলেই তখন দুর্গা ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করাবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠত। দশ বৎসরের মধ্যে তিনি প্রায় লক্ষ টাকা উপার্জন করলেন।

অর্থ ও খ্যাতি তিনি অর্জন করেছিলেন একান্তভাবে নিজ জ্ঞান ও পরিশ্রমে। ধর্মীয় ব্যাপারে পিতার আচার আচরণ তাঁর মনোমত ছিল না। তাছাড়া দেশবাসীর ধর্মবিশ্বাসকে তিনি মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন; ঝোঁক খ্রীস্ট ধর্মের দিকে; যাঁদের কাছে তিনি শিক্ষা লাভ করেছিলেন, তাঁদের ধর্ম, খ্রীস্ট ধর্মকে তিনি শ্রদ্ধাই করতেন না, খ্রীস্ট ধর্মের জন্য তাঁর উৎসাহেরও অন্ত ছিল না। ফলে, বাবা ও ভাইদের সঙ্গে একত্রে একান্নে আর তার থাকা চলল না। দৃঢ়চেতা পিতাও ক্রমে পুত্রের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ছিলেন। কাজেই পুত্রবিচ্ছেদ তাঁকে কাতর করতে পারল না।

দুর্গাচরণ বয়স্কা মহিলাদের মা এবং কম বয়সীদের বোন বলে সম্বোধন করতেন। রোগাক্রান্তদের প্রতি তাঁর সহানুভূতির সীমা পরিসীমা ছিল না। বাঙলার দূর দূরান্তর অঞ্চল থেকে আগত সকল রোগী ও তাঁদের সঙ্গীদের পথ্য ও আহারের ব্যবস্থা হত দুর্গাচরণের বাড়ীতে—এইভাবে দৈনিক প্রায় পঞ্চাশ জন তাঁর বাড়ীতে আহার করতেন। তাঁর মানবতাবোধও ছিল আদর্শস্থানীয়। দরিদ্রতম ব্যক্তির রোগাক্রান্ত-শিশুর চিকিৎসার জন্য তিনি আনন্দচিত্তে যেতেন—গভীর রাতেও তার ব্যতিক্রম হত না। ধনীদের জাঁকজমক আর এই সমাজ ব্যবস্থার প্রতি তাঁর ঘৃণাও ছিল প্রবাদ তুল্য। ইচ্ছে করেই তিনি সস্তা অতি-সাধারণ পোষাক পরতেন, খেতেনও সুপরিচিত প্রকৃতিদত্ত অতি সাধারণ খাদ্য। পানাভ্যাসও ছিল দুর্গাচরণের—সুরা সম্পর্কে তিনি ছুঁৎমার্গী যেমন ছিলেন না, তেমনি মাতলামিও করতেন না। কখনও কখনও অত্যধিক পান করেও তিনি যে সব প্রেসক্রিপশন লিখতেন তার কোনটিতে কোন বিজ্ঞ চিকিৎসক কখনও কোন ভুল ত্রুটি পান নি। একথা ঠিক যে, অনেক সময় অন্যের ভুলত্রুটির বোঝা তাঁর ঘাড়ে চাপান হত।

শেষ দিকটায় স্বাস্থ্যহীনতার জন্য তিনি চিকিৎসা ব্যবসায় ত্যাগ করেন। তার

ওপর, পুত্র সুরেন্দ্রনাথকে ইংল্যাণ্ডে পাঠিয়েছিলেন আই সি এস পড়বার জন্য ; কিন্তু সংবাদ পেলেন তাঁর পুত্রকে আই সি এস পড়বার অনুমতি দেওয়া হয় নি : এই দুঃখ ও হতাশায় তিনি প্রায় ভেঙে পড়েন। পরের ডাকে সংবাদ পেলেন, কমিশনারগণ সুরেন্দ্রনাথের আবেদন-পত্র পুনর্বিবেচনা করতে স্বীকৃত হয়েছেন। এতে তাঁর মনে আবার আশার আলো জ্বলে উঠল, শরীরেও অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করলেন ; কিন্তু পুত্রের সাফল্য সংবাদ শোনবার অবকাশ বা মহামান্যা মহারাণীর সিভিল সার্ভেণ্ট হয়ে প্রত্যাগত পুত্রকে স্বাগত জানান তাঁর আর হল না ; তার আগেই, ১৮৭০-এর ১৬ ফেব্রুয়ারী তাঁর জ্বর হয়, জ্বর পরিণত হয় নিউমোনিয়ায় এবং এই রোগেই (ঐ বৎসর) ২২ ফেব্রুয়ারী তিনি পরলোকগমন করেন। তখন তাঁর বয়স ৫২। মৃত্যুকালে তিনি পাঁচ পুত্র রেখে যান। এঁদের মধ্যে মধ্যম সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, আই সি এস, স্বদেশবাসীর উন্নতি ও প্রগতির জন্য প্রভূত চেষ্টা করেন। একদিকে তিনি যেমন মহান চরিত্রের অধিকারী, অপর দিকে তেমন তিনি দেশের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক ও বাগ্মীদের অন্যতম।

বাগবাজারের দেওয়ান দুর্গাচরণ মুখার্জির পরিবারবর্গ

পর্যায়ক্রমে রাজশাহীর কালেক্টর মিঃ রৌস, মিণ্ট মাস্টার মিঃ হ্যারিস এবং অফিস এজেণ্ট মিঃ হ্যারিসনের অধীনে দেওয়ানের চাকরী করায় বাবু দুর্গাচরণকে লোকে দেওয়ান বলত। ধনসম্পদ তিনি অর্জন করেছিলেন প্রচুর কিন্তু তার অধিকাংশই তিনি খরচ করেছিলেন গঙ্গা তীরে একটি ঘাট নির্মাণে ; এটি এখনও (১৮৮১) আছে ; লোক মুখে এটির নাম 'দুর্গাচরণ মুখার্জির ঘাট' ; আর ব্যয় করেছিলেন বাগবাজারে তাঁর নিজের বাড়ীতে প্রতিদিন বহু কাঙাল ও অনাথ আতুরকে খাইয়ে—'কাঙালী ভোজনের' নামে যেমন তেমন খাদ্য না দিয়ে, দিতেন ভাল ভাল বাঙালী ভোজ্য। তিনি কলকাতায় কিছু সম্পত্তি ও মেদিনীপুরের বৌরিতে একটি জমিদারী ক্রয় করেন। পরিণত বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি শিবচন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্র মুখার্জি নামে দুই পুত্র রেখে যান। শিবচন্দ্র রেখে যান তাঁর একমাত্র কন্যাকে ; তাঁর দৌহিত্র বাবু কালীপ্রসন্ন গাঙ্গুলী এখনও জীবিত আছেন। শম্ভুচন্দ্র রেখে যান ছয় পুত্র। তাঁদের মধ্যে জগৎচন্দ্র মুখার্জি ছিলেন সচ্চরিত্র, ধর্মপ্রাণ, সরল ও সাদাসিধা। তাঁর পাঁচ পুত্রের মধ্যে ধীরেন্দ্রনাথ ও বৃন্দাবনচন্দ্র জীবিত আছেন। এঁরা অমায়িক ও সজ্জন।

আরপুলির ঘোষ পরিবার

কায়স্থ জাতীয় দৈবকী নন্দন ঘোষ কলকাতায় এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি তাঁর পুত্রগণ : উদয়রাম, লক্ষ্মীনারায়ণ, মনোহর, গোকুলচন্দ্র, ও গোরাচাঁদের জন্য সামান্য কিছু ভূসম্পত্তি রেখে যান। তাঁর পৌত্র ও মনোহরের অন্যতম পুত্র রামশঙ্কর ঘোষ ওরফে শঙ্কর ঘোষ কোন জাহাজের ক্যাপ্টেনের বেনিয়ান হওয়ার সুবাদে প্রচুর ধন উপার্জন করেন, কিন্তু তার অধিকাংশই তিনি ব্যয় করেন দান খয়রাতে। কলকাতার চোরবাগানে তিনি একটি কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এটি এখনও (১৮৮১) বর্তমান ; তাতে একটি ফলকে লেখা আছে :

শঙ্করের হৃদয় মাঝে কালী বিরাজে

দৈবকী নন্দনের কয়েকজন বংশধর এখনও কলকাতায় আছেন, এঁদের মধ্যে বাবু যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ডাঃ তুকড়ি ঘোষ ও বাবু অনন্তরাম ঘোষ ও আরও কয়েকজন বেশ সুশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত।

হোগলকুড়িয়ার গুহ পরিবার

পারিবারিক নথিপত্র বিশ্বাস করলে বলতে হয় যে, যশোহরের প্রতাপাদিত্যের কোন জ্ঞাতি, সম্ভবত, কোন ভাই থেকে এই বংশের উদ্ভব। মানসিংহের বিজয় ও প্রতাপাদিত্যের জীবন ও শোচনীয় ভাগ্য বিপর্যয়ে পরিবারটিরও অবনতি শুরু হয় ; তখন বংশের বিভিন্ন শাখা দেশের নানা স্থানে পূর্বের তুলনায় কিছুটা দারিদ্র্য নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানাও যায় না। বংশলতিকার এসব কাহিনী ছেড়ে দিয়ে, প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় যে, এই গুহ পরিবার কলিকাতা আসে আজ (১৮৮১) থেকে প্রায় ১২৫ বৎসর আগে। তখন এঁদের অবস্থা এখনকার মতো ছিল না। তখন এঁরা ছিলেন গরীব, অন্তত সে সময় তাঁরা জনগণের মধ্যে বিশেষ পরিচিত ছিলেন না। এই বংশের পরিচিতির

গুরু শিবচন্দ্র গুহ থেকে। আদর্শবান, পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী শিবচন্দ্র ব্যবসায় বুদ্ধিতে সুদক্ষ ছিলেন।

ব্রজনাথের পুত্র শিবচন্দ্রের জন্ম হয় ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে। ব্রজনাথের অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না; সে কারণে এবং সে-যুগের রীতির জন্য শিবচন্দ্রের পক্ষে উচ্চ শিক্ষা লাভ করা সম্ভব হয় নি; মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সে তিনি মেসার্স ল্যাকারস্টীল অ্যাণ্ড কোম্পানির অফিসে কেরাণীর চাকরী পান। এই পদে তিনি তিন চার বৎসর মাত্র কাজ করেন; কিন্তু এর মধ্যেই তিনি বুদ্ধিমত্তা সহকারে কাজ করার জন্য মালিকদের স্নেহ ও অনুগ্রহ অর্জনে সক্ষম হন। প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসায় বেড়ে ওঠায় শিবচন্দ্রকে করা হয় কোম্পানির বেনিয়ান; তখন তাঁর বয়স আঠার বৎসর। বয়স কম, বেনিয়ানের কাজের অভিজ্ঞতা আরও কম, শিক্ষাও অল্প, কিন্তু বয়সোচিত উৎসাহ, উদ্দীপনা ও তীক্ষ্ণ বাস্তব বুদ্ধি দ্বারা কাজ করে তিনি সে-সব অভাবের ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছিলেন। তেত্রিশ বৎসর যাবৎ এই কাজ করে তিনি শিখেছিলেনও অনেক; কার্যত এই পেশায় তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিতে পরিণত হন। একান্ন বৎসর বয়স হবার পূর্বেই তিনি দু-তিনটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বেনিয়ান হন। ল্যাকারস্টীল কোম্পানি দেউলিয়া হবার (১৮৪৭) পরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের বেনিয়ান হন। কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের বেনিয়ান হবার ফলে অর্জিত অভিজ্ঞতা ও সুযোগ নিয়ে তিনি নিজেই একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন; এর থেকে তাঁর লাভ বেনিয়ানের রোজগার অপেক্ষা অনেক বেশী হতে থাকে। অনধিককালের মধ্যে তিনি বিশেষ ধনী হয়ে ওঠেন। সৎ ভাবে তিনি যে অর্থ উপার্জন করেছিলেন, দীনদুঃখী আর্তের দুঃখ মোচনে এবং ধর্ম কার্যে তার অধিকাংশই তিনি ব্যয় করেন। তাঁর যা সামাজিক মর্যাদা ছিল, দানধ্যান ছিল তার তুলনায় অনেক বেশী। ধর্মানুষ্ঠানও তিনি করতেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান হিন্দু হিসাবেই। স্বয়ং স্থূলকায় হলেও তিনি তুলাব্রত করে স্বীয় ওজনের সমপরিমাণ চাঁদি ব্রাহ্মণদিগকে দান করেন, আবার নিষ্ঠাবান হিন্দু হিসাবে তিনি বার মাসের তের পার্বণ নিষ্ঠাসহকারে পালন করতেন। দেবদ্বিজে তাঁর ভক্তি ছিল অচলা। তাঁর ভক্তিশ্রদ্ধার মধ্যে লোক দেখান কোন ভাব ছিল না। ভীম ঘোষ লেনে তিনি একটি শিবমন্দির ও নিস্তারিণী (কালী) মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, এঁদের নৈমিত্তিক পূজার্চনা, আনুষঙ্গিক ব্যয় ও মন্দিরদ্বয়ের সংরক্ষণের জন্য তিনি সম্পত্তি উৎসর্গ করেন। ২৪ পরগণা ও খাস কলকাতা শহরে তিনি জনহিতার্থে পুষ্করিণী খনন করান। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী হয়তো খুব উদার বা প্রগতিশীল ছিল না, কিন্তু তাঁর নিষ্ঠা, সততা ও ব্যবসায়ে তীক্ষ্ণ বাস্তব বুদ্ধির প্রশংসা সকলেই করতেন। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে তাঁকে অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট করা হয়েছিল। মৃত্যুকালে তাঁকে গঙ্গাতীরবর্তী তাঁর বাগানবাড়ীতে

নিয়ে যাওয়া হয়; সেখানে ১৮৭৪-এর অগাস্ট মাসে ৮১ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

মৃত্যুকালে তিনি রেখে যান তাঁর দুই পুত্র, বাবু অভয়চরণ গুহ ও বাবু তারাচাঁদ গুহকে। এঁরা দুজনেই পিতার মতো বেনিয়ান এবং সম্ভ্রান্ত। ব্যবসায় ও সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত স্থান ও প্রভাব প্রতিপত্তির জন্য তাঁদের উন্নতি অনেক সহজ হয়েছে। পিতার জীবিতকালে বাবু অভয়চরণ তিন চারটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বেনিয়ান ছিলেন, এখনও তিনি সেইভাবেই কাজ করছেন। পিতার মতো তিনিও একই সঙ্গে বেনিয়ান, ব্যবসায়ী। এঁরই প্রচেষ্টায় পৈতৃক সম্পত্তি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। দুই ভাই নদীয়ায় একটি জমিদারীও ক্রয় করেছেন; এছাড়া কলকাতার ইংরেজ পল্লীতে তাঁদের পঁচিশখানা বড় বড় বাড়ী আছে। অভয়চরণের দুই পুত্র ভবাণীচরণ ও অম্বিকাচরণ, আর তারাচাঁদের একমাত্র পুত্র বরদাপ্রসাদ। অভয়চরণ অনারারী ম্যাজিস্ট্রেটও। তিনি এতই সুপরিচিত যে তাঁর সম্বন্ধে আর অধিক লেখা বাহুল্য হবে।

বাগবাজারের গুহ বা সরকার পরিবার
(পূর্বনিবাস হুগলী জেলার সিংটি)

পরমেশ্বর গুহর পুত্র রামকান্ত ছিলেন হুগলী জেলার সিংটির সুপরিচিত জমিদার। এই পরিবারটি ইতিহাস হিসেবে দাবী করেন যে, রামকান্ত কোন মুসলমান শাসকের অধীনে চাকরী করতেন; চাকরী সূত্রে তিনি সরকার পদবী লাভ করেন, তখন থেকে এই কায়স্থ পরিবারটির পদবী সরকার।

রামকান্ত ব্রাহ্মণদের ব্রহ্মোত্তর ভূমিদান, জনহিতার্থে পুষ্করিণী খনন এবং সিংটিতে সিংহবাহিনী দেবীর মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পাঁচ পুত্র, এঁদের জ্যেষ্ঠ গঙ্গানারায়ণ কলকাতায় চলে এসে বাগবাজারে বাস করতে থাকেন। তাঁর একমাত্র পুত্র শম্ভুচন্দ্র ছিলেন বাগবাজারের গোকুলচন্দ্র মিত্রের এস্টেটের ম্যানেজার। শম্ভুচন্দ্রের পুত্রদ্বয়ের মধ্যে কনিষ্ঠ শ্যামাচরণ ছিলেন সরকারের সাবঅ্যাসিস্ট্যাণ্ট সার্জন। চাকুরীসূত্রে তাঁকে গয়া, কুচবিহার, পুরী, কটক প্রভৃতি স্থানে বদলী হতে হয়।

বহু সদগুণের অধিকারী ডাঃ শ্যামাচরণকে সরকার দ্বিতীয়বারের জন্য কুচবিহারে

বদলী করেন; এই সময় কুচবিহারের মহারাজা তাঁকে অহলকার (অর্থাৎ ম্যাজিস্ট্রেট এবং রেজিস্ট্রার অব ডীডস) নিয়োগ করেন। ২২ বৎসর সরকারী চাকরী করবার পর কুচবিহারে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর একমাত্র পুত্র লোকনাথকে রেখে যান। শ্যামাচরণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভগবতীচরণের দুই পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ যাদবকৃষ্ণ মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারী পাস করে এখন ভাল চিকিৎসা করছেন।

বাগবাজারের গোকুলচন্দ্র মিত্রের পরিবারবর্গ

বালী থেকে এসে কায়স্থ জাতীয় সীতারাম মিত্র কলকাতার বাগবাজারে বাস করতে থাকেন। সম্পত্তি বলতে সামান্য কিছু তিনি তাঁর পুত্র গোকুলচন্দ্রকে দিয়ে যেতে পেরেছিলেন। গোকুলচন্দ্র লবণের ব্যবসায় করে বেশ সমৃদ্ধ হয়ে ওঠেন। ইনিই বিষ্ণুপুরের রাজা দামোদর সিংহের রাজপরিবারের মদনমোহন বিগ্রহ এক লক্ষ টাকায় বন্ধক রাখেন। জনশ্রুতি, এর ফলেই গোকুলচন্দ্রের অবস্থা ভাল হতে থাকে, আর বিষ্ণুপুরের রাজপরিবারের অবস্থা পড়তে থাকে। বিগ্রহটি পাবার পর গোকুলচন্দ্র চিৎপুরে একটি অতি চমৎকার মন্দির ও রাসমণ্ডপ নির্মাণ করেন। বিগ্রহের ব্যয় নির্বাহার্থ ও মন্দিরাদির সংরক্ষণের জন্য তিনি বর্ধমানের একটি জমিদারী উৎসর্গ করেন। বিভিন্ন হিন্দু পর্ব উপলক্ষে যে-সকল দরিদ্র তীর্থযাত্রী গঙ্গাস্নানের জন্য ওখানে আসেন তাঁদের থাকার জন্য মন্দির সংলগ্ন কয়েকটি কক্ষও তিনি নির্মাণ করিয়ে দেন। মদনমোহনের এস্টেটের আয় হতে এই সকল তীর্থ-যাত্রীকে আহার্য দেবারও ব্যবস্থা আছে।

গোকুলচন্দ্রের সম্পত্তি বর্তমানে বহু ভাগ উপভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। এই বংশের বাবু যদুনাথ মিত্র বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও সুপরিচিত ব্যক্তি।

(সিমলা) কাঁসারীপাড়ার হরচন্দ্র বসুর পরিবারবর্গ

কায়স্থ জাতীয় গুরুপ্রসাদ বসু ছিলেন সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ। তাঁর পুত্র হরচন্দ্র ধনী হয়ে ওঠেন স্বীয় চেষ্টা ও কর্মপ্রেরণায়। প্রথমে কোন জাহাজের ক্যাপটেনের

অধীনে বেনিয়ান হিসাবে কাজ আরম্ভ করে, পরে হরচন্দ্র মেসার্স বইড অ্যাণ্ড কোং, বইড বিবী অ্যাণ্ড কোং, রবিনসন, ব্যালফুর অ্যাণ্ড কোং প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের বেনিয়ান হন। ক্রমে তিনি প্রভূত ধনের মালিক হন; কিন্তু অর্জিত অর্থের অধিকাংশই তিনি ব্যয় করতে থাকেন মহাধূমধামের সঙ্গে দুর্গাপূজায় ও কাঙালী ভোজন করিয়ে।

তাঁর পাঁচ পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ মহেন্দ্রনাথ বেনিয়ান ছিলেন মেসার্স রবিনসন ব্যালফুর অ্যাণ্ড কোং ও চার্চলেক কার্টার অ্যাণ্ড কোম্পানীর। তাঁর প্রথম বিবাহ হয় সিমলার বিশিষ্ট ধনী লালচাঁদ মিত্রের কন্যার সঙ্গে; সেই স্ত্রীর মৃত্যুর পর, তিনি বিবাহ করেন কাঁসারীপাড়ার রাজেন্দ্রনাথ সেনের কন্যাকে।

মহেন্দ্রনাথও ধূমধামের সঙ্গে দুর্গাপূজা করতেন। তাঁর শিষ্ট অমায়িক ও সাদাসিদা ভাবের জন্য তিনি কলকাতার ধনী মহলে বিশিষ্টতা অর্জন করেছিলেন।

ঈশানচন্দ্র ব্যানার্জি ও মহেশচন্দ্র ব্যানার্জি

সুশিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে গণ্য প্রবাণ ও শ্রদ্ধেয় এই অধ্যাপকদ্বয় দীর্ঘকাল সাফল্যের সঙ্গে সরকারের শিক্ষা-বিভাগে কাজ করেছেন।

জ্যেষ্ঠ ঈশানচন্দ্রের জন্ম হয় ১৮১৪-তে। তিনি শিক্ষা লাভ করেন হিন্দু কলেজে, ছাত্র জীবন ছিল তাঁর উজ্জ্বল; বহু পুরস্কার যেমন পেয়েছিলেন তেমনি এক শ্রেণী থেকে উচ্চতর শ্রেণীতে তিনি দ্রুত উত্তীর্ণও হয়েছিলেন। মেসার্স পামার অ্যাণ্ড কোম্পানীর পতনের ফলে কতকটা অসময়ে কলেজ ছাড়তে তিনি বাধ্য হলেন; বাধ্য হলেন জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশানের অধীনে চাকরী নিতে; এ প্রতিষ্ঠানে থেকে স্যার চার্লস ট্রেভেলিয়ন তাঁকে কোলদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করতে চাইবাসা পাঠালেন। এখানে গভর্নর জেনারেলের এজেণ্ট ক্যাপটেন উইলকিন্সের সুসমৃদ্ধ গ্রন্থাগারটি ইচ্ছামত ব্যবহার করবার সুযোগ পাওয়ায় তাঁর অসময়ে স্কুল ছাড়ার ক্ষতি পুষিয়ে নেবার এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে অগ্রসর হবার পথ প্রশস্ত হল। এখানকার আদিবাসিদের আচার ব্যবহার জীবনযাত্রা পদ্ধতির ওপর তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণী দিয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন; এটি প্রকাশিত হয় ক্যালকাটা খ্রীস্টিয়ান অবজারভার পত্রিকায়। পাণ্ডিত্যপূর্ণ এই প্রবন্ধ অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট করে; ফলে সদর কোর্টের মিঃ ডি সি স্মিথ কর্তৃক

প্রতিষ্ঠিত জমিদারী স্কুলে তাঁকে বদলী করে আনা হয়। কিছু পরে তাঁকে বদলী করা হয় হাজি মহম্মদ মহসিন কলেজে। অল্প কিছুকালের জন্য তাঁকে বহরমপুর ও কৃষ্ণনগরেও বদলী করা হয়েছিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে হুগলী কলেজেই স্থায়ী অধ্যাপকরূপে রাখা হয়। অধ্যাপকরূপে তাঁর প্রতিভার চরম বিকাশ ঘটে এই কলেজেই। শিক্ষা বিভাগে তিনিই প্রথম ভারতীয় গ্রেডেড অফিসার।

ছোট ভাই মহেশচন্দ্রের শিক্ষা শুরু হয় জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইন্সটিটিউশনে রেভারেণ্ড ডাঃ ডাফের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। পরে তিনি রেভারেণ্ড ম্যাকে ও রেভারেণ্ড এওয়াটের কাছে শিক্ষা লাভ করেন। এই প্রতিষ্ঠান থেকে তিনিই প্রথম (১৮৩৭) পদক লাভ করেন। তিনটি বিভিন্ন বিষয়ে তিনটি প্রবন্ধ লেখার জন্য পান তিনটি রৌপ্য পদক; এছাড়া মিঃ মুইর (পরে স্যার উইলিয়াম মুইর) তাঁকে তাঁর 'হিন্দু ও হিব্রু শাস্ত্র'-এর ওপর লিখিত প্রবন্ধের জন্য একটি পুরস্কার দেন।

মহেশচন্দ্রের কর্মজীবন শুরু হয় মেজর জেনারেল কল্‌ফিল্‌ডের অধীনে কেরাণীর চাকরী নিয়ে। কিছুকাল পরেই স্যার এড্‌ওয়ার্ড রায়ান তাঁকে হুগলী কলেজের অ্যাংলো পার্শিয়ান বিভাগের হেডমাস্টার নিয়োগ করেন। পরবর্তীকালে তাঁকে হিন্দু স্কুলের সেকেণ্ড মাস্টারের পদে নিয়োগ করে কলকাতায় আনা হয়। অধীনস্থ শিক্ষকগণ এই নিয়োগের বিরুদ্ধে এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তাঁদের বিরূপতার কারণ তিনি বহিরাগত এবং দ্বিতীয় কারণ তিনি পাদ্রি মনোনীত শিক্ষক। কিন্তু অল্পকাল পরেই তাঁকে এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। বাঙলার লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্নর স্যার সিসিল বীডন তাঁকে ফোর্থ গ্রেড অফিসারে উন্নীত করেন। জ্যেষ্ঠের মতো এখন তিনি অবসরপ্রাপ্ত ও পেনসন ভোগী। জেলা দাতব্য সমিতির সদস্য মহেশচন্দ্র অত্যন্ত দায়িত্ব সচেতনভাবে স্বীয় কর্তব্য পালন করে চলেছেন।

ডাঃ যদুনাথ মুখার্জি, কলিকাতা

ডাঃ যদুনাথ মুখার্জি ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইসেন্‌সিয়েট অব মেডিসিন অ্যাণ্ড সার্জারী। বাঙলা ভাষায় চিকিৎসা শাস্ত্রের ওপর বেশ কয়েকখানি বই লিখে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। ১৮৩৯-এর সেপ্টেম্বরে নদীয়া জেলার শান্তিপুরে মাতুলালয়ে তাঁর জন্ম। অবশ্য, এখানে তাঁর পূর্বপুরুষদেরও

বাস ছিল। শান্তিপুর থেকে রাণাঘাট ও বনগাঁর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত গরীবপুরে বাসস্থান স্থানান্তরিত করেন তাঁর সাধুপ্রকৃতির প্রপিতামহ।

যদুনাথের বাল্যশিক্ষা শুরু হয় গ্রাম্য পাঠশালায়। বাল্য অবস্থা হতেই তিনি পরিচ্ছন্নতাবোধ ও অধ্যয়নপ্রিয়তার জন্য লক্ষণীয় হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর ন' বছর বয়সে তাঁকে মূলনাথের ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। বিদ্যালয়টি পরিচালিত হত মিশনারী আদর্শে। মিঃ জেমস ফরলঙ নামক এক নীলকর এর সম্পূর্ণ ব্যয় বহন করতেন; নীলকরদের ব্যতিক্রম এই জেমস ফরলঙ ছিলেন সুশিক্ষিত ও মানব দরদী। ১৮৫২তে তাঁকে ভর্তি করা হয় কৃষ্ণনগর কলেজে। এখানে তৃতীয় বর্ষ পর্যন্ত পড়ে তিনি কলেজ ছাড়েন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষকতার একটি চাকরী পেয়ে যান। সারাটা কলেজ জীবন তিনি কঠিন ডিস্‌পেপসিয়া রোগে ভুগতে থাকেন। এর থেকেই তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মজীবন নির্ধারিত হয়। তিনি স্থির করেন স্বয়ং ডাক্তার হয়ে তিনি নিজের চিকিৎসা করবেন। বাল্যকাল থেকেই অত্যন্ত জেদী যদুনাথ ১৮৬০-এর জুন মাসে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন এবং স্নাতক হন ১৮৬৫তে। তাঁর ডাক্তারী শিক্ষার চতুর্থ বর্ষে, ধাত্রীর অকর্মণ্যতা ও অজ্ঞতার জন্য তাঁর প্রথম সন্তানের মৃত্যু হয়। এতে তিনি মনে অত্যন্ত আঘাত পান এবং স্থির করেন দেশবাসিগণ এমন দুর্ভাগ্য যাতে এড়াতে পারেন তার জন্য ধাত্রীদের শিক্ষার উপযোগী একখানি বই লিখবেন। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি 'ধাত্রীশিক্ষা' নামক একখানি বই লেখেন। প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে বইখানি এতই জনপ্রিয়তা লাভ করে যে, বাঙলার প্রায় প্রতিটি শিক্ষিত পরিবারেই বইখানি স্থানলাভ করে। এরপর তিনি আরও কয়েকখানি বই লেখেন; তাদের প্রতিটি প্রথমখানির মতো প্রয়োজনীয় ও জনপ্রিয়। চিকিৎসা ব্যবসায়েও তিনি সাফল্য লাভ করেছেন; কিন্তু চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ওপর বই লিখে দেশবাসীর বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার উন্নয়ন ও মঙ্গলসাধন করার জন্য তিনি অধিক সময় ব্যয় করেন। তাঁর লিখিত প্রধান প্রধান পুস্তকের তালিকা :

১. ধাত্রীশিক্ষা
২. শরীর পালন
৩. উদ্ভিদ বিচার (উদ্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ক সচিত্র পুস্তক)
৪. চিকিৎসা-বিজ্ঞান (চিকিৎসকদের জন্য বাংলায় লিখিত পুস্তক)
৫. রোগ বিচার (রোগের নিদান ও চিকিৎসা সম্পর্কিত)
৬. এশিয়াটিক কলেরার চিকিৎসা সম্পর্কিত একখানি পুস্তক
৭. ম্যালেরিয়া জ্বরে কুইনিনের প্রয়োগ সম্পর্কিত একখানি পুস্তক
৮. শিশু চিকিৎসার উপর একখানি পুস্তক
৯. চিকিৎসা কল্পক্রম, ১ম খণ্ড (চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিশ্বকোষ)

১০. সরল জ্বর চিকিৎসা, ১ম খণ্ড (ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য জ্বরের চিকিৎসা বিষয়ক)

১১. শরীর পালন পুস্তকখানির ইংরেজী অনুবাদ।

নিজের পেশাগত ব্যবসায়ের দিক উপেক্ষা করে তিনি এদেশীয় অল্পশিক্ষিত চিকিৎসকদের পেশাগতভাবে তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অংশভাগ করেছেন। এছাড়া ইংরেজী পড়তে অক্ষম চিকিৎসকদের জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের ওপর লেখা ইংরেজী পুস্তক থেকে আহরিত জ্ঞানও তিনি বিতরণ করেছেন। দেশবাসীর মঙ্গলকামী এমন মানুষ আমাদের পরম শ্রদ্ধার পাত্র।

মাননীয় দ্বারকানাথ মিত্র, ভবানীপুর

হুগলী জেলার আগুন্‌সি গ্রামে ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে মাননীয় দ্বারকানাথ মিত্র জন্মগ্রহণ করেন। জাতিতে তিনি ছিলেন কায়স্থ। "তাঁর পিতা ছিলেন হুগলী কোর্টের মোক্তার ; অবস্থা তাঁর বিশেষ ভাল না হলেও, পুত্রকে তিনি উদার-নৈতিক ও ভালভাবে শিক্ষা লাভের সুযোগ করে দেন। দ্বারকানাথ শিক্ষালাভ করেন হুগলী কলেজে—প্রথম থেকেই এখানে তাঁর বিশিষ্টতা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। সহপাঠীদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাগ্রগণ্য। পরবর্তীকালে তাঁকে হিন্দু কলেজে ভর্তি করা হয়। এই সময়কার শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, পাঠাভ্যাস ও রচনা সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি ইংরাজী ভাষায় তাঁর বিশেষ অধিকারের পরিচয় দিয়েছিলেন। লর্ড বেকনের ওপর প্রতিযোগিতামূলক রচনা লিখে তিনি প্রথম স্থান লাভ করেন ; মনে হয়, ১৮৫২তে এই প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। রচনাটি এডুকেশন রিপোর্টে ছাপানো হয়েছিল। বিখ্যাত সাহিত্য সমালোচক ডি এল আর সহ অন্যান্য বহু সাহিত্য সমালোচক রচনাটির ভূয়সী প্রশংসা করেন। ১৮৫৫তে তিনি কলকাতা পুলিস কোর্টের জুনিয়র ম্যাজিস্ট্রেট বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্রের দোভাষীর চাকরী গ্রহণ করেন। অল্পকালের মধ্যে প্লিডারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি সদর কোর্টের উকিল হন। এখানে প্রবীণ উকিলদের কাছে তিনি কোন সহানুভূতি না পেলেও তাঁকে সাদরে কাছে টেনে নিলেন, তদানীন্তন জুনিয়র সরকারী উকিল বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত। পরবর্তীকালে জজ হিসাবে তিনি

এঁরই স্বলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। উচ্চ গুণের অধিকারী দ্বারকানাথকে উপেক্ষা অবহেলার যন্ত্রণা বেশী দিন সহ্য করতে হয় নি। হাইকোর্ট স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সৌভাগ্যসূর্যও উদিত হতে থাকে। এখানে তিনি তাঁর বিদ্যাবত্তা ও গুণের মর্যাদা দিতে পারেন এমন সব ব্যক্তির সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য লাভ করলেন। স্যার বার্নেস্ই সর্বপ্রথম তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ও দক্ষতার স্বীকৃতি দেন। মিত্রের আইন ও আইনের মূলনীতির ওপর দখল ভারতীয় আইনকানুন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান, এবং আইন ব্যবসায়ী হিসাবে তাঁর দক্ষতার পরিচয় পেয়ে প্রভাবশালী বার্নেস এতই চমৎকৃত হন যে, তিনি প্রথমাবধিই মিত্রকে তাঁর সমর্থন জানান; অল্পকালের মধ্যে অন্যান্য জজ, ব্যারিস্টার উকিলগণ ও আদালতের কর্মচারীবর্গ তাঁর গুরুত্ব ও চারিত্রিক দৃঢ়তা উপলব্ধি করেন। আইনজ্ঞ হিসাবে তাঁর দক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত, কিন্তু খ্যাতিলাভ করেছিলেন তিনি মূলত তাঁর সততা ও অনমনীয় স্বাধীনচিত্ততার জন্য। অনৈতিক ব্যবসায়ের সঙ্গে সমার্থক ভেবে এতদিন শিক্ষিত এদেশবাসী আইন ব্যবসায়কে পেশা হিসাবে গ্রহণ করতে চাইতেন না। পুরাতন আইন ব্যবসায়ীদের মধ্যে বহু সম্মানীয় ব্যক্তি যে ছিলেন না তা নয়, তাঁদের অনেকে দেশের গৌরবও, কিন্তু তবুও সাধারণভাবে জনগণ আইন ব্যবসায় ও আইন ব্যবসায়ীদের খুব একটা শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন না; সে অবশ্য অধিকাংশ ব্যবহারজীবীর আচার আচরণের জন্যই। সেটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল পুরাতন সদর কোর্টের নিম্নমানের পরিবেশের জন্য, না—ইংরাজী শিক্ষা না থাকায় পেশাগত মর্যাদাবোধ ও আত্মসম্মানবোধের অভাবের জন্য জনগণের মনে এমন একটা ধারণার উদ্ভব হয়েছিল, তা নিরূপণ করতে যাওয়া বৃথা। একথা বললেই যথেষ্ট হবে যে, উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ এই পেশা গ্রহণ করতে থাকায়, এবং এঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন বাবু দ্বারকানাথ মিত্র, দেশীয় আইনজীবীদের সম্পর্কে জনগণের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হতে থাকে। ফলে, নব্য শিক্ষিতদের মধ্যে এখন স্বাধীন বৃত্তি হিসাবে আইন ব্যবসায়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। তাঁদের নৈতিক প্রভাব আবার বহু বিস্তৃত হয়েছে। দেশে এখন এমন জেলা প্রায় নেই বললেই চলে যেখান-কার আদালতে অন্তত পক্ষে জনা ছয় শিক্ষিত ব্যবহারজীবী না আছেন। এই পরিবর্তনটি সাধিত হয়েছে বাবু দ্বারকানাথ মিত্র এবং সমগোত্রীয় ব্যক্তিদের দ্বারা। ব্যবহারজীবী হিসাবে তিনি বহু সদ্গুণের অধিকারী ছিলেন। ধৈর্যশীল এই মানুষটি কোন মামলা হাতে নেবার আগে তার সব দিক খুঁটিয়ে বুঝে নিতেন। তীক্ষ্ণধী ছিলেন বলে, অতি দ্রুত তিনি তাঁর মামলার গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় প্রশ্নগুলি বুঝে নিতে পারতেন; মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর ভাষণ হত বুদ্ধিদীপ্ত ও পরিচ্ছন্ন, তাই প্রায়ই দেখা যেত আদালত তাঁর অভিমত গ্রাহ্য করছেন। স্বাভাবিক বাগ্মিতা থাকায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি বিচারকদের মনের ওপর

কার্যকরী আবেদন রাখতে সক্ষম হতেন। প্রতিপক্ষ যত দক্ষতার সঙ্গেই তাঁদের বক্তব্য পেশ করুন না, নির্ভীক দ্বারকানাথ আপন কর্তব্য থেকে কখনও বিচ্যুত না হয়ে তাঁর মামলার বিষয়গুলি পরিচ্ছন্নভাবে পেশ করে যেতেন ; প্রখ্যাত ব্যারিস্টার-দের বিরুদ্ধেও তিনি পরম স্বচ্ছন্দে সওয়াল করে যেতেন। এজন্য তাঁরা তাঁকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখতেন। সর্বোপরি তিনি ছিলেন পুরোপুরি সৎ এবং স্বাধীনচিত্ত ; কোন অবস্থাতেই তিনি প্রতিপক্ষের ভুল ত্রুটি বা দুর্বলতার সুযোগ যেমন নিতেন না, তেমনি স্বীয় মক্কেলের মামলার বিষয়বস্তু সুপরিস্ফুট করবার জন্য, জজদের পক্ষে যত বিরক্তিকরই হোক তিনি তাঁর বক্তব্য নিখুঁতভাবে, নির্ভীকভাবে এবং স্বাধীন-চিত্ততার সঙ্গে পেশ করে যেতেন। চাইলে, তিনি তাঁর ব্যবহারজীবী জীবনের বহু গৌরবজনক অধ্যায়ের কাহিনী বলতে পারতেন। তবে, ১৮৬৫-র রাজস্ব মামলায় তিনি একটানা সাত দিন ধরে হাইকোর্টের সকল জজের সামনে যে ভাবে সাওয়াল করেছিলেন— এবং সে সওয়ালে যে-ভাবে রাজনৈতিক অর্থনীতি, ল্যাণ্ডলর্ড ও টেন্যান্ট সম্পর্কীয় ইংলিশ ল', ভারতীয় রাজস্ব বিধি এবং দেশীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান একের পর এক বিবৃত করতে থাকেন, তাতে তাঁর কৃতিত্ব বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়। সে মামলায় তিনি সওয়াল শুরু করতেন বেলা এগারটায় আর শেষ করতেন সন্ধ্যা ছ'টায়—শারীরিকভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়লেও, বিষয়বস্তু ও যুক্তি উত্থাপনে তাঁর ক্লান্তি ছিল না। আদালতের প্রবীণ আইনজ্ঞগণ এ বিষয়ে তাঁর মতের বিরোধী ছিলেন, তাছাড়া খোদ প্রধান বিচারকের মুহুর্মুহু প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁকে, কিন্তু যে কৌশল ও দক্ষতার সঙ্গে সকল বিরোধিতা ও প্রশ্নের তিনি সম্মুখীন হয়েছিলেন, সে হয়ে উঠেছিল পরম আনন্দদায়ক। অল্পকালের জন্য তিনি অস্থায়ী জুনিয়র গভর্নমেন্ট প্লিডারের স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। এর পর তাঁর বন্ধু ও সহ ব্যবহারজীবী, হাইকোর্ট বার ও বেঞ্চের অলঙ্কারতুল্য, মাননীয় শম্ভুনাথ পণ্ডিত মহাশয়ের পরলোকগমনে, দ্বারকানাথ (হাইকোর্টের জজরূপে) ১৮৬৭-র জুন মাসে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন এবং উচ্চ ও সম্মানজনক পদে সাত বৎসর অধিষ্ঠিত থাকেন। এই নিয়োগের ফলে আর্থিক দিক থেকে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হন, কারণ, ব্যবহারজীবী হিসাবে তখন তাঁর উপার্জন ছিল, শোনা যায়, বার্ষিক ৫০,০০০ টাকা। কিন্তু তিনি দ্বিতীয়বার জজপদে নিযুক্ত হওয়ায়, উচ্চতম পদসমূহে এদেশীয়দের নিযুক্ত হবার দাবী ও যোগ্যতা প্রমাণিত হয়। মাননীয় শম্ভুনাথ পণ্ডিতের দক্ষতা ও যোগ্যতা সম্পর্কে হাইকোর্টের অন্যান্য বিচারকবর্গ, সরকার ও জনগণ সর্বৈব-ভাবে সহমত ছিলেন ; এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, পার্লামেণ্ট এদেশবাসীদের দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয়ের বিচারকের পদে নিয়োগের অনুমতি দিয়ে বাস্তব উপলব্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন, আর মাননীয় দ্বারকানাথ মিত্র তাঁর দক্ষতাদ্বারা

ভারতীয়দের চারিত্রিক পরিচয়কে উজ্জলতর করেন। ব্যবহারজীবী থেকে বিচারক পদে উন্নীত হবার পর, তাঁর দায়িত্ব অনেক বেড়ে যায়, কিন্তু দায়িত্ব যতই বাড়ুক, প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি তাঁর সুবিবেচনা, সম্পূর্ণতা ও একান্ত দক্ষতার সঙ্গে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করেন। ধীর, স্থির, বিজ্ঞ এবং দৃঢ়চেতা দ্বারকানাথ হয়েছিলেন আদর্শ বিচারক; আদালতের অন্যান্য বিচারক ও ব্যবহারজীবিগণ তাঁকে সমভাবে সম্মান করতেন। স্যার বারনেস্ তো তাঁর প্রতি প্রায় অপত্য স্নেহ পোষণ করতেন। তখনও তিনি প্রৌঢ়ত্বের সীমানায় পৌছননি, বয়স মাত্র ৪০ বৎসর—কিন্তু যুবাবৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন; তার কারণ, তাঁর দক্ষতা ও স্বাধীনচিত্ততা। 'উইকলি রিপোর্টারে' গত সাত বৎসরে তাঁর প্রদত্ত বহু মূল্যবান ও স্মরণীয় রায় সংগৃহীত হয়ে আছে; বহু ক্ষেত্রে তিনি তাঁর সহবিচারকদের থেকে আলাদা মত পোষণ করতেন; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর দেওয়া রায়-ই প্রিভি কাউনসিল অনুমোদন করতেন। 'দি গ্রেট আনচেস্‌টিটি কেসের' ফুল বেঞ্চ বিচারে বিচারপতি দ্বারকানাথ প্রায় সম্পূর্ণতই তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলি ব্যাপৃত ছিলেন—এই মামলায় তাঁর প্রদত্ত রায় সারা দেশকে বিস্ময়ে অভিভূতও করেছিল, দেশবাসী তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিল। দেশের উচ্চতম শ্রেণীর পদের অধিকারী হলেও, তিনি অহঙ্কার ও গর্বের অনেক উর্ধ্বে ছিলেন—তাঁর স্বভাব ছিল শিশুসুলভ সরলতায় পূর্ণ। মানুষ ছিলেন তিনি একান্তই সাদাসিধে। জনগণের কোন আন্দোলনে তিনি কোন অংশ নিতে পারেননি, এটা দুঃখের, অবশ্য শেষ জীবনে তিনি যে উচ্চপদে আসীন ছিলেন, তার জন্য তাঁর কোন আন্দোলনে অংশ গ্রহণ সম্ভবও ছিল না, তবে প্রতিটি আন্দোলনের প্রতি তিনি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন, এ-সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তাও করতেন। কোঁতের দর্শনে তিনি আস্থাবান ছিলেন; স্যার পীকক্ বার্ণেসের বাড়ীতে একদিন তিনি মানবধর্ম সম্বন্ধে ভোজনান্তিক চমৎকার একটি ভাষণ দিয়েছিলেন। ফরাসী ভাষা জানা থাকায় ফরাসী সাহিত্য মূলভাষায় পাঠ করে তিনি যথেষ্ট আনন্দ পেতেন। ফ্রান্স ও প্রাসিয়ার যুদ্ধ সম্পর্কে তিনি গভীরভাবে আগ্রহান্বিত ছিলেন, তাঁর সহানুভূতি ছিল বীর ও কল্পনাপ্রবণ ফরাসী জাতির প্রতি। যে-কোন প্রকারের নির্যাতন নিপীড়নকে তিনি ঘৃণা করতেন, তাই বিচারক হিসাবে তাঁর সহানুভূতি থাকত দুর্বল ও দরিদ্রদের প্রতি। আইন ও শৃঙ্খলার প্রবক্তা রূপে শক্তিমদমত্তদের বদখেয়াল ও দুর্নীতির মুখোস তিনি নির্ভয়ে খুলে দিতেন। কুখ্যাত 'মালদহ কেস'-এ ব্যক্তিগত সরকার (Personal Government)-এর কুকীর্তিসমূহ তিনিই সর্বপ্রথম অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে ফাঁস করে দেন, তাঁর দৃষ্টান্ত সমান সাহস নিয়ে অনুসরণ করেন বিচারপতি কেম্প ও বিচারপতি ফিয়ার (Phear); ফলে দ্বারকানাথের নিকট প্রেরিত

গভর্নর জেনারেলের গোপনীয় পত্র মারফৎ বেলভেডিয়ারের 'বজ্র' তাঁর ওপর নেমে আসে ; পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে, সকলের ধারণা হয়, তেমন সুযোগ পেলে স্যার জর্জ ক্যাম্পবেল আর কোন ভারতীয়কে হাইকোর্টের বিচারপতি পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করবেন না। সে কাহিনী থাক। এমনিতে গভীর অনুভূতিসম্পন্ন মানুষ দ্বারকানাথ ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনার সময় কড়া ভাষায় ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশে দ্বিধা করতেন না। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন জনগণের মানুষ, তিনি তাদের প্রতি অনুষ্ঠিত অন্যায়, অত্যাচারের সুবিচার করতেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি তাদের আন্দোলনের সামনে আসতে পারেন নি। ব্যাপকভাবে তিনি অধ্যয়ন করতেন, কিন্তু লেখার ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন না। একমাত্র বিশ্লেষণাত্মক জ্যামিতির ওপর তিনি মুখার্জীর ম্যাগাজিনে কয়েকটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তিনি ছিলেন বিজ্ঞানের ভক্ত, সময় তাঁর কমই ছিল, কিন্তু সেই সময়টুকুরও অনেকখানি তিনি ব্যয় করতেন বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকাদি পাঠ করে। কিছুদিন তিনি সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে ফাদার লা-ফঁর বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতা নিয়মিত শুনতে যেতেন। ডাঃ সরকারের সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের উন্নতিকল্পে চার হাজার টাকা দান করে তিনি তাঁর বিজ্ঞান প্রীতির পরিচয় দিয়েছিলেন। দানশীলতা ছিল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ; প্রকৃত অভাবী কোন মানুষ তাঁর সাহায্যপ্রার্থী হয়ে বিমুখ প্রায় কখনও হতেন না। অত উচ্চপদে আসীন হলেও, বিদ্যালয়ের সহপাঠীদের সঙ্গে তিনি সেই পূর্বের সারল্য নিয়েই মেলামেশা করতেন। তিনি ছিলেন খোলামেলা মনের মানুষ, লোক-দেখানো কোন কিছুর তিনি ধার ধারতেন না ; অবশ্য অপরিচিত ব্যক্তিদের নিকট তিনি ছিলেন গম্ভীর ও স্বল্পভাষী ; তবুও তাঁর পরিচিত মহলে তিনি ছিলেন সর্বজনপ্রিয়।" (দি হিন্দু পেট্রিয়ট, ২ মার্চ, ১৮৭৪)

গলার ক্যান্সারে দ্বারকানাথ বেশ কয়েকমাস ভুগেছিলেন ; এই সময় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন ভাইসরয়ের পক্ষ থেকে তাঁর দেহরক্ষী, হাইকোর্টের বিচারকগণ, অসংখ্য বন্ধুবান্ধব ও গুণমুগ্ধ ব্যক্তি। অসুস্থ অবস্থায় তাঁর স্বগ্রাম দেখবার বাসনা হয় ; স্থান পরিবর্তনে স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে পারে ভেবে, চিকিৎসকগণও এতে সম্মতি জানান। কিন্তু রোগের আর উপশম হল না, জন্মস্থানেই তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন ১৮৭৪-এর ২ মার্চ। মৃত্যুকালে তিনি রেখে যান বৃদ্ধা মাতা, তরুণী স্ত্রী ও তিনটি নাবালক সন্তান। তাঁর মৃত্যুতে সমগ্র জাতির ওপর শোকের ছায়া নেমে আসে। [প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, দ্বারকানাথ ছিলেন অত্যন্ত মাতৃভক্ত। দ্বারকানাথের প্রথমা ও দ্বিতীয়া স্ত্রীর অকালে মৃত্যু হওয়ায় তৃতীয়বারে তিনি বিবাহ করেন বর্ধমান জেলার বেনাপুরের জমিদার প্রাণগোবিন্দ রায় চৌধুরীর জ্যেষ্ঠা কন্যাকে]। তাঁর মৃত্যুতে হাইকোর্টের

বিচারকগণ এক সভায় মিলিত হয়ে পরলোকগত সহকর্মীর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসার জন্য সেদিনকার মতো হাইকোর্টের ছুটি ঘোষণা করেন। উক্ত শোক-সভায় বিচারপতি লুই জ্যাক্সান্ আবেগপূর্ণ দীর্ঘ ভাষণে দ্বারকানাথের অসাধারণ গুণাবলী ও অমূল্য সেবার উল্লেখ করেন। অ্যাডভোকেট জেনারেল অনুপস্থিত থাকায়, স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল মিঃ কেনেডি ইংরাজ ব্যবহারজীবীদের পক্ষ থেকে সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন :

"মিঃ জাস্টিস মিত্রকে ব্যবহারজীবীমহল, সাধারণভাবে, যে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতেন, তাঁর খ্যাতি সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও কম নয়—তার থেকে বলতে পারি, তাঁর পরলোকগমনে বার ও বেঞ্চের যে ক্ষতি হল, সে ক্ষতি, আমার ধারণা, কখনও পুরণ হবার নয়। লার্নেড্ জজ তাঁর ভাষণে যে কথাগুলি বললেন সে সবই ব্যবহারজীবী মহলের প্রত্যেকের মনের কথার প্রতিধ্বনি। তাঁর প্রজ্ঞার জন্য যে-ভাবে অনুপ্রাণিত বোধ করতাম, তেমন অনুপ্রেরণা অন্য কোন বিচারকের কাছে থেকে আমরা পাইনি, তাঁর মতো অন্য কোন বিচারপতি আমাদের শ্রদ্ধা অর্জনে সক্ষম হন নি; এমন বিচারপতি খুবই কম, যিনি তাঁর মতো সঠিক ও ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গীযুক্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে মামলার নিষ্পত্তি করতে পারেন। অবশ্য, এই সূত্রে একটা বিষয় স্বীকার করতে হবে যে, তিনি এই উপমহাদেশবাসীদের ভাষা জানতেন, তাঁদের রীতিনীতির সঙ্গে চিরপরিচিত ছিলেন, এই সুবিধা অপরাপর বিচারপতির ছিল না। এ ক্ষতি শুধু বার, বা মামলাকারীরাই অনুভব করবেন না, অনুভব করবে সমগ্র জাতি—এ ক্ষতি অপূরণীয়।"

সিনিয়র গভর্নমেণ্ট প্লীডার এতই শোকাভিভূত হয়ে পড়েন যে, তাঁর পক্ষে কিছু বলা সম্ভব হয় নি; তাঁর পক্ষ থেকে বলেন অ্যাপেলেট কোর্ট বারের নেস্টর মিঃ আর টি অ্যানেল। তিনি তাঁর দীর্ঘ ভাষণে দ্বারকানাথের দুর্লভ গুণাবলী ও বিদ্যাবত্তার উল্লেখের পর এই বলে উপসংহার টানেন :

"সামান্য যে-কটি কথা আমি বললাম তার সমাপ্তি টানতে এ কথা বলা একান্ত প্রয়োজন, এবং আমার ধারণা, তিনি স্বয়ং তাঁর জীবনের প্রকৃত পরিচয় হিসাবে একথা মেনে নিতেন: স্বভাবতই তিনি দয়াপ্রবণ, স্নেহপরায়ণ ও সমভাবে ইওরোপীয় ও ভারতীয়দের প্রতি বন্ধুবৎসল ছিলেন কিন্তু একথাও অনস্বীকার্য যে, তাঁর স্বদেশবাসীর প্রতিই তাঁর ভালবাসা ছিল প্রগাঢ়তর। তাঁর স্মৃতিস্তম্ভে এই উক্তি খোদিত করা যায় (সম্ভবত তিনি স্বয়ং এটি অনুমোদন করতেন):

আমার দেশের মনে এই কথা লেখা থাক,
ইনি সেবা করেছিলেন স্বদেশের
এবং ভালবেসেছিলেন স্বদেশবাসীকে।"

দ্বারকানাথের মৃত্যুতে বড়লাট বাহাদুরও গভীর শোক-জ্ঞাপক এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিলেন।

দ্বারকানাথ হিন্দু ফ্যামিলি অ্যান্যুইটি ফাণ্ডের অন্যতম অছি ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ছিলেন। বস্তুত তিনি ছিলেন শিক্ষা বিস্তারে পরমোৎসাহী। ভবানীপুরের বাড়ীতে তিনি কয়েকজন ছাত্রকে রেখে তাদের খাদ্য বস্ত্র পাঠ্যপুস্তক ও বিদ্যালয়ের বেতন দিতেন। স্বগ্রামে তিনি প্রতি বৎসর দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান করতেন। সে সময় তিনি বেশ কিছু সংখ্যক দরিদ্রনারায়ণের সেবাও করতেন।

তাঁর সন্তানগণ এখন ভবানীপুরের বাড়ীতে বাস করছেন।

হরিশচন্দ্র মুখার্জি
(সম্পাদক, হিন্দু পেট্রিয়ট)

কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান বাবু হরিশচন্দ্র মুখার্জির পিতা সাতটি বিবাহ করেছিলেন; তাঁর কনিষ্ঠতমা পত্নীর মাতামহের গৃহে হরিশচন্দ্রের জন্ম হয় ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে। কলকাতা থেকে প্রায় এক মাইল দূরে অবস্থিত ভবানীপুর গ্রামের বর্ধিষ্ণু ও সম্মানিত অধিবাসী ছিলেন হরিশচন্দ্রের মাতামহ। সে যুগের কুপ্রথা অনুযায়ী কুলীন ব্রাহ্মণ ইচ্ছে হলেই বিয়ে করতেন, অনেক সময় এরূপ পাত্রের অনিচ্ছা সত্ত্বেও অন্য কোন কুলীন ব্রাহ্মণকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করতে প্রায় বাধ্য করা হত, আর এইভাবে বিবাহিতা স্ত্রীদের দুঃখ দুর্দশার অন্ত থাকত না, এঁদের কেউ কেউ হয়তো হীন জীবনেও নেমে যেতে বাধ্য হতেন। সেই রীতি অনুযায়ী হরিশচন্দ্রের মাকেও পিতৃগৃহে থেকে সন্তান পালন করতে হত। শৈশবে হরিশচন্দ্র বাড়ীতেই তাঁর দাদার কাছে ইংরেজী শেখেন; সাত বৎসর বয়সে তাঁকে ভবানীপুরের একটি ইংরেজী বিদ্যালয়ে, দরিদ্র বলে বিনা বেতনের ছাত্র হিসাবে, ভর্তি করে নেওয়া হয়। তাঁর বয়সের বিবেচনায় তাঁর মেধা ও স্মৃতিশক্তি দেখে বিদ্যালয়ের ডিরেক্টরবর্গ এতই বিস্মিত হন যে, তাঁর মাত্র তের বৎসর বয়সে তাঁকে হিন্দু কলেজের উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্রদের সঙ্গে একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসতে প্রায় বাধ্য করা হয়; সময় অত্যন্ত অল্প থাকায় সফল তিনি হতে পারেন নি, কিন্তু উপযুক্ত প্রস্তুতির সময় পেলে তাঁর মতো মেধাবী ছাত্র যে সাফল্য লাভ করতেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সে যাই হোক পরিস্থিতির চাপে তাঁকে

বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার পাট এখানেই শেষ করে জীবিকার সন্ধানে বের হতে হল। মসার্স টুল্লাহ্ অ্যাণ্ড কোম্পানীর নীলাম ঘরে মাসিক আট টাকা মাইনের একটা চাকরীও তাঁর অল্প দিনের মধ্যে জুটে গেল।

হীন চাকরী, হেয় কাজ, কিন্তু চাকরী পেয়ে তিনি যেন হাতে স্বর্গ পেলেন; কারণ, তাঁদের সাংসারিক অবস্থা এমন যে, ঠিকমত গ্রাসাচ্ছাদনও চলে না। একদিনের কথা বলতে গিয়ে তিনি নিজেই বলেছেন, এক জমিদারের মোক্তার তাঁকে দুটি টাকা দিয়ে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বাঙলা দলিল ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়ে না নিলে, সেদিন তাঁর নিরুপায় উপবাসেই কাটত। পরবর্তীকালে তাঁর বেতন বৃদ্ধি পেয়ে হল দশ টাকা। টুল্লাহ্ কোম্পানীতে বেশ কয়েক বৎসর তাঁর কেটে গেল। ১৮৫১তে মিলিটারি (অ্যাকাউণ্টস) ডিপার্টমেণ্টে একটি পদ খালি হল: মাসিক বেতন ২৫ টাকা, কিন্তু ভবিষ্যতে উন্নতির আশা থাকায় বহু ব্যক্তি ঐ পদের জন্য আবেদন করেন, হরিশচন্দ্রও আবেদন করেন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাদ্বারা পদটি পূরণের ব্যবস্থা হল। পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করে হরিশচন্দ্রই এই পদে নিযুক্ত হলেন। অতি বাল্যকাল থেকেই তাঁর অধ্যয়ন স্পৃহা ছিল প্রবল; বিদ্যালয়ে তিনিই ছিলেন সর্বাপেক্ষা অধিক অধ্যয়নশীল বালক। জীবনে যে ক্ষেত্রেই তিনি অধিষ্ঠিত থাকুন, অধ্যয়নশীলতা ছিল তাঁর আজীবনের অভ্যাস। দৈন্যজনিত বিপত্তির জন্য বাধা অবশ্যই মাঝে মাঝে সৃষ্টি হয়েছে, এ অভ্যাস কিন্তু তিনি কখনও ছাড়েন নি। পরিস্থিতি এখন অনেকটা অনুকূল হল। বেতন পেতে লাগলেন এখন দ্বিগুণেরও বেশী। ওদিকে, নতুন চাকরী ক্ষেত্রে তাঁর কর্তব্যানুরাগ, কাজে নিষ্ঠা ও উন্নতমানের কাজের জন্য উচ্চতর সকল আধিকারিকই তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে উঠলেন। হরিশের তৃপ্তিহীন অধ্যয়নশীলতার পরিচয় পেয়ে তাঁরা তাঁকে নিজ নিজ পুস্তক ও জ্ঞান দ্বারা সাহায্য করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর মেধা, অর্জিত জ্ঞান ও জানার আগ্রহ এত বিপুল, যে তাঁদের দেওয়া সামান্য কয়েক খণ্ড পুস্তকে তার তৃপ্তি সম্ভব ছিল না। কাজেই তিনি স্থির করলেন যে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরীর সদস্য হবেন। মাসিক চাঁদা ২ টাকা; মাইনে কম; ঐ অল্প বেতন থেকেই দুটি টাকা তিনি এই উদ্দেশ্যে আলাদা করে রাখতে লাগলেন। অফিসের ছুটির পর মেটকাফ হলে গিয়ে তিনি গভীর অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়নে মগ্ন হতেন; তিনি ইতিহাস, দর্শন ও রাজনীতি বিষয়ক বই অধ্যয়ন করে বিশেষ আনন্দ পেতেন।

অফিসারদের মধ্যে কর্নেল গোল্ডিক ও কর্নেল শ্যাপেনেজ তাঁর বুদ্ধিমত্তা প্রথমাবধিই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সানন্দেই তাঁরা তাঁকে উচ্চতর ও অধিকতর সম্মানজনক পদে উন্নীত করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁদের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে তাঁর মাসিক মাইনে ২৫ টাকা থেকে বেড়ে ১০০ টাকা হল।

হরিশ কিন্তু কারও অনুগ্রহের প্রত্যাশী ছিলেন না। অত্যন্ত তেজস্বী মানুষ হরিশচন্দ্র এক এক সময় অফিসারের অন্যায় অভিযোগ বা ভিত্তিহীন দোষারোপ মেনে না নিয়ে, প্রতিবাদ করে, অফিসি কেতার দিক থেকে 'অপরাধ'-ই করে ফেলতেন বলা যায়। একবার তাঁর করা একটা হিসাবের ভুল ধরে কর্নেল শ্যাঁপেনেজ তাঁকে বকাবকি করেন; কিন্তু হরিশ জানতেন তাঁর কোন ভুল হয়নি—ভুল করেছেন কর্নেল নিজে; এই নিয়ে কথা কাটাকাটি হতে ব্যাপার এতদূর গড়ায় যে হরিশ পদত্যাগ করতে উদ্যত হন। পদত্যাগ অবশ্য তাঁকে করতে হয়নি। কর্নেল শ্যাঁপেনেজ একে তো তাঁর গুণগ্রাহী, তার ওপর মানুষের যে উদারতা ও মহানুভবতা থাকলে মানুষ নিজের ভুল বোঝবার ও স্বীকার করবার ক্ষমতা পায়, কর্নেলের সে-সব গুণ ছিল। ব্যাপারটা 'দেওয়া নেওয়া'র মধ্যে মিটে যায়। এরপর কর্নেল তাঁকে অনেকটা বন্ধুর মতো করেই গ্রহণ করলেন; একজন প্রতিভাধরের প্রাপ্য মর্যাদাও দিতে থাকলেন। অল্পকালের মধ্যেই হরিশকে অ্যাসিস্ট্যান্ট অডিটর পদে উন্নীত করা হল—পদমর্যাদার সঙ্গে বেতনও মর্যাদাসূচক স্তরে পৌঁছল; মৃত্যুর কয়েকমাস আগে হরিশচন্দ্রের মাসিক বেতন বেড়ে হয়েছিল ৪০০ টাকা।

অফিসের কাজে ব্যস্ত থাকলেও এই সময় তাঁর সাহিত্য সংক্রান্ত কার্যকলাপ বন্ধ ছিল না। পণ্ডিত ব্যক্তি ও লেখক হিসাবে খ্যাতি অর্জনের উচ্চশা নিয়ে তিনি পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখছিলেন। অন্য লক্ষ্যও তাঁর ছিল। দেশবাসীর ওপর অনুষ্ঠিত অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিনিধিত্ব করে তিনি জননেতা হবারও উচ্চাশা পোষণ করতেন—তাঁর বিশ্বাস ছিল, তাঁর অনুসৃত পথেই অবিচার অত্যাচারের প্রতিকার হবে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি হিন্দু ইন্‌টেলিজেন্সার পত্রিকার মালিক ও সম্পাদক কাশীপ্রসাদ ঘোষের সঙ্গে পরিচয় করলেন—হয়ে উঠলেন, এই পত্রিকার অন্যতম প্রধান লেখক। ভুল বুঝাবুঝির ফলে ইন্‌টেলিজেনসারের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে, তিনি বেঙ্গল রেকর্ডারের সম্পাদকত্ব গ্রহণ করলেন। অল্পকাল পরে রেকর্ডার উঠে গেলে, হিন্দু পেট্রিয়ট তার স্থান অধিকার করল, কিন্তু পেট্রিয়টের প্রচার ছিল সীমিত; তার ওপর পর পর তিন বছর বিপুল লোকসান হওয়ায় পত্রিকাটির মালিক পত্রিকা ইজারা দিয়ে, ছাপাখানা ও অন্যান্য সরঞ্জাম বিক্রী করে দিতে চাইলেন। এতে দুঃখ পেয়ে হরিশ তাঁর মিতব্যয়িতাদ্বারা সঞ্চিত অর্থ দিয়ে সে-সব কিনে নেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। পত্রিকাটির স্বল্প প্রচার তাঁকে বিমুখ করতে পারল না, কারণ স্বীয় শক্তি সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন—বিশ্বাস ছিল সামান্য উপকরণ নিয়েও তিনি সফল হতে পারবেন। ১৮৫৫-র জুন মাস থেকে তিনি হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকা পরিচালনা করতে লাগলেন। প্রথম দিকে তিনি আদৌ সাফল্য লাভ করতে

পারেন নি, কিন্তু অদম্য উৎসাহ নিয়ে তিনি প্রতিটি বাধাবিপত্তি জয় করে এগিয়ে চললেন। ফলে, অল্পকালের মধ্যে পত্রিকাটি বিখ্যাত হয়ে উঠল। মহা (বা সিপাহী) বিদ্রোহের সময়, বাঙালীর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের কলঙ্ক অপনয়নে পেট্রিয়টে প্রভাবশালী প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে লাগল। পেট্রিয়ট পত্রিকা অপেক্ষাও কিছু বেশী ছিল; এতে বিখ্যাত পশ্চিমী চিন্তাবিদদের গ্রন্থ-সমূহের ওপর বিশ্লেষণাত্মক নিবন্ধ থাকত। হ্যামিল্টন ও অন্যান্য দার্শনিকদের চিন্তাধারা বিষয়ে এতে উল্লেখযোগ্য লেখা থাকত। কিন্তু তাঁর এবং তাঁর পত্রিকার খ্যাতি ছড়িয়েছিল অন্য কারণে।

কয়েক বৎসর পূর্বে নীলচাষ দ্বারা ভারতের মাটি উর্বর করার জন্য এবং অত্যাচার করে 'ভারতীয় জনগণকে সুখী করবার' উদ্দেশ্য নিয়ে একদল লোককে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ থেকে এদেশে পাঠান হয়েছিল। ভারতীয় চাষীদের ওপর চরম অত্যাচার চালিয়ে এই নীলকররা কী ভাবে তাদের নীলচাষ করতে বাধ্য করত— সে কাহিনী এই সেদিনের, তাই সকলেই সে সম্পর্কে ওয়াকেফাল। তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। টাকা করাই ছিল নীলকরদের একমাত্র উদ্দেশ্য। অর্থ উপার্জনে সফল হলেই, কি পদ্ধতিতে সেটা সাধিত হল, সে ব্যাপারে তারা আদৌ চিন্তিত ছিল না। তাদের বেপরোয়া পদ্ধতি কল্পনা করা কঠিন নয়; আগুন, তলোয়ার, চাবুক, মুগুর, লাথি আর অশ্রাব্য গালিগালাজ ছিল তাদের পদ্ধতির অঙ্গ। মানবিক কোন বোধ তাদের অন্তরে ছিল না। পুরুষদের সম্মানবোধ বা নারীর সতীত্বের কোন মূল্যই এরা দিতে জানত না।

এমন অকথ্য অত্যাচারে অতি দুর্বল চরিত্রের মানুষও ফুঁসে ওঠে। এই ক্ষুদে তানাশাহ্‌দের বিরুদ্ধে বাংলার রায়তরাও শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ করলেন। কিন্তু নীলকরদের প্রবল প্রভাবপ্রতিপত্তির বিরুদ্ধে এদের দুর্বল প্রতিরোধ বিশেষ কার্যকর হল না; শক্তিশালী, উদ্যমী এবং নিঃস্বার্থ কোন ব্যক্তি তাঁদের পক্ষে না দাঁড়ালে সফল হবার কোন আশাই তাঁদের ছিল না। এই সংকটকালে, হরিশ তাঁর সমগ্র শক্তি নিয়ে রায়তদের পক্ষে দাঁড়ালেন। নীলকরদের অচিন্তনীয় অবিচার, অভাবিত শক্তি প্রয়োগ, বর্বর নিষ্ঠুরতার একটা-না-একটা সজীব বিবরণ পেট্রিয়টের পাতায় দিনের পর দিন প্রকাশিত হতে লাগল। সঠিক বর্ণনা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন এলাকায় নিজ ব্যয়ে লোক (সংবাদদাতা) রেখেছিলেন। (ফলে) যে আলোড়নের সৃষ্টি হল তার সম্মুখীন হয়ে সরকার প্রকৃত পরিস্থিতি জানবার জন্য একটি কমিশন নিয়োগ করতে বাধ্য হলেন। হরিশচন্দ্র সহ বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করা হল। সাক্ষ্যদানে প্রধান ভূমিকা ছিল হরিশচন্দ্রের। এইভাবে নিপীড়িত কৃষকদের ওপর অনুষ্ঠিত অত্যাচার সর্বসমক্ষে 'ফাঁস করে' দিয়ে তিনি বিরাট বিপদের ঝুঁকি নিজের কাঁধে

তুলে নিলেন। নীলকরগণ তাঁর ওপর মহাক্রুদ্ধ হয়ে উঠল; গালিগালাজ করাকে যারা সাংবাদিকতা ভাবে, তেমন কতকগুলি সংবাদপত্র দিনের পর দিন তাঁর ওপর বিষ বর্ষণ করে চলেছিল। নীলকরদের শত্রুতা বা তথাকথিত সংবাদপত্র সমূহের গালিগালাজকে তিনি আদৌ গ্রাহ্য করতেন না। নিন্দা প্রশংসা সব কিছু অগ্রাহ্য করে তিনি অবিচল রইলেন নিজ কর্তব্যে। শুধু নৈতিক বা বৌদ্ধিক সহায়তা নয়, প্রয়োজনে তিনি নির্যাতিত কৃষকদের আর্থিক সাহায্যও দিতেন। তাঁর বাড়ীতে অত্যাচারক্লিষ্ট কৃষকদের ভীড় লেগে থাকত। তাঁদের দুঃখের কাহিনী শুনতে শুনতে হরিশচন্দ্র কেঁদে ফেলতেন। তিনি কৃষকদের খেতে দিতেন, পরামর্শ দিতেন, অর্থ দিতেন আর দিতেন আশা। একে পবিত্র কর্তব্য বলে তিনি মনে করতেন; এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি অন্তর অর্থ ও শক্তি দিয়ে যথাসাধ্য দেশ, দেশবাসী ও ঈশ্বরের প্রতি তাঁর কর্তব্য করে চললেন। সংগ্রামে কৃষকগণ জয়ী হয়েছেন, এ খবর শুনে মৃত্যুশয্যায় শায়িত হরিশের নিষ্প্রভ চক্ষু দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠত; এর থেকেই বোঝা যায়, কী উদগ্র আগ্রহ, কত নিঃস্বার্থ উদ্যম নিয়ে তিনি নিপীড়িতের দুঃখ মোচনে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন—বরং বলা যায় তিনি নিপীড়িত কৃষকদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন।

মাত্র ৩৭ বৎসর বয়সে হরিশচন্দ্রের মৃত্যু হয়। অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রমই যে তাঁর অকাল মৃত্যুর অন্যতম কারণ, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। স্বাস্থ্যের যখন তাঁর অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা, যে অবস্থায় সাধারণ মানুষ শয্যায় আশ্রয় নেয়, তখনও তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন। পরের মঙ্গল সাধন চেষ্টায় তিনি ছিলেন অদম্য। দারিদ্র্য দেখলেই তাঁর দানের হাত প্রসারিত হত। একবার অত্যন্ত লাভদায়ক একটা পেশা গ্রহণের জন্য তাকে পরামর্শ দেওয়া হলে, তিনি বলেন, ও কাজ নিলে, ওতেই তো আমার সমস্ত সময় কেটে যাবে, অপরের জন্য ব্যয় করবার মতো সময় পাব কোথায়? দরিদ্রের প্রতি বন্ধুত্ব প্রসারের উৎসাহে তিনি বহু ধনী, মানী ব্যক্তিকে শত্রুতে পরিণত করে বসেন। দৃঢ়চেতা হরিশচন্দ্র সেজন্য ভীত হবার মানুষ ছিলেন না। স্বগ্রামকেও তিনি বহুলাংশে উন্নত করেছিলেন। সাধারণ বিষয় আলোচনার জন্য তিনি সেখানে একটি 'অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে সংযুক্ত গ্রন্থাগারটি 'হরিশচন্দ্র মুখার্জির গ্রন্থাগার' নামে এখনও অভিহিত হয়ে চলেছে।

পাইকপাড়া রাজ পরিবার

প্রাচীন সম্ভ্রান্ত এই পরিবারটির আদি বাস ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দীতে, এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা **হরকৃষ্ণ সিংহ** মুসলমান সরকারের অধীনে চাকরী করে প্রচুর সম্পদের অধিকারী হন। হরকৃষ্ণের পৌত্র বিহারীর দুই পুত্র: **রাধাগোবিন্দ** ও **গঙ্গাগোবিন্দ**। নবাব আলিবর্দী খাঁ ও নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার অধীনে রাধাগোবিন্দ রাজস্ব আধিকারিকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ব্রিটিশরা রাজস্ব আদায়ের অধিকার পেলে রাধাগোবিন্দ জরিপ, বন্দোবস্ত ও রাজস্ব সংক্রান্ত সকল প্রকার দলিল দস্তাবেজ তাদের হাতে তুলে দেন; এই উপকারের পুরস্কারস্বরূপ তাঁকে হুগলীর 'সয়ার মহল' বা চুক্তি কর আদায়ের অধিকার দেওয়া হয়, ১৭৯০-এ চুঙ্গিকর আদায়ের অধিকার সরকার হতে অধিগৃহীত হলে, পরিবারটিকে বার্ষিক ৩,৬৯৮ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়; পরিবারটি এখনও (১৮৮১) ক্ষতিপূরণ বাবদ এই অর্থ পাচ্ছেন। (দ্রষ্টব্য: ওয়েস্টল্যাণ্ডের যেসোর, ১৮৭১, পৃঃ ১৯০)। কনিষ্ঠ, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, হিন্দুস্থানের রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাতে ভালবাসতেন। উদারচেতা গঙ্গাগোবিন্দ মাতৃ-শ্রাদ্ধে কয়েক লাখ টাকা ব্যয় করেন। ওয়ারেন হেসটিংসের শাসনকালে গঙ্গাগোবিন্দ অনারেবল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে ভূমি বন্দোবস্তের পূর্ণ অধিকার ও দায়িত্বসম্পন্ন দেওয়ান ছিলেন। পুত্র প্রাণকৃষ্ণকে লালনপালনের ভার দিয়েছিলেন তিনি তাঁর জেষ্ঠ রাধাগোবিন্দর ওপর।

দেওয়ান প্রাণকৃষ্ণ জমিদারী সংক্রান্ত সকল বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, আবার উদারচেতা ও দয়াবানও ছিলেন। দেওয়ান **কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ** ওরফে **লালা বাবু** এঁরই পুত্র। কৃষ্ণচন্দ্র কিছুকাল বর্ধমান ও কটকের সমাহর্তাদের অধীনে দেওয়ানের চাকরী করেন। যৌবনেই লালাবাবু সংসার-বিবাগী হন—এর দ্বারা তাঁর নৈতিক সাহসের পরিচয় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। দীর্ঘ তীর্থভ্রমণের পর তিনি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে বাস করতে থাকেন, সেখানে তাঁর বিপুল দানের জন্য তিনি বিখ্যাত হন। বৃন্দাবনে তিনি রাজপুতানার মর্মর প্রস্তর দ্বারা একটি মন্দির নির্মাণ করেন, কিন্তু মর্মর প্রস্তর কেনবার জন্য রাজপুতানা গিয়ে তিনি রাজনৈতিক জটিলতার মধ্যে জড়িয়ে পড়েন। মথুরা জেলায় রাধাকুণ্ড

নামে একটি বড় দীঘি আছে; লালা বাবু এর চতুর্দিক বাঁধিয়ে সিঁড়ি করে দিয়েছিলেন। (দ্রষ্টব্য : ওয়েস্টল্যাণ্ডের 'যেসোর', ১৮৭১, পৃষ্ঠা ১৯০-১৯১)। বিপুল সম্পত্তি ও শিশুপুত্র শ্রীনারায়ণ (পরে দেওয়ান)-কে রেখে লালাবাবু বৃন্দাবনে পরলোক গমন করেন।

নিঃসন্তান শ্রীনারায়ণ সিংহ, প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্রকে পোষ্য পুত্ররূপে গ্রহণ করেন।

ফিবার হসপিট্যালের জন্য, উদারহস্তে দান, অন্যান্য দাতব্য প্রতিষ্ঠানে দান খয়রাৎ ও এদেশবাসীর উন্নতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণের জন্য প্রতাপচন্দ্র সিংহকে ব্রিটিশ সরকার রাজা বাহাদুর খেতাব দ্বারা সম্মানিত করেন। তিনি 'কম্প্যানিয়ন অব দি মোস্ট এগ্‌জল্‌টেড অর্ডার অব দি স্টার অব ইণ্ডিয়া' খেতাব দ্বারাও সম্মানিত হন। মৃত্যুকালে তিনি চার পুত্র : কুমার গিরিশচন্দ্র সিংহ, কুমার পূর্ণচন্দ্র সিংহ, কুমার কান্তিচন্দ্র সিংহ এবং কুমার শরৎচন্দ্র সিংহকে রেখে যান। কুমার গিরিশচন্দ্র ১৮৭৭এ মারা যান, তিনি কান্দী হাসপাতালকে ১,১৫,০০০ টাকা দান করে যান।

রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ সংগীতপ্রেমী ছিলেন। তাঁর বেলগাছিয়া ভিলায় তিনি ধুমধাম করে শর্মিষ্ঠা প্রভৃতি নাটকের অনুষ্ঠান করাতেন। তাঁর একমাত্র পুত্র কুমার ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ পিতার বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। ১৮৭৭-এর দিল্লীর সাম্রাজ্যিক সমাবেশে বড়লাট লর্ড লিটন তাঁকে একটি পদক দান করেন।

কুমার পূর্ণচন্দ্র, কুমার কান্তিচন্দ্র, কুমার শরৎচন্দ্র এবং কুমার ইন্দ্রচন্দ্র এখন এই বংশের প্রতিনিধি। এঁরা বর্তমান বাংলার শিক্ষিত ধনী সম্মানিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের অন্যতম।

এই বংশের জমিদারী বাঙলার বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে আছে। এঁরা নাবালক থাকাকালে কোর্ট অব ওয়ার্ডস কর্তৃক নিযুক্ত সুদক্ষ সুপরিচালক ইওরোপীয় অফিসার মিঃ হার্ডি সমগ্র এস্টেটটি পরিচালনা করেন। তাঁর সুপরিচালনায় সম্পত্তি ও সম্পদ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

রায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাহাদুর এল এল ডি, সি আই ই
(শুরাহ্‌ রাজপরিবার)

[১৮৭৮এর ৩ ডিসেম্বর তারিখে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া হল।]

আজ থেকে প্রায় ন'শো বছর আগে কনৌজ থেকে বাঙলায় আদিশূর কর্তৃক আনীত মুখ্য কুলীন কালিদাস মিত্র থেকে উদ্ভূত বংশে ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র জন্মগ্রহণ করেন। উচ্চবংশীয়দের স্বাভাবিক বা অর্জিত গুণ থাকলে সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ অবশ্যম্ভাবী হয়—এ বংশটির ক্ষেত্রে তাই হয়েছিল। কালিদাস মিত্রের অধস্তন চতুর্দশতম পুরুষ সত্যভাম মিত্র ২৪ পরগণার বরুষেতে বাস করতেন—তাই থেকে পরিবারটি বরষের মিত্র পরিবার নামে অভিহিত হয়ে থাকে। পরিবারটির একটি শাখা হুগলী জেলার 'ক্যান্নাঘরে' বসবাস করবার জন্য চলে যায়, ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের জন্ম, তাঁর মতে, এই বংশে। কালক্রমে পরিবারটি 'ক্যান্নাঘর' থেকে কলকাতা (উপনিবেশে)-র মধ্যে অবস্থিত গোবিন্দপুরে, সেখান থেকে 'মছুয়াবাজার' এবং শেষ পর্যন্ত কলকাতার উপকণ্ঠ শুরাহ্‌তে বসবাস করতে থাকেন। সম্মানিত বংশ হিসাবে পরিচিত হলেও, সত্যভামের পৌত্র রামরাম মিত্রের পূর্বে এঁরা সম্ভ্রান্ত বংশরূপে পরিচিত হতে পারেন নি। রামরাম মিত্র ছিলেন মুর্শিদাবাদে নবাবের দেওয়ান। রামরামের পুত্র অযোধ্যারাম রায় বাহাদুর খেতাব লাভ করেন। বংশের মর্যাদা শীর্ষবিন্দুতে পৌছয় অযোধ্যারামের পৌত্র পীতাম্বরের সময়ে। পীতাম্বর দিল্লীর বাদশাহী দরবারে অযোধ্যার নবাবের ভকীল ছিলেন; পরে তিনি বাদশাহী সরকারে উচ্চ পদ লাভ করেন। বাদশাহ তাঁকে রাজা বাহাদুর ও 'তীন হাজারী মন্‌সব্‌' খেতাবে ভূষিত করেন। শেষোক্ত পদবীটি সেকালে নাইট পদবীর সমতুল্য এবং শাহজাদাদের পরবর্তী মর্যাদা ছিল, শাহজাদারা হতেন 'দস হাজারী মন্‌সব'। পীতাম্বর মিত্র-যাতে রাজা বাহাদুর খেতাবের মর্যাদা রক্ষা করে চলার মতো আর্থিক সঙ্গতি লাভ করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে তাঁকে দোয়াবের অন্তর্গত কোরাহ্‌ জেলা জাগীর হিসাবে দেওয়া হয়। বাদশাহ তাঁকে এত নেকনজরে দেখতেন এবং দরবারে তাঁর এত প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল যে, বাদশাহ তাঁকে রাজা বাহাদুর খেতাব দেবার সময় তাঁর দুই ভাইকেও রায় বাহাদুর খেতাব দান করেন।

বেনারসে চৈৎ সিংহের বিদ্রোহ ও ধর্মীয় গোঁড়ামির ঐ কেন্দ্রে জনগণের আন্দোলন দমনের জন্য ১৭৮৪তে ওয়ারেন হেস্‌টিংস কর্তৃক প্রেরিত সেনাপতি পামার যখন 'রাম নগ্‌গর' দুর্গ অধিকার করেন, রাজা পীতাম্বর মিত্র বাহাদুর তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এই ঘটনার কিছু পরে, ১৭৮৭ বা ১৭৮৮তে রাজা কলকাতা ফিরে আসেন এবং তার দু' তিন বৎসর পর বিষয়কর্ম ত্যাগ করে পুরোপুরি বৈষ্ণব হয়ে যান। তিনি মারা যান ১৮০৬-এ। মৃত্যুকালে তিনি রেখে যান তাঁর একমাত্র পুত্র বৃন্দাবনচন্দ্র মিত্রকে; বৃন্দাবনচন্দ্র পিতার খেতাব ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। বাদশাহের চাকরী ত্যাগ করবার সময় রাজা পীতাম্বর মিত্র বাহাদুর আউধের নবাব সুজাউদ্‌দৌলার বিরুদ্ধে ন' লাখ টাকার দাবী পেশ করেন, এবং নগদে ঐ অর্থ আদায় করেন; এই অর্থই তাঁর শেষ উপার্জন। কোরাহ্‌ জাগীর থেকে তিনি বার্ষিক সওয়া দু' লাখ টাকা খাজনা পেতেন—মারাঠা যুদ্ধের সময় তিনি এই জাগীর ছাড়তে বাধ্য হন। অমিতব্যয়ী বৃন্দাবনচন্দ্র অল্পকালের মধ্যে পিতার ধনসম্পত্তির অধিকাংশ খুইয়ে কটকের কালেকটরেটে দেওয়ানের চাকরী নিতে বাধ্য হন, কিন্তু ছ' মাসের বেশী চাকরী করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

'রামনগ্‌গর' দুর্গ লুণ্ঠনের সময় রাজা পীতাম্বর মিত্র হস্তগত করেছিলেন বহু দুর্লভ সংস্কৃত পুথি। সেই সব পুথির একটা অংশ এখন এই পরিবারের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ। এই নিবন্ধের নায়কের পিতা 'জনমেজয়' মিত্র ছিলেন বৃন্দাবন মিত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং বংশের প্রতিষ্ঠাতা কালিদাস মিত্র হতে অধঃস্তন চতুর্বিংশ-তম পুরুষ। তাঁর (রাজেন্দ্রলালের) পিতামহ বা পিতা সরকারী চাকরী করেন নি, তবে তাঁর পিতা ছিলেন সংস্কৃতিবান মানুষ—তিনি সংস্কৃত ও ফার্সী সাহিত্য চর্চা করে সময় কাটাতেন। তাঁর অপ্রকাশিত রচনা সমূহের মধ্যে আছে বহু সংস্কৃত শ্লোক ও ফার্সী গজল, আর তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে আছে বাংলা স্তোত্র সংগ্রহ, উচ্চভাব সমন্বিত ফার্সী কবিতা সংগ্রহ, অষ্টাদশ পুরাণের টীকা এবং ভাগবদ্‌গীতার বর্ণানুক্রমিক নির্ঘণ্ট। ডাঃ শৌলব্রেড নামক জনৈক ইওরোপীয় বিজ্ঞানীর কাছে তিনি রসায়ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন—এক্ষেত্রে বাঙালীদের মধ্যে তিনিই প্রথম স্থানের অধিকারী। রাজেন্দ্রলাল উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার সাহিত্য রুচি পেয়েছিলেন, কিন্তু প্রকৃতি তাঁকে যে দুর্লভ গুণ, অর্থাৎ প্রতিভার অধিকার দিয়েছিল, তাঁর পিতা সে গুণের অধিকারী ছিলেন না। প্রকৃতি-দত্ত প্রতিভাকে রাজেন্দ্রলাল সীমাবদ্ধ সুযোগ সুবিধার মধ্যেও কঠোর পরিশ্রমের সাহায্যে পরিপুষ্ট করে তুলেছিলেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাজা পীতাম্বর মিত্র পুরোপুরি বৈষ্ণব হয়ে যান; বৈষ্ণব হবার পর তিনি 'মছুয়া বাজারের' বাসভবন ছেড়ে পরিবারবর্গ নিয়ে

সাধন ভজনের সুবিধার জন্য 'ভরাহ'-র বাগান বাড়ীতে বাস করতে চলে যান। এই বাসভবনে ১৮২৪-এর ১৫ ফেব্রুয়ারী ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের জন্ম হয়। তাঁর জন্মের অল্পকাল পরে, তাঁর অমিতব্যয়ী পিতামহ 'মছুয়া বাজারের' বসতবাটী বিক্রী করে দেন। অবশ্য বৃন্দাবনের সপক্ষে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, ব্যক্তিগত বিলাস ব্যসনে তিনি অমিতব্যয়ী হয়ে সংসারকে দারিদ্র্যের মধ্যে টেনে আনেন নি; তিনি অতি সহজে অভাবগ্রস্ত বন্ধুবান্ধব বা সাহায্যপ্রার্থীদের বিশ্বাস করতেন এবং বিশ্বাস করে প্রবঞ্চিত হতেন। জোড়াসাঁকোর স্যাণ্ডেল পরিবার এককালে ধনী ছিল, এই বংশের মধুসূদন স্যাণ্ডেলের মা জনৈক অকিঞ্চিৎকর সরকারের বেনামীতে নাবালক পুত্রদের মঙ্গলের জন্য সুপ্রীম কোর্টের রিসিভারের কাছে থেকে একটি জমিদারী ইজারা নেন। বৃন্দাবন ছ' বছর যাবৎ বার্ষিক তিন লাখ টাকা দেবার শর্তে এঁদের জামিন দাঁড়ালেন। মধুসূদনের মা টাকা দিতে না পারায়, শর্ত অনুযায়ী বৃন্দাবন 'মছুয়া বাজারের' ভদ্রাসন বিক্রী করে জামিনের টাকা দিয়ে দিলেন। আর একটি ক্ষেত্রে, রমজানী ওস্তাগর আর্মি ক্লোদিং ডিপার্টমেণ্ট থেকে এক লাখ টাকার একটি ঠিকা নিলেন—ওস্তাগর চুক্তির শর্ত পূরণে অক্ষম হলে বা ব্যর্থ হলে ঐ পরিমাণ অর্থ মিটিয়ে দেবার শর্তে বৃন্দাবন তার জামিন দাঁড়ালেন। ঠিকা অনুযায়ী কাজ হল না—ফলে বৃন্দাবনের লোকসান হল প্রায় তিন লক্ষ টাকা। এই দুটি লোকসানের ফলে, পরিবারটির সম্পদ প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায়।

(রাজেন্দ্রলালের পিতা) 'জনমেজয়' মৃত্যুকালে রেখে যান ছয় পুত্র ও এক কন্যা, এঁরা সকলেই জীবিত আছেন। [জনমেজয়ের ছয় পুত্র হলেন: গোপাললাল, ব্রিজেন্দ্রলাল, রাজেন্দ্রলাল, উপেন্দ্রলাল, দেবেন্দ্রলাল ও ভবেন্দ্রলাল।]

রাজেন্দ্রলাল পিতামাতার তৃতীয় সন্তান। যথারীতি গৃহদেবতার পূজাপাঠসহ তাঁর হাতে খড়ি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় এবং হাতেখড়ির পর শুরু হয় ফার্সী বর্ণমালা শিক্ষা। এরপর তিনি রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের পারিবারিক (পাঠশালার) গুরুমশায়ের নিকট শিক্ষা করেন বাংলা ভাষা। তিন বৎসর ফার্সী ও বাংলা শেখার পর পাথুরিয়াঘাটায় 'খেম' বোসের স্কুলে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা শুরু করেন—উল্লেখ্য 'এখন' যেমন পটলডাঙ্গা, তখন পাথুরিয়াঘাটা তেমনি ছিল এদেশীয়দের শিক্ষার কেন্দ্র স্থল। বাল্যকালে থাকতেনও তিনি পাথুরিয়াঘাটাতে তাঁর নিঃসন্তান পিসিমার কাছে। এরপর তিনি ভর্তি হন গোবিন্দ বসাকের বিদ্যালয়ে। পনের বছর বয়স থেকে তিনি পুরো এক বছর, ১৮৩৮-এর অকটোবর থেকে ১৮৩৯-এর অকটোবর পর্যন্ত, হাঁপানী, জ্বর আর প্লীহা বৃদ্ধিতে ভুগতে থাকেন; বিরক্ত হয়ে তিনি স্থির করলেন নিজে ডাক্তারী পড়ে চিকিৎসক হবেন; সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৮৩৯এর নভেম্বর মাসে তিনি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হলেন। স্কুল ও কলেজের

শিক্ষা একই সঙ্গে চলতে থাকল ; তার সঙ্গে চলল গৃহে মিঃ ক্যামেরনের কাছে উচ্চ শিক্ষা। স্কুলে যেমন কলেজেও তেমনি তিনি পুরস্কারের পর পুরস্কার পেতে থাকেন। তখন দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁকে সঙ্গে করে ইংল্যাণ্ড নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা-শাস্ত্রে উচ্চতর শিক্ষা দেবার প্রস্তাব করেন। যুবক রাজেন্দ্রলাল সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে যান ; কিন্তু কথাটা তাঁর বাপের কানে যেতেই তিনি দ্বারকানাথের প্রস্তাব শুধু নাকচ করলেন না, পুত্রের মেডিক্যাল কলেজে পড়াও বন্ধ করে দিলেন। রাজেন্দ্রলাল তখন আইন পড়তে লাগলেন, প্রতিভার পক্ষে যা স্বাভাবিক—অতি দ্রুত তিনি আইন শাস্ত্রের ও পেশার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয় অধিগত করে একটি পরীক্ষায় বসলেন ; এবং সফলও হলেন—এখন তিনি সদর আদালতের উকীল বা মুনসেফ হবার যোগ্যতা অর্জন করলেন। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস এবং সাহিত্য জগতের সৌভাগ্য, এই পরীক্ষার পরীক্ষার্থীদের সব উত্তরপত্র চুরি হয়ে যাওয়ায় পরীক্ষাটাই নাকচ হয়ে গেল, এবং আইন আদালতের উচ্চ স্থান অধিকার করার যে সম্ভাবনা তাঁর ছিল, সেও শেষ হয়ে গেল। জীবনে একটা পেশা গ্রহণের উদ্দেশ্য নিয়ে এত পরিশ্রম এতখানি অধ্যবসায় নিয়ে যে বিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন, তিতিবিরক্ত হয়ে এখন তার সঙ্গে সব সংশ্রব ত্যাগ করলেন। যে দুটি বৃত্তির যে-কোন একটি অবলম্বন করে যুবা বয়সে মানুষ যশ ও অর্থ অর্জনের স্বপ্ন দেখে, সেই দুটি বৃত্তির দ্বার তাঁর সামনে রুদ্ধ হয়ে গেল। এসব দেখে মনে হয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর যে বিপুল দান, সে পথে তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য ভাগ্য তাঁকে শিক্ষিত জনের অর্থকরী পেশায় যেতে দেন নি। বাইরের শিক্ষার ক্ষেত্র ছেড়ে এবার তিনি স্বাধীনভাবে জ্ঞান রাজ্যে প্রবেশ করলেন ; গভীর ও ব্যাপক-ভাবে তিনি অধ্যয়ন করতে লাগলেন সংস্কৃত, ফার্সী, হিন্দী এবং উর্দু ভাষা ও সাহিত্যসমূহ— আর বাইরে নয়, এখন সাধনা চলল স্বগৃহে। ১৮৪৬এর নভেম্বর মাসে, তাঁর তেইশ বছর বয়সে, তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির অফিস সেক্রেটারী ও লাইব্রেরিয়ান পদে নিযুক্ত হলেন, এই পদে এর আগে অধিষ্ঠিত ছিলেন মহান হাঙ্গেরীয় প্রাচ্যতত্ত্ববিদ ৎসোমা দ্য কোরোস [চোমা ডি কোরজ্ ?] —জ্ঞান তপস্বী এই মানুষটি আগ্রহ ও আন্তরিকতার সঙ্গে জ্ঞানবিজ্ঞানের গবেষণায় এই ভারতেই আত্মোৎসর্গ করেন। অর্থ মূল্যের দিক থেকে পদটি আদৌ লোভনীয় ছিল না ; কিন্তু ডাঃ রাজেন্দ্রলালের কাছে এর অন্য মূল্য ছিল অপরিসীম ; স্বগৃহে তিনি যে রুচি নিয়ে তাঁর জ্ঞান ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে চাইছিলেন, তারই পরিপুষ্টি সাধনের জন্য জ্ঞান রাজ্যের অমূল্য সম্পদসমূহ সোসাইটির গ্রন্থাগারে অবাধে ব্যবহারের তিনি সুযোগ পেয়ে গেলেন। এই পদে তিনি দশ বৎসর চাকরী করেন—এই সময়ের মধ্যে এশিয়াটিক সোসাইটির রত্নরাজী ব্যবহার করে তিনি তাঁর বহু ব্যাপ্ত বিপুল জ্ঞানরাশিকে যে অনেক সমৃদ্ধ করেছিলেন, এ বিষয়ে কোন

সন্দেহ নাই। ১৮৫৬র মার্চ মাসে তিনি কলকাতাস্থিত গভর্নমেণ্ট ওয়াড্‌সের ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত হন।

মেডিক্যাল কলেজে পড়বার সময়, সতের বছর বয়সে তাঁর প্রথমবার বিবাহ হয়। একটি কন্যা সন্তান রেখে এই স্ত্রী মারা যান; কন্যাটিও তার ছ' মাস পরে মারা যায়; তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন ছত্রিশ বছর বয়সে। এই বিবাহের ফলে তাঁর দুটি পুত্রের জন্ম হয়; এঁরা জীবিত আছেন।

বহু-ভাষাবিদ্ ডাঃ রাজেন্দ্রলাল সম্পর্কে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, বাল্যকাল থেকেই তিনি বাংলা, সংস্কৃত, উর্দু, হিন্দী, ফার্সী ও ইংরেজী ভাষাসমূহ শিখছিলেন, মেডিক্যাল কলেজে পড়বার সময় দেখলেন, ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষা দুটি না শিখলে তিনি পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের উৎসে পৌঁছতে পারবেন না; ঐ সময় তিনি এই ভাষা দুটি শিখে নিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটির অফিস সেক্রেটারী পদে কাজ করার সময় তিনি কাজ চালাবার মতো ফরাসী ভাষা এবং কিঞ্চিৎ জার্মান ভাষা শেখেন।

উল্লেখ্য যে, তিনি লিখতে আরম্ভ করেন এশিয়াটিক সোসাইটিতে চাকরী নেবার পর; প্রথম লেখেন সোসাইটির জার্নালের জন্য ১৮৪৭-এর কোন এক সময়। ১৮৫১তে (?) তিনি তাঁর বাংলা সাময়িক পত্র 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' প্রকাশ করতে থাকেন; [এর সাতটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়]। [১৮৫৬তে এর প্রকাশ বন্ধ করে] সমগোত্রীয় সাময়িক পত্র 'রহস্য সন্দর্ভ' প্রকাশ করেন [১৮৫৮তে], সন্দর্ভ প্রকাশিত হয় পাঁচ বৎসর। [এর ছ'টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়]। বলা প্রয়োজন যে, 'সংগ্রহ', ছিল বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ক সচিত্র বাংলা সাময়িক পত্র, উচ্চতম কোটির এই সাময়িক পত্রটির সমকক্ষ আর কোন পত্র আজ (১৮৮১) পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি। 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'-এর পর তিনি ১৮৪৯-এ প্রকাশ করেন সংস্কৃত কামন্দকী ও নীতিসারের একটি সংস্করণ। ঐ বৎসরই তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির মিউজিয়ামের একটি ক্যাটালগ প্রকাশ করেন। তাঁর রচনা সমূহের একটি তালিকা বর্তমান নিবন্ধের শেষে সংযোজিত হল। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা বহু; বলা বাহুল্য তাঁর 'হিস্ট্রি অব দি অ্যানটিকুইটিজ অব ওড়িষ্যা' গ্রন্থখানিই আজ পর্যন্ত লিখিত গ্রন্থগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, ভবিষ্যতে যদি এর থেকে উন্নততর কোন গ্রন্থ তিনি রচনা করেন তো সে আলাদা কথা; সে যাই হোক, ইংরেজী ভাষায় এতখানি দখল নিয়ে গ্রন্থ রচনার দিক থেকে তিনিই প্রথম স্থানের অধিকারী থাকবেন। শুধু তাই নয়, তাঁর বিস্তৃত ও ধৈর্যপূর্ণ গবেষণা, গভীর ও ব্যাপক পাণ্ডিত্য এবং তুলনীয় দৃষ্টান্ত থেকে নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিক থেকে গ্রন্থখানিকে তাঁর কীর্তিস্তম্ভ বলা যায়। তাছাড়া এই গ্রন্থখানি প্রমাণ করে যে, আমাদের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থাপনা দ্বারা জ্ঞান

ও গবেষণায় যে স্তরে শিক্ষার্থীদের পৌঁছে দেবার বৃথা চেষ্টা করছে, এদেশীয় যুবকদের মধ্যে স্বাভাবিক প্রতিভা থাকলে এবং সে প্রতিভাকে প্রজ্ঞা ও সাবধানতার সঙ্গে পরিচালনা করতে পারলে, (স্কুল কলেজের বাইরে স্বীয় চেষ্টায়) যুবকদের পক্ষে পৌঁছন সম্ভব। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সক্রিয় মনন শুধুমাত্র সাহিত্য ও বিজ্ঞানের আলোচনার মধ্যে ব্যাপৃত থাকে নি; জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়েও তাঁর সদাপ্রস্তুত লেখনী বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়, এত বৎসর ধরে, প্রবন্ধ লিখে চলেছে। পুরাতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কিত তাঁর প্রবন্ধাদি দেশ বিদেশের বহু পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে চলেছে; গুরুত্বের দিক থেকে এগুলি তাঁর বড় বড় গ্রন্থগুলি অপেক্ষা কোন অংশেই উপেক্ষনীয় নয়। তাঁর বড় বড় গ্রন্থগুলি তাঁকে যে সাহিত্যিক খ্যাতি এনে দিয়েছে, এই প্রবন্ধগুলির দ্বারা সে খ্যাতি আরও প্রতিষ্ঠিত ও পরিব্যাপ্ত হচ্ছে। এখানে আমাদের একটা ধারণার কথা বললে আশা করি পাঠকবর্গ আমাদের ক্ষমা করবেন। বর্তমানে তিনি 'বুদ্ধ গয়া'র বিষয় একখানি গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত আছেন— আমাদের ধারণা, এখানি তাঁর উড়িষ্যা সংক্রান্ত গবেষণা গ্রন্থ অপেক্ষা অধিক মূল্যবান যদি না-ও হয় তার সমকক্ষ হবে এবং এর দ্বারা খ্যাতি যদি বৃদ্ধি না-ও পায় ক্ষুণ্ন যে হবে না এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত।

এই নিবন্ধে নায়কের আর একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ না করলে, তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। জনস্বার্থ বিষয়ক কোন প্রশ্নে যুক্ত হতে হলে তাঁর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। যে সরকারের অধীনে তিনি চাকরী করছেন তারও কোন নীতির প্রতি ভৎ সনা জানাতে হলে বিস্ময়কর স্বাধীনচিত্ততার সঙ্গেই তিনি তা করেন। রাজনৈতিক সভা সমাবেশে তিনি সাধারণত অংশ নেন না কিন্তু আমাদের এই মেট্রোপলিটন মিউনিসিপ্যালিটির সম্পর্কে কোন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা থাকলে তিনি তাতে সক্রিয় অংশ নেন; এই সংস্থার দুর্নীতি-পরায়ণ প্রশাসনের মুখোস তিনি নির্ভীকভাবে খুলে দেন; পৌর কাজকর্মে এই সংস্থার অনিয়ন্ত্রিত সীমাহীন দুর্নীতির ফলে নাগরিকদের ওপর ট্যাক্সের অসহনীয় যে বোঝা দীর্ঘদিন ধরে ক্রমাগত চাপিয়ে চলা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে ডাঃ রাজেন্দ্রলালের প্রভাব বার বার সোচ্চার হয়ে উঠেছে। জনসভায় তাঁর বক্তৃতা তাঁর বিরুদ্ধ মতাবলম্বীরাও একান্ত মনোযোগ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে শোনেন, তার কারণ তাঁর বাগ্মিতা, যুক্তিসিদ্ধ উক্তি এবং ইংরেজী ভাষার ওপর পরিপূর্ণ দখল।

ইওরোপ ও আমেরিকার বিদগ্ধজনেরা তাঁকে সম্মান জানিয়ে নিজেদেরও সম্মানিত করেন, তাঁদের কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করলে আশা করি পাঠকগণ অখুশী হবেন না। প্রাচ্যতত্ত্বের যে সব শাখায় ডাঃ মিত্র বিশেষজ্ঞরূপে পরিচিত সেসব বিষয় তাঁরা চিঠিপত্র মারফৎ তাঁর মতামত জানতে চান; এঁদের মধ্যে

আছেন : ডাঃ ম্যাক্সমুলার, স্বর্গীয় এম গার সাঁ গু তাসি, অধ্যাপক ফ্ক (ফরেস্ট অ্যাকাডেমির সঙ্গে যুক্ত) অধ্যাপক কুহ্ন, বার্লিনের অধ্যাপক মায়ের ভিয়ার ও অধ্যাপক ওয়েবার, সেণ্ট পিটার্সবার্গের প্রাক্তন এবং বর্তমানে জেনার অধ্যাপক বোহৎলিংক, খ্রীস্টিয়ানার অধ্যাপক হোল্ম্ বোয়ে, কোপেনহ্যাগেনের পরলোকগত অধ্যাপক রষ্ফ, ফ্লোরেনসের অধ্যাপক দা গুবারনাতিস, স্ট্রাসবুর্গের অধ্যাপক গোল্ডস্মিট্, এডিনবার্গের অধ্যাপক এগলিং ও অধ্যাপক ডাঃ জনমুইর, লিপজিগের অধ্যাপক আমারি ও অধ্যাপক হারমান ব্রকহস্, এডিনবার্গের অধ্যাপক কাওয়েল, প্রিন্‌সেপস্ এসেজ পত্রিকার সম্পাদক ও মুদ্রাতত্ত্ববিদ মিঃ এডওয়ার্ড টমাস, নিউ ইয়র্কের অধ্যাপক হুইটনি, হ্যাওহার্স্ট স্টাফ্ কলেজের মি ড' সন, বনের অধ্যাপক অ'ফ্রেক্‌ৎ, কলকাতা মাদ্রাসার প্রাক্তন ও বর্তমানে সুইজারল্যাণ্ডের শিক্ষক ডাঃ স্প্রেংগার, ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর ডাঃ রসট পূর্বে নেপালের এবং বর্তমানে ইংল্যাণ্ডে অবস্থানকারী মিঃ ব্রায়ান হজসন, বোম্বাই-এর ডাঃ বুহ্‌লার, পুনার ডাঃ কিয়েলহর্ণ এবং ম্যাঙ্গালোরের ডাঃ বর্নেল। ইচ্ছে করলে এই তালিকা আরও অনেক বাড়ান যায় ; কিন্তু যে তালিকা দেওয়া হল, তাই থেকে এ কথা পরিষ্কার হবে যে, ভারতীয় পুরাতত্ত্ব ও প্রাচীন সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞানকে বৈদেশিক পণ্ডিতগণ কতখানি মর্যাদা দেন।

তাঁর বিপুল পাণ্ডিত্যের প্রতি সম্মান জানাবার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক এল এল ডি ডিগ্রী প্রদান করেছেন। দিল্লীর সাম্রাজ্যিক সমাবেশে লর্ড লিটন তাঁকে রায় বাহাদুর খেতাবে ভূষিত করেন এবং ১৮৭৮ এর একটি ঘোষণা দ্বারা তাঁকে নবসৃষ্ট কমপ্যানিয়ন অব দি অর্ডার অব দি ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার খেতাব দান করা হয়।

ডাঃ মিত্র এশিয়াটিক সোসাইটির ভাইস প্রেসিডেণ্ট, ১৮৬৫-র ডিসেম্বর থেকে হাঙ্গেরীয় অ্যাকাডেমি অব সায়েন্‌সেস্-এর বৈদেশিক সদস্য : হাঙ্গেরীয় পত্রিকা দি সানডে নিউজ অব বুদাপেস্ত যথোপযুক্তভাবেই তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন 'ইওরোপীয় বিজ্ঞান সমূহের গর্ব', তাছাড়া তিনি গ্রেট ব্রিটেনের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য ; জার্মান ও মার্কিন ওরিয়েণ্টাল সোসাইটীদ্বয়ের পত্রাচারী সদস্য ; ভিয়েনার ইম্পিরিয়াল অ্যাকাডেমির সাম্মানিক সদস্য, কোপেনহ্যাগেনের সোসাইটি অব নর্দান অ্যাণ্টিকুইটিজের ফেলো এবং বার্লিনের অ্যানথ্রোপো-লজিক্যাল সোসাইটির পত্রাচারী সদস্য। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে যে, কিছু কাল আগে ফরাসী রিপাবলিক তাঁকে ফরাসী পাবলিক ইন্‌স্ট্রাকশন দপ্তরের পামলীফ ও ডিপ্লোমা প্রেরণ করেছে।

ডাঃ মিত্রের স্বাস্থ্য দুর্বল, তবু আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা তিনি দীর্ঘজীবী হোন ; যাতে কারও সাহায্য না নিয়ে স্বীয় সহজাত প্রতিভা ও পরিশ্রম দ্বারা তিনি

যে সম্মানসমূহ অর্জন করেছেন নূতন নূতন সম্মান দ্বারা অর্জিত সম্মান আরও বৃদ্ধি পায়।

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রকাশিত গ্রন্থাদির তালিকা :

ইংরেজী

১।	অ্যান্টিকুইটিজ অব ওড়িষ্যা, ভল্যুম ১, ১৮৭৫	১
২।	সামবেদের অন্তর্গত ছন্দোগ্য উপনিষদের অনুবাদ ৮ভো, ১৮৬২	১
৩।	নোটিসেস অব স্যাঁসক্রট ম্যানুসক্রপট্স ৪ ভল্যুম, রয়্যাল ৮ভো, ১৮৭১-১৮৭৮	৪
৪।	ডেস্ক্রপটিভ ক্যাটালগ অব কিউরিওসিটিজ ইন দি এশিয়াটিক সোসাইটিজ মিউজিয়াম, ১৮৪৯	১
৫।	ক্যাটালগ অব দি এশিয়াটিক সোসাইটিজ লাইব্রেরী ৮ভো, ১৮৫৪	১
৬।	ইনডেক্স টু ভল্যুম্স I টু XXIV অব দি জার্ণাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ৮ভো ১৮৫৬	১
৭।	ডেসক্রপটিভ ক্যাটালগ অফ স্যাঁসক্রট গ্রামারস, ১৮৭৭	১
৮।	বুদ্ধগয়া দি হার্মিটেজ অব শাক্যমুনি ৪টো, ১৮৭৮	১
৯।	এ স্কীম অব দি রেনডারিং অব ইউরোপীয়ান সায়েনটিফিক টার্মস ইন টু ভার্ণাক্যুলার্স অব ইণ্ডিয়া ৮ভো ১৮৭৭	১

এছাড়া, জার্ণাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ট্র্যানজ্যাক্শনস্ অব দি অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল সোসাইটি, ক্যালকাটা রিভিউ, মুখার্জি'জ ম্যাগাজিন, জার্ণাল অব দি ফোটোগ্রাফিক্যাল সোসাইটি এবং অন্যান্য পত্র পত্রিকায় তাঁর শতাধিক প্রবন্ধ ও আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে।

ইংলিশম্যান, ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ ও ফিনিক্স পত্রিকায় পত্র ও আলোচনা সহ সিটিজেন, ইণ্ডিয়ান ফিল্ড, হিন্দু পেটরিয়ট, ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া ও স্টেটসম্যান পত্রিকার জন্য তাঁর লেখা সম্পাদকীয়ের সংখ্যা এক হাজারের অপেক্ষা কম নয়।

সংস্কৃত

১।	যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৮ভো, ১৮৫৪-১৮৬৯	৩
২।	ঐ আরণ্যক, ঐ, ১৮৭২	১
৩।	ঐ প্রতি সাখ্য, ঐ, ১৮৭২	১

৪। অথর্ব বেদের গোপথ ব্রাহ্মণ, ঐ, ১৮৭২ ১

৫। কামন্দকীয় নীতি, ঐ, ১৮৪৭ ১

৬। চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক, ঐ, ১৮৫৽ ১

৭। ললিত বিস্তার, ৮ ভো, ১৮৫৪-১৮৭৭
ছয় অংশে ক্রমশ প্রকাশিত ১

৮। অগ্নি পুরাণ, ৮ ভো, ১৮৭৩-১৮৭৮ ৪

৯। ঐতরেয়ারণ্যক, ঐ ১৮৭৬ ১

বাংলা

১। বিবিধার্থ সংগ্রহ, ৪টো, ১৮৫০-১৮৫৬ ৭

২। রহস্য সন্দর্ভ, ঐ, ১৮৫৮-১৮৬৩ ৬

৩। প্রকৃত ভূগোল, ১২মো., ১৮৫৪ (৫টি সংস্করণ) ১

৪। পত্র কৌমুদী, ঐ, ১৮৬৩ ১

৫। ব্যাকরণ প্রবেশ, ঐ, ১৮৬২ (৪টি সংস্করণ) ১

৬। তিল্পিকা দর্শন, ঐ, ১ খণ্ড, ১৮৬০ ১

৭। আসঙ্ক ব্যবস্থা, ১ খণ্ড, ৮ভো., ১৮৭৩ ১

৮। শিবাজীর জীবনী, ১৮৬২ ১

৯। মেবারের ইতিহাস ১৮৬১ ১

মানচিত্র ভূচিত্রাবলী

১। ভারতবর্ষ (বাংলায়) ১৮৫২ ১

২। ঐ (নাগরী) ১৮৫৩ ১

৩। ঐ (ফার্সীতে) ১৮৫৪ ১

৪। এশিয়া (ফার্সীতে) ১৮৫৫ ১

৫। ফিজিক্যাল চার্ট, ১৮৫৪ ১

৬। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সকল জেলার মানচিত্র, ১৮৬০ ১

৭। বৃহৎ ভূচিত্রাবলী (বিদ্যালয়ের জন্য) ১

৮। ছোট ভূচিত্রাবলী (ঐ) (পাঁচটি সংস্করণ) ১

ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র বর্তমানে মাসিক ৫০০ টাকা পেনশন পাচ্ছেন

দি অনারেবল রমেশচন্দ্র মিত্র ও তাঁর পরিবারবর্গ

২৪ পরগণার দমদমের নিকটবর্তী রাজারহাট বিষ্ণুপুরের বনেদী সম্ভ্রান্ত মিত্র পরিবারে দি অনারেবল রমেশচন্দ্র মিত্রের জন্ম হয়। তাঁর প্রপিতামহ কালী-প্রসাদ মিত্র নদীয়ার কালেক্টরের অধীনে সম্মানিত পদে চাকরী করতেন, ব্যক্তিগত বহু গুণের জন্যও তাঁকে জনগণ শ্রদ্ধা করতেন।

কালীপ্রসাদের পুত্র রামধন মিত্র হলেন পিতার সমগ্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, পিতার কাছে তিনি উত্তম শিক্ষা লাভ করে বাঁকুড়া জেলার বনবিষ্ণুপুরে মুন্সেফের চাকরী করতেন; তেজস্বী, ন্যায়পরায়ণ ও বুদ্ধিমান রামধনের প্রতি সরকার ও বাদীবিবাদী সকল পক্ষই সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁর পুত্র রামচাঁদ মিত্রও উত্তম শিক্ষা লাভ করেছিলেন; তিনি ছিলেন সদর দেওয়ানী আদালত (বর্তমানে হাইকোর্ট, আপীল বিভাগ)-এর সেরেস্তাদার বা জুডিশিয়াল হেডক্লার্ক।

রামচন্দ্রের ছয় পুত্র : প্রসন্নচন্দ্র (অল্প বয়সে মারা যান), উমেশচন্দ্র, কেশব চন্দ্র, কাশীচন্দ্র, প্রবোধচন্দ্র এবং অনারেবল রমেশচন্দ্র মিত্র।

উমেশচন্দ্র ইংরেজীতে সুপণ্ডিত, তিনি জমিদারী সংক্রান্ত বিষয় খুব ভাল বোঝেন; বর্তমানে তিনি বর্ধমান জেলার চকদীঘির জমিদার সারদাপ্রসন্ন রায়ের জমিদারী এস্টেটের ম্যানেজার।

শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান কেশবচন্দ্র নিজের বিষয় সম্পত্তি দেখাশোনা করেন। সচ্ছল মানুষ কেশবচন্দ্র অন্য কোন কাজ করেন না। মৃদঙ্গ বাদনে তিনি দেশজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছেন।

কাশীচন্দ্র ছোট আদালতের সম্মানিত অ্যাটর্নী।

পরলোকগত প্রবোধচন্দ্র ছিলেন হাইকোর্টের নাম করা অ্যাটর্নী।

অতি বাল্যকাল থেকেই রমেশচন্দ্রের লেখাপড়ার দিকে অসাধারণ ঝোঁক। একে সাধারণ ছেলেমেয়ের চেয়ে অনেক বেশী বুদ্ধিমান, তার ওপর অভি-ভাবক ও গৃহশিক্ষকগণের উৎসাহদান, ফলে, অল্পকালের মধ্যেই শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর প্রচুর অগ্রগতি হল। মাত্র পনের বছর বয়সেই তিনি শ্রেষ্ঠ ইংরেজ লেখকদের গ্রন্থসমূহ কারও সহায়তা না নিয়েই পড়তে ও বুঝতে পারতেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়বার সময় তিনি তাঁর সক্রিয় অনুসন্ধিৎসা এবং সহজ

বোধ শক্তির জন্য সেখানকার সুপণ্ডিত অধ্যাপকদের প্রদত্ত শিক্ষা দ্রুত আয়ত্ত করে নিতেন। সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ব্যাচেলার অব আর্টস ডিগ্রী লাভ করেন। বংশের ঐতিহ্য অনুযায়ী আইনের দিকে ঝোঁক থাকায়, তিন বৎসরের অধিককাল প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন পড়ে তিনি আইনের স্নাতক হন।

এর কিছুকাল পরে তিনি সদর দেওয়ানী আদালতে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন, পরিশ্রম সততা ও বুদ্ধিমত্তার জন্য তিনি অল্পকালের মধ্যে মক্কেলদের আস্থা অর্জনে সক্ষম হন। সদর দেওয়ানী আদালতে বছর দেড় এবং হাইকোর্টে প্রায় বার বছর ওকালতি করার পর বার-এর শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবীদের অন্যতমরূপে তিনি পরিগণিত হতে থাকেন। এই সময় (১৮৭১এ) অনারেবল অনুকূলচন্দ্র মুখার্জী পরলোক গমন করায় সরকার ঐ শূন্যপদে রমেশচন্দ্রকে নিয়োগ করতে চান।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের এবং বহু শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে রমেশ-চন্দ্র উচ্চ স্থানের অধিকারী। কেবলমাত্র কঠোর ন্যায়পরায়ণতা, নৈতিকতা বা স্বাধীনচিত্ততার জন্য তিনি বিশিষ্টতা অর্জন করেন নি, আইনে গভীর জ্ঞানের জন্যও তিনিও বিশিষ্ট। তাঁর ভদ্র, নম্র, অমায়িক আচরণ এবং পরহিতৈষণার জন্য তিনি সর্বজনের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করেছেন। বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানকে তিনি নিয়মিত চাঁদা দেন, স্বগ্রাম বিষ্ণুপুরের উন্নতির জন্য, বিশেষত এর দাতব্য চিকিৎসালয়টির উন্নতিসাধনে তিনি অর্থদান ছাড়াও, সর্বপ্রকারে চেষ্টা করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং কলকাতা ও ২৪ পরগণার বহু শিক্ষাবিষয়ক ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সদস্য।

অনারেবল শম্ভুনাথ পণ্ডিত (ভবানীপুর)

কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ সদাশিব পণ্ডিতের পুত্র শম্ভুনাথ পণ্ডিত ১৮২০তে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার অনুমতি নিয়ে তাঁর পিতৃব্য তাঁকে পোষ্য নেন। এই পিতৃব্য ছিলেন প্রাক্তন সদর দেওয়ানী আদালতে পেশকার।

কলকাতার জলবায়ু শম্ভুনাথের সহ্য না হওয়ায়, তাঁকে তাঁর মামার কাছে লখ্‌নৌতে রাখা হয়, সেখানে তিনি উর্দু ও ফার্সী শেখেন। পরে ইংরেজী শিক্ষার

তাঁকে রাখা হয় বারাণসীতে। চৌদ্দ বছর বয়সে তাঁকে কলকাতা এনে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে ভর্তি করা হল; এখানে অন্যান্য বিষয়ে ভাল করলেও, গণিতে তিনি আদৌ উন্নতি করতে পারেন নি। ১৮৪১-এ বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে, মাসিক ২০ টাকা বেতনে তিনি সদর আদালতের নথিরক্ষকের সহকারীর চাকরীতে নিযুক্ত হন। ফার্সী ও বাংলা দলিলাদি অনুবাদ করে এখানে বাড়তি কিছু রোজগারও তিনি করতেন। তাঁর এই বিদ্যার জন্য মেসার্স ম্যাকলিয়ড অ্যাণ্ড কোম্পানী তাঁর সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করত। ১৮৪৫এ তাঁকে স্যার রবার্ট বার্লোর অধীনে 'ডিক্রীজারী মুহুরার' পদে নিয়োগ করা হয়; তাঁর কাজে কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

তিনি ছিলেন ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি, তিনি 'অব দি বীইং অব গড' নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন; ১৮৪৬-এ তিনি তাঁর 'নোটস্ অ্যাণ্ড কমেণ্টস্ অন বেকন্স্ এসেজ' প্রকাশ করেন; ক্যাপটেন রিচার্ডসন এই পুস্তকের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁর 'অন দি ল রিলেটিং টু দি একজিকিউটার্স অব ডিক্রীজ' নামক পুস্তিকাখানি সরকার ও সদর আদালতের বিচারকগণের অনুমোদন লাভ করে।

এর কিছুদিন পরে শম্ভুনাথ রীডার পদের জন্য আবেদন করেন, কিন্তু ঐ পদ না পাওয়ায় হতাশ হয়ে তিনি স্থির করেন সদর আদালতের ব্যবহারজীবী হবেন। উক্ত আদালতের রেজিস্ট্রার মিঃ কারপ্যাট্রিক তাঁকে একখানি উচ্চ শ্রেণীর প্রশংসা-পত্র দেন; তার জোরে তিনি প্লীডারশিপ পরীক্ষা দেবার অনুমতি লাভ করেন ও উক্ত পরীক্ষায় বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৪৮এর ১৬ নভেম্বর তখনকার প্রথা অনুযায়ী সনদ লাভ করেন। অত্যল্পকালের মধ্যে তিনি ফৌজদারী মামলার সফল উকীল হিসাবে নাম করেন, এই সময় হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকায় তিনি আইন বিষয়ক প্রবন্ধ লিখতে থাকেন, এগুলি পড়ে বিচারকগণ খুশী হতেন। স্কুল বুক সোসাইটি পিয়ারসনের 'বাক্যাবলী' পুনর্মুদ্রণ করবার জন্য প্রস্তুত হলে, অনারেবল মিঃ বেথুন আইন ও আইনের সঙ্গে সম্পর্কিত কয়েক পৃষ্ঠা লিখে দেবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন; অনুরোধমত তিনি উক্ত পুস্তকের জন্য কয়েক পৃষ্ঠা লিখেও দেন।

১৮৫৩র ২৮ মার্চ সরকার তাঁকে জুনিয়র গভর্ণমেণ্ট প্লীডার নিযুক্ত করেন। এর অল্পকাল পরে 'একজন ক্রীতদাসকে হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত আমন আলি খান বাহাদুর প্রভৃতি মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের দরবার সদস্যগণের বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনার' জন্য সরকার শম্ভুনাথকে প্রেরণ করেন। ১৮৫৫তে সরকার তাঁকে মাসিক ৪০০ শত টাকা বেতনে প্রেসিডেন্সি কলেজের 'চেয়ার অব দি রেগুলেশন ল' পদে নিয়োগ করেন। এই পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন প্রায়

দু' বছর ; এখানে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলির কয়েকটি ঐ সময়ই তিনি তাঁর 'ল লেকচার্স' পুস্তকে প্রকাশ করেন। ১৮৬১তে তিনি বাবু রমাপ্রসাদ রায়ের স্থলে সিনিয়র গভর্নমেণ্ট প্লীডার পদে নিযুক্ত হন।

এর কিছুকাল পরে অনারেবল স্যার বার্নেস্ পীকক্ 'বেঞ্চে যোগদানে তিনি ইচ্ছুক কিনা তাঁকে চিঠি লিখে জানতে চান। যথা সময়ে রাজকীয় পত্র দ্বারা তাঁকে (হাইকোর্টের জজ পদে) নিয়োগ করা হয় ; রাজকীয় পত্রের সঙ্গে আসে সেক্রেটারী অব স্টেট ফর ইণ্ডিয়া স্যার চার্লস উডের একখানি ব্যক্তিগত পত্র। শম্ভুনাথ উক্ত উচ্চপদ গ্রহণ করেন।' 'লাখেরাজ সম্পত্তি সরকারে পুনর্গ্রহণ সম্পর্কিত মামলাসমূহের নিষ্পত্তিতে চীফ জাস্টিসের সঙ্গে সক্রিয় অংশ নেওয়ায়' তিনি সবিশেষ গুরুত্ব লাভ করেন। মামলার নিষ্পত্তিতে শম্ভুনাথ সব সময় ন্যায়পরায়ণ থাকতেন বলে সকল শ্রেণীর মানুষই তাঁকে পছন্দ করতেন।

স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে তিনি উৎসাহী ছিলেন ; তিনিই প্রথম তাঁর মেয়েকে মিঃ বেথুনের বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। তাঁর জীবনধারণের পদ্ধতি ছিল সরল ও সাদাসিধা ; সকলের সঙ্গে ব্যবহারে তিনি ছিলেন ভদ্র, নম্র ও অমায়িক। তাঁর চরিত্রের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল তাঁর দানশীলতা। তাঁর উপার্জনের এক তৃতীয়াংশ তিনি রেখে দিতেন দরিদ্রদের চিকিৎসা ও ঔষধে ব্যয়ের জন্য ; তাছাড়া তিনি বহু অনাথ ও অভাবী ছাত্রের বিদ্যালয়ে পড়ার সকল ব্যয় বহন করতেন। ছিপে মাছ ধরা ছিল তাঁর প্রিয় পেশা আর ভালবাসতেন জাতীয় সকল প্রকার খেলাধূলা।

শম্ভুনাথ মাত্র ৪২ বছর বয়সে, ১৮৬৭র ৬ জুন, কার্বাঙ্কলে ভুগে মারা যান। তাঁর মৃত্যুতে হাইকোর্টের বিচারকবৃন্দ, বন্ধুবান্ধব ও গুণমুগ্ধ ব্যক্তিগণ গভীর শোক প্রকাশ করেন। তিনি দুই পুত্র রেখে গেছেন, জ্যেষ্ঠ প্রাণনাথ এম এ বি এল, সংস্কৃত নিয়ে এম এ পাস এবং সরস্বতী উপাধি লাভ করেন। কনিষ্ঠ বিশ্বম্ভরনাথ এখনও সংস্কৃত কলেজের ছাত্র।

এখন প্রাণনাথ হাইকোর্টে জুনিয়র অ্যাডভোকেট। কলকাতার নিকটবর্তী ভবানীপুরে পৈতৃক বাসভবনে দুই ভাই বাস করছেন।

শোভাবাজারের নন্দরাম সেনের পরিবারবর্গ

কায়স্থ বংশীয় নন্দরাম সেন ছিলেন ঢাকার কমার্শিয়াল রেসিডেন্টের দেওয়ান। তিনি বাস করতেন শোভাবাজারে। দান ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের জন্য তাঁর খ্যাতি ছিল। জনগণের মধ্যে দারুণ জলকষ্ট দেখা দিলে তিনি বারাসাত, হুগলি প্রভৃতি স্থানে প্রায় বারটি পুষ্করিণী খনন করান। নন্দরাম সেন স্ট্রীটটির নামকরণ হয়েছিল তাঁরই নাম অনুসারে; এই পথের পাশে তিনি মহাদেবের বিরাট মন্দির নির্মাণ করান। বারাসাতের বেশ কয়েকজন ব্রাহ্মণকে তিনি ভূমি দান করেছিলেন; তাঁদের বংশধরগণ এখনও সেই জমি ভোগদখল করছেন। এই বংশে তাঁর পরবর্তী পুরুষ রামচন্দ্র সেন ও গোবিন্দচন্দ্র সেন। ভাষাবিৎ গোবিন্দচন্দ্র জানতেন ইংরেজী, ফরাসী, বাংলা, সংস্কৃত, উর্দু ও ফার্সী ভাষাসমূহ। আশী বৎসর বয়সে তিনি সংস্কৃতে 'কাশীখণ্ড' গ্রন্থটি রচনা করেন, গ্রন্থখানি হিন্দুদের ঘরে ঘরে এখনও ব্যবহৃত হচ্ছে। তিনি চার পুত্র রেখে যান। তাঁদের মধ্যে জয়ন্তীচন্দ্র 'বত্রিশ সিংহাসন' ও 'শ্রীসীতানবমীব্রত' নামক দু'খানি বই লেখেন। বত্রিশ সিংহাসনের বিক্রয়লব্ধ যাবতীয় অর্থ তিনি দরিদ্রদের মঙ্গলের জন্য জেলা দাতব্য সমিতিকে নিয়মিত দান করেন। তাঁর পাঁচ পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শরৎচন্দ্র 'প্লিজিং কোড' নামক একখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন।

সেন পরিবারের পূর্বের সে প্রাচুর্য আর নাই। বেগুণ্টায় তাঁদের একখানি ছোট তালুক ও কলকাতায় কিছু বাড়ী ও ভূসম্পত্তি আছে।

বাগবাজারের নিধুরাম বসুর পরিবারবর্গ

গৌড়ের পতনের পর মুক্তরাম বসুর ২১শ পুরুষ দেওয়ান নিধুরাম গৌড় ছেড়ে মীনাগড়ে বাস করতে চলে আসেন।

ইংরেজরা কলকাতায় উপনিবেশ স্থাপন করবার বহু পূর্বেই নিধুরাম বাগবাজার

অঞ্চলে বাসস্থান স্থাপন করেন। এঁর ছয় পুত্রের প্রত্যেকেই ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু। তাঁরা দাতা হিসাবে খ্যাত ছিলেন। মধ্যম রামচরণের পৌত্র মোহনচাঁদ ছিলেন কবি এবং অপেশাদার সংগীত শিল্পী ; হাফ্ আখড়াইয়ের গান লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। তৃতীয় পুত্র শ্যামাচরণের পৌত্র গোপীকৃষ্ণ ছিলেন তাঁর কালের কলকাতার শ্রেষ্ঠ অপেশাদার চিত্রশিল্পী। গোপীকৃষ্ণের নাতি কালীকিঙ্কর বর্ধমান জেলার অজয় নদের তীরে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র পরিচালনা করছেন।

এককালের ধনী এই পরিবারটির আর্থিক অবস্থা এখন বড় শোচনীয়।

জোড়াসাঁকোর পাল পরিবার

তিলি বংশীয় কালীচরণ পাল থেকে কলকাতায় এই বংশের সূত্রপাত। এঁর তিন পুত্র—নাথু, দয়ারাম ও রাধাচরণ। তিনজনেই দান ও ধর্মনিষ্ঠার জন্য খ্যাতি-লাভ করেছিলেন। কলকাতার উপকণ্ঠের মানুষদের জলকষ্ট নিবারণের জন্য এঁরা কয়েকটি পানীয় জলের পুকুর কাটিয়ে দেন।

রাধাচরণের বর্তমানে একমাত্র জীবিত পুত্র রামগোবিন্দের মধ্যেও পিতৃপুরুষের সকল সদ্গুণ বর্তমান। ধর্মকর্ম ও দানধ্যানে তিনি বহু সময় ও অর্থ ব্যয় করেন। কালীঘাট মন্দিরে যাবার পথটি তীর্থযাত্রীদের উপকারার্থ তিনি নিজ ব্যয়ে চুণার পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে দেন ; এজন্য তাঁর ব্যয় হয় ২,৫০০ টাকা। এ ছাড়া খড়দহ শ্মশানযাত্রীদের জন্য তিনি একটি বিশ্রাম-নিবাসসহ একটি ঘাট নির্মাণ করিয়ে দেন ; এই বাবদ তাঁর ব্যয় হয় ২৪,০০০ টাকা। এর ফলে জনগণের বহুকালের একটি অসুবিধা দূর হয়। তাঁর এই সৎ কাজের জন্য জনগণ ও সরকার, সকল পক্ষই সাধুবাদ জানান।

চোরবাগানের পিয়ারীচরণ সরকার ও তাঁর পরিবারবর্গ

শিবরাম সরকার থেকে এই বংশের সূত্রপাত। তাঁর পিতার নাম ইন্দ্রনারায়ণ সরকার এবং পিতামহের নাম ছিল বিশ্বেশ্বরদাস দাস।

জাতিতে এঁরা কায়স্থ। বিশ্বেশ্বরের জন্ম হয় ১৬৮১ খ্রীস্টাব্দে। তাঁদের নিবাস ছিল হুগলী জেলার তারা গ্রামে। বিশ্বেশ্বর ছিলেন নবাব সরকারের তহ্শিলদার। হিসাবে ও জমিদারীর কাজে বিশেষ দক্ষতার জন্য নবাব তাঁকে সরকার পদবী দেন। তখন থেকে পরিবারটির পদবী হয় সরকার। ১৭৫৯ খ্রীস্টাব্দে ৭৮ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি রেখে যান তাঁর একমাত্র পুত্র ইন্দ্রনারায়ণকে। ইন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হয় ১৭৬৩তে; তখন তাঁর বয়স ৬২ বৎসর। তিনিও রেখে যান একমাত্র পুত্র শিবরামকে।

শিবরামের জন্ম হয় ১৭২২এ; জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি কাটান তাঁর স্বগ্রাম তারায়। ১৭৯১এ তিনি গ্রাম ছেড়ে কলকাতা চলে আসেন; তখন তাঁর বয়স ৬৯ বৎসর। চোরবাগানের মুক্তারাম বাবু স্ট্রীটে একখানি বাড়ি কিনে সপরিবারে বসবাস করতে থাকেন। কিন্তু বেশী দিন তিনি বাড়ি ভোগ করতে পারেন নি; এর ছ' বৎসর পর তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর দুই পুত্র তারিণীচরণ ও ভৈরবচন্দ্র এবং স্ত্রী ধনমণি দাসীকে রেখে যান। তারিণীচরণ ও ভৈরবচন্দ্রের বয়স তখন যথাক্রমে তের ও আট। আঁটপুরের কৃষ্ণমোহন মিত্রের কন্যা এই ধনমণি শেষ বয়সে তীর্থযাত্রা করেন; বরাণসীতে তাঁর মৃত্যু হয় ১৮৪৮এ; তখন তাঁর বয়স ১১৫ বৎসর।

অল্প বয়সে পিতৃহীন হয়ে দুই ভাই, তারিণীচরণ ও ভৈরবচন্দ্র আত্মনির্ভরশীলতার গুরুত্ব বুঝতে পারেন; সহজাত বুদ্ধিবলে ও কঠোর শ্রম করে তাঁরা সামান্য কিছু ইংরেজী শিখে নিয়ে বিখ্যাত থ্যাকার স্পিঙ্ক কোম্পানীতে শিক্ষানবিশ হিসাবে প্রবেশ করেন। তাঁদের সততা ও কর্মদক্ষতার গুণে তাঁরা অল্পকালের মধ্যেই কর্তৃপক্ষের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। তাঁদের আস্থা অর্জন করেন। প্রতিষ্ঠানটির বেনিয়ান হতে তারিণীচরণের বিলম্ব হল না; তখন দুই ভাই মিলিতভাবে সততা ও পরিশ্রম সহকারে কাজ করে প্রতিষ্ঠানটির সমৃদ্ধিসাধনে প্রভূত পরিমাণে সহায়ক হয়ে উঠলেন। দাদার সহকারী হওয়া ছাড়াও, ভৈরব বন্দরে আগত জাহাজে খাদ্যদ্রব্যাদি সরবরাহ করে নিজেও পৃথকভাবে উপার্জন করতে থাকেন। দুজনেই ছিলেন ধর্মপ্রাণ ও দানশীল। ছোট ভাই ভৈরব ছিলেন সরল, সাদাসিধে মানুষ, দাদার চেয়ে তাঁর সাংসারিক আসক্তি কম ছিল। যা কিছু তিনি উপার্জন করতেন, সে সবই ব্যয় হয়ে যেত দান ও ধর্মকর্মে। তাঁর জীবনের একমাত্র কামনা ছিল সাড়ম্বরে হিন্দু পূজাপার্বণের অনুষ্ঠান ও দরিদ্রনারায়ণকে ভূরিভোজে আপ্যায়ন। তারিণীচরণ মারা যান ১৮৩৯-এ; তখন তাঁর বয়স ৫৫ বৎসর। মৃত্যুকালে তিনি রেখে যান তাঁর স্ত্রী এবং তিন পুত্র: পবিত্রকাচরণ, প্রেমচাঁদ এবং রাজকিশোর; তাঁর স্ত্রী তারামণি ছিলেন খানাকুলের গোকুল বোসের কন্যা; এঁর মৃত্যু হয় ১৮৬৬ সালে।

ভৈরবচন্দ্রের জন্ম ১৭৮৯-তে এবং বংশের ধারা অপেক্ষা অল্প বয়সে, ১৮৩৮-এ, তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, চার পুত্র ও তিন কন্যা রেখে যান। তাঁর স্ত্রী দ্রবময়ী ছিলেন চোরবাগানের গোকুলচন্দ্র বসুর পৌত্রী এবং ভৈরবচন্দ্র বসুর কন্যা। দ্রবময়ী এখনও জীবিত আছেন; তাঁর বর্তমান বয়স ৮৫ বৎসর। ভৈরবচন্দ্রের চার পুত্রের নাম পার্বতীচরণ, প্রসন্নকুমার, পিয়ারীচরণ, এবং রামচন্দ্র।

পার্বতীচরণের জন্ম হয় কলকাতায় ১৮১১ খ্রীস্টাব্দে। তিনি ডেভিড হেয়ারের প্রিয়পাত্র এবং পুরাতন হিন্দু কলেজের বিশিষ্ট ছাত্র ছিলেন। কলেজের পড়া শেষ হলে তাঁকে ঢাকা স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। সেখানে গিয়ে তিনি পুরাতনপন্থীদের প্রতিকূলতার মুখে পড়লেন; তাঁরা তাদের পুত্রদের ইংরেজী তথা ইংরেজী-কেতার শিক্ষা নিতে দেবেন না; এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে শান্তভাবে অগ্রসর হয়ে, তাঁদের ধীরে ধীরে বুঝিয়ে তিনি সেখানে স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন—এই স্কুলটিই ক্রমে বর্তমান ঢাকা কলেজে উন্নীত হয়। এখানে প্রায় তিন বৎসর শিক্ষকতা করে তিনি স্থানীয় জনগণের প্রভূত শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করেন। ঢাকা থেকে তাঁকে হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলের প্রধান শিক্ষক করে বদলী করা হয়। তাঁর প্রজ্ঞা ও নৈতিক শৃঙ্খলাবোধের দ্বারা অল্পকালের মধ্যে তিনি বিদ্যালয়ে একটি নতুন চেতনার সূচনা করেন; ফলে, অনতিবিলম্বে এই স্কুলটি হয়ে ওঠে বাংলার শ্রেষ্ঠ বিদ্যায়তনগুলির অন্যতম। পার্বতীচরণ ছিলেন স্বাস্থ্যবান, সুদর্শন, বন্ধুবৎসল এবং সদালাপী। তাঁর বন্ধুও ছিলেন বহু। অল্প বয়স থেকেই তিনি ছিলেন সঙ্গীতপ্রিয়, সবচেয়ে আনন্দ পেতেন সেতার-বাদনে।

কর্মব্যস্ত জনহিতৈষী পার্বতীচরণ অকালে, ১৮৪৩-এর ১১ নভেম্বর কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করেন; তাঁর এই অকালমৃত্যুতে তাঁর বন্ধুগণ, কি ইওরোপীয় কি ভারতীয় সকলেই শোকাভিভূত হন। শিক্ষা-বিভাগের তিনি অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন; শিক্ষাপর্ষদ একটি প্রস্তাবে তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন। দর্জিপাড়ার কুলীন কায়স্থ দুর্গাচরণ মিত্রের অন্যতম পৌত্র হরচন্দ্র মিত্রের কন্যার সঙ্গে পার্বতীচরণের বিয়ে হয়েছিল। মৃত্যুকালে পার্বতীচরণ স্ত্রী ও চার পুত্র রেখে যান। পতিপ্রাণা স্ত্রী পতির সঙ্গে পরলোকে মিলিত হবার আশায়, স্বামীর মৃত্যুর মুহূর্ত থেকেই খাদ্য পানীয় ত্যাগ করেন; এই অবস্থায় কোনপ্রকারে তিন মাস জীবিত থাকার পর ১৮৪৪-এর ২২ ফেব্রুয়ারী তাঁর মৃত্যু হয়। চার পুত্রের মধ্যে দুজন অল্প বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। জ্যেষ্ঠ গোপালচন্দ্র এবং মধ্যম ভুবনমোহন এখনও জীবিত আছেন। যথাস্থানে তাঁদের প্রসঙ্গ আলোচনা করব।

ভৈরবচন্দ্রের মধ্যমপুত্র প্রসন্নকুমারের জন্ম হয় ১৮২১-এ। তিনি কলুটোলা

ব্রাঞ্চ স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। ১৮৭৭-এ তাঁর মৃত্যু হয়; মৃত্যুকালে তিনি এক পুত্র, উপেন্দ্রচন্দ্র, এবং এক কন্যা রেখে যান। উপেন্দ্রচন্দ্র পোর্ট কমিশনার্সে চাকরী করেন।

ভৈরবচরণের তৃতীয় পুত্র পিয়ারীচরণ সরকারের জন্ম হয় কলকাতায়, ১৮২৩-এর ২৩ জানুয়ারী। 'ভারতীয় শিক্ষার জনক' ডেভিড হেয়ারের তত্ত্বাবধানেই তাঁর শিক্ষা শুরু হয়। শিক্ষারম্ভ হেয়ার স্কুলে, সেখান থেকে তিনি উন্নীত হন (তখনকার) হিন্দু কলেজে। তাঁর ছাত্রজীবন ছিল অত্যন্ত উজ্জ্বল; এখানকার সর্বোচ্চ পুরস্কার ও বৃত্তি তিনিই অর্জন করেছিলেন—বৃত্তিটি তিনি বেশ কয়েক বছর ভোগ করেন। তাঁর কর্মজীবন আরম্ভ হয় হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলের শিক্ষকরূপে। পরে, তাঁকে বারাসাত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ করা হয়। তাঁর পরিচালনার গুণে বারাসাত বিদ্যালয়টি অল্পকালের মধ্যে বাংলার শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়-গুলির অন্যতম হয়ে ওঠে। এখানে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁরই উদ্যোগে এখানে একটি ছাত্রাবাস ও একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর সারল্য, অমায়িকতা এবং সদাশয়তার গুণে তিনি শুধু তাঁর ছাত্রদেরই একান্ত আপনজন হয়ে ওঠেন নি, স্থানীয় জনগণেরও তিনি অশেষ প্রীতি ও শ্রদ্ধাভাজন হন। বারাসাত থেকে চলে আসার সময় সত্যসত্যই জনগণ তাঁকে চোখের জলে বিদায় জানান। এরপর তাঁকে হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে নিয়োগ করা হয়। তাঁর পরিচালনগুণে কয়েক বৎসরের মধ্যেই বিদ্যালয়টি সর্বশ্রেষ্ঠ সরকারী স্কুলে পরিণত হয়। কয়েক বৎসর পূর্বে তাঁকে প্রেসিডেন্সি কলেজের সাহিত্যের সহকারী অধ্যাপকের পদে উন্নীত করা হয়েছে—তাঁর অর্জিত বিপুল জ্ঞানরাশি এখানে পূর্ণরূপে প্রকাশিত হবার ক্ষেত্র লাভ করেছে। ইংরেজী সাহিত্য থেকে দুরূহ জটিল গদ্য বা পদ্যাংশ পড়াবার সময় চিরায়ত সাহিত্য থেকে উদ্ধৃতি ও উদাহরণ দিয়ে, কাহিনী, কিংবদন্তী বলে যেভাবে তিনি ব্যাখ্যা করতেন, সে দেখবার মতো, শোনবার মতো—তিনি যা পড়াতেন, বোঝাতেন, ছাত্রদের মনে তার স্থায়ী ছাপ পড়ে যেত। ছাত্রদের তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন, তাঁদের তিনি কখনও দূরে সরিয়ে রাখতেন না—এটাই ছিল তাঁর সাফল্যের প্রধান কারণ। তাঁদের সঙ্গে মেলামেশায় তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ প্রশান্তভাব, অত্যন্ত জেদী বিরুদ্ধভাবাপন্ন ছাত্রকেও বশীভূত করে ফেলত। গুরুমশায়ের বেত কখনও তাঁর হাতে ওঠেনি—তাঁর পড়ানোর আবেদন ছিল ছাত্রদের অন্তরে। তিনি যেমন তাঁর ছাত্রদের ভালবাসতেন, ছাত্ররাও তেমনি তাঁকে ভালবাসত। আজকের উঠতি যুবাদের অনেকেই এর সত্যতা স্বীকার করবেন। বাবু পিয়ারীচরণ কখনও ভাবতেন না যে, ক্লাস ঘরেই তাঁর কর্তব্য শেষ হয়ে গেল—ক্লাস ঘরের বাইরেও তিনি তাদের উন্নতি ও মঙ্গলের জন্য একইভাবে চিন্তা ও চেষ্টা করতেন। আক্ষরিক অর্থে-ই তিনি ছিলেন শিক্ষার শুভঙ্কর। দরিদ্র ছাত্ররা সরকারী বিদ্যালয়ে যেতে

পারে না দেখে তিনি চোরবাগানে 'চোরবাগান প্রিপেরেটরী স্কুল'টি স্থাপন ও কয়েক বৎসর যাবৎ এর ব্যয় নির্বাহ করেন। অভাবগ্রস্ত বহু ছাত্রকে তিনি অর্থ, বস্ত্র ও পুস্তকাদি দিয়ে সাহায্য করতেন। তিনি স্ত্রীশিক্ষার প্রসারেও উৎসাহী ছিলেন; ঐ পল্লীতে তিনি একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, সেটি এখনও বিদ্যমান। তিনি বিধবা বিবাহেরও উৎসাহী সমর্থক ছিলেন; এ-বিষয়ে তিনি তাঁর বন্ধুবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রশংসনীয় কর্মোদ্যোগকে সমর্থন করতেন। এই আন্দোলনের প্রসারের জন্য তিনি অর্থ ব্যয় করতে বা পরিশ্রম করতে কুণ্ঠিত হতেন না। দেশীয় সমাজে মদ্যপানজনিত কুফল লক্ষ্য করে তিনি 'বেঙ্গল টেমপারেন্স সোসাইটি' স্থাপন করেন। আশানুরূপ সাফল্যের সঙ্গে এই সমিতি কাজ করতে পারে নি, সে কথা সত্য হলেও নব্য যুবকদের ওপর এর প্রভূত প্রভাব পড়েছিল। এই বিষয়েই তিনি 'ওয়েল উইশার' নামে একখানি পত্রিকা প্রশংসনীয় ভাবে কয়েক বৎসর পরিচালনা করেন। কিছুকালের জন্য তিনি 'এডুকেশন গেজেট' সম্পাদনার দায়িত্বেও ছিলেন। স্বভাবতই তিনি ছিলেন দানশীল, দরিদ্রের বন্ধু, অথচ বণিকদের মতো ধনাঢ্য মানুষ তিনি ছিলেন না; ১৮৬৬-র দুর্ভিক্ষের সময় তিনি দুর্ভিক্ষপীড়িতদের জন্য অন্নবস্ত্রের সংস্থান করবার উদ্দেশ্যে সবিশেষ কর্মব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

শিক্ষা ও সাহিত্যক্ষেত্রে বাবু পিয়ারীচরণ যে স্বাক্ষর রেখে গেছেন তার জন্য তিনি অবশ্যই স্মরণীয়, তবে জনগণের মনে তিনি ভালবাসার স্থান অধিকার করে আছেন তাঁর উজ্জ্বল নৈতিক গুণাবলীর জন্য। তাঁর মধ্যে কোন কপটতা ছিল না। বিনয়ী, বিবেকী, সৎ এই মানুষটি কারও ওপর কর্তৃত্ব করতে চাইতেন না। দানশীল হলেও তার কোন প্রচার ছিল না, বাহ্য প্রকাশও ছিল না। ইংরেজী শিক্ষার তিনি ছিলেন চরমোৎকৃষ্ট নিদর্শন; যাঁরা সরকার পরিচালিত ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা-ব্যবস্থার পক্ষপাতী, তাঁরা এই আদর্শ বাঙালী ভদ্রলোকের জীবনী অনুধাবন করলে ভাল করবেন। ৪ অক্টোবর, ১৮৭৫-এর হিন্দু পেট্রিয়টের মতে, তাঁর মৃত্যুতে পারিবারিক ক্ষেত্রে, বন্ধুমহলে এবং দেশের বৃহত্তর সামাজিক ক্ষেত্রে যে স্থান শূন্য হল তা সহজে পূর্ণ হবে না। হাটখোলার মাণিকরাম বসুর পৌত্র শিবনারায়ণ বসুর চতুর্থ কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। আমৃত্যু তিনি ছিলেন মাতৃভক্ত। হিন্দু পেট্রিয়টের মতে, তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ ভারতীয় শিক্ষক এবং প্রাচ্যের আর্নল্ড।

দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি কঠিন বহুমূত্র রোগে ভুগছিলেন; এই রোগেই ১৮৭৫-এর ৩০ সেপ্টেম্বর বেলা সাড়ে বারোটায় তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যু-সংবাদ পাওয়া-মাত্র প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ টনির নির্দেশ অনুযায়ী প্রেসিডেন্সি কলেজ, হিন্দু স্কুল ও হেয়ার স্কুল ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। মিঃ টনির সভাপতিত্বে

.হুষ্ঠিত এক সভায় প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রগণ এই শিক্ষাব্রতীর স্মৃতিরক্ষার্থে গদা তুলতে আরম্ভ করেন; এই কলেজের ছাত্রগণ বাইরের দেশীয় জনগণের মতো, তাঁর মৃত্যুতে স্বজনবিয়োগের শোক অনুভব করেন।

পিয়ারীচরণ রেখে যান পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা। জ্যেষ্ঠ যোগেন্দ্রনাথ শিক্ষা সম্পূর্ণ করবার জন্য ইংল্যাণ্ড যান, সেখান থেকে তিনি ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফেরেন; মধ্যম নগেন্দ্রনাথ বি এ পাস করে এখন মেদিনীপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট-রূপে কর্মে নিযুক্ত আছেন।

ভৈরবচন্দ্রের চতুর্থ পুত্র রামচন্দ্র অল্প বয়সে মারা যান, তাঁর জন্ম ১৮২৭-এ এবং মৃত্যু হয় ১৮৫৬তে—তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৯ বৎসর। তাঁর দুই পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ও নরেন্দ্রনাথ। এঁরা দুজনেই এম এ বি এল পাস করে ওকালতি করছেন। সুরেন্দ্রনাথ স্মল জজ কোর্টের উকিল।

পার্বতীচরণের দুই পুত্র গোপালচন্দ্র এবং ভুবনমোহন পিতৃহারা হবার পর স্নেহময় ও শ্রদ্ধেয় পিতৃব্য পিয়ারীচরণ হলেন তাঁদের অভিভাবক; তিনি তাঁদের নিজের ছেলের মতই স্নেহ করতেন। বারাসাত নিয়ে গিয়ে তিনি তাঁদের নিজ তত্ত্বাবধানে লালন-পালন ও শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন।

বাবু গোপালচন্দ্রের জন্ম হয় ঢাকায় ১৮৩৬-এর মে মাসে। প্রেসিডেন্সি কলেজের শিক্ষা শেষ করে তিনি ওকালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও ভাগলপুরে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। বিশেষ দক্ষতা ও চারিত্রিক সততার গুণে অল্পকালের মধ্যেই তাঁর পসার জমে ওঠে; আর সেই সঙ্গে তিনি স্থানীয় জনগণের শ্রদ্ধাভক্তিও অর্জন করেন। ভাগলপুর উকিলমহলেও তিনি সম্মানিত; ফৌজদারী মামলায় তাঁর স্থান প্রথম। তাঁর কর্মদক্ষতা ও আদর্শনিষ্ঠার জন্য সরকারীমহলও তাঁকে সম্মান করেন। এখন তিনি সেখানকার অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট এবং স্থানীয় প্রায় সকল কমিটিরই সদস্য।

বাবু ভুবনমোহন সরকারের জন্ম হয় কলকাতায় ১৮৩৮এর ৪ জানুয়ারী। বাবু পিয়ারীচরণ স্বয়ং তাঁকে যত্ন সহকারে পড়াতেন; তাঁরই পরিচালনায় ভুবন-মোহন প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষালাভ করেন; ১৮৫৬তে তিনি মেডিক্যাল কলেজে ছাত্র-রূপে ভর্তি হন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেডিসিনে লাইসেনসিয়েট হন। তাঁর সর্বপ্রকারের সংযম, নগর বৈদগ্ধ্য আর রোগীদের প্রতি সহানুভূতির জন্য অল্পকালের মধ্যেই তিনি শহরের প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসকদের অন্যতম হয়ে উঠেছেন। বাবু পিয়ারীচরণের মৃত্যুর পর বাবু ভুবনমোহন বেঙ্গল টেম্‌পারেন্‌স সোসাইটির সম্পাদক হয়েছেন। চোরবাগানে স্বগৃহে তিনি একটি বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনা করছেন, তারও তিনি সম্পাদক। তিনি অন্যতম মিউনিসিপ্যাল কমিশনার এবং ডিস্ট্রিকট চ্যারিটেব্‌ল সোসাইটিতে নেটিভ কমিটির সদস্য।

মহামান্যা মহারাণী 'ভারত সম্রাজ্ঞী' উপাধি ধারণ উপলক্ষে ১৮৭৭-এর ১ জানুয়ারী কলকাতায় অনুষ্ঠিত দরবারে তাঁকে সার্টিফিকেট অব অনার দেওয়া হয়।

উচ্চ নৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী বাবু ভুবনমোহন সরকার স্বভাবতই দানশীল মানুষ; সর্বদাই তিনি দরিদ্রদের শুধু বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসাই করেন না, প্রয়োজনে অর্থও দান করেন। তাঁর ভদ্র মার্জিত আচার আচরণের জন্য তাঁর বন্ধুর সংখ্যাও বহু—এঁরা সকলেই তাঁকে যথেষ্ট সম্মান করেন।

দর্জিপাড়ার রাধাকৃষ্ণ মিত্রের পরিবারবর্গ

কুলীন কায়স্থ রাধাকৃষ্ণ মিত্রের পিতার নাম কালীপ্রসাদ মিত্র এবং পিতামহের নাম মনোহর মিত্র। বিখ্যাত ধনী রাম দুলাল দে'র জ্যেষ্ঠা কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তিনি ছিলেন অত্যন্ত গোঁড়া হিন্দু; ধর্মীয় প্রেরণায় তিনি কাশীতে শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা ও উৎসর্গ করেন। তাঁর পাঁচ পুত্র: জয়কৃষ্ণ, রাজকৃষ্ণ, গোপালকৃষ্ণ, জীবনকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণ। মধ্যম রাজকৃষ্ণ সে-সময়ের সুপ্রতিষ্ঠিত মার্কিন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহের বেনিয়ান ও এজেণ্ট হয়ে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। ব্যবসায়-বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল গভীর; নতুন ও জটিল বিষয় শেখবার আগ্রহও ছিল তাঁর প্রচুর। মৃত্যুকালে তিনি এক বুদ্ধিমান পুত্র রেখে যান—এঁর নাম অমরকৃষ্ণ।

রাধাকৃষ্ণ মিত্রের চতুর্থ পুত্র জীবনকৃষ্ণের দুই পুত্র: কুমারকৃষ্ণ ও কুমুদকৃষ্ণ। রাধাকৃষ্ণের অন্যান্য পুত্রগণ ছিলেন নিঃসন্তান।

এই পরিবারের কলকাতার ভূসম্পত্তি ও ২৪ পরগণাস্থিত জমিদারী এখন ফ্যামিলি ট্রাস্ট ফাণ্ডের পরিচালনাধীন।

বাবু কুমারকৃষ্ণ মিত্র এখন এই পরিবারের কর্তা। আগ্রহ সহকারে তিনি বিষয়সম্পত্তি দেখাশোনা করেন। এই যুবক সচ্চরিত্র এবং দানশীল। তিনি ও এই পরিবারের অন্যান্য মানুষ হিন্দুধর্মের বিধিবিধান কঠোরভাবে মেনে চলেন।

(কলকাতার) রাজেন্দ্রনাথ মিত্রের পরিবারবর্গ

কলকাতার দক্ষিণস্থ সুপরিচিত হরিনাভি গ্রামে ছিল এই পরিবারের আদি বাস। এখানেই আদিগঙ্গার একটি পুরনো খাতকে এখনো বলে মিত্রদের গঙ্গা।

এই পরিবারের ২২তম পুরুষ দাতারাম মিত্র প্রথম বসবাসের জন্য কলকাতা আসেন। ঠনঠনিয়ায় তিনি সুরম্য প্রাসাদতুল্য একটি বাসগৃহ নির্মাণ আরম্ভ করেন। এর নির্মাণ সম্পূর্ণ করেন তাঁর খ্যাতিমান পুত্র চন্দ্রশিখর মিত্র। কিন্তু গত চল্লিশ বৎসরের মধ্যে বাড়ীটি অনেক হাত-বদল হয়েছে। এখন এটি বাবু দুর্গাচরণ লাহার বাসগৃহ।

কলকাতার কায়স্থ সমাজে দাতারামের উচ্চ স্থান ছিল ; ধর্মপরায়ণতা ও ভক্তির জন্য সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। ১৮১০ সাল নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয় ; তাঁর ধর্মপ্রাণা স্ত্রী সতী হয়ে স্বামীর সহগামিনী হন। দাতারামের তিন পুত্র : মদন-মোহন, চন্দ্রশিখর এবং ভোলানাথ।

সেই সেযুগেও মদনমোহন ইংরেজী ও সংস্কৃতে তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি ছিলেন রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধু। তাঁরই সহযোগিতায় তিনি কিছু বাংলা বইয়ের ইংরেজী অনুবাদ করতে থাকেন। কিছুকাল তিনি বরিশাল কালেক্টরেটের দেওয়ান ছিলেন ; কিন্তু মাত্র ২২ বৎসর বয়সে প্রতিশ্রুতিময় এই জীবনেয় অবসান ঘটে।

চন্দ্রশিখর ছিলেন এই পরিবারের বিশিষ্ট ব্যক্তি ; ঔদার্য ও দানের জন্য তিনি য খ্যাতি অর্জন করেন, তার দ্বারা পিতার খ্যাতিও ম্লান হয়ে যায়।

ম্যারাইন বোর্ডের দেওয়ানরূপে চন্দ্রশিখর বর্মা যুদ্ধের সময় সরকারের প্রভূত উপকার সাধন করেন। উচ্চতর সরকারী অফিসারগণ তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন আর এদেশীয়গণ তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন তাঁর ধর্মপরায়ণতার জন্য। প্রতিটি পূজাই তিনি মহাধুমধামের সঙ্গে পালন করতেন, তাঁর সুবিস্তৃত আঙিনায় পূজা উপলক্ষে বিখ্যাত 'অধিকারী' পরমানন্দের যাত্রাগানের অনুষ্ঠান হতো।

রাজপুরের ধনী জমিদার দুর্গারাম করের কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়, অন্যান্য দিক থেকেও তিনি কলকাতার প্রধান প্রধান কায়স্থ পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন ; কিন্তু তিনি পরিবারের জন্য ধনসঞ্চয় করে রাখতে চাননি। আয় করতেন তিনি প্রচুর, কিন্তু দান ও ধর্মকর্মে তাঁর ব্যয় ছিল ততোধিক। অমিতব্যয়িতার

ফলে জমিদারী হাতছাড়া হয়ে গেল; সমগ্র সংসারের আর্থিক পরিস্থিতি এসে দাঁড়াল বিভ্রান্তিকর অবস্থায়। তাঁর ছোট ভাই ভোলানাথ, যিনি এতকাল দাদার একান্ত অনুরক্ত ছিলেন, লোকে বলত রাম-লক্ষ্মণ, সেই ভোলানাথ দাদার তীব্র বিরোধিতা করতে লাগলেন, এই তিক্ততা এবং বিভ্রান্তিকর আর্থিক পরিস্থিতির জন্য ভগ্নহৃদয় চন্দ্রশিখর এই সব ঘটনার অল্পকাল পরেই মাত্র ৪২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন।

ভাই ভোলানাথ অতি শোচনীয় অবস্থায় জীবনযাপন করলেও চন্দ্রশিখরের পরিবারের সঙ্গে তাঁর মারাত্মক বিরোধ চালিয়ে যেতে লাগলেন—চল্লিশ বছর ধরে এই বিরোধ চালাবার পর পৈতৃক ভদ্রাসন বিক্রী হয়ে গেলে দুই শরিক পৃথক হয়ে যায় -বিরোধেরও অবসান ঘটে। ভোলানাথের তিন ছেলে—তিন জনই এখন মৃত।

চন্দ্রশিখরের পাঁচ পুত্র: ঈশ্বরচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, গোপালচন্দ্র, কালাচাঁদ ও গোকুলচন্দ্র। কালাচাঁদের মৃত্যু হয় ১২।১৩ বৎসর বয়সে। নবীনচন্দ্র ছিলেন সুশিক্ষিত; তিনি প্রথমে জেনারেল ট্রেজারীতে চাকরী করতেন, পরে হন স্মল কজ কোর্টের অ্যাকাউন্টেন্ট; তাঁর বুদ্ধিমত্তা, ন্যায়বোধ এবং শিষ্টাচারের জন্য জজ-সাহেবরাও তাঁকে সম্মান করতেন। ১৮৫১তে মাত্র ৩৫ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর সন্তান ছিল না। কনিষ্ঠ গোকুলচন্দ্র বুদ্ধিমান কিন্তু কিছুকাল যাবৎ তিনি অসুস্থ। তিনি ধর্মতলায় বাস করেন; তাঁর দুই পুত্র। চন্দ্রশিখরের তৃতীয় পুত্র গোপালচন্দ্র খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর বর্তমান বয়স ৬০ বৎসর। তিনি শিক্ষালাভ করেন প্রথমে হেয়ার স্কুলে এবং উচ্চতর শিক্ষালাভ করেন বিশপ'স কলেজে। রেভঃ জি সি মিটার সুপণ্ডিত এবং ধার্মিক এবং বিনয়ী খ্রীস্টিয়ান। তিনি বাংলা, সংস্কৃত, ইংরেজী, গ্রীক, ল্যাটিন এবং হিব্রু ভাষায় পণ্ডিত। তিনি কালীঘাটের দক্ষিণে টালীগঞ্জে বাস করেন। বিনা পারিশ্রমিকে তিনি বালকদের শিক্ষাদান করেন। এই অঞ্চলের সকল অধিবাসীরই তিনি অতীব প্রিয়জন।

চন্দ্রশিখরের জ্যেষ্ঠ পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রের যৌবন পর্যন্ত কাটে পারিবারিক ঐশ্বর্যে। সে গৌরব অস্তমিত হওয়ায় তিনিই সব থেকে বেশী আঘাত পান; তিনি অসাধারণ স্থৈর্যের সঙ্গে বর্তমানের দুরবস্থা মেনে নেন। হতাশায় ভেঙে না পড়ে তিনি ধৈর্যের সঙ্গে সুদিনের অপেক্ষা করতে থাকেন। ব্যক্তিগত জীবনে সৎ ও ধার্মিক ঈশ্বরচন্দ্র দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে সৎভাবে এবং ধর্মপথে থাকলে পিতৃপিতামহের গৌরবের দিন আবার ফিরে আসবে। এখন তাঁর একমাত্র লক্ষ্য হল পাঁচ পুত্রকে সুশিক্ষিত করে তোলা; নিজে তিনি হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করেছিলেন; এবং স্বয়ং ছেলেদের শিক্ষায় সহায়তা করতে লাগলেন। ৬৭ বৎসর বয়সে ১৮৭৪এর এপ্রিল মাসে তাঁর মৃত্যু হয়; কিন্তু এই তৃপ্তি নিয়ে তিনি মরতে পেরেছিলেন যে কনিষ্ঠ

পুত্র ব্যতীত অন্য সকলেই প্রেসিডেন্সি কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করতে পেরেছেন এবং জীবিকার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিতও হতে পেরেছেন। তাঁর পাঁচ পুত্র হলেন: রাজেন্দ্রনাথ, মহেন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ এবং যোগেন্দ্রনাথ।

পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর রাজেন্দ্রনাথ প্রায় ৯ বৎসর বয়সে হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন; সেখান থেকে ১৮৪৮এ তাঁকে ভর্তি করা হয় প্রেসিডেন্সি (তখন হিন্দু) কলেজে। এখানে তিনি দু'টি জুনিয়র এবং পাঁচটি সিনিয়র স্কলারশিপ লাভ করেন; কলেজী শিক্ষা জীবনের শেষ বৎসরে ১৮৫৪-৫৫তে তিনি বাংলার সব কলেজের মধ্যে প্রথম স্থানের অধিকারী হন। এই কলেজের আইন বিভাগেও তিনি ভাল ফল করেছিলেন; আইন পরীক্ষায় তিনি পুরস্কার ও ডিপ্লোমার সঙ্গে সম্মানসূচক প্রশংসাপত্র লাভ করেন; ফলে তিনি সদর (এখন, হাই) কোর্টে প্র্যাকটিস করবার অধিকারী হন, মুনসেফের চাকরীর উপযোগী শিক্ষাগত যোগ্যতাও অর্জিত হয়। ১৮৬১তে তিনি সদর আদালতে উকিল হিসাবে তাঁর নাম নথিভুক্ত করান। কিন্তু তাঁর কলেজ জীবনে, কলেজ কর্তৃপক্ষের জোর সুপারিশক্রমে বাংলা সরকারের সচিব স্যার উইলিয়াম গ্রে তাঁকে ১৮৫৫তে বেঙ্গল অফিসে নিয়োগ করেছিলেন; ওকালতি না করে এই অফিসে থাকা শ্রেয় বিবেচনা করে তিনি চাকরী করতে থাকেন; এই অফিসে, হেড অ্যাসিস্ট্যাণ্ট, রেজিস্ট্রার প্রভৃতি স্তরগুলি পার হয়ে তিনি বাংলা সরকারের সচিবের পদে উন্নীত হন—এই পদেই তিনি এখন মর্যাদার সঙ্গে অধিষ্ঠিত আছেন। চার নম্বর ওয়ার্ড থেকে তিনি ক্যালকাটা টাউনের নির্বাচিত কমিশনার, বেথুন সোসাইটির অবৈতনিক সম্পাদক এবং বেঙ্গল সোশ্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য। তাঁর বর্তমান বয়স ৪৭ বৎসর; তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র খগেন্দ্রনাথ কিছুদিন পূর্বে ঢাকার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেকটর নিযুক্ত হয়েছেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যমপুত্র মহেন্দ্রনাথও তাঁর প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন হেয়ার স্কুলে এবং পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। বিখ্যাত ব্যারিস্টার মিঃ এ টি টি পিটারসনের অধীনে চাকরীর মধ্য দিয়ে তাঁর কর্মজীবনের সূত্রপাত হয়; তারপর তিনি ঈ বি রেলওয়েতে চাকরী করেন। কয়েক বৎসর চাকরী করার পর তিনি ব্যবসায় করবার জন্য চাকরী ছেড়ে দেন; শুরু করেন ঠিকাদারী এবং মাল সরবরাহের ব্যবসায়: বুদ্ধিমান ও পরিশ্রমী হওয়া সত্ত্বেও স্বাধীন পেশায় সফল হতে পারলেন না। এখন তিনি ই আই আর অফিসে চাকরী করছেন। তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও ব্যবসায়ী স্বভাবের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তিনি প্রিয়পাত্র। তাঁর বর্তমান বয়স ৪৩ বৎসর।

ঈশ্বরচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র উপেন্দ্রনাথের এখন বয়স ৩৭ বৎসর; তিনি এম এ বি এল। ১৮৬৩তে কলেজ ছাড়ার পর তিনি ঢাকা কলেজের লেকচারার হন; পরে

হন সেখানকার সরকারী উকিল। এখন তিনি কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় করছেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের চতুর্থ পুত্র সুরেন্দ্রনাথ। এখন তাঁর বয়স ৩০। তিনি বাংলা সরকারের সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যাণ্ট পদে চাকরী করছেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের পঞ্চম পুত্র খগেন্দ্রনাথ ল' পাস করে তিন বৎসর ঢাকা জজ কোর্টে প্র্যাক্‌টিস করার পর, এখন জলপাইগুড়িতে। নসেফের চাকরী করছেন।

দরমাহাটার রসিকলাল ঘোষের পরিবারবর্গ

ফরাসী সরকারের দেওয়ান কালীচরণ ঘোষ থেকে এই বংশের ইতিহাসের সূত্রপাত। কালীচরণের পুত্র রামদুলাল চন্দননগর ছেড়ে কলকাতায় বসবাসের জন্য চলে আসেন—সে সময় ইংরেজরা এখানে কেনাবেচার ব্যবসায় শুরু করেছেন। পর্তুগীজ বণিকদের কলকাতার এজেণ্ট হয়ে তিনি ধনী হয়ে ওঠেন। ইওরোপীয় ও দেশীয় উচ্চতর সমাজের মহাসমারোহপূর্ণ কত রজনী যেখানে অতিবাহিত হয়েছে, এদেশীয় অভিজাত মহল যেখানে মহামান্য প্রিন্স অব ওয়েলেস্‌কে সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন, সেই সুবিখ্যাত 'বেলগাছিয়া ভিলা' প্রথমে ছিল এই রামদুলাল ঘোষের 'বাগানবাড়ী'; তাঁর কাছে থেকে বাগানবাড়ীটি কিনে দ্বারকানাথ ঠাকুর তার বহু প্রকার উন্নতিসাধন করে নাম দেন 'বেলগাছিয়া ভিলা'। এই সুন্দর 'ভিলা' এখন পাইকপাড়ার রাজাদের সম্পত্তি। রামদুলালের মৃত্যু হয় ১০৮ বৎসর বয়সে। তাঁর পুত্র রামধন ঘোষও কয়েকটি ইওরোপীয় বণিক প্রতিষ্ঠানের এজেণ্ট ছিলেন—এই রামধনই ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম নীলকুঠির প্রতিষ্ঠাতা—তাঁর নীলকুঠি ছিল বিহারে। নীলের ব্যবসায়ে এবং ভগ্নীপতির (বা শ্যালকের) জামিনদার হয়ে রামদুলাল সর্বস্বান্ত হয়ে যান, তাঁর সকল সম্পত্তি বিক্রি হয়ে যায়। তাঁর তিন পুত্র: রসিকলাল, দ্বারকানাথ এবং ভুবনমোহন। এঁদের মধ্যে প্রথম দু'জন দক্ষতা, কর্মক্ষমতা এবং অনুসন্ধিৎসা দ্বারা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম হন।

রসিকলালের জন্ম হয় ১৮১৭-তে। তাঁর শিক্ষা শুরু হয় রাজা রামমোহন রায়ের বিদ্যালয়ে। মানবপ্রেমিক এবং এদেশীয়দের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা প্রসারে পরম উৎসাহী ডেভিড্ হেয়ারের কাছে থেকে রসিকলাল তাঁর ইংরেজী জ্ঞানের

জন্য প্রশংসাপত্র লাভ করেন। বীরভূমের সিংহ পরিবারে শিক্ষক হয়ে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। পরে ভারতের অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের অফিসে কেরানীর চাকরী পান তাঁর শিক্ষা, জ্ঞান ও কর্মদক্ষতার জন্য তিনি (স্যার) জে পি গ্র্যান্ট, হবহাউস, আর পি হ্যারিসন, ই পি হ্যারিসন ও বল মেপল্‌স এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন আধিকারিকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হন। ধীরে ধীরে তিনি ঐ অফিসের চীফ্ অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং পরে গেজেটেড্ অফিসারের পদে উন্নীত হন। কর্মোপলক্ষে তিনি যে সকল ইওরোপীয়ের সংস্পর্শে আসেন তাঁদের সকলেরই শ্রদ্ধা অর্জনে সক্ষম হন। রসিকলাল ধর্মপ্রাণ নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন; তাঁর চরিত্রে প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর মাতৃভক্তি; তাঁর মা ভারতের দূর দূরান্তরে অবস্থিত তীর্থক্ষেত্রে যাবার বাসনা করলে, তিনি সানন্দে সে ব্যয় বহন করেন। মহাধূমধামের সঙ্গে তিনি পূজাপার্বণের অনুষ্ঠান করতেন এবং ঐ সকল অনুষ্ঠান উপলক্ষে ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনকে যত্ন ও শ্রদ্ধার সঙ্গে আপ্যায়িত করতেন। দরিদ্রের প্রতিও তাঁর গভীর সহানুভূতি ছিল। আট পুত্র রেখে ৫২ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র গোপাললাল কুচবিহারের মাননীয় মহারাজার মুদ্রণ বিভাগের অধীক্ষক।

দ্বারকানাথও শিক্ষিত মানুষ ছিলেন। জ্যেষ্ঠের মতো তিনিও মিলিটারি অ্যাকাউন্টস অফিসে সম্মানিত পদে উন্নীত হতে পেরেছিলেন। ইনিও জ্যেষ্ঠের মতো মাতৃভক্ত ছিলেন। দুই ভাই-ই মায়ের মৃত্যুর পূর্বে পরলোকগমন করেন। মা, হরমণি দাসী পুরীধাম যান চোদ্দবার, হরিদ্বার তিনবার, বৃন্দাবন আটবার এবং অন্যান্য তীর্থক্ষেত্রেও এইভাবে ভ্রমণ করেন। শেষ বয়সে তিনি বারাণসীতে থাকতেন। সেখানে ৮৫ বৎসর বয়সে ১৮৮০-তে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি কনিষ্ঠ পুত্র ভুবনমোহন, দুই কন্যা ও বহু নাতিনাতনী রেখে যান।

রামধনের তৃতীয় পুত্র ভুবনমোহনের তিন পুত্র। তাঁর মধ্যম পুত্র দেবনাথকে তাঁর মেজদাদা দ্বারকানাথ তাঁর জীবিতকালেই পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন।

আপার চিৎপুর রোডস্থ নতুন বাজারের সাণ্ডেল পরিবার

যশোহর জেলার কোরকদি গ্রাম থেকে শিবরাম সান্যাল (বা সাণ্ডেল) কলকাতা আসেন; তখন তিনি সাধারণ ভদ্রলোকমাত্র। কলকাতায় হাটখোলার দত্ত

পরিবারের সঙ্গে মিলিতভাবে ব্যবসায় করে তিনি অত্যন্ত ধনী হয়ে ওঠেন। বাংলার বিভিন্ন জেলায় তাঁর মোট ২৪টি নীলকুঠি ছিল; আর্থিক লেনদেন ছিল মেসার্স কোলভিন কাউঙ্গি অ্যাণ্ড কোম্পানীর সঙ্গে। যশোহর ও নদীয়া জেলায় তিনি জমিদারীও ক্রয় করেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর দুই পুত্র মধুসূদন ও কালিদাসের জন্য নগদ বাষট্টি লাখ টাকা ও ঐ জমিদারী রেখে যান। পিতার মৃত্যুর পর দুই ভাই মামলা মোকদ্দমা করে ঐ অর্থ ও সম্পত্তির অধিকাংশই নষ্ট করেন।

জ্যেষ্ঠ মধুসূদন আপার চিৎপুর রোডের ওপর সুরম্য একখানি অট্টালিকা নির্মাণ করেন; তার নাম দেন 'ইণ্ডিয়ান প্যালেস' অল্পদিন পূর্বে বাবু আশুতোষ মল্লিক বাড়ীখানি কিনে নিয়ে এর সংস্কার ও উন্নতিসাধন করছেন। মধুসূদনের দুই পুত্র আনন্দচন্দ্র ও নিমচাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ আনন্দচন্দ্র এখন জীবিত আছেন।

শিবরামের কনিষ্ঠ পুত্র কালিদাস পিতৃসম্পদের স্বীয় অংশ নিয়ে ভবানীপুরে বাস করতেন।

দানের জন্য এই স্যাণ্ডেল পরিবার এককালে খ্যাত ছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই দানধর্ম স্থায়ী হতে পারল না।

বাগবাজারের সোম পরিবার

বলভদ্র সোমের বংশধর এবং কৃপারাম সোমের পুত্র রামচরণ সোমের বোসপাড়া (বাগবাজার)-য় অবস্থিত বাসগৃহটি ছিল বিরাট; এর উত্তরে ছিল নেবুবাগান বা শ্যামবাজার স্ট্রীট, দক্ষিণে প্রসন্ন চ্যাটার্জির বাড়ী, পশ্চিমে বোসপাড়া লেন আর পূর্বে ছিল কৃষ্ণ নিয়োগীর জমি। সাধারণ্যে তিনি চরণ সোম নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি তাঁর ধর্মপ্রাণতা ও ব্রাহ্মণদের প্রতি ভক্তির জন্য সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর চার পুত্র: শিবচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র, ভগবানচন্দ্র ও জগৎচন্দ্র এবং এক কন্যা হরসুন্দরী দাসী। হরসুন্দরীর বিবাহ হয় কাঁটাপুকুর (বাগবাজার)-এর বিখ্যাত দেওয়ান হরি ঘোষের কনিষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে। ১৮২৯-এর ৪ ডিসেম্বর লর্ড বেনটিংক সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করে আইন জারী করার পূর্বে এই হরসুন্দরীই কলকাতার 'শেষ সতী।

রামচরণ সোমের জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্র সোম ছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর

আগ্রায় নিযুক্ত দেওয়ান—তাঁরই তত্ত্বাবধানে ছিল সেখানকার কেল্লা ও তাজমহল। তাঁর কর্মোৎসাহ, ন্যায়ানুবর্তিতা, এবং মার্জিত আচরণের জন্য তিনি ব্রিটিশ আধিকারিকদের উচ্চ প্রশংসা অর্জনে সক্ষম হন। কলকাতাস্থ সিমলার কাঁসারীপাড়ার গুরুপ্রসাদ বসুর কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁর তিন পুত্র রামলাল, শ্যামলাল ও মাধবলাল। শ্যামলাল হিন্দু কলেজের মেধাবী ছাত্র ছিলেন। রাজা দিগম্বর মিত্র, সি এস আই ছিলেন তাঁর সহপাঠী। শিক্ষা বিভাগে চাকরী করার পর এখন তিনি অবসরভোগী। বাবু ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব ছিল। শ্যামলাল হুগলী কলেজের দক্ষ শিক্ষক ছিলেন। ইওরোপীয় অধ্যাপকগণও তাঁর সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। ছাত্র, সহকর্মী ও স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের কাছে তিনি ছিলেন শ্রদ্ধার পাত্র। দুর্ভাগ্যবশত অকালে মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি দুই পুত্র রেখে যান; তাঁদের মধ্যে কনিষ্ঠ সুরেন্দ্রনাথ এখনও জীবিত আছেন। শ্যামলালের কনিষ্ঠ ভাই মাধবলাল হেয়ার স্কুলে শিক্ষালাভের পর মেডিক্যাল কলেজ থেকে চিকিৎসা বিদ্যায় ডিপ্লোমা অর্জন করেন। তাঁকে তখন গাড়োয়াল জেলার শ্রীনগর সরকারী ডিসপেন্সারীতে সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন নিয়োগ করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত উন্মাদরোগগ্রস্ত হয়ে তিনি অকালে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি একটি শিশুপুত্র রেখে যান।

রামচরণ সোমের মধ্যম পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন অনারেবল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কটকস্থ দেওয়ান। তাঁরই তত্ত্বাবধানে ছিল সেখানকার কেল্লা। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভাল মানুষ, সৎ লোক—এজন্য অতি উচ্চস্থানীয় ইওরোপীয় আধিকারিকগণ তাঁর প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন। কাঁসারীপাড়া, সিমলার গুরুপ্রসাদ বসুর মধ্যমা কন্যার সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়। তাঁর চার পুত্র, রামকৃষ্ণ, নবকিশোর, কালীকিশোর এবং দুর্গাকিশোর। কনিষ্ঠ দুর্গাকিশোর এখন জীবিত আছেন।…

রামচরণ সোমের অবশিষ্ট দুই পুত্র, ভগবানচন্দ্র ও জগৎচন্দ্র সরকারের অধীনে কোন চাকরী করতেন না। তাঁরা নিঃসন্তান ছিলেন।

এই বংশের উল্লেখযোগ্য এখন আর কেউ জীবিত নেই।

কাঁটাপুকুর, বাগবাজারের দেওয়ান হরি ঘোষের পরিবারবর্গ

বনেদি এবং এককালে প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী এই পরিবারটি বর্তমানে দুর্দশাগ্রস্ত। এই পরিবারটি দাবী করে, আদিশূর যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থকে কনৌজ থেকে আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন, তাঁদের অন্যতম মকরন্দ ঘোষ থেকে এই বংশের সূত্রপাত। রাজআমন্ত্রিত মকরন্দ ঘোষ স্থান লাভ করেন গৌড়ের রাজদরবারে। গৌড়েই তিনি সপরিবারে বসবাস করতে থাকেন। ষষ্ঠ পুরুষে এই বংশের বড় তরফ গৌড় ছেড়ে বর্তমান হুগলী জেলার আকনায় বসবাস করবার জন্য চলে আসেন—বড় তরফের প্রধান ছিলেন প্রভাকর ঘোষ। ঐ জেলারই বালি গ্রামে—এই পরিবারের প্রধান ছিলেন নিশাপতি ঘোষ। মাধব বা মনোহর ঘোষের সময় এই ছোট তরফ বালি ছেড়ে ব্যারাকপুরের চন্দনপুকুর গ্রামে বসবাসের জন্য চলে আসেন।

মকরন্দ ঘোষের ঊনবিংশ পুরুষ এই মনোহর ঘোষ ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র। সম্পত্তি বলতে তাঁর কিছুই ছিল না। সুযোগ আসায় এবং বুদ্ধি ও দক্ষতা বলে তিনি নিজে অবস্থার উন্নতি করতে সক্ষম হন। তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় আকবর বাদশাহের রাজপুত বাহিনীর সেনাপতি টোডরমলের অধীনে সামান্য গোমস্তার চাকরী নিয়ে। গোমস্তার চাকরীতে তিনি অবস্থা ফেরাতে পারলেন না। উক্ত সম্রাটের নির্দেশে এই সুবাহ্‌র সকল জাগীর ও খালসা জমির প্রথম জরীপ শুরু হলে, তিনি টোডরমলের মুহরিরার নিযুক্ত হন। এই পদে চাকরী করবার সময় তিনি বিপুল বিত্তের মালিক হন। এই ঐশ্বর্য নিয়ে শেষ জীবন শান্তিতে নিরুপদ্রবে কাটাবার উদ্দেশ্যে তিনি সুবর্ণরেখার তীরে বসবাস করবার জন্য চলে যান। কিন্তু তাঁর আশা ফলবতী হয় নি।

সুবর্ণরেখার তীরে মহারাজা মানসিংহ ও আফগানদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলে, মনোহর ঘোষ তাঁর সম্পদ ও সম্পত্তির বৃহত্তর অংশ হারিয়ে, চিত্রপুরীতে (বর্তমান চিৎপুর) আশ্রয় নেন। যা কিছু নিয়ে পালাতে পেরেছিলেন, তাই দিয়ে এখানে একটি কুটীর তৈরী করে বাস করতে থাকেন। লুকিয়ে আনা সম্পদের একটা অংশ দিয়ে তিনি সর্বমঙ্গলা ও চিত্রেশ্বরীর মন্দির নির্মাণ ও প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেন; দেবসেবার ব্যয়নির্বাহের জন্য মোহান্তকে কিছু ভূসম্পত্তিও দান

রেন। ইওরোপীয়গণ চিত্রেশ্বরী মন্দিরকে কালী মন্দির বলে বর্ণনা করেছেন। এ সম্পর্কে ক্যালকাটা রিভিয়্যু (খণ্ড তিন, ১৮৪৫) লিখছেন: 'জনগণের ধারণা এবং এ-ধারণার প্রতিবাদও কোথাও হয়নি যে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে, এখানেই সর্বাধিক সংখ্যক নরবলি দেওয়া হয়েছিল।'

মনোহর ঘোষের মৃত্যু হয় ১৬৩৭ নাগাদ। তার অল্প পরেই ডাকাতরা এখানে এত বেশী নরবলি দিতে থাকে যে সে বীভৎসতার নিরুপায় দর্শক হয়ে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ায় মনোহর ঘোষের পুত্র রামসন্তোষ ঘোষ, ওরফে সন্তোষ ঘোষ, চিৎপুর ছেড়ে সপরিবারে বর্ধমান পালিয়ে যান। সন্তোষ বহুভাষা জানতেন; তিনি ক্রমান্বয়ে ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ কুঠীতে চাকরী করেন। ৭০ বৎসর বয়সে তিনি চাকরী হতে অবসর গ্রহণ করেন। এই সময় রহিম সিংহ জানতে পারেন যে সন্তোষ ঘোষ বহু ধন সঞ্চয় করেছেন, এই ধন ছিনিয়ে নেবার জন্য রহিম সসৈন্য তাঁর ওপর চড়াও হন; বৃদ্ধ হলেও সন্তোষ ঘোষ মরবার আগে রহিমের কয়েকজন সৈন্যকে বধ করেন এবং স্ত্রী ও পুত্র বলরামের পলায়নের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হন। আশ্রয় ও নিরাপত্তার খোঁজে বলরাম স্থান থেকে স্থানান্তরে চলতে চলতে শেষে আশ্রয় নেন ফরাসী অধিকৃত চন্দননগরে। এখানে, ব্যবসায় করে আবার তিনি মাথা উঁচু করে দাঁড়ান।

[বলরামের জ্ঞাতিভ্রাতা বারাণসী ঘোষ ছিলেন ২৪ পরগণার কালেকটর মিঃ গ্লাডউইনের দেওয়ান। বারাণসী ঘোষের পিতা ও পিতামহের নাম ছিল যথাক্রমে রাধাকান্ত ও গণেশচন্দ্র এবং শ্বশুর ছিলেন জোড়াসাঁকের শান্তিরাম সিংহ। জোড়াসাঁকোতেই বারাণসী একটি সুরম্য বাসভবন নির্মাণ করেন এবং ব্যারাকপুরে গঙ্গাতীরে ছ'টি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সে সময়ে তিনি ছিলেন কলকাতার প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী অধিবাসী; সেইজন্য তাঁর নামে শহরের এদেশীয়দের এলাকায় একটি রাস্তার নামকরণ করা হয়।]

(বলরামের কথায় ফিরে আসা যাক।) তখন মঁশিয় দুপ্লে ছিলেন চন্দননগরের গভর্নর; পরে তিনি ভারতস্থ ফরাসী অধিকৃত এলাকাসমূহের গভর্নর জেনারেল হন; তাঁরই উর্বর মস্তিষ্কে এই চিন্তার উদ্ভব হয় যে, ভারতীয়দের দ্বারা সেনাবাহিনী গঠন করে এবং ভারতীয়দেরই সহযোগিতায় ভারতবর্ষকে ইওরোপীয় সাম্রাজ্যের অধীনস্থ একটি দেশে পরিণত করা যায়—এই দুপ্লে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষত ব্যবসাসংক্রান্ত বিষয়ে বলরামের পরামর্শ নিতে থাকেন। বলরামও প্রচুর ধন অর্জন করতে থাকেন কিন্তু জীবন যাপন করতে থাকেন অতি দরিদ্রের মতো। ১৭৫৬তে, অর্থাৎ 'ব্লাক হোল' হত্যাকাণ্ডের বৎসর বলরামের মৃত্যু হয়—তখন তাঁর বয়স ৯৫ বৎসর। তাঁর চার পুত্র: রামহরি, শ্রীহরি, নরহরি, ও শিবহরি বা শিবনারায়ণ। ছোট দুজন বলরামের জীবিতাবস্থাতেই মৃত্যুমুখে

াতিত হন। পিতার মৃত্যুর পর রামহরি ও শ্রীহরি চন্দননগরের ব্যবসায় গুটিয়ে কলকাতা চলে আসেন। এখানে তাঁরা বাগবাজারে ২০ বিঘা জমি কিনে পুষ্করিণী ও বাগানসহ যক্ষ-প্রাসাদতুল্য বিরাট একখানি অট্টালিকা নির্মাণ করে বাস করতে থাকেন; থাকতেন তাঁরা রাজার মতই। পুকুরটি এখনও আছে, আর সে অট্টালিকার যেটুকু ধ্বংসাবশেষ এখনও টিকে আছে তার থেকে বুঝা যায় যে অট্টালিকাটির উত্তরে ছিল বোসপাড়া লেন, দক্ষিণে কাঁটাপুকুর, পশ্চিমে, গৌর বোসের লেন আর পূর্বে ছিল গোপালচন্দ্র বোস ও অন্যান্যের বাড়ী।

বলরাম ঘোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামহরি, স্ত্রী মারা যাওয়ায় পর পর ছ'বার বিয়ে করেন। পঞ্চম বারে তিনি বিয়ে করেন রাজা গোপীমোহন দেব বাহাদুরের কন্যাকে, সে স্ত্রীও মারা যাবার পর ষষ্ঠ বারে তিনি বিয়ে করেন বার সিমলার বিনোদরাম দাসের কন্যাকে। এই স্ত্রীর গর্ভে তাঁর তিনটি পুত্র হয়। তার মধ্যে দু'জনের আগেই মৃত্যু হয়; জীবিত থাকেন একমাত্র পুত্র আনন্দমোহন। কাবুল যুদ্ধের সময় আনন্দমোহন ছিলেন কমিসারিয়েটের গোমস্তা; এই চাকরীর সুবাদে তিনি বিপুল বিত্তের মালিক হয়ে বেনারসে একটি নাচঘর স্থাপন করেন। সেখানে প্রতি সন্ধ্যায় নাচের আসর বসত। এতে তাঁর বহু অর্থ ব্যয় হয়; অবশ্য তিনি উদারভাবে দানেও ব্যয় করতেন। এই সব কারণে এই পবিত্র শহরের লোক এখনও তাঁকে স্মরণ করে। তিনি দু'বার বিয়ে করেছিলেন, তাঁর দ্বিতীয়া পত্নী ভুবনেশ্বরী দাসী গয়াতে বাস করেন; সেখানে তাঁর একটি ছোট তালুক আছে। এই সম্রান্ত প্রাচীনা বাংলা ভাষা ভালই জানেন; অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তিনি তাঁর ধনসম্পত্তি পরিচালনা করেন। প্রতি বৎসর মহাধুমধামের সঙ্গে তিনি অন্নপূর্ণা পূজা করেন। আনন্দ-মোহনের রক্ত সম্বন্ধের কোন উত্তরাধিকারী নেই।

বলরামের মধ্যম পুত্র শ্রীহরি ঘোষ বাংলা ও ফার্সী ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন, ইংরেজিও কিছু শিখেছিলেন। তিনি অনারেবল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মুঙ্গের কেল্লার দেওয়ান নিযুক্ত হয়েছিলেন। সামরিক ও অসামরিক সকল শ্রেণীর আধিকারিকের তিনি প্রিয়পাত্র ছিলেন। এই চাকরী দ্বারা তিনি বিশেষ ধনবান হয়ে ওঠেন, ধনবান হয়েও তিনি মাত্রা হারান নি; অত্যন্ত সাদাসিধা জীবন যাপন করতেন কিন্তু তাঁর দান ছিল প্রায় সীমাহীন।

[মুঙ্গের কেল্লার একটি বিস্তৃত বর্ণনা আছে, কলকাতার বাবু বৃত্তান্তের সঙ্গে সেটির সঙ্গতি না থাকায়, আমরা এই অংশটি বাদ দিচ্ছি।]

দেওয়ানের পদ থেকে অবসর গ্রহণের পর শ্রীহরি ঘোষ কলকাতায় বসবাস করতে থাকেন। তিনি বহু জ্ঞাতি কুটুম্ব ও স্বজাতীয় অসহায় মানুষকে নিজ বাড়ীতে খেতে থাকতে দিতেন। গৃহহীন বহু মানুষের আশ্রয়স্থল হওয়ায় তাঁর বাড়ীটিকে লোকে বলত হরি ঘোষের 'গোহাল'।

'হরি ঘোষের গোয়াল' এখন প্রবাদে পরিণত হয়েছে, অনিয়ন্ত্রিত ভীড়ভর্তি বাড়ীকে এখন বলে 'হরি ঘোষের গোয়াল'। কন্যাদায়গ্রস্ত বহু ব্রাহ্মণ ও কায়স্থকে তিনি কন্যাদায় হতে উদ্ধার এবং ঋণগ্রস্তকে ঋণমুক্ত করেছিলেন। শ্রীহরি ঘোষের ছেলে ও অন্যান্য নিকট আত্মীয় যে আহার্য পেতেন, আশ্রিতজনকেও সেই খাদ্যই দেওয়া হত। অপর পক্ষে নিষ্ঠাবান ও ধনী হিন্দু হিসাবে তিনি বার মাসের তের পার্বণ সমারোহের সঙ্গে পালন করতেন।

জীবনের অধিকাংশ সময় এইভাবে অতিবাহিত করবার পর, শেষজীবনে এক বন্ধুর হয়ে জামিন দাঁড়িয়ে, বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি সর্বস্বান্ত হয়ে গেলেন। বিপুল পরিমাণ অর্থের ব্যাপারে বন্ধুটি তাঁকে প্রতারণা করায়, তিনি বন্ধু ও সংসার সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে জীবনের অবশিষ্ট অংশ পবিত্র কাশীধামে অতিবাহিত করবার উদ্দেশ্যে কলকাতা ত্যাগ করেন। কলকাতা ত্যাগ করার পূর্বে তিনি তাঁর বাসভবনটি গাঙ্গুলীদের কাছে বিক্রী করে দেন এবং কাঁটাপুকুর ও শ্যামপুকুর অঞ্চলের বিস্তৃত ভূসম্পত্তি নকুড়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক জনৈক ব্রাহ্মণের হেপাজতে রেখে যান। নকুড়চন্দ্রের বংশধরগণ এখন ওই ভূসম্পত্তি ভোগ করছেন। বহুদিন যাবৎ এই সব জমিতে কেউ বসবাস করেনি, তাই এগুলির নাম হয়ে গিয়েছিল 'হরি ঘোষের পোড়ো'। হরি ঘোষের বংশধরগণ ইচ্ছে করলেই এই সব জমি-জমার দখল নিতে পারেন, কিন্তু তাঁদের দিক থেকে সে রকম কোন চেষ্টা করা হয় নি।

কলকাতার বাড়ী ও অন্য কিছু সম্পত্তি বিক্রি করে শ্রীহরি ঘোষ জ্যেষ্ঠ পুত্র কাশীনাথ ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে কাশীবাসী হন। অল্পকাল পরে তিনি শান্তিতে পরলোক গমন করেন। শ্রীহরি ঘোষের চার পুত্র: কাশীনাথ, বিশ্বনাথ, হরলাল এবং রসিকলাল, আর দুই কন্যা। জ্যেষ্ঠা কন্যা ভগবতী দাসীর বিয়ে হয়েছিল বাগবাজারের নিধুরাম বসুর পৌত্র জগন্নাথ বসুর সঙ্গে। কাশীনাথ অপুত্রক অবস্থায় কাশীতেই পরলোক গমন করেন।

বিশ্বনাথ ঘোষের একমাত্র পুত্র ভৈরবচন্দ্র সরকারের অধীনে কিছুদিন মীর্জাপুরে চাকরী করেন। মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়সে একটি শিশুপুত্র রেখে তিনি মারা যান। এই শিশু বেণীমাধব তাঁর মাতুল, চোরবাগানের আনন্দচন্দ্র বোসের আশ্রয়ে মানুষ হন। বেণীমাধব ডেভিড হেয়ারের স্কুলে ইংরেজী শেখেন, সামান্য ফার্সীও তিনি জানতেন। তাঁর প্রথম বিবাহ হয় চাষা-ধোপাপাড়ার তারাচাঁদ বসুর কন্যার সঙ্গে। এই স্ত্রী মারা গেলে তিনি দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন ঠনঠনিয়ার নবকৃষ্ণ সরকারের কন্যাকে। বেণীমাধব মেসার্স পীল, ব্লেয়ার অ্যাণ্ড কোম্পানীর বাজার সংক্রান্ত ব্যবসায়ের দায়িত্বে ছিলেন। এই পেশায় তাঁর ভালই উপার্জন হয়েছিল, কিন্তু অর্জিত সম্পদের অধিকাংশই তিনি সৎকাজে ব্যয়

করেন। তিনি ধমায় সঙ্গীত বেশ ভাল গাইতেন। তাঁর দুই পুত্র: চন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রনাথ। এঁদের মধ্যে যোগেন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি প্রেসিডেন্সি প্রেসের মালিক। মুদ্রণ সম্পর্কে তাঁর তাত্ত্বিক ও কার্যকরী উভয় প্রকারেরই গভীর জ্ঞান আছে।

দেওয়ান শ্রীহরি ঘোষের তৃতীয় পুত্র হরলালের একমাত্র পুত্র ভোলানাথ ঘোষ ছিলেন আলিপুর মুন্সেফ কোর্টের উকিল। তিনি ভবানীপুরে বাড়ী করেন, সেখানে এখন তাঁর বিধবা বাস করেন; তাঁর একমাত্র পুত্র সূর্যকুমার ঘোষ ভবানীপুরের লণ্ডন মিশনারী ইনস্টিটিউশনে পড়বার সময় খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেন। মিশনারীদের উপদেশ অনুযায়ী তিনি খ্রীস্টিয় যাজক হন। রেভারেণ্ড সূর্যকুমারের কলেরায় মৃত্যু হয়। তাঁর সন্তানগণ খ্রীস্টধর্মাবলম্বী।

দেওয়ান শ্রীহরি ঘোষের কনিষ্ঠ পুত্র রসিকলালের বিবাহ হয় বাগবাজারের বিখ্যাত রামচরণ, ওরফে চরণ সোমের কন্যা হরসুন্দরী দাসীর সঙ্গে। জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হয়ে রসিকলাল যৌবনেই প্রাণত্যাগ করেন। তাঁর স্ত্রী হর-সুন্দরীই কলকাতার শেষ সতী। তাঁর তিন পুত্র, কেদারেশ্বর, মুক্তীশ্বর ও ভুবনেশ্বর, ওরফে কালাচাঁদ আর এক কন্যা তারাসুন্দরী। কেদারেশ্বর বাল্যকালেই মারা যান। তারাসুন্দরীর বিবাহ হয় সিমলার তারিণীচরণ সরকারের সঙ্গে। বিবাহের অল্পকাল পরেই তারাসুন্দরীর মৃত্যু হয়। জীবিত পুত্রদ্বয় মুক্তীশ্বর ও ভুবনেশ্বর মাতুলালয়ে মানুষ হতে থাকেন। মুক্তীশ্বর ডেভিড হেয়ারের স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। দেওয়ান শ্রীহরি ঘোষের বন্ধু ডাঃ কাম্বারল্যাণ্ড মুক্তীশ্বরকে তাঁর ১৪ বৎসর বয়সে কটক নিয়ে যান। কাম্বারল্যাণ্ড ও কটকের কমিশনার মিঃ এ জে এম মিল্‌স বালককে স্বগৃহে রেখে ডাক্তারী বিদ্যা পড়াতে ও শেখাতে থাকেন— পুঁথিগত এবং হাতে কলমে উভয় প্রকার শিক্ষাই মুক্তীশ্বর তাঁর কাছে পেতে থাকেন। ডাক্তারী শাস্ত্রে সুপণ্ডিত মিঃ কাম্বারল্যাণ্ড ওড়িশা থেকে চলে আসবার সময় পুরীর সমুদ্রতীরে তিনি যে বাঙলোটি নিজের জন্য নির্মাণ করেছিলেন সেটি মুক্তীশ্বরকে দান করে যান।

মুক্তীশ্বর কটক ডিস্পেনসারীতে কিছুকাল ডাক্তারী করবার পর পুরীতে জগন্নাথ পিলগ্রীম হসপিটালে বদলী হন। এখানে সুনামের সঙ্গে তিনি ৩৫ বৎসর ডাক্তারী করেন; ডাক্তারী শাস্ত্রে তাঁর গভীর জ্ঞান ও চিকিৎসায় পারদর্শিতার জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার সিভিল সার্জনগণ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ ই বি খ্রিং, ডাঃ রবার্ট প্রিংগল, ডাঃ বি ক্যেডালি, ডাঃ জে জে ডিউর‍্যাণ্ট, ডাঃ মেরেডিথ এবং অন্যান্য কয়েকজন।

ডাঃ প্রিংগল লিখছেন, 'তাঁর কাজে কোন ত্রুটি হয়েছে এমন ঘটনা স্মরণ

করতে পারি না; বরং এই ডিস্পেনসারীতে মানবতার সেবায় তিনি যতদূর সম্ভব নিজের জ্ঞান ও পরিশ্রম সহকারে কাজ করেছেন এমন দৃষ্টান্ত বহু। এদেশীয় একজন ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা শাস্ত্রে যতখানি জ্ঞান আশা করা যায়, তাঁর জ্ঞান তার অনেক ঊর্ধ্বে। আকস্মিক উৎসাহে আমি এই অভিমত ব্যক্ত করছি না, দীর্ঘ চার বছর প্রতিক্ষণ তাঁর কাজ লক্ষ্য করে এই মন্তব্য (লিপিবদ্ধ) করছি।'

ডাঃ ডিউর‍্যাণ্ট লিখছেন, 'ইনি পুরাতন ও চমৎকার কর্মচারী। চিকিৎসা-শাস্ত্রের ব্যবহারিক দিকটা ভালই আয়ত্ত করেছেন—হাসপাতালে দীর্ঘকাল কাজ করার ফলে তিনি এ জ্ঞানের অধিকারী হয়েছেন।'

ডাঃ জন মেরিডিথ লিখছেন, 'ডাঃ মুক্তীশ্বর ঘোষ সম্পর্কে আমার উচ্চ ধারণার কথা লেখবার সুযোগ পেয়ে আমি আনন্দিত বোধ করছি। যে-ভাবে তিনি তাঁর কর্তব্যকাজগুলি করেন, তাতে আমি সন্তুষ্ট। এই হাসপাতালে তিনি দীর্ঘকাল সরকারী কর্মচারী হিসাবে কাজ করছেন এবং যোগ্য কারণেই সর্বশ্রেণীর মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধা করেন।'

জগন্নাথ পুরীতে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক এবং জনগণের উপকারী বন্ধুরূপে পরিচিত ছিলেন। তাঁর পসার ছিল ব্যাপক, কিন্তু রোগী ধনী বা দরিদ্র যাই হোক তিনি কারও কাছ থেকে চিকিৎসক হিসাবে প্রাপ্য তাঁর দক্ষিণা নিতেন না। তিনি ছিলেন সদানন্দ পুরুষ, দুঃখ-দুর্বিপাকের মধ্যেও তিনি সর্বদা প্রফুল্ল থাকতেন। বন্ধুদের তিনি বলতেন, 'আমার টাকা নেই যে দান করব—কাজেই (দরিদ্রকেও ধনীর মত) সমানভাবে সকলের সেবা করব'—অর্থাৎ 'দক্ষিণা আমি কারও কাছে থেকে নেব না'। এই কারণেই পুরীর মহারাজাগণ তাঁকে ভালবাসতেন, শ্রদ্ধাও করতেন। অতি ধনী থেকে অতি দরিদ্র পর্যন্ত সকলেরই প্রতি তাঁর সহানুভূতি অন্তর থেকে প্রবাহিত হত। তাঁর চিকিৎসায় উপকৃত হয়ে ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা তাঁকে কোন মূল্যবান উপহার দিতে চাইলে সসম্মানে সবিনয়ে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন—এরূপ দৃষ্টান্ত বহু। তাঁর ছেলেমেয়ের মুখ চেয়ে একজন সিভিল সার্জন তো তাঁকে ফীজ নেবার জন্য জেদাজেদি করতে থাকেন। মুক্তীশ্বরের বিনীত উত্তর, 'আমি শপথ করেছি কারও কাছ থেকে কোন দক্ষিণা নেব না। পিতা হিসাবে আমি ছেলেমেয়েদের ভরণপোষণ ও শিক্ষার ব্যবস্থা করতে বাধ্য, কিন্তু সে বাধ্যবাধকতা আমার জীবিতকাল পর্যন্ত। আমার মৃত্যুর পর তারা ধনী হয়ে যাক, সে আমি চাই না। জগতে একা এসেছি একাই যাব।'

সরকার থেকে মাইনে তিনি সামান্যই পেতেন, তবু অনাহারক্লিষ্ট গরীবদের তিনি খাওয়াতেন; যে সব বাঙালী তীর্থযাত্রী পুরী গিয়ে টাকার অভাবে ফিরতে

পারতেন না, ধার করে হলেও তিনি তাঁদের টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করতেন। তার ওপর যে-সব রোগী সরকারী হাসপাতালে থাকতে চাইতেন না, তাঁদের তিনি নিজের বাড়ীতে রেখে চিকিৎসা করতেন। এইভাবে দান খয়রাৎ করতে করতে অবসর গ্রহণের পূর্বে তিনি বেশ ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। ঋণমুক্ত হবার জন্য তখন তিনি তাঁর পৃষ্ঠপোষক ডাঃ কাম্বারল্যাণ্ড তাঁকে যে বাঙলোটি উপহার দিয়েছিলেন সেই বাঙলোটি বিক্রী করতে বাধ্য হলেন; অথচ সরকারী চাকুরে এক ইওরোপীয় ভদ্রলোককে বাঙলোটি ভাড়া দিলে তাঁর ভাল মাসিক আয় হত। নিষ্ঠাবান হিন্দু হিসাবে তিনি ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন। পুরীর রামচণ্ডীর মন্দিরটির তিনি সংস্করণ ও উন্নতি সাধন করেন। যাতে কেউ বিঘ্ন সৃষ্টি করতে না পারে এই উদ্দেশ্যে নিয়মিতভাবে মধ্যরাত্রে এখানে তিনি পূজা-অর্চনা করতেন।

পেন্‌শন নিয়ে তিনি চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ করলে পর তাঁর পরিবারের সকলে তাঁকে বর্ধমানে চিকিৎসা ব্যবসায় শুরু করবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকেন যাতে তাঁদের অবস্থা কিঞ্চিৎ ভাল হয়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁদের অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে, তিনি বর্ধমান জেলার কুলীন গ্রামে তাঁর আত্মীয় গোলকচন্দ্র সিংহের বাড়ীতে ডিসপেনসারী খোলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সহানু-ভূতিশীল সুচিকিৎসক হিসাবে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। এখানে প্রায় এক বৎসর তিনি চিকিৎসা ব্যবসায় করেছিলেন। কেউ স্বেচ্ছায় তাঁকে ফী দিলে তিনি নিতেন, নিজে থেকে কারও কাছে ফী চাইতেন না। এইজন্য ছেলেমেয়েদের জন্য বিশেষ কিছু রেখে যেতে পারেন নি। বন্ধু ও গুণমুগ্ধদের শোকসাগরে ভাসিয়ে ১৮৪৯র ৩ জানুয়ারী তিনি পরলোকগমন করেন।

মুক্তেশ্বর ঘোষ রোগী-পিছু সামান্য কিছু ফী নিলেও, পুরীতে তিনি যে ৩৫ বৎসর যাবৎ চিকিৎসক ছিলেন তার মধ্যে তিনি নিজের আর্থিক অবস্থা ভাল করে নিতে পারতেন। কিন্তু টাকাপয়সা সম্পর্কে তিনি ছিলেন উদাসীন, ধনী হবার উচ্চাশাও তাঁর ছিল না। তাই মিঃ উইলকিনসন, মিঃ আনন্দ, মিঃ মানি এবং অন্যান্য অনেকের সঙ্গে পুরীর ম্যাজিস্ট্রেট-কলেকটরগণও তাঁকে ফী নেবার জন্য বারবার অনুরোধ জানালে তিনি তাঁর সেই একই উত্তর দিতেন—'একাই এসেছি ভবে, একাই তো যেতে হবে।' এঁরা তাঁকে বেশী রোজগারের কাজ দিতে চাইলেও তিনি নিতে চাইতেন না -তাঁর ধারণা ছিল মানবতার সেবায় তিনি নিয়োজিত আছেন, এ কাজ ছেড়ে যাওয়া মানে সে সেবাধর্ম ত্যাগ করা।

তাঁর সমগ্র জীবনটাই ছিল 'শিক্ষনীয়। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাঁর যা কিছু গুণ, সে প্রকৃতিগত বা অর্জিত যাই হক, সে সবই ঈশ্বরের শক্তি, তাঁর কাছে

গচ্ছিত আছে মাত্র। সংসারে অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়ে, অভাবও ছিল, দান ও সেবা করার আকাঙ্ক্ষাও ছিল, তৎসত্ত্বেও তিনি শ্রমের বিনিময়ে কোন পারিশ্রমিকই নিতেন না ; তাঁর বিশ্বাস ছিল তাঁর সকল সাফল্যের মূলে আছে ঈশ্বরের আশীর্বাদ। দুঃখের বিষয় মুক্তীশ্বর ঘোষের এই আদর্শ আজ আর অনুসৃত হয় না। এই স্বার্থপর পরিবেশের মধ্যেও তিনি নিঃস্বার্থপরতার আদর্শ অনুসরণ করে গেছেন, সেটিই তাঁর চরিত্রবত্তার উজ্জ্বল দিক। সন্তানদের জন্য টাকা পয়সা রেখে যেতে না পারলেও তিনি তাঁর নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের আদর্শ তাঁর সন্তানদের জন্য রেখে যান, আর রেখে যান রোগী আর অভাবী মানুষের অজস্র আশীর্বাদ।

মুক্তীশ্বর ঘোষ সংস্কৃত জানতেন ; দাবা খেলায়ও তাঁর নাম ছিল। বর্ধমান জেলার বেনাপুর নিবাসী রাধাগোবিন্দ বসুচৌধুরীর জ্যেষ্ঠা কন্যাকে তিনি বিবাহ করেন। তাঁর পাঁচ পুত্র : লোকনাথ, প্রমথনাথ, চণ্ডীচরণ, ত্রৈলোক্যনাথ ও পূর্ণচন্দ্র। এঁদের মধ্যে এখন জীবিত আছেন লোকনাথ ও চণ্ডীচরণ।

লোকনাথ ঘোষের বিবাহ হয় শ্যামপুকুরের কালীচরণ বসুর একমাত্র কন্যার সঙ্গে। কালীচরণবাবু ছিলেন সম্মানিত ব্যক্তি। শোভাবাজারের রাজা প্রসন্ননারায়ণ দেব বাহাদুর এবং এই রকম আরও কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন তাঁর বন্ধু। এঁর জ্ঞাতি নয়ন বসু তমলুকের সল্ট এজেণ্ট এবং জঙ্গীপুরের কমার্শিয়াল রেসিডেণ্ট মিঃ অ্যানড্রু র‍্যামজের অধীনে চাকরী করে ঐশ্বর্যবান হয়ে ওঠেন। হাটখোলার নিকটবর্তী দর্মাহাটায় তাঁর বিরাট বাসভবন ছিল।

মুক্তীশ্বরের সেজ ছেলে চণ্ডীচরণের বিয়ে হয়েছিল জগদ্দল নিবাসী বিখ্যাত সেন পরিবারের গোবিন্দচরণ সেনের একমাত্র কন্যার সঙ্গে।

মুক্তীশ্বর ঘোষের বিধবা পত্নীও বহু সদ্গুণের অধিকারিণী, আর্ত আতুরের সেবায় তিনি সব সময় তৎপর ছিলেন।

রসিকলাল ঘোষের তৃতীয় পুত্র ভুবনেশ্বর বা কালাচাঁদ দুই পুত্র রেখে মারা যান। এঁদের মধ্যে কনিষ্ঠ বিহারীলাল এখন জীবিত আছেন।

জোড়াসাঁকোর তারকনাথ প্রামাণিক

তারকনাথ প্রামাণিক ছিলেন কাঁসা পিতলের ব্যবসায়ী ; তাঁর পিতা গুরুচরণ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁর ধর্মনিষ্ঠা ও পরোপচীকির্ষার জন্য।

নিরাময় করে তিনি এখন দেশীয় চিকিৎসক (কবিরাজ)-দের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতির অধিকারী হয়েছেন। বস্তুত তাঁকে রোগী খুঁজে বেড়াতে হয় না, রোগ-গ্রস্তরাই তাঁর কাছে ভীড় করে আসেন। লক্ষ লক্ষ টাকা যেমন তিনি উপার্জন করেছেন, তেমনি উদারভাবে দান খয়রাৎও করে থাকেন। চিকিৎসার জন্ত তাঁর কাছে দৈনিক সমাগত বহু রোগীকে তিনি সকল প্রকার ঔষধ বিনামূল্যে দান করে থাকেন। তাঁর গ্রাম-দেশ থেকে আগত অনেক ছাত্র তাঁর কলকাতার বাড়ীতে থেকে খেয়ে তাঁর কাছে আয়ুর্বেদ শিক্ষা করেন। ঐ অঞ্চল থেকে এসে বহু ছাত্র তাঁর বাড়ীতে থেকে খেয়ে কলকাতার স্কুল কলেজে পড়বার সুযোগ পান। মহামান্যা মহারাণী কর্তৃক ভারত-সম্রাজ্ঞী পদবী গ্রহণ উপলক্ষে কলকাতায় ১৮৭৭-এর ১ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত দরবারে কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন ও সমযশস্বী কবিরাজ রমানাথ সেন হিন্দু চিকিৎসা-শাস্ত্রে অসাধারণ নৈপুণ্যের জন্য সাম্মানিক প্রশংসাপত্র লাভ করেন।

গঙ্গাপ্রসাদের অনুজ দুর্গাপ্রসাদ ও অন্নদাপ্রসাদ সংস্কৃত ভাষা ও আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী। চিকিৎসক হিসাবেও তাঁরা অভিজ্ঞ। স্বাস্থ্য-হীনতার জন্য দুর্গাপ্রসাদ অগ্রজের কাছ থেকেই চিকিৎসা ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন; কিন্তু কনিষ্ঠ অন্নদাপ্রসাদ হোগল কুড়িয়ায় আলাদাভাবে কবিরাজী করছেন। পূজাঅর্চনাতেই দুর্গাপ্রসাদের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হয়; অনেকাংশে তিনি সন্ন্যাসী প্রকৃতির মানুষ।

হরিমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র রামলোচন সেন জ্যেষ্ঠ নীলাম্বর সেন অপেক্ষা জ্ঞান ও চিকিৎসা বিদ্যায় ন্যূন ছিলেন না। রামলোচনের পুত্র রামকুমার ছিলেন সংস্কৃত, ফার্সী ও বাংলা ভাষায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের অধিকারী। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেও তিনি গভীর ও ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত শারীরিক কারণে চিকিৎসা ব্যবসায়ে তিনি আর্থিক সাফল্যলাভে সমর্থ হন নি। তৎসত্ত্বেও দরিদ্র রোগীদের প্রতি তাঁর দয়ার অন্ত ছিল না। অমায়িক স্বভাবের এই মানুষটির সর্বশ্রেণীর মানুষের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক ছিল। তাঁর কথাবার্তায় থাকত বুদ্ধিদীপ্ত রসিকতা। সংস্কৃতে তিনি কবিতাও রচনা করতেন। এঁর প্রতিবেশী ছিলেন ডাঃ মুনিশ্বর ঘোষ। মহৎহৃদয়, দানশীল ও মানবহিতৈষী খ্যাতিমান এই মানুষ দুটির মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় মাত্র দেড় বৎসরের ব্যবধানে দুজনেই মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় এই বন্ধুত্ব দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি।

মৃত্যুকালে রামলোচন সেন রেখে গেছেন শিক্ষিত পুত্র কালীপ্রসন্নকে। এঁর চিকিৎসালয় কম্বুলিটোলায়। এঁর বয়স অল্প, মাত্র ২৬ বৎসর, কিন্তু সংস্কৃত ও আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ইনি সুপণ্ডিত, ইংরেজীও জানেন। মূল সংস্কৃত থেকে তিনি চক্রদত্তের মতো কয়েকখানি চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেছেন।

চিকিৎসক হিসাবেও তাঁর যথেষ্ট পসার আছে। তাঁর কাকা গঙ্গাপ্রসাদ, দুর্গাপ্রসাদ ও অন্নদাপ্রসাদের মতো তিনিও বহু নিরাশ রোগীকে নিরাময় করেছেন। কয়েকজন ছাত্র তাঁর কাছে আয়ুর্বেদ শিক্ষা করেন। আবার প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসকগণও অনেক সময় তাঁর পরামর্শ নেন।

ঢাকায় সেন পরিবারের একটা তালুক আছে। কলকাতাতেও তাঁদের ভূসম্পত্তি আছে। এখানেই তাঁরা সাধারণত বসবাস করেন।

রামচন্দ্র রায়

(আন্দুলের রাজপরিবার)

বাংলার বনেদী ও সম্মানিত এই কায়স্থ পরিবারের আদি পদবী ছিল 'কর'; মুসলমান শাসনকালে তাঁরা রায় পদবী লাভ করেছিলেন। এই বংশের রামলোচন রায় সম্ভবত ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে রাজা বাহাদুর খেতাব লাভ করেন। তখন থেকে পরিবারটিকে রাজপরিবাররূপে গণ্য করা হয়।

রাজা রামলোচন রায় ও তাঁর ভাই রাজচন্দ্র রায়ের পিতা রামচন্দ্র রায় ছিলেন শোভাবাজার রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সমসাময়িক। রামচন্দ্র প্রথম জীবনে ছিলেন কর্নেল ক্লাইভের সরকার (উল্লেখ করা যায় সে-সময় সরকার পদটি ছিল বিশেষ মর্যাদার)। পরবর্তীকালে তিনি গভর্নর এইচ ভান্সিটর্টের ও জেনারেল স্মিথের দেওয়ান হন। তিনি বাস করতেন পাথুরিয়াঘাটায়। প্রচুর অর্থ তিনি ব্যয় করেন। তবে, তার একটা বড় অংশ তিনি দান ও ধর্মকর্মে ব্যয় করেন। তাঁর পুত্রদ্বয় রাজা রামলোচন ও রাজচন্দ্র ছিলেন প্রভাবশালী, শিক্ষিত ও দয়ালু প্রকৃতির মানুষ। রাজা রামলোচনের দুই পুত্র: কুমার কাশীনাথ ও কুমার শিবচন্দ্র। এঁরা উভয়েই ছিলেন সংস্কৃত, বাংলা ও ফার্সী ভাষায় সুশিক্ষিত। এঁরা কিছু ইংরেজীও জানতেন; সর্বোপরি, এঁরা ছিলেন ব্রিটিশ রাজশক্তির অনুগত।

কুমার কাশীনাথের দুই পুত্র: রাজনারায়ণ ও তারকনাথ। এঁরা হাওড়ার আন্দুলে বসবাস করবার জন্য চলে যান। রাজনারায়ণের উচ্চ সামাজিক মর্যাদা, রাজভক্তি এবং নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের জন্য ব্রিটিশ সরকার তাঁকে রাজাবাহাদুর খেতাব দ্বারা সম্মানিত করেন।

রাজা রাজনারায়ণ রায় বাহাদুর শিক্ষালাভ করেন হিন্দু কলেজে; তিনি সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। কায়স্থদের সকল সামাজিক আন্দোলনে তিনি অগ্রণীর ভূমিকায় থাকতেন; তাঁর মতে কায়স্থগণ ব্রাহ্মণ জাতি ব্যতীত কারও চেয়ে নিম্নস্থানীয় নয়। বহু সংস্কৃত শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি সহকারে রাজা রাজনারায়ণ অভ্রান্তভাবে প্রমাণ করেন, কায়স্থ জাতি প্রকৃতপক্ষে ক্ষত্রিয় জাতির অন্তর্ভুক্ত; প্রাচীনকালে এই জাতিরও পবিত্র উপবীত ধারণের অধিকার ছিল। আন্দুল রাজবাড়ীতে তাঁর পুত্রের বিবাহের সময় তিনি ক্ষত্রিয়দের মতই কুশণ্ডিকা অনুষ্ঠান করান। রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, কে সি এস আইও তাঁর পৌত্রের বিবাহের সময় এই অনুষ্ঠানটি করিয়েছিলেন।

জীবিতকালে রাজা রাজনারায়ণ পণ্ডিত সমাজের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন; তাঁর মৃত্যুতে বেশ কয়েকজন ইওরোপীয় ও এদেশবাসী শোক প্রকাশ করেন। মৃত্যুকালে তিনি পুত্র কেশববিজয় রায়কে রেখে যান। কেশববিজয়ের মৃত্যুতে তাঁর দুই বিধবা এক এক জন করে দত্তক গ্রহণ করেন।

বাবু ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সি আই ই

খানাকুল কৃষ্ণনগরের শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত বিশ্বনাথ তর্কভূষণ কলকাতার মাণিকতলায় বাস করতেন। বাবু ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সি আই ই এঁরই পুত্র। ১৭৮৭ বাংলা শকে ভূদেবচন্দ্রের জন্ম হয়। মাত্র ৮ বৎসর বয়সে তাঁকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করা হয়। ইংরেজী শেখেন তিনি হিন্দু কলেজে: ছাত্রজীবন ছিল তাঁর অত্যন্ত উজ্জ্বল; এখানে তিনি বহু পদক পুরস্কার ও বৃত্তিলাভ করেন।

কলেজের পাঠ সমাপনান্তে তিনি দেশবাসীর মঙ্গলের জন্য 'শিয়াকোলা', চন্দননগর শ্রীপুর প্রভৃতি স্থানে বেসরকারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে থাকেন; কিন্তু অর্থাভাবের জন্য কিছু দিনের মধ্যেই এই জনহিতব্রত ত্যাগ করে তাঁকে কলকাতা মাদ্রাসায় ইংরেজীর দ্বিতীয় শিক্ষকরূপে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে চাকরী নিতে হয়। দশ মাস এইপদে থাকার পর তিনি হাওড়া সরকারী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। তাঁর অদম্য উৎসাহ ও ক্লান্তিহীন পরিশ্রমের ফলে এই বিদ্যালয়ের বহু সংখ্যক ছাত্র 'জুনিয়র স্কলারশিপ এগ্‌জামিনেশনে' সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়; ফলে তাঁর প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে সরকার তাঁকে ১৮৫৬-র ৬ জুন

তারিখে হুগলী নর্ম্যাল স্কুলের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেন ; তাঁর মাসিক বেতন হয় তিন শত টাকা। এই সময় কলকাতা ছেড়ে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য তিনি হুগলী চলে যান। ১৮৬২তে মাসিক চার শত টাকা বেতনে তাঁকে মিঃ মেড্‌লেকটের অধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইন্সপেক্টর অব স্কুল্‌স্ পদে নিযুক্ত করা হয় ; পর বৎসর ১৩ ফেব্রুয়ারী তাঁকে অ্যাডিশনাল ইন্সপেক্টর পদে উন্নীত করা হয়। ১৮৬৭তে তাঁর বেতন বৃদ্ধি করে মাসিক পাঁচ শত টাকা করা হয়। ১৮৬৯ হতে তাঁকে নর্থ সেন্‌ট্রাল প্রভিন্সের ডিভিশন্যাল ইন্‌সপেক্‌টর পদে নিযুক্ত করা হয়। উল্লেখ্য যে, এই পদে ইতিপূর্বে কোন ভারতীয়কে নিযুক্ত করা হয় নি। সে সময় স্কুল পাঠ্য-পুস্তকের অভাব থাকায় ভূদেবচন্দ্র শিক্ষাবিধায়ক, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (১ম ও ২য় ভাগ) ও পুরাবৃত্তসার রচনা করেন (এছাড়া, তিনি অনুবাদ করেন ইংল্যাণ্ড ও রোমের ইতিহাস এবং ইউক্লিডের (জ্যামিতির) তৃতীয় পুস্তক। এই সকল পুস্তকের কয়েকখানি এখন বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক। ভূদেববাবুর আর একখানি গ্রন্থের নাম 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'। বর্তমানে তিনি এডুকেশনাল গেজেটের সম্পাদক। তিনিই প্রথম ভারতীয় যাঁকে শিক্ষা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করা হয়েছে। স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তা, শিক্ষাগত উচ্চস্থানীয় যোগ্যতা ও শিক্ষা বিস্তারে তাঁর অদম্য উৎসাহের জন্য তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মহামান্যা মহারাণী কর্তৃক ভারত-সম্রাজ্ঞী পদবী ধারণের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে তাঁকে ১৮৭৮ এর ১ জানুয়ারী 'কম্প্যানিয়ন অব দি অর্ডার অব দি ইণ্ডিয়ান এমপায়ার' পদবীতে ভূষিত করা হয়েছে।

অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী

মেদিনীপুর জেলার আকবরপুর নিবাসী গোস্বামী পরিবারে ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রাধাকান্ত গোস্বামীর কাছে তিনি সংস্কৃত বাংলা ও হিন্দী ভাষা শিক্ষা করেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি বাঁকুড়া জেলার পণ্ডিত রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করতে থাকেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই সঙ্গীতে পারদর্শিতা লাভ করে তিনি জনসমক্ষে গাইতে আরম্ভ করেন। অল্পকালের মধ্যেই গায়ক হিসাবে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। ১৮৪৭-এ তিনি কলকাতায় মাননীয় মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর সি এস

আই মহোদয়ের সঙ্গীত সভায় যোগদান করেন এবং তাঁর ভবনেই বাস করতে থাকেন। তখন মহারাজের সঙ্গীত শিক্ষক ছিলেন ওস্তাদ লছমন প্রসাদ মিশ্র। এই ওস্তাদের কাছে ক্ষেত্রমোহন সঙ্গীত শাস্ত্রে আরও শিক্ষা লাভ করেন। তখন থেকে গত তেত্রিশ বৎসর তিনি পাথুরিয়াঘাটাতেই বাস করেছেন। বেঙ্গল মিউজিক স্কুল প্রতিষ্ঠার অনেক আগে থেকেই তিনি মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ও তাঁর ভাই শৌরীন্দ্রমোহনের সঙ্গে ভারতীয় সঙ্গীতের পুনর্জাগরণ ও উন্নতির জন্য পরিশ্রম করতে থাকেন।

সঙ্গীতের ডক্টরেট রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের উদার পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি বেঙ্গল মিউজিক স্কুলের ছাত্র ও সঙ্গীতপ্রিয় জনগণের জন্য সঙ্গীত বিষয়ক সঙ্গীতসার, কান্তকৌমুদী জয়দেব প্রভৃতি কয়েকখানি অমূল্যগ্রন্থ রচনা করেন। এগুলি রচিত হয়েছিল রাজা শৌরীন্দ্রমোহন প্রবর্তিত স্বরলিপির ভিত্তিতে।

সম্মানিত এই প্রবীণ অধ্যাপক সঙ্গীতশাস্ত্রে পারদর্শিতা ছাড়াও অন্যান্য বহু সদ্গুণের অধিকারী। ধর্মের প্রতি তিনি নিষ্ঠাবান। ১৮৭৫এ তদানীন্তন ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেল নর্থব্রুক মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের বাসভবনে অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহনের সঙ্গীতে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে একটি প্রশংসাপত্র দ্বারা সম্মানিত করেন।

মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলায় তাঁর ছোট তালুক আছে। ক্ষেত্রমোহনের কোন পুত্রসন্তান নেই—আছেন ভ্রাতুষ্পুত্র প্রাণকৃষ্ণ গোস্বামী।

কাশিমবাজারের রাজ পরিবার

যে সকল সদগুণ মানবচরিত্রের অলঙ্কারস্বরূপ, সে সকলের মধ্যে আর্তের সেবা ও ভাগ্যহীনদের প্রতি সহানুভূতিই বোধ হয় সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম। এর দ্বারা, বিচার বিবেচনা করে হলেও, সম্পদের প্রকৃত সদব্যবহার হয়। শিক্ষাবিস্তার, জাতির নৈতিক উন্নতি এবং আর্তের সেবার জন্য কাসিমবাজার রাজপরিবারের মহারাণী স্বর্ণময়ী যে বিপুল পরিমাণ দান নিয়মিতভাবে করে থাকেন, তার তুলনা বর্তমান বাংলায় কেন, ভারতেও বোধ হয় নেই। দান, সেবা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য তিনি বোধ হয় শুধুমাত্র নাটোরের রাণী ভবানী ও ইন্দোরের অহল্যাবাঈ-এর সঙ্গে তুলনীয়া।

বনেদী ও সম্ভ্রান্ত এই পরিবারটির ইতিহাস মোটামুটি সকলেরই জানা।

বাংলার প্রথম গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের অধীনে ও আনুকূল্যে বাবু (পরবর্তীকালে, দেওয়ান) কৃষ্ণকান্ত নন্দী, বা কান্ত বাবু বিত্ত ও মর্যাদার অধিকারী হন। কিন্তু জনগণ ও সরকারের কাছে এই বংশের যে মর্যাদা তার মূলে আছে সদগুণের অধিকারিণী মহারাণী স্বর্ণময়ীর ধর্মপ্রণতা ও জনহিতৈষণার জন্য দান। ওয়ারেন হেস্টিংস যখন কাসিমবাজারে কোম্পানীর রেসিডেণ্ট পদে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় বাংলার তদানীন্তন নবাব নাজিম সিরাজউদ্দৌলা কোন কারণে রুষ্ট হয়ে হেস্টিংস সহ তথাকার সকল ইংরেজকে বন্দী করবার নির্দেশ দেন। এই দুঃসময়ে হেস্টিংসকে আত্মগোপন করবার ও পালাবার ব্যবস্থা ও সুযোগ করে দেন এই কান্তবাবু। এই সাহায্য না পেলে হেস্টিংস হয়তো প্রাণে মারা পড়তেন। হেস্টিংস কখনও এই উপকারের কথা ভোলেন নি। ১৭৭২এ বাংলার গভর্নর জেনারেল হয়ে তিনি কান্তবাবুকে দেওয়ান পদে নিয়োগ করেন। হেস্টিংসের সমগ্র শাসনকালে কান্তবাবু এই পদেই আসীন ছিলেন।

কান্তবাবুর রাজভক্তি এবং কোম্পানীর উপকার হয় এমন বহু সৎকাজের স্বীকৃতিস্বরূপ হেস্টিংস তাঁকে গাজিপুর এবং আজমগড় জেলায় 'দুহা বেহারা' জাগীর দেন আর তাঁর পুত্র লোকনাথকে রাজা বাহাদুর খেতাব দান করেন।

১১৯৫ বঙ্গাব্দের (১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দের) পৌষ মাসে কান্তবাবু পরলোকগমন করেন। তাঁর সমগ্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন রাজা লোকনাথ রায় বাহাদুর।

আঠার বৎসর কাল অর্থাৎ ১৮০৪ পর্যন্ত রাজা লোকনাথ রায় বাহাদুর এই বংশের প্রধান ছিলেন; কিন্তু এর অর্ধেক সময় তিনি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ অবস্থায় কাটান। তাঁর মৃত্যুকালে তার পুত্র হরিনাথের বয়স ছিল মাত্র এক বৎসর।

কুমার হরিনাথ সবালকত্ব প্রাপ্ত হন ১৮২০তে। ১৮৮৫এর ২৬ ফেব্রুয়ারী আর্ল অ্যামহার্সট একটি সনদ দ্বারা তাঁকে রাজা বাহাদুর পদবীতে ভূষিত করেন। স্বল্পায়ু রাজা হরিনাথের বহু বিশিষ্ট দানের মধ্যে আছে কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য ২০,০০০ টাকা দান এবং কাসিমবাজারে সংস্কৃত শিক্ষার প্রসারের জন্য উদারভাবে অর্থব্যয়। উল্লেখ্য যে, তাঁর সময়ে ওই অঞ্চলে সংস্কৃত শিক্ষার বিশেষ প্রসার ঘটে। ১২৩৯ বঙ্গাব্দের (১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে) অগ্রহায়ণ মাসে তাঁর মৃত্যু হয়, মৃত্যুকালে তিনি রেখে যান তাঁর একমাত্র পুত্র কিষেণনাথকে, তিনিই হন সমস্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী।

১৮৪০ (১২৪৭ বঙ্গাব্দ)-এ কুমার কিষেণনাথ সাবালকত্ব লাভ করেন; ১৮৪১-এ লর্ড অকল্যাণ্ডের শাসনকালে তাঁকে রাজা বাহাদুর খেতাব দ্বারা ভূষিত করা হয়।

তিনি বিশ্বাস করতেন যে, শিক্ষা সুচারু ও সঠিকভাবে পরিচালিত হলে এর

দ্বারাই দেশবাসীর নৈতিক ও অর্থনৈতিক মানের উন্নতি হবে এবং প্রাচীন ভারতের মতো নতুন ভারত আবার জ্ঞানের ক্ষেত্রে উন্নত স্থানের অধিকারী হতে পারবে; বয়সে তরুণ হলেও তিনি শিক্ষার একাগ্র ও উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠেছিলেন। স্বয়ং যেমন তিনি শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিটি আন্দোলনে অগ্রণীর ভূমিকায় থাকতেন, তেমনি শিক্ষা প্রসারে যারা সক্রিয় অংশ নিতেন তাঁদেরও তিনি মর্যাদা দানে পিছিয়ে থাকতেন না। ডেভিড হেয়ারের মৃত্যুতে শিক্ষিত দেশবাসার মনোভাব উপলব্ধি করে তিনি এই সমুন্নত মানবপ্রেমিক এবং ভারতীয় জনগণের মহান ও প্রকৃত বন্ধুর স্থায়ীভাবে স্মৃতিরক্ষার জন্য ব্যবস্থাগ্রহণের উদ্দেশ্যে কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজের থিয়েটারে একটি সভা আহ্বান করেন। ডেভিড হেয়ারের একটি মূর্তিস্থাপনের প্রস্তাবে তিনি সানন্দ সমর্থন জানান এবং এজন্য সংগৃহীত অর্থের বৃহত্তম অংশ আসে তারই প্রদত্ত চাঁদা থেকে। বয়সে তরুণ হওয়ায়, তাঁর জনহিতৈষণার কাজে যুক্তি অপেক্ষা ভাবপ্রবণতা থাকত অনেক অধিক; কিন্তু এ কথাও সত্য যে যাঁরা তাঁর কাজ করতেন বা তাঁর সৎ কাজে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করতেন, সুচিন্তিত ভাবেই তিনি তাঁদের গুণের মূল্য দিতেন। বাংলার হিন্দু সমাজের সম্ভ্রান্ত ও সুপরিচিত ব্যক্তি রাজা দিগম্বর মিত্র, সি এস আই-কে তিনি এক লক্ষ টাকা উপহার দিয়েছিলেন।

(মহারাণী) স্বর্ণময়ার স্বামা রাজা কিষেণনাথ রায়, বাহাদুর আত্মহননের পথ বেছে নেন। তিনি আত্মহত্যা করেন ১৮৪৪-এর ৩১ অক্টোবর। এই দুঃখজনক ঘটনার পর সরকার পরিবারটির সমগ্র সম্পত্তি অধিগ্রহণ করেন; 'স্ত্রীধন' ব্যতীত রাজা কিষেণনাথের পত্নী স্বর্ণময়ার আর কোন সম্পত্তি রইল না। স্বীয় সম্পত্তির সুপরিচালনা ও মিতব্যয়িতা দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করে তিনি স্বামীর সম্পত্তিতে স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে মোকদ্দমা করলেন। এই অবস্থাতেও বংশের মর্যাদা অনুযায়ী সংসারের ব্যয় নির্বাহ তাঁকে করতে হয়েছিল।

রাজা কাশীনাথের শেষ উইল অনুযায়ীই কোম্পানী উক্ত সম্পত্তি অধিকার করেছিলেন; কিন্তু সাক্ষ্যে প্রমাণিত হল যে, ইষ্টিপত্র সম্পাদনের সময় রাজা মানসিক দিক থেকে সুস্থ ছিলেন না; ফলে এই মামলায় মহারাণী জয়ী হলেন। সম্পত্তির পুনরুদ্ধার হলেও, কাসিমবাজার রাজ এস্টেটের অবস্থা তখন শোচনীয়; জমিদারীতে চলছে অরাজক অবস্থা; খাজনা আদায় নেই বললেই চলে; তার ওপর এস্টেটটি ঋণে ঋণে জর্জরিত। এই পরিস্থিতিতে স্বর্ণময়ী এস্টেটের পরিচালনার দায়িত্ব স্বহস্তে তুলে নিলেন; আন্তরিক ও নিঃস্বার্থ সহায়তা পেলেন দেওয়ান রাজীবলোচন রায় বাহাদুরের কাছ থেকে; জমিদারী-সংক্রান্ত সকল বিষয়ে রাজীবলোচন ছিলেন গভীর জ্ঞানের অধিকারী; চরিত্রও ছিল তাঁর নিষ্কলঙ্ক।

দুজনের মিলিত প্রচেষ্টা ও পরিচালনায় জমিদারীটি তার পূর্ব গৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল। এই জমিদারীর রায়তগণই বোধ হয় সব থেকে বেশী সন্তুষ্ট ও সুখী; তৎসত্ত্বেও জমিদারী থেকে যে আয় হতে থাকল, তার দ্বারা উচ্চতম ব্রিটিশ অভিজাতদের সমপর্যায়ে পরিবারটির মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর হল।

মহারানী স্বর্ণময়ী সি আই

মহারাণী স্বর্ণময়ী সি আই, ১২৩৪ বঙ্গাব্দের (১৮২৭ খ্রীস্টাব্দ) অগ্রহায়ণ মাসে বর্ধমান জেলার ভাটাকুলে জন্মগ্রহণ করেন; তাঁর বিবাহ হয় ১২৪৫ বঙ্গাব্দের (১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দ) বৈশাখ মাসে। তাঁর এস্টেটের মহালসমূহ ছড়িয়ে আছে বাংলার মুর্শিদাবাদ, রাজসাহী, পাবনা, দিনাজপুর, মালদহ, রংপুর, বগুড়া, ফরিদপুর, যশোহর, নদীয়া, বর্ধমান, হাওড়া ও ২৪ পরগণা জেলাসমূহে আর উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের গাজিয়াবাদ ও আজমগড় জেলা দুটিতে। কলকাতা ও তার উপকণ্ঠেও তাঁর বহু ভূসম্পত্তি আছে। রংপুর জেলার পরগণাবাহার বন্দর তাঁর এস্টেটের বৃহত্তম মহাল। যার থেকে ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্য স্থাপনের ইতিহাস শুরু হয় সেই পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রটি তাঁর নদীয়া জেলার জমিদারীর মধ্যেই অবস্থিত।

রাজশক্তির প্রতি তাঁর সশ্রদ্ধ আনুগত্য, জনগণের মঙ্গলের জন্য তাঁর গঠনমূলক কাজ ও প্রায় সীমাহীন দানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৮৭১এর ১০ অগস্ট তাঁকে 'মহারাণী' খেতাবে ভূষিত করা হয় (দ্রষ্টব্য, ঐ তারিখের কলকাতা গেজেট)। তাঁকে সনদদানের উদ্দেশ্যে ঐ বৎসর ১৩ অক্টোবর কাসিম বাজার রাজবাড়ীতে আহূত বিশেষ দরবারে সভাপতিত্ব করেন কমিশনার মিঃ মোলোনি।

তাঁর জনকল্যাণমূলক কার্যসমূহ, তাঁর দান ও মানবপ্রেম এতই প্রত্যক্ষ ও উল্লেখযোগ্য যে কলকাতার ইংলিশম্যান পত্রিকাটি তাঁকে ইংল্যাণ্ডের বর্তমান ব্যারোনেস বার্ডেট্ কুটের সঙ্গে তুলনা করেন।

১৮৭৪ এর দুর্ভিক্ষের সময় তিনি যেভাবে আর্ত জনগণের সেবা করেছিলেন তার স্বীকৃতিস্বরূপ এবং পূর্বাপর তাঁর অন্যান্য গুণের মূল্যায়ন করে ১৮৭৫এর ১২ মার্চ একটি ঘোষণা দ্বারা সরকারের এতাবৎকাল অনুসৃত প্রথানুগ রীতি শিথিল করে তাঁকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে, তাঁর ইচ্ছামত যে-কাউকে তিনি পোষ্য

নবেন তাঁকেই সরকার মহারাজা খেতাব দেবেন যাতে মানবসেবায় যে অক্লান্ত ধারা তিনি অনুসরণ করে চলেছেন, সেটি তাঁর অবর্তমানেও তাঁর উত্তরাধিকারিগণ যথোচিত মর্যাদার সঙ্গে পালন করতে পারেন। (দ্রষ্টব্য, কলিকাতা গেজেট)।

রাজকীয় সম্মানলাভের এটি সূচনামাত্র। ১৮৭৮এর জানুয়ারীতে (দ্রষ্টব্য, ইণ্ডিয়া গেজেট) ব্রিটিশ অভিজাতশ্রেণীর কয়েকজন মহিলার সঙ্গে তাঁকেও 'মেম্বার অব দি ইম্‌পিরিয়্যাল ক্রাউন অব ইণ্ডিয়া' করার জন্য মনোনয়নের প্রথম তালিকায় তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়; উল্লেখ্য যে খেতাবটিও ছিল নবসৃষ্ট। ঐ বৎসরই কাসিমবাজার রাজবাড়ীতে ১৪ অগস্ট অনুষ্ঠিত দরবারে প্রেসিডেন্সি কমিশনার মিঃ পীকক্‌ তাঁর হাতে রাজকীয় সম্মাননা পত্রটি তুলে দেন। বাংলার তিনিই একমাত্র মহিলা যাঁকে এই দুর্লভ সম্মান দ্বারা সম্মানিত করা হয়।

১৮৭৮ এর ২২ অগস্ট কলকাতার ইংলিশম্যান পত্রিকায় মিঃ পীককের এই অবসরে প্রদত্ত ভাষণের পূর্ণ বয়ান এবং উত্তরে মহারাণী স্বর্ণময়ীর প্রদত্ত ভাষণের সারাংশ প্রকাশিত হয়। এই ভাষণটি এখানে উদ্ধৃত হল :

মহামান্যা মহারাণীর রাজকীয় অনুগ্রহ ও শ্রদ্ধার প্রতীকস্বরূপ 'ইম্‌পিরিয়াল অর্ডার অব দি ক্রাউন অব ইণ্ডিয়া' সম্মাননাটি মহারাণীর নামে আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থেকে প্রদান করতে না পারার জন্য বাংলার মাননীয় লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্নর দুঃখ প্রকাশ করে আমাকে উক্ত কাজের জন্য প্রতিনিধি হিসাবে পাঠিয়েছেন।

আপনি যে সকল সময় ও বিবিধ প্রকারে মুক্ত হস্তে দান করে চলেছেন তার এবং আপনার জনহিতৈষণামূলক কার্যাবলীর স্বীকৃতি স্বরূপই এটি দেওয়া হচ্ছে। এই সভায় নিশ্চয়ই এমন অনেক ব্যক্তি উপস্থিত আছেন, যাঁরা আপনার সংকার্যসমূহ ও সুবিস্তৃত এস্টেটের সুপরিচালনা সম্পর্কে আমার চেয়ে অনেক বেশী ওয়াকিবহাল, কিন্তু এমন অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁরা আপনার দানশীলতার কথা শুনে থাকলেও তার ব্যাপ্তি ও পদ্ধতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল নন। এই জন্য আমার মনে হয় আপনার যে দানশীলতা ও ঔদার্যের জন্য মহারাণীর এই স্বীকৃতিমূলক সম্মাননা, তার কয়েকটির উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। পূর্বে আপনি বহুক্ষেত্রে যেভাবে দান করেছেন, এবং বর্তমানে দানশীলতার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তার কয়েকটির উল্লেখ করা আমার পক্ষে কঠিন হবে না। বস্তুতপক্ষে দীর্ঘ দানশীলতাই আপনার জীবন। বিগত কয়েক বৎসরের দৃষ্টান্তের মধ্যে আমি আমার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখব, কারণ আপনার দানের ক্ষেত্র ও পাত্র এত ব্যাপক এবং সংখ্যায় এত বেশী যে, সবগুলির উল্লেখ না করে নিদর্শনমূলক কয়েকটির মাত্র আমি এখানে উল্লেখ করছি।

১৮৭১-৭২-এ আপনি চট্টগ্রামের নাবিক-আবাসের জন্য দিয়েছেন ৩,০০০ টাকা, কলকাতার চাঁদনী হাসপাতালের জন্য ১,০০০ টাকা, যশোহরে ভৈরব নদের উন্নয়ন বাবদ ১,০০০ টাকা, মুর্শিদাবাদে ত্রাণকার্যের জন্য ১,০০০ টাকা।

১৮৭২-৭৩ এ আপনি দিয়েছেন বেথুন ফিমেল স্কুলকে ১,৫০০ টাকা, বগুড়া ইনস্‌টিটিউশনকে ৫০০ টাকা; নেটিভ হাসপাতালকে ৮,০০০ টাকা, সংক্রামক জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ত্রাণের জন্য ১,৫০০ টাকা এবং বহরমগঞ্জ রাস্তা নির্মাণের জন্য ১,০০০ টাকা।

১৮৭৪-৭৫ এ অন্যান্য দান ছাড়াও, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর, বগুডা, পাবনা, ২৪ পরগণা, নদীয়া ও বর্ধমানে দুঃস্থদের ত্রাণের জন্য আপনি এক লক্ষ দশ হাজার টাকা দান করেছেন।

পরবর্তী বৎসর আপনি দিয়েছেন, বহরমপুর কলেজকে ১০,০০০ টাকা, রাজসাহী মাদ্রাসাকে ৫,০০০ টাকা, কটক কলেজকে ৫,০০০ টাকা আর গারো পাহাড় ডিসপেনসারিকে ৫,০০০ টাকা।

১৮৭৬-৭৭-এ আপনি দিয়েছেন মিস মিলম্যান কর্তৃক স্থাপিত ক্যালকাটা ফিমেল স্কুলকে ১,০০০ টাকা; রংপুর হাই স্কুলকে ৪,০০০ টাকা; আলিগড় কলেজকে ১,০০০ টাকা; ক্যালকাটা জুওলজিক্যাল গার্ডেনকে ১৪,০০০ টাকা, কলকাতার অ্যাসোসিয়েশন অব ফেমিনকে ৮,০০০ টাকা; বাখরগঞ্জে সাইক্লোনে ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণের জন্য ৩,০০০ টাকা, গত বৎসর আপনি দিয়েছেন গরীবদের গরম কাপড় কেনার জন্য ১১,১২১ টাকা; জঙ্গিপুর ডিসপেনসারিকে ৫০০ টাকা, মাদ্রাজ দুর্ভিক্ষ ত্রাণনিধিতে ১০,০০০ টাকা, টেম্পল নেটিভ অ্যাসাই লামকে ১,০০০ টাকা, হাওড়া ডিসপেনসারিকে ৫০০ টাকা, ক্যালকাটা ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারীকে ৩,০০০ টাকা; নদীযা ও বাঁকুডায গৃহদাহে ক্ষতিগ্রস্ত-দের ত্রাণের জন্য ১,০০০ টাকা; ক্যালকাটা ডিস্‌ট্রিক্‌ট্‌-চ্যারিটেবল সোসাইটিকে ৫০০ টাকা; ম্যাক্‌ডোনাল্ড ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনকে ১,০০০ টাকা, পতিতাদের জন্য মিস ফিউড্যালের ইন্‌স্‌টিটিউশনকে ১,০০০ টাকা।

এ তালিকা হয়তো কিঞ্চিৎ দীর্ঘ তবু একে আপনার দানের পূর্ণ বিবরণ বলা যায় না। আমার বক্তব্য হল এ তালিকা আদৌ পূর্ণাঙ্গ নয়, কারণ, বিভিন্ন ব্যক্তির স্মৃতিরক্ষা প্রভৃতি উদ্দেশ্যে আপনার কাছ থেকে যে অজস্র চাঁদা নেওয়া হয়েছে, ইচ্ছাকৃত ভাবেই আমি এখানে সেগুলির উল্লেখ করলাম না।

উপরের তালিকাটি দীর্ঘ, তালিকাভুক্ত দানের পরিমাণ ২,০০,০০০ টাকা কিন্তু স্কুল, গ্রন্থাগার, ডিসপেন্‌সারী, দরিদ্র ও দুঃস্থদের ত্রাণবাবদ ঐ সময় আপনার দানের পরিমাণ তিন লক্ষ টাকারও অধিক; তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ঐ সময়কালে আপনি দান করেছেন সওয়া পাঁচ লাখ টাকারও অধিক। এই

অর্থ আপনার মোট আয়ের এক ষষ্ঠাংশের থেকে কম নয়। পরিমাণটি এমনিতেই পর্যাপ্ত; কিন্তু যে-ভাবে এই সকল দান দেওয়া হয়েছে সেটিই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এদেশে বিপুল পরিমাণ অর্থ হঠাৎ দান হিসাবে দিতে আমরা দেখেছি; সে সব দান যে সৎ ও প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্যেই দেওয়া হয়ে থাকে, এতেও কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু সে-সব দানের উদ্দেশ্য থাকে জনগণের মধ্যে দাতার নাম যশ হবে বা তিনি অন্য কোন ভাবে পুরস্কৃত হবেন। আপনার ক্ষেত্রে কিন্তু সে কথা বলা যায় না। প্রার্থী হয়ে কেউ আপনার কাছে এসে দাঁড়ালে, তবে আপনি দান করবেন, তা না করে আপনি চান, সাহায্যদানের উপযুক্ত ক্ষেত্র ও পাত্রের কথা আপনাকে জানান হোক; জানামাত্রই আপনি উদারভাবে দান করেন, বিনিময়ে কোন পুরস্কারই আপনি আশা করেন না। এককথায় জনগণের মঙ্গলসাধনের মহৎ ইচ্ছা থেকেই আপনার দান উৎসারিত হয়, আপনি ডান হাত দিয়ে দান করলে আপনার বাঁ হাত সে কথা জানতে পারে না। এ ধরনের দান অবশ্যই প্রশংসনীয়, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা এমন দান অ-সাধারণও। বাংলা ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশের কমপক্ষে দশটি জেলায় ছড়িয়ে থাকা আপনার বিস্তৃত জমিদারী আপনি যে কত সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন, সে সম্পর্কে আমার বলার কিছু নেই। তবু বলতেই হয় যে জমিদারী সংক্রান্ত ব্যাপারে আপনি যেমন সক্রিয় অংশ নেন এবং এর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয়ে যে গভীর জ্ঞানের পরিচয় দেন, এদেশে মহিলাদের মধ্যে তেমন সক্রিয়তা ও দক্ষতা তুলনাহীন না হলেও বিরল। আপনার সুদক্ষ পরামর্শদাতা বাবু রাজীবলোচন রায়ের সহায়তায় প্রজাদের বিন্দুমাত্রও হয়রান না করে আপনার ন্যায্য খাজনা আপনি সুচারুরূপে আদায় করতে পারায়, ইদানিংকালে অন্যান্য বহু জমিদার যে-ভাবে নানা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছেন, আপনাকে সেরকম কোন ঝঞ্ঝাটের সম্মুখীন হতে হয় না। আমার দিক থেকে একথা বলা বাহুল্য, আমার ওপর আজ যে কর্তব্য সম্পাদনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সেটি আমার পক্ষে অত্যন্ত আনন্দদায়ক। ২৪ পরগণার ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে এবং ঢাকার কমিশনার হিসাবে আমার প্রতিটি পরিকল্পনায় আপনার উদার ও অবাধ সহযোগিতার জন্য বহুবার আপনাকে ধন্যবাদ জানাবার অবকাশ আমার হয়েছে। ১৮৭৬ এর অক্টোবর বাখরগঞ্জ জেলার দক্ষিণাংশে মৃত্যু আর ধ্বংসের তাণ্ডব ঘটিয়ে যে দুর্যোগ বয়ে যায়, তার ফলে ঐ সমগ্র এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল আর্ত অভাবগ্রস্ত মানুষের হাহাকার, মানুষের সে দুঃসময়ে আপনি উদারভাবে আর্ত মানুষের সেবায় এগিয়ে এসেছিলেন, তার জন্য এই অবকাশে আপনাকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না। মহামান্যা সম্রাজ্ঞী কৃপাবশত যে সম্মানিত সাম্মানিক পদে আপনাকে নিয়োগ করলেন, তৎসংক্রান্ত অভিজ্ঞানপত্র এবং মাননীয় ভাইসরয় ও মান্যবর লেফটেন্যান্ট গভর্নরের

অভিনন্দনপত্র আপনাকে অর্পণ করে এবং যোগ্যতাবশে যে সম্মাননা আপনি অর্জন করলেন, দীর্ঘজীবী হয়ে সে সম্মান আপনি ভোগ করুন এই কামনা জানিয়ে, আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।'

উত্তরে মহারাণী অভিজাত মহিলার যোগ্য ভাষণ দেন। এই সম্মাননার জন্য তিনি মহামান্যা সম্রাজ্ঞীকে তাঁর রাজভক্তিমিশ্রিত কৃতজ্ঞতা বিনীতভাবে নিবেদন করেন; আশা প্রকাশ করেন, তাঁর প্রতি যে অনুগ্রহ মহামান্যা সম্রাজ্ঞী, মাননীয় ভাইসরয়, মান্যবর লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্নর এবং কমিশনার সাহেব থেকে সকল শ্রেণীর আধিকারিক এতদিন দেখিয়ে এসেছেন সে অনুগ্রহ ভবিষ্যতেও তাঁরা অক্ষুণ্ণ রাখবেন। পরিশেষে তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে, তিনি আদৌ ইংরেজী ভাষা না জানার জন্য, আর যে সকল ইওরোপীয় মহিলা কৃপাপরবশ হয়ে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেছেন, তাঁরা ভাল বাংলা না জানায়, ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁদের সঙ্গে খোলামেলা ভাবে মেলামেশা করতে পারলেন না।

দেখা যাচ্ছে, মিঃ পীকক্ ১৮৭৬-৭৭ পর্যন্ত মহারাণীর দানের যে হিসাব দিয়েছেন তার মোট পরিমাণ দাঁড়ায় এগার লক্ষ টাকা; কাজেই, এখন (১৮৮১) পর্যন্ত তাঁর দানের হিসাব ধরতে হলে নির্ভয়ে আরও কয়েক লক্ষ টাকা এর সঙ্গে যোগ করা যায়।

তাঁর ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান

প্রতি বৎসর মকর সংক্রান্তিতে তিনি অন্নমেরু উৎসব পালন করেন। এতে হাজার হাজার মণ চালের অন্ন, আর সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণ তরিতরকারী, ঘি, ডাল, চিনি, বিভিন্ন প্রকারের মিষ্টান্ন এবং তার পাশে বিপুল পরিমাণ বস্ত্র সাজিয়ে পূজা অনুষ্ঠানের পর ব্রাহ্মণ, ফকির এবং সকল সমাজ, সম্প্রদায় ও শ্রেণীর জনগণের, বিশেষত দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। অন্ন বিতরণের পর তিনি বাংলার সকল জেলার ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতগণকে শাল ও চাদর আর নাগা ফকিরগণকে শীত থেকে রক্ষা করবার জন্য কম্বল দান করেন।

মহাবিষুব সংক্রান্তিতে তিনি পিতলের ঘড়া এবং অন্ন ও বস্ত্র ব্রাহ্মণগণকে দান করেন। তাছাড়া, এই উপলক্ষে তিনি বহুসংখ্যক কাঙালী ভোজন করান।

দুর্গাপূজা উপলক্ষেও তিনি বাংলার সমস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবর্গকে মূল্যবান দান ও দক্ষিণা দেন; তার সঙ্গে থাকে ব্রাহ্মণ ও কাঙালী ভোজন। স্বগৃহের দুর্গাপূজা অনুষ্ঠানের জন্য যে-সকল ব্রাহ্মণ এই ধর্মপ্রাণা মহিলার অর্থসাহায্য প্রার্থনা করেন, তিনি তাঁদেরও যথোপযুক্ত অর্থসাহায্য দান করেন।

শ্যামা পূজা, দোল, ঝুলন, জন্মাষ্টমী, রথ প্রভৃতি অন্যান্য হিন্দু পূজাপার্বণ

উপলক্ষে তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। সারা রাজবাড়ী আলোকমালায় সাজিয়ে মহা ধুমধামের সঙ্গে তিনি শ্যামাপূজার অনুষ্ঠান করেন।

হিন্দু সমাজের প্রায় সকলেই জানেন, যাঁরা অর্থাভাবের কারণে কন্যার বিবাহ দিতে পারছেন না, স্বর্গত মাতাপিতার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করতে পারছেন না, বা পুত্রের উপনয়ন দিতে পারছেন না, মহারাণী স্বর্ণময়ীর কাছে প্রার্থনা জানালেই তাঁরা উপযুক্ত দান লাভ করেন। এমন দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই, যখন দেওয়ানী আদালতের রায়ে কোন ঋণগ্রস্তের ভদ্রাসন বা সম্পত্তি নীলাম হয়ে যাচ্ছে, সে ব্যক্তি তাঁর সাহায্যপ্রার্থী হলে তিনি অকৃপণভাবে তাকে ঋণমুক্ত করেন।

একথা বললে আদৌ অত্যুক্তি করা হবে না যে, প্রতিদিন তিনি যে-সব ভিখারীকে রান্না করা অন্নব্যঞ্জন বা চাল-দাল দান করেন, সংখ্যায় তারা প্রায় অগণিত।

শিক্ষাবিস্তারের জন্য তাঁর ব্যয়

শিক্ষা বিস্তারে তিনি বিশেষ উৎসাহী; এজন্য তিনি বেশ কয়েকজন অনাথ বালকের থাকা-খাওয়া, বই-খাতাসহ সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তাঁরই কৃপায় বেশ কিছু ছাত্র বহরমপুর কলেজে পড়ছেন। সংস্কৃত শিক্ষার উন্নয়নের জন্য তিনি বাংলার বিভিন্ন অংশে বহু টোলের সর্বপ্রকার ব্যয় বহন করেন। নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের মতো তিনিও সংস্কৃতে গভীর পাণ্ডিত্যসম্পন্ন মনীষীদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন। স্বদেশবাসীর মধ্যে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রসার যাতে ভালভাবে হয়, এই উদ্দেশ্যে তিনি সংস্কৃত পণ্ডিতগণকে উদারভাবে উৎসাহ দেন, তাঁদের পরিচালিত টোলগুলিকেও সর্বপ্রকারে সাহায্য করেন। সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষায় চারটি বৃত্তিদানের উদ্দেশ্যে তিনি ৮,০৫০ টাকার একটি নিধি স্থাপন করেছেন। মহারাণী নিজে বাঙলা ভাষায় পাণ্ডিত্যের অধিকারিণী হওয়ায় এই ভাষায় উপযুক্ত সাহিত্যিকদের তিনি উদারভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। বিভিন্ন বিষয়ে বাঙলায় ছোট ছোট পুস্তিকা রচয়িতাগণও তাঁর কাছ থেকে প্রচুর পারিতোষিক লাভ করেন। আর, ইংরাজী বা অন্য ভাষায়ও যাঁরা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাঁদেরও তিনি উপেক্ষা করেননি। শিক্ষাপ্রসারে উৎসাহ দানের জন্য তিনি বাঙলার প্রায় সকল বিদ্যালয়কে বার্ষিক ভাল পরিমাণ আর্থিক অনুদান ছাড়াও পুস্তক, পুরস্কার ও পদক দিয়ে সাহায্য করেন।

বহু সংখ্যক পুষ্করিণী ও কূপ তিনি খনন করিয়েছেন, কোথাও সংক্রামক ব্যাধি দেখা দিলে আর্তদের ত্রাণকার্যে তাঁর দান অবশ্যম্ভাবী; তাছাড়া, পথ বা পুল নির্মাণের জন্য বা ডিসপেনসারী, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য বেসরকারী

প্রতিষ্ঠানসমূহকে তিনি অকৃপণভাবে সাহায্য করেন।

জীবজন্তুর প্রতিও তাঁর মমতার শেষ নেই। কলকাতার চিড়িয়াখানাকে তিনি প্রচুর অর্থ দান হিসাবে দিয়েছেন; সরকারও তাঁর সম্মানে এখানকার একটি গৃহের নামকরণ করেছেন "মহারাণী স্বর্ণময়ী হাউস"।

দুঃখী, অভাবী, আর্ত মানুষের সেবায় তিনি যেভাবে অকাতরে দান করে চলেছেন এবং ধনী ও অভিজাত শ্রেণীর মানুষদের কাছে তিনি উচ্চ আদর্শ ও সৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন সে কথা স্মরণ করলে আপনা থেকেই মনে প্রার্থনা উৎসারিত হয় যে, ঈশ্বর তাঁকে দীর্ঘজীবী করুন যাতে তিনি আরও বহু বহু বৎসর মানুষের মঙ্গল সাধন করতে পারেন, স্বার্থপর, সহানুভূতিহীনদের যাতে তাঁর আদর্শ পরোপকারে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। মনে হয় তাঁর গভীর উপলব্ধি, স্বাভাবিক সৎ প্রকৃতি, ন্যায়-অন্যায় বোধ এবং আন্তরিক দানশীলতা তাঁকে আজকের অন্যান্য মানুষ অপেক্ষা অনেক ঊর্ধ্বে স্থাপন করেছে; তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই, বিশেষত এই দানশীল জাতির মধ্যেও তাঁর সদা প্রবাহিত দানশীলতা তুলনাবিহীন।

মহারাণী স্বর্ণময়ীর প্রকৃতি এতই স্বার্থলেশশূন্য ও সহানুভূতিপূর্ণ যে আর্তের আর্তিমোচনকেই তিনি তাঁর দানশীলতার সর্বোচ্চ পুরস্কারহিসাবে গণ্য করেন অন্য কোন পুরস্কারের প্রত্যাশা তিনি করেন না, উপকৃত তাঁর জয়ধ্বনি করুক, এও তাঁর কাম্য নয়। কিন্তু তাঁর মহৎ কর্মসমূহই তাঁকে জনসমক্ষে এনে দেয়; তাই ভয়ভীতিশূন্য, ক্লান্তিহীন বদান্যতা জনগণকে তাঁর কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছে; আগামী বহু যুগ, উপকৃতের সংখ্যার মতই সীমাহীনকাল পর্যন্ত লোকে তাঁকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবেন।

নিম্নোদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোকটি তাঁর সম্পর্কে যথা অর্থেই প্রযোজ্য :

দয়ালবশ্চ দাতারৌ রূপবন্তৌ জিতেন্দ্রিয়াঃ।
পরোপকারিণশ্চৈব তেৎপূর্বা মানবাঃ স্মৃতাঃ ॥

[দয়ালু, দাতা, রূপবান, জিতেন্দ্রিয় এবং পরোপকারী মানবদেব অপূর্ব মানবরূপে স্মরণ করা হয়।]

এই ভারতের বহু বিশিষ্টা মহিলা দেবতার উদ্দেশ্যে বহু ব্যয়ে বিরাট বিরাট দেবমন্দির নির্মাণ করেছেন, কিন্তু মহারাণী আরও বাস্তব ও মঙ্গলময় পন্থায় ঈশ্বর-সৃষ্ট আর্ত, পীড়িত ও অভাবগ্রস্তদের সেবায় বিরামবিরতিহীনভাবে দান করে চলেছেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে, মহারাণী তাঁর সম্পত্তিতে অধিকার পাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রায় রাজীবলোচন রায় বাহাদুর তাঁর দেওয়ান নিযুক্ত হন। ঢাকা জেলার তিল্লির এই মানুষটি দেশবাসীর মঙ্গলসাধনের জন্য মহারাণীর মহাব্রতের প্রকৃত

সহায়ক হবার জন্যই যেন সৃষ্ট হয়েছেন।

রাজীবলোচন রায়ের জীবন সম্পর্কে কিছু না লিখলে, মহারাণীর জীবনকথা অপূর্ণ থেকে যাবে। তাই আমরা তাঁর সম্পর্কেও একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেব।

রাজা রাজীবলোচন রায়, বাহাদুর

গুরুত্বে দ্বিতীয় হলেও রাজীবলোচন তাঁর নিয়োগকর্ত্রী মহারাণী স্বর্ণময়ীর মতই সুখ্যাত ও সুপরিচিত। তাঁর বাস্তব পরামর্শ, মহারাণীর পরোপকারবৃত্তির প্রতি তাঁর আন্তরিক সহানুভূতি ও সমর্থন, এবং মানুষ ও সংসার সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞানের সহায়তা না পেলে, দরিদ্র ও আর্ত্তদের দুঃখমোচনে মহারাণীর ব্যাপক পরিকল্পনা অত চমৎকারভাবে ও সাফল্যের সঙ্গে কার্যকর হতে পারত না। দেওয়ান রাজীবলোচন জন্মগ্রহণ করেন ঢাকার এক সম্রান্ত বনেদী পরিবারে।

মুসলমান শাসনকালে বাঙলার নবাব নাজিমের সরকারে চাকরী করবার সময় পীতাম্বর দত্ত 'রায়' পদবীতে ভূষিত হন। পদবীটি বংশানুক্রমিকভাবে ব্যবহারের অধিকার তিনি লাভ করেছিলেন। পীতাম্বর দত্ত ঢাকার তিল্লিতে অনেক সম্পত্তি করেন; তাঁর বংশধরগণের শাখাপ্রশাখায় সে সম্পত্তি ভাগ বাঁটোয়োরা হয়ে যায়। এই সকল পরিবার এখনও তিল্লিতে বসবাস করছেন।

মহারাণীর অধীনে চাকরী নেবার পর রাজীবলোচন ঢাকা ছেড়ে মুর্শিদাবাদ চলে আসেন। মুর্শিদাবাদের সৈদাবাদে তিনি বাস করছেন। তিল্লির পৈতৃক সম্পত্তির অংশ তো আছেই, তাছাড়া তিনি স্বোপার্জিত অর্থে, মুর্শিদাবাদ ও ২৪ পরগণা জেলায় ভূসম্পত্তির অধিকারী হয়েছেন।

সন ১২১৩ সালে ঢাকার তিল্লিতে রাজীবলোচন রায় বাহাদুরের জন্ম হয়। প্রথমত তিনি কাসিমবাজার রাজ এস্টেটের রঙ্গপুর জেলার মোক্তার নিযুক্ত হন, স্বামীর সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য সরকারের বিরুদ্ধে মহারাণীর মামলা চলাকালে, তিনি যে দক্ষতা, ঐকান্তিকতা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে এই মোকদ্দমায় মহারাণীকে সাহায্য করেন, যার ফলে মহারাণী স্বামীর সম্পত্তি পুনরুদ্ধারে সাফল্যলাভ

করেন, সেজন্য মহারাণী স্বয়ং তাঁকে স্বীয় দেওয়ানপদে নিযুক্ত করেন। গত ত্রিশ বৎসর তিনি মহারাণীর অধীনে এই পদে নিযুক্ত আছেন; এই দীর্ঘ সময় তিনি বিশেষ দক্ষতা ও সুবিবেচনার সঙ্গে তাঁর কর্তব্য পালন করেছেন, তার জন্য মহারাণীর স্বার্থ ও মর্যাদা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি তাঁর অগণিত প্রজাসাধারণও সন্তুষ্ট হয়েছে; প্রশংসা অর্জন করেছে বাঙলার জনগণের কাছ থেকেও। তাঁর কর্তব্যবোধ ও কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ সরকার তাঁকে ১৮৭১-এর ১০ অগস্ট "রায় বাহাদুর" পদবীতে ভূষিত করেন। (দ্রষ্টব্য, ক্যালকাটা গেজেট।) মাননীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ীকে 'দি অর্ডার অব দি ক্রাউন অব ইণ্ডিয়া' সম্মানে ভূষিত করবার জন্য অনুষ্ঠিত দরবারে কমিশনার মিঃ পীককও রায় রাজীবলোচন রায় বাহাদুরের সপ্রশংস উল্লেখ করেন।

দেওয়ান রাজীবলোচনের চাকরীসূত্রে প্রভূত অর্থ উপার্জনের সুযোগ থাকলেও, তিনি আজীবন থেকেছেন নিঃস্বার্থ সেবা ও আপনভোলা কর্তব্য-পালনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে। স্বার্থসিদ্ধিতে অনিচ্ছুক এই মানুষটি আপন সম্মানজনক দারিদ্র্যে সন্তুষ্ট, এটা তাঁর চরিত্রের নিষ্ক্রিয় দিক। কিন্তু যে পরোপকারবৃত্তি ও মানবহিতৈষণা মহারাণীর অস্তিত্বের মূলকথা, সেক্ষেত্রে কিন্তু রাজীবলোচন অত্যন্ত সক্রিয়, সৎ কাজে সহায়তা দানে তিনি সদা প্রস্তুত। মহারাণীর সীমাহীন দান খয়রাৎ হয় তাঁরই মাধ্যমে কিন্তু এ জন্য তিনি বিন্দুমাত্র প্রশংসা বা কৃতিত্ব দাবী করেন না, এমন কি মহারাণীর দানশীলতায় নিম্নতম কর্মচারীদের দুর্নীতি ও লোভ নিবারণের জন্য তাঁকে যে অত্যন্ত পরিশ্রম করতে হয়, তার জন্য তাঁর প্রাপ্য প্রশংসাটুকুও গ্রহণে তিনি অনিচ্ছুক। জমিদারী পরিচালনার ক্ষেত্রেও তিনি যে কত দক্ষ, তার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত হল কাসিমবাজার রাজ এস্টেটের বর্তমান সমুন্নত আর্থিক অবস্থা। তাঁর উচ্চাশাহীন চরিত্র না হলে এবং একান্ত বিনীত না হলে তিনি এদেশীয় জনগণের মধ্যে ধনী-মানী ব্যক্তিরূপে অক্লেশেই গণ্য হতে পারতেন।

বাংলা ও ফার্সী ভাষা ও সাহিত্যে তিনি সুপণ্ডিত হলেও, রাজীবলোচন কখনও অন্যান্য অনেকের মতো ইংরাজী ভাষা সাহিত্য এবং বিজ্ঞানে দক্ষতা অর্জন করে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে চান নি। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাঁর বিচারবুদ্ধি ও সুবিবেচনা প্রায় অভ্রান্ত, আর জমিদারী পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর দক্ষতা ও জ্ঞান অসাধারণ। নিষ্ঠাবান হিন্দু রাজীবলোচন জীবনযাপন করেন অত্যন্ত সাদাসিধা ভাবে; অন্যান্যদের তুলনায় তাঁর আপন অভাববোধ সামান্যই। নিজস্ব সংসার না থাকায়, সে দিকে তাঁকে আদৌ মনোনিবেশ করতে হয় না, তাঁর সমগ্র মন ও চিন্তা অধিকার করে আছে মহারাণীর স্বার্থ আর প্রজা-সাধারণের মঙ্গল। আবার তাঁর ব্যক্তিগত উপার্জনেরও বড় একটা অংশ তিনি

ব্যয় করেন মহারাণীর দান বহির্ভূত ক্ষেত্রে দান খয়রাতে। বিষয়কর্ম ও মানব-চরিত্র সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হওয়ায়, তিনি জনগণের মঙ্গলজনক কাজ ও দানের যোগ্য ব্যক্তি সম্পর্কে মহারাণীকে সঠিক পরামর্শ দেন। দান খয়রাতে মহারাণীর ব্যয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পেলেও রাজীবলোচনের সুপরিচালনায়, এস্টেটের আয়ও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। - এ জন্য তিনি আদৌ প্রজাপীড়ন করেন না। এই সকল কারণেই এবং অত্যন্ত যুক্তিযুক্তভাবেই তিনি দেশবাসীর অকুণ্ঠ প্রশংসা ও স্বীকৃতি লাভ করেছেন। তবে, যে কোন বিচার বিভাগীয় বা প্রশাসনের যে কোন উপ বা অবর আধিকারিককে যে রায় বাহাদুর খেতাব দেওয়া হয় সেই একই সাধারণ খেতাব রাজীবলোচনের ক্ষেত্রেও দেওয়া না হলে, এবং উচ্চতর কোন খেতাবে তাঁকে ভূষিত করলে তাঁর যোগ্যতা ও নিঃস্বার্থপরতার প্রতি অধিকতর সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

বাবু রামদাস সেন, জমিদার, বহরমপুর

দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত সেনের পৌত্র ও বাবু লালমোহন সেনের পুত্র বাবু রামদাস সেন বহরমপুরের একজন সম্ভ্রান্ত জমিদার। বর্তমানে এঁর বয়স ত্রিশ বৎসর মাত্র, জনসাধারণের মধ্যে ইনি "সাহিত্যিক জমিদার" নামে পরিচিত। বাস্তবে তিনি একজন পুরাতত্ত্ববিদ। ডাঃ এম মিচেলের বিদুষী পত্নী শ্রীমতী মারে মিচেল তাঁর 'ইন ইণ্ডিয়া' নামক ভ্রমণ বৃত্তান্তে বাবু রামদাস সম্পর্কে লিখেছেন :

"দেখলাম ইনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান, সুশিক্ষিত এবং একান্ত বিনয়ী মানুষ। এই তরুণ জমিদারের সঙ্গে ডাঃ মিচেলের মনোগ্রাহী আলোচনা হয়, তাঁর মতে বাবু রামদাস সেন সংস্কৃতে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী।"

তাঁর কবিতা ও সনেটের একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। ভারতের পুরাতত্ত্ব সম্পর্কে তিনি বঙ্গদর্শন পত্রিকায় বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রকাশিত এই সকল প্রবন্ধ "ঐতিহাসিক রহস্য" নামে পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। অনুমতি নিয়ে তিনি পুস্তকখানি ডাঃ ম্যাক্সমুলারকে উৎসর্গ করেন। লণ্ডনের ওরিয়েণ্ট্যাল কংগ্রেসে উক্ত মহাপণ্ডিত পুস্তকখানির বিশেষ প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে মিঃ বার্গেস 'অ্যান্টিকুইরি' নামক পত্রিকাখানি পরিচালনা করেছেন; এতে ত্রিবাঙ্কুরের মাননীয় রাজা বহরমপুরের

জমিদার রামদাস সেন, কাশীনাথ টি তেলাং, শেষাদ্রি শাস্ত্রী ও অপর কয়েকজনের মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে; প্রবন্ধগুলি ইওরোপীয় পণ্ডিতবর্গের নিকট একাধারে আকর্ষণীয় এবং শিক্ষাপ্রদ। পুস্তকখানি সম্পর্কে ক্যালকাটা রিভিউ মন্তব্য করেন, 'ভারতীয় ইতিবৃত্তের বিপুল কিন্তু অবিন্যস্ত উপকরণসমূহকে ইতিহাসাশ্রয়ী একটা রূপ দেবার মহৎ ও পরিশ্রমসাধ্য যে উদ্যম আমাদের দেশবাসীর মধ্যে দেখা যাচ্ছে, তারই এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হল এই "ঐতিহাসিক রহস্য" পুস্তকখানি। কয়েক খণ্ডে পুস্তকখানি সমাপ্ত হবে; এর দ্বিতীয় খণ্ডের মুদ্রণ চলছে এবং তৃতীয় খণ্ডটি প্রস্তুতির পথে। আধুনিক বৌদ্ধতাত্ত্বিক গবেষণা বিষয়ে বাবু রামদাস সেনের বক্তৃতা প্রসঙ্গে মন্তব্য করে 'ন্যাশন্যাল ম্যাগাজিন' লেখেন, "সফল পুরাতাত্ত্বিকের সকল গুণই বাবু রামদাস সেনের আছে।" সাহিত্য ও গবেষণাকার্যে লিপ্ত থাকা ছাড়াও, তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, এগ্রিকালচারাল অ্যাণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া, সাংসকৃট টেক্সট সোসাইটি অব লণ্ডন, অ্যাকাডেমিয়া ওরিয়েন্‌তল ফ্লোরেন্স প্রভৃতির সদস্য।

মুর্শিদাবাদ, ২৪ পরগণা, হুগলী, নদীয়া, দিনাজপুর, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলাতে তাঁর জমিদারী আছে। বহরমপুরে তাঁর একটি অতিথিশালা আছে, সেখানে প্রতিদিন বহুসংখ্যক দরিদ্রনারায়ণকে আহার্য দান করা হয়।